[illegible]यालय
भदैनी, [illegible]
वाराणसी-

1.2

राग अभिज्ञान

लेखक - सत्यकिङ्कर बन्दोपाध्याय

प्रकाशक :- सत्यकिङ्कर बन्दोपाध्याय

मुद्रण :- ज्योति प्रेस - बाँकुडा

बङ्गाब्द - 1376

बंगला

लय
ासी-५

রাগ-অভিজ্ঞান

ভূতপূর্ব পঞ্চকোট, নাটোর, লালগোলার মহারাজার এবং মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর
বাহাদুরের সভাগায়ক ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, আই, ও বি, মিউজিকের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক ; 'সঙ্গীত-মুকুর' 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ' 'সঙ্গীত ও
কাহিনী' 'বাংলাভাষায়-উচ্চাঙ্গ-খেয়াল', 'কবিতাশত'
প্রভৃতির গ্রন্থ রচয়িতা—

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—সঙ্গীত-শাস্ত্রী
কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রকাশক—
শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—
জ্যোতি-প্রেস—বাঁকুড়া।

প্রাপ্তিস্থান—
প্রকাশকের ঠিকানায়—
২৫/ই, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪
ফোন্ নং ৫৫-১৮১৮॥

আর, বি, দাস
৮/সি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১॥

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং বিধানসরণী, কলিকাতা-৬

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

মূল্য—কুড়ি টাকা।

নববর্ষ-সন ১৩৭৬
ইং ১৯৬৯-এপ্রিল

উৎসর্গ

যিনি একাধারে ছিলেন—বিশিষ্ট-শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতজ্ঞ, সুপণ্ডিত
এবং শ্রীমদ্ভাগ্‌বত ও পুরাণ পাঠক, সেই আমার
পরমপূজনীয় প্রপিতামহ ৺ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা
মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করলাম।

সেবক—
সত্যকিঙ্কর

জ্ঞাপন

শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের ঔপপত্তিক (Theoretical) বিষয়ক, রাগরূপপরিচয়, সঙ্গীতসম্বন্ধীয় বহুবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ নিয়ে বিস্তৃত আকারে একটি গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হলাম।

রাগরূপের সংগে প্রকৃতির স্বভাবগত কি সম্পর্ক আছে এবং অন্যান্য যেগুলি মানুষের ভাব-ধারায় সৃষ্টি হয়েছে,—সামগ্রিকভাবে তাদের সেই কারণ মুলক রূপকে গভীরভাবে মনঃসংযোগ দিয়ে দর্শন করতে করতে পরে তাদের গঠন তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়। এজন্য দর্শনের চিন্তা নিয়ে যখন তার সফলতা আসে তখনই ধরা দেয় বিজ্ঞান এবং পরে ব্যাকরণের বিষয়।

শাস্ত্রীয়গ্রন্থে রাগরূপের তত্ত্ব ও ব্যাকরণ ঘটিত যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে, তার মধ্যে অনেক বিষয়ের যথাযথ অর্থ ও বিশ্লেষণ সম্বলিত ভাষ্য খুঁজে না পাওয়ায় তার তথ্য হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তথাপি শাস্ত্রের ওই সমস্ত বিষয়বস্তুর যথাসম্ভব সহজ-সরল ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারার মত ব্যাখ্যার দ্বারা তার অর্থ নিরাকরণের জন্য আমাদের আগ্রহ রেখে যাওয়া সমীচীন বলে মনে করি। শাস্ত্রবর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও যদি আরো অনেক কিছু মূল্যবানবিষয় ধ্যান-চিন্তার দ্বারা আবিষ্কৃত হবার উপায় থাকে তাহলে সে দিকেও দৃষ্টিশক্তি নিয়োগ করে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য আছে। রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্র এত বিরাট যে তার সীমা নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য। তবুও যদি অপ্রতিহত উদ্যম রেখে চিন্তাশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায় তাহলে তার মধ্যে অনেক কিছু অনাবিষ্কৃত বস্তুরও সন্ধান পেয়ে যাওয়া আশ্চর্য্যের কিছু থাকবে না।

এই তথ্যানুসন্ধানের বিষয় নিয়ে বরাবরই আমার অন্তরে কে যেন উৎসাহ দিয়ে বলে এসেছে—রাগসঙ্গীতের বহুবিধ তত্ত্বানুসন্ধান যদি করতে চাও তাহলে গভীরভাবে ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ধ্যান-চিন্তার সহায়তায় ব্যবহারিক (Practical) ক্রিয়ার মাধ্যমে আজীবনই খুঁজতে থাক। অন্তরের এই আহ্বানকে সযতনে রক্ষা করে ওই সাধনার পথে চলতে চলতে দু'পাশের মন্দির মধ্যে স্বভাবসত্যের বস্তুসম্ভার নিয়ে রাগরূপ গঠনের নিয়ম প্রকৃতি যে ভাবে আমি দর্শন করে এসেছি এবং যাঁদের কৃপায় পেয়েছি তার প্রাণময় স্পর্শ, সেই তাকে নিয়েই আমি বাল্যকাল হতে সামর্থ্য তুলিতে করে আমার মানসপটে এঁকে আসছি।

যে সমস্ত রাগেররূপ আমার ধ্যান-দৃষ্টির সাহায্যে দর্শন লাভ হয়েছে তার প্রায় অধিকাংশই বহু প্রাচীন শিল্পীদেরই সৃষ্ট বলে ধারণায় আনতে পেরেছি এবং তারমধ্যে বহুরই বীজ যে প্রকৃতিদত্ত হয়ে উদ্ভুত তার বিশ্বাসও এসেছে অনেক অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

বিশেষ করে এই সমস্ত বিষয়ের তথ্য, আলোচনা ও নির্ণয় জ্ঞাপনই এই গ্রন্থ রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই গ্রন্থে বহুবিধ বিষয় বস্তুর সঙ্গে মোট একশত তিনটি রাগের রূপপরিচয় ও তার আলোচনা প্রদত্ত হ'ল।

সঙ্গীতের বিষয় নিয়ে কতকগুলি মূল্যবান প্রাচীন তথ্যের ইতিহাস ও নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বহু আগের যে যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তা এখন সাধারণভাবে দুষ্প্রাপ্য মনে হওয়ায় এই গ্রন্থের যোগ্য পরিসর মত উক্ত বিষয় বস্তুর কতকগুলি সংগ্রহ করে তৃতীয় অধ্যায়ে সংরক্ষিত হল—পুরাকালের সৃষ্টসামগ্রীর বিষয় সহজ সুযোগে এই গ্রন্থেই জানতে পারা যাবে এই উদ্দেশ্য রেখে। এই সঙ্গে নৃত্যকলার বিষয়ও কিছু উদ্ধৃত হল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ রাখি,—বাংলা ১৩৫৬ সালে অর্থাৎ আমার বয়স যখন পঞ্চাশের কাছাকাছি তখন আমার রচিত 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাতে প্রধানতঃ ক্রিয়াঙ্গের বিষয়, স্বরলিপিসহ ধ্রুপদ-খেয়ালাদির কতকগুলি গান এবং তৎসম্পর্কিত ঔপপত্তিক বিষয়ের বহুবিধ বস্তু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে আহরণ করে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধরে উপরোক্ত গ্রন্থের ঔপপত্তিক বিষয়গুলি কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত আকারে এই গ্রন্থে রক্ষিত হল।

গ্রন্থের শেষভাগে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় রাগসঙ্গীতের বিস্তার ও নীতিধারা কতকাল ধরে বিপুল প্রশস্ততায় প্রবাহিত হয়ে আসছে সে বিষয়ের ইতিহাস সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে লিপিবদ্ধ করলাম এবং কবি জয়দেব ও সঙ্গীতাচার্য্য লোচনপণ্ডিতের সঙ্গীত শিক্ষা ও জন্মবৃত্তান্ত বিষয় নিয়েও তার কিছু সম্ভাব্য সন্ধান পরিচয় উপস্থাপিত করেছি।

গ্রন্থের মুদ্রণ ও তার অন্য বিষয়ে যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে,—আমার সাধনা ও অনুধ্যানের দ্বারা এই গ্রন্থের রাগাদি ও মূল বিষয়বস্তু সমূহ যেভাবে আলোচিত ও উপস্থাপিত হল এবং শিক্ষা ও সাধনার জন্য আমার জ্ঞানমত সত্যের আদর্শকে ধরে তার যে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছনীতিধারাকে রক্ষার প্রচেষ্টা রাখলাম তা যদি যুক্তিবাদী পাঠকগণ সহৃদয়তার সংগে পাঠ ও সহানুভূতির সহিত হৃদয়ঙ্গম করেন তাহলে এর যথাযথ মূল্য নিরাকৃত হবে বলে ভরসা রাখি এবং তাহলেই শ্রম সার্থক মনে করব।

মুদ্রণ বিষয়ের ভুল-ভ্রান্তি যতগুলি দৃষ্টির মধ্যে এসেছে সেগুলি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হয়ে রইল। আরো যদি ভুল-ভ্রান্তি থেকে যায় তাহলে তা সংশোধন করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখলাম সহৃদয় পাঠকগণের উপর।

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

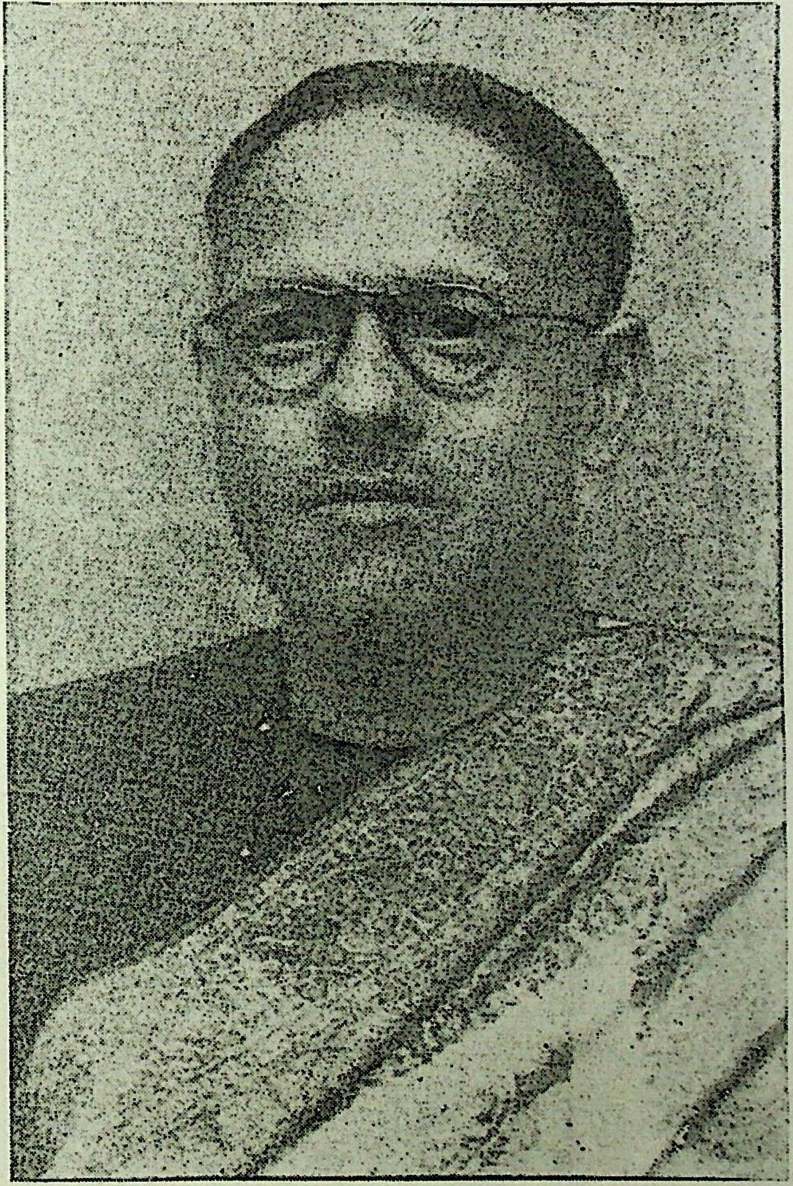

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগ-অভিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দু'টি প্রধান বিভাগ

শাস্ত্রমতে সঙ্গীত শিক্ষার দু'টি প্রধান বিভাগের নামকরণে আছে,—'ক্রিয়াসিদ্ধ' ও 'ঔপপত্তিক'। শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা কণ্ঠে বা স্বর প্রকাশক যন্ত্রের মাধ্যমে অতি উত্তমভাবে রাগাদি প্রকাশ করে উচ্চমার্গে উঠতে পারলে সেই সাধনাই হয় ক্রিয়াসিদ্ধ সাধনা, অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধিলাভ।

ঔপপত্তিকের অর্থ,—শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের রাগাদি নির্মাণ বিষয় এবং তার বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, রূপধর্ম ইত্যাদির ব্যবস্থাসমূহকে যথার্থভাবে সংরক্ষিত করে রাখার বস্তুকে 'ঔপপত্তিক' বলে। বিচার মতে ঔপপত্তিকের দুটি স্তর আছে, যথা— প্রথমটি উক্ত বিষয়ের উপর এবং দ্বিতীয়টি সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত গভীরতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকবাদ এবং বিজ্ঞানের গবেষণার বস্তু আছে তাকে অন্বেষণ ও উপলব্ধি করার বিষয় নিয়ে।

বয়সানুপাতে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধ বিষয়ক শিক্ষার প্রায় সময়কাল থেকেই ঔপপত্তিকের ওই প্রথম স্তরের বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে পাঠক্রমে রাখবার ও জানবার একান্ত আবশ্যক থাকে। অনেকের দেখেছি রাগরূপপ্রকাশে দক্ষতা এসেছে কিন্তু তার রূপাকৃতির গঠনের বিস্তারিত নীতি-নিয়ম কি, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই। এরূপ অভাব থাকা শিক্ষা ও সাধনার পরিচয়ের উপর খুবই ক্ষতিকর।

শাস্ত্রকারপণ্ডিতগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন,—শাস্ত্রীয়সঙ্গীতবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সেই বিদ্যাকে প্রকৃতভাবে আয়ত্তে আনতে হলে তার বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অর্থাৎ ঔপপত্তিক বিষয়ে জ্ঞান ও বিচারবোধ থাকা যে অত্যাবশ্যক সে কথা কোন বোধজ্ঞ চর্চারত ব্যক্তিকে বলার আবশ্যক করে না।

ক্রিয়াসিদ্ধ বিষয়ক এবং ঔপপত্তিক—এই দু'এর উপরই শাস্ত্রীয়সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং রাগ সঙ্গীতের শুধু শিল্পকেই ধরে থাকলে নিয়ম-নীতি ও তার সত্যসংরক্ষণের অভাব

হয়ে পড়বেই। এই অভাব শুধু শিক্ষার্থিদের মধ্যেই দেখা যায় না,—বহুকাল ধরে অর্থাৎ যবনযুগের এক সময় থেকে বহু গায়ক-বাদকদের মধ্যে দিয়েও বিশেষভাবে চলে আসছে—সঙ্গীত বিদ্যাকে একমাত্র শিল্পরূপেরই প্রতীক বলে মনে করে নেওয়ার জন্য। এই বিষয়ে এখন দৃষ্টি যে দেওয়া হচ্ছে না তা নয় তবে বহু ক্ষেত্রেই যথাযথ বিচারসম্মত নির্দ্ধারণের উপর এই বিষয়ের ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে 'ক্রিয়াসিদ্ধ' এই কথাটির নামের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতাগণ 'ক্রিয়াসিদ্ধ' এবং 'ঔপপত্তিক' এই দু'টি কথার প্রথমটির ইংরেজী অর্থে ব্যবহার করেছেন Practical এবং দ্বিতীয়টির অর্থে বলেছেন Theoretical। সাধনক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধিলাভকে প্র্যাক্‌টিক্যাল বলা সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় না। কারণ, Practical এই কথা শিক্ষা-সাধনার প্রারম্ভিক স্তর থেকেই তার ক্রিয়াঙ্গকেই বুঝায়; ক্রিয়াসিদ্ধ অর্থাৎ Perfection by Practical এই কথাকে বুঝায় না। সুতরাং কেবল Practical এই কথাটি ক্রিয়াসিদ্ধ এই সংজ্ঞা বিচারসহ নয়।*

স্বর

সামান্যত কণ্ঠোদ্গত ধ্বনিই স্বর নামে অভিহিত হয়, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বর শব্দে সুমিষ্ট স্বরকেই বুঝায়। যা স্বভাবতই শ্রোতার চিত্তরঞ্জন করে তাকেই স্বর বলে।

'স্ব' শব্দপূর্বক 'রঞ্জ' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয়ে—
স্বর-শব্দ নিষ্পন্ন। এই স্বর শব্দের অপভ্রংশ সুর।

শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থে লিখেছেন,—

“আত্মা বিবক্ষ মানোহয়ং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিঃত সোহথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরণ।
নাভিহৃৎকণ্ঠ—মূর্দ্ধাস্যেষ্বাবির্ভাবয়তি ধ্বনিম্ ॥

ব্যাখ্যা,—কথনেচ্ছু আত্মা দ্বারা প্রেরিত মন দেহস্থিত বহ্নিকে আহত করে। সেই বহ্নি পরিচালিত ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত বায়ু উর্দ্ধপথে সঞ্চারিত হয়ে যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক হয়ে বদনের মধ্য দিয়ে ধ্বনি উৎপাদন করে।

---

* আমার রচিত 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ' গ্রন্থের যেখানে 'ক্রিয়াসিদ্ধ' কথাকে **Practical** বলা হয়েছে তাকে **Perfection by Practical** বলে ধরে নিতে হবে।

এই নির্ণীত ব্যাখ্যার মধ্যে অনুভবশীল ব্যক্তির কাছে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। যখন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলি তখন হয়ত স্বরের উদ্ভাবনক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারা যায় না, কিন্তু যখন বিশেষ করে সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বর উৎপন্ন হতে থাকে তখন শ্লোকের অর্থ অতি সঙ্গতরূপেই প্রতীয়মান হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যাবিশারদরা বলেছেন,—কণ্ঠনালীর মুখগহ্বরে নিবদ্ধ স্বরোৎপাদক সূক্ষ্মতন্তু বহির্নিঃসারিত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা তৎপ্রান্তে আহত ও কম্পিত হয়ে ধ্বনি উৎপাদন করে। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় বায়ুর উৎপত্তি ও অবস্থান ধরে স্বরোৎপাদনের পূর্ণ নিয়মপ্রকরণ দেওয়া নেই। এজন্য যে মহানব্যক্তি নিজের সাধনালব্ধ যোগবলের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে ধ্বনি উৎপাদনের মূলতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা শ্লোকের মাধ্যমে দিয়েছেন তা পাশ্চাত্যের শরীরতত্ত্ব অবলম্বনে নির্দ্ধারিত স্থূল ব্যাখ্যা অপেক্ষা বাস্তব উপলব্ধিতে শ্রেষ্ঠতর। সহজভাবেও এ বিষয়ের সত্যতা অনেকখানি উপলব্ধি হবে—উদারার দিকে স্বর যখন নিম্ন ও উর্দ্ধগামী হতে থাকে তখন নাভির স্থানে কেমনভাবে বায়ুর প্রসারণ ও সঙ্কুচনের ক্রিয়া আসে এবং মুদারা সপ্তক যখন কণ্ঠে উত্থিত হতে থাকে তখন হৃদয়ের স্থানে বায়ুর ক্রিয়ার সাহায্য নেয়, তারপর তারাসপ্তকের উপর দিকে যখন কণ্ঠস্বর যেতে থাকে তখন তাকে মস্তকের বায়ুশক্তির ক্রিয়া সাহায্য নিতে হয়। কণ্ঠস্বরের এই সহজ প্রকাশের সময় ওই বিষয়ের যতখানি সত্য উপলব্ধি হয়, তদপেক্ষা আরো অধিক উপলব্ধিতে আসে যখন কণ্ঠে গুরু-গম্ভীরধ্বনি উৎপন্ন করা যায় এবং মীড়, গমক ইত্যাদি দ্বারা নানান জটিল প্রয়োগকৌশল শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রাণায়াম ক্রিয়ার মত আরোহণ-অবরোহণের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতে থাকে। মনঃস্থির করে দেখলে বিশেষ চর্চ্চারত প্রত্যেক ব্যক্তিই এর সত্যতা সহজেই স্বীকার করবেন।

স্বরের নামার্থ সম্বন্ধে —

'সা' সুরের ষড়জ নাম কেন হল তার অর্থ শাস্ত্রকাররা দিয়েছেন,—"ষট্‌যায়ন্তে যস্মাৎ"। এর অর্থ—যার উৎপত্তির শক্তি নিয়ে অন্য ছয়টি স্বরের উদ্ভব হয়ে বিভিন্ন উচ্চতায় সুরের রূপ প্রদান করেছে। ওই তিন অক্ষরের নামে আর একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যথা 'ষড়-জ', যার থেকে ছয়টি স্বরের জন্ম। অন্য ছয়টি স্বরের নামার্থ এইরূপ,—রীষভ মানে 'শোক' অর্থাৎ ঋষভ স্বরে করুণ রস পাওয়া যায়, এজন্য রীষভ নাম হয়েছে এবং তার থেকে বানানে রূপান্তরিত হয়ে ঋষভ বা ঋখব নামে প্রচলিত হয়ে আছে।

গান্ধার মানে ধীর। ভিন্নার্থে গন্ধ, ঘ্রাণ প্রবোধ ইত্যাদি। গান্ধার স্বরে ধীর ভাব পাওয়া যায়, এজন্য গান্ধার নাম হয়েছে। তাছাড়া শাস্ত্রকাররা বলেছেন, সুগন্ধে মন যেমন আন্দোলিত হয় তেমনি গান্ধার স্বরটি আনন্দ প্রদান করে। মধ্যম স্বরটি সপ্ত স্বরের মধ্যস্থানীয় বলে মধ্যম নাম দেওয়া হয়েছে। ষড়জ থেকে পঞ্চমস্বর পঞ্চমস্থানীয় - এজন্য তার পঞ্চম নাম। এই দুটি স্বরের মধ্যেও অপূর্ব্ব ভাবরস আছে। ধৈবত মানে, ধাব—দ্রুত অতিক্রমন, অর্থাৎ কামনার আকুলতা নিয়ে মনের বেগবান ভাব। ধৈবত স্বর প্রকাশ কালীন অবস্থায় মনে হয় যেন ওই রকম ইচ্ছা আছে—তার রাগের ভাবরূপ প্রকাশে এবং স্বরের পৃথক প্রকাশেও। নিষাদ মানে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ সরু, ধারাল। নিষাদের স্বররূপে এই ব্যাখ্যার বেশ মিল পাওয়া যায়। স্বরসমূহের নামের স্বরূপার্থ বুঝতে হলে প্রত্যেকটি সুরের মধ্যে ওই সমস্ত উদ্ভুত রসের প্রতি বিশেষভাবে যদি ধ্যান, চিন্তা ও অনুভব শক্তি নিয়োগ করা যায় তাহলে এর সত্য নিরাকৃত হবে।

শাস্ত্রকাররা যে সমস্ত বিষয় গভীরভাবে গবেষণা করে নিরাকরণ করে গেছেন, সেগুলিকে বুঝতে হলে আরো বেশী বিচার শক্তির আবশ্যক থাকবে। নির্দ্ধারিত বিষয়ের কোনটিকেই নিছক উপেক্ষা করা চলে না। সেরূপ মনে করলে আমি মনে করি নিজের বিচার শক্তির অভাব থাকে। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে যদি নিজের জ্ঞানলব্ধ বিচার বুদ্ধির দ্বারা মনে হয় সংশয় আছে তাহলে তার যথোপযুক্ত আলোচনাপূর্ব্বক গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার থাকবে; কারণ অভ্রান্ত কেউই নয়। তাছাড়া যুগের পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে চিন্তাশক্তির পরিবর্ত্তন আসে বর্দ্ধিত আকারেও॥

ষড়জের মূর্দ্ধণ্য'ষ' দন্ত'স' রূপে কেন লিখিত হল

ষড়জ শব্দটি 'স' বা 'সা' রূপে পরিচিত ও প্রচলিত, কিন্তু সুররূপে উচ্চারণ করতে তালব্য'শ'র উচ্চারণে আসে। কারণ 'ষ' এর উচ্চারণ আয়ত্ত কষ্ট এবং দ্রুত ও অবিরত প্রকাশের পক্ষেও অনুপযোগী। 'স' এর উচ্চারণও শ্রুতিকটু এবং দ্রুত উচ্চারণের পক্ষেও অসুবিধাজনক। এজন্য 'ষ' এর উচ্চারণে 'শ'ই সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে। ওষ্ঠ ও জিহ্বা এরাই পরস্পর মিলিত হয়ে পারে সুষ্ঠুভাবে মুহুর্মুহুঃ উচ্চারণ করতে।

'ষ' আর 'স' এর ব্যবহার প্রসঙ্গে ভাষা-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। দেখা গেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার 'ষ' মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষায় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পর হতে 'স' এ

পরিবর্ত্তিত হয়েছে। যেমন কৃষ্ণ শব্দটি মধ্যভারতীয় আর্য্য ভাষায় 'স' রূপে উচ্চারিত হত। যেমন-কিসন্। সঙ্গীতের প্রাচীন গ্রন্থে সাধুরূপ ষড়জের পাশে তৎকালীন গীতরূপে 'স' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা সাধুরূপের সঙ্গে কথ্য ও গীতরূপ 'স' কে উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই মনে হয়। গীত ও লিখিত রূপে এই 'স' স্থান পাওয়ায় পরবর্ত্তী যুগে ভারতের সর্ব্বত্রই 'স' টিকে গ্রহণ করা হয় এবং তখন থেকেই 'স' এর ব্যবহার চলে আসছে। তবে এই প্রসঙ্গে আমার মন্তব্যের একটা কথা আছে, ষড়জের 'ষ'কে দমের ক্রিয়ায় যথাস্থানে কণ্ঠে উৎপন্ন করলে দেখেছি তার ধ্বনিতে বেশ সুন্দর নাদগম্ভীররূপ প্রতীয়মান হয় এবং সেই স্বর নাভির স্থান হতে বক্ষে প্রশস্ত হয়ে কণ্ঠ দিয়ে যখন বহির্গমন হয় তখন বেশ ভাব মাধুর্য্য পাওয়া যায়, যেন মনে হয় ওঙ্কার ধ্বনির স্বরূপ অনুভব হচ্ছে। এই উপলব্ধির দ্বারা বিশ্বাসে আসে আগে সামগানে মুনি, ঋষিদের কণ্ঠে ষড়জের 'ষ' এর ধ্বনিরূপই প্রকাশ পেত।

স্বরোৎপত্তির সপ্তদ্বীপ

সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থে বলা হয়েছে লবণ, ইক্ষু, জম্বু ইত্যাদি সাতটি দ্বীপ থেকে সাতটি স্বরেরউৎপত্তি। আবার অন্য গ্রন্থের শ্লোকে আছে সাতটি প্রাণী হতে সাতটি স্বরের উৎপত্তি। যথা,—ময়ূরের স্বর হতে ষড়জ, বৃষ হতে ঋষভ, ছাগ হতে গান্ধার, ক্রৌঞ্চ হতে মধ্যম, কোকিল হতে পঞ্চম, ঘোটক হতে ধৈবত, মাতঙ্গ হতে নিষাদ।

পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ হতে সাতটি স্বরের উৎপত্তি কি করে হতে পারল সে সম্বন্ধে তার সত্য সম্ভাবনা নিয়ে কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরূপ আশ্চর্য্য কথা সম্ভব হতে পারে এ বিশ্বাস করার মত কোন যুক্তি বা কারণই নির্ণয় করতে পারিনি। এ বিষয় নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছিলাম। সর্ব্বদা ভাবতাম কেন তাঁরা এ কথা লিখলেন। পরে এক তান্ত্রিক যোগী মহাত্মার সংগে এক তীর্থস্থানে সাক্ষাৎ হয়। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে এই বিষয় জানাতে তিনি বললেন—"তন্ত্রোক্ত কথায় আছে স্বরনালীর সম্মুখভাগে স্বর কম্পনের ঝিল্লিসমূহের স্থানে জলাধারের মধ্যে রসযুক্ত হয়ে সাতটি কোষ (গ্ল্যাণ্ড) দ্বীপের মত হয়ে আছে এবং সেই জলবেষ্টিত বিভিন্ন রসের সপ্তকোষ বা সপ্তদ্বীপের উপর আহত হয়ে সপ্তস্বর নির্গত হয়' ইহাই ধ্যানযোগের প্রকরণে স্বরসংযোগ ব্রহ্মরন্ধ্রে, বক্ষে এবং ষটদলচক্রে আহত ও অনাহত হয়ে সুরব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।"

তাঁর ওই ব্যাখ্যা ওই বিষয়ের অর্থ নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে ধরেছিল। শাস্ত্রকারদের 'নিহিত গুহায়াং'কে এইভাবে অনেক কিছুর সন্ধান করে তার একটা সম্ভাব্য অর্থ করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাঁদের দেওয়া কোন বিষয়ে নিতান্ত সংশয় আসলে তার আলোচনা ও মতবাদ স্থাপন করারও প্রয়োজন আছে—সত্য উদ্‌ঘাটনের পথ প্রশস্ত করবার জন্য। সপ্তদ্বীপ হতে সপ্তস্বরের উৎপত্তি বিষয়ে আমার দেওয়া ওই অর্থই যে তাঁদের নির্দ্ধারণের সংগে মিলে যাবে প্রকৃত সমাধান নিয়ে এ কথা বলা শক্ত।

পরেরটির প্রাণীকণ্ঠ নিয়ে স্বরসৃষ্টির বিষয় আমার মনে কোন রকমেই বিশ্বাস আনতে পারেনি। কারণ ওই সাতটি প্রাণীকে একত্রে এনে পর পর তাদের কণ্ঠস্বর শুনে নিরাকরণ করা শুধু দুঃসাধ্যই নয় ওরূপ সম্ভব হওয়াও অসম্ভব বলে মনে করি। আর একটা কথা ওই সাতটি প্রাণী মনুষ্য কণ্ঠে কি করে স্বর সন্ধানের শিক্ষা দিতে পারল এবং তার মধ্যে এমনকি স্বভাবক্রিয়া থাকল তার বিষয়ে আমি বহু চিন্তা করেও এর সত্য নিরাকরণ করতে পারিনি। শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে—ময়ূরের স্বর হতে ষড়জ, (সা) এবং বৃষভের অর্থাৎ বৃষ'র কণ্ঠস্বর হ'তে ঋষভ (রে) সুরকে পাওয়া গেছে। আলোচনা করে দেখা যাক কি করেএ সম্ভব হল। ময়ূরের কেকা রব যে ভাবে উচ্চস্বরে নির্গত হয় তার থেকে বৃষের হাম্বারব বিরাট গাম্ভীর্য্য নিয়ে অনেক নিম্নে বহির্গত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ষড়জ ও ঋষভের উচ্চতার বিচার ধরে এর মূলে কোন সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া কেকারব একই ধ্বনি ধরে নির্গত হয় না এবং ওই সাতটি প্রাণীর কোনটির মধ্যেই তা নেই। প্রত্যেকেরই কণ্ঠের স্বর বিভিন্ন হয়ে নির্গত হয়। ময়ূরের কেকারবের শেষ রেষটুকুকে অনুভবে এনে যদি তাকে আন্দাজের উপর 'সা' ধরা যায় তাহলে সেই সুরেররূপকে অনুভব করে দেখা গেছে কোকিলের কণ্ঠের স্বর সেই 'সা' সুরের পঞ্চমের সংগে মিল নেই। বরং অনুধাবন করলে খানিকটা মনে হ'বে বহু বহু আগের যুগ হ'তে যে সাতটি স্বরসৃষ্টি হয়ে আছে তারই কয়েকটা স্বরের আভাস আসে। প্রথমে সা-রে-সা, তারপর যখন আবেগ নিয়ে ক্রমশ উপর দিকে কণ্ঠস্বর তুলতে থাকে তখন যেন মনে হয়—র-গ-র, গ-ম-গ, ম-প-ম, এই রকম স্বরের একপ্রকার ইঙ্গিত। যাইহোক এই স্বর সৃষ্টির অর্থের যদি কোন ভিন্ন তাৎপর্য্য থাকে তাহলে আলাদা কথা।

সপ্তস্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর প্রভাব সম্বন্ধে

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন সাতটি স্বরের প্রত্যেকটির এক একটিকারে দেবী বা দেবতা আছেন। যথা, ষড়জের—অগ্নি, ঋষভের—ব্রহ্মা, গান্ধারের—সরস্বতী, মধ্যমের—মহাদেব, পঞ্চমের—বিষ্ণু, ধৈবতের—গণেশ, এবং নিষাদের—সূর্য্য।

স্বরসমূহের উপর দেব-দেবীদের এই প্রভাব-প্রতিষ্ঠা কি তাৎপর্য্য ধরে তাঁরা নির্দ্ধারণ করেছেন—তার যথাযথ ব্যাখ্যা তাঁদের গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানিনা আমার অজানিত কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যথাযথ অর্থ দেওয়া আছে কি-না। যাইহোক,—আমি এই নির্দ্ধারণের তাৎপর্য্য যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি তাতে উক্ত বর্ণিত বিষয়ের উপর যে বিরাট সত্য আছে তাই বিশ্বাসে আসে। এ বিষয়ের আলোচনা বহু বিস্তৃতভাবে করবার আছে কিন্তু তাতে জটীলতা যদি বৃদ্ধি পায় সেই আশঙ্কা নিয়ে সহজ সংক্ষেপে বুঝানই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

ষড়জ স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নিকে কেন ধরা হল তার তাৎপর্য্যে বুঝা যায়:— রাগরূপের গঠনের উপর এবং সাতটি স্বরের সৃষ্টি মহিমায় ষড়জই প্রধান অর্থাৎ তাদের প্রাণ-শক্তি।

উত্তাপ অর্থাৎ অগ্নিশক্তি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না। তাই ষড়জের সেই শক্তির মূলে অগ্নি দেবতাকে স্থাপন করা হয়েছে।

ঋষভের শক্তি দেবতা ব্রহ্মাকে ধার্য্য করার মূলে যে তাৎপর্য্য আছে তাতে বুঝা যাচ্ছে, ষড়জের প্রাণশক্তি থেকে ঋষভ জন্মনিয়ে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেছে বহু শ্রুতি ও স্বর, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তার শক্তি দেবতা হয়েছেন। ঋষভের ধ্বনিটি যেন সৃষ্টি আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ বলে মনে হয়। যে কোন ঋষভ-প্রধান রাগে এই রকম সৃজনী ভাবের প্রকাশ আছে বলে বেশ অনুভব হয় এবং ব্রহ্মার মত ঋবিকল্প রূপের স্নিগ্ধতার স্পর্শ যেন ঋষভ স্বরের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়ে মনে মধুর তৃপ্তি আনয়ন করে। তারপর ষড়জের প্রাণবহ্নি নিয়ে ঋষভের মধ্যে দিয়ে যে সৃষ্টির সঞ্চার হল তাতে স্বভাবগত বুদ্ধির প্রয়োজন আসতে লাগল নানান ভাবে সুরের রূপ গঠনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সেই আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞানশক্তি সঞ্চারিত করতে লাগলেন জ্ঞানবুদ্ধি দায়িনী দেবীসরস্বতী গান্ধার স্বরকে আশ্রয় করে। তাই তিনি গান্ধারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন। তারপর এল সৃষ্টি মহিমায় সুরের উপর মঙ্গল মূর্ত্তির প্রভাব ও আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা যিনি পূরণ করলেন তিনি সেই মঙ্গলময় শিব অর্থাৎ মহাদেব মধ্যমের দেবতা রূপে। তাঁর দেবত্ব শক্তি ওই স্বরে প্রভাবিত হল। এরপর পঞ্চম স্বরের উপর আবির্ভূত হলেন 'বিষ্ণু' তাঁর ব্যাপ্তি শক্তি প্রকাশ করে। তারপর ধৈবতের ধাববান অর্থাৎ অগ্রগমন শক্তির আকর্ষণে সিদ্ধিদান কোরতে এলেন সিদ্ধিদাতা 'গণেশ'। তিনি থাকলেন সেই শক্তির আধার হয়ে। শেষে নিষাদে আলোকিত হল সূর্য্যের আলোক রশ্মি। সাতটি স্বরের শক্তি সমন্বয়ের উপর তাঁর সপ্তবর্ণের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে একত্রিত করল রঞ্জন কারিণী রশ্মির ধারা রূপে।

এই ব্যাখ্যা নিছক কল্পনা প্রসূত হয়ে আমার অন্তরে ধরা দেয়নি। সাধ্যমত গভীর ভাবে অনুধাবন করে যে সত্য আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি তাকে এই ব্যাখ্যায় বিশ্বাসের সাফল্যরূপ বলেই আমার মনে রেখাপাত করেছে। প্রত্যেক স্বরের উপর অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে সাধনা করলে এবং রাগরূপের বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে সপ্ত স্বরের বিভিন্ন প্রয়োগে এক এক স্বরের যে শক্তি মহিমা আছে, সেই শক্তির প্রভাব অতি সত্য বলে মনে হ'বে। একথাও আমি মনে করি—যাঁরা আরো বেশী আধ্যাত্মিক ভাব ধারায় সাধনমার্গে উঠতে পারবেন তাঁরা আরো অনেকবেশী শাস্ত্রীয় সংগীতের বহুবিধ বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, সংগীতবিদ্যা শুধু শিল্প বিদ্যাই নয়, আধ্যাত্মিক তপস্যারও বিদ্যা ॥

জাতি সম্বন্ধে

রাগ সমূহের উপর সপ্তস্বরের প্রয়োগনীতি ধরে এবং বর্জ্জিত স্বরের সংখ্যা নিয়মানুসারে তাদের মধ্যে তিনটি বিভাগ ধার্য্য করে জাতি গোষ্ঠীতে ফেলা হয়েছে: যথা, সাত স্বর বিশিষ্ট রাগগুলি সম্পূর্ণ জাতি, ছয় স্বর যুক্ত রাগগুলি 'ষাড়ব' জাতি, এবং পাঁচ স্বর বিশিষ্ট রাগগুলি 'ঔড়ব' জাতি নামে পরিচিত হ'য়েছে।

আবার কোন কোন রাগে এই প্রধান তিনটি জাতির মধ্যে কোন তু'টি যুক্ত হয়ে যে সকল রাগের আরোহণ—অবরোহণে স্বরের গতিবিধি নির্ণীত হয়েছে সেই সকল রাগকে মিশ্রজাতির রাগ বলা হয়। এস্থলে একটা প্রশ্ন আসতে পারে,—তাহ'লে মিশ্রজাতির রাগগুলি কি বর্ণশঙ্কর ? আমার বিচারে ওই গোষ্ঠীর সমস্ত বর্ণশঙ্কর নয়। কারণ অনেক রাগের শুধুমাত্র জাতির মিশ্রন নিয়ে মিশ্র হয়েছে। যেমন খাম্বাজ রাগের আরোহনে ঋষভ বর্জিত এবং অবরোহণে সাতটি স্বরেরই ব্যবহার আছে। এজন্য ওই রাগ ষাড়ব—সম্পুর্ণ জাতিতে পরিণত হয়েছে,—কিন্তু আরোহণের ষাড়ব জাতিত্বের ভিতর অন্য কোন রাগের সুর তাতে নেই এবং অবরোহণেও। সুতরাং বর্ণশঙ্কর নয়। তুটো বা তিনটে রাগের সুর মিশিয়ে যদি তার রূপ সৃষ্টি হত তাহ'লে সে বর্ণশঙ্করের পর্য্যায়ে পড়ত। আবার দেখা যাচ্ছে, সুরট রাগের আরোহণে গান্ধার, ধৈবত বর্জিত থাকায় তার মধ্যে যে সুরের রূপ এসে পড়ে, তা খাঁটি সারঙ্গ এর এবং অবরোহণের কোমল 'নি' দিয়ে সাতটি সুরের মধ্যে থাকে খাম্বাজের রূপ।

এই নির্দ্ধারণের উপর সন্দেহ রেখে কেউ যদি বলেন—সুরটের অবরোহণের সুরকে খাম্বাজের না বলে যদি বলি ওই সুর সুরটেরই তাহলে তা বলা কেন চলবে না ?

রাগ বিজ্ঞানের বিচারে এর উত্তর এই—আরোহণের সুর যদি তার নিজস্ব হত তাহ'লে তারপুর্ব্বে আরোহণে তার নিজস্ব সুরের প্রকাশ থাকত, কিন্তু তা তার মধ্যে নেই সারংরাগের সুর নিয়ে উঠেছে। সুতরাং উক্ত তু'টি রাগের স্বরগতির রূপ নিয়ে উঠানামায় বর্ণশঙ্কর অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রেণী করণের শালঙ্ক শ্রেণীর রাগ নামে পরিণত হ'য়েছে।

এই বিচার স্থলে শুধুমাত্র কোমল নিষাদ যুক্ত রাগগুলির স্বরগতির উপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে—খাম্বাজই তাদের মধ্যে আদি রাগ। কারণ সে তার রূপের উপর স্বয়ং সম্পুর্ণ এবং রাগ বিজ্ঞানের মধ্যে শুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

রাগের অন্তর্নিহিতরূপের প্রতি দৃষ্টি রেখে তার নীতি বিজ্ঞানকে স্বীকার করে একথাই বিশ্বাস করতে হ'বে যে, 'আলাইয়া'য়, 'কেদারা'য় মেঘ রাগে এবং ছায়ানটের মত রাগে কোমল নিষাদ ব্যবহার করা চলে না। তা করলে রাগবিজ্ঞানের নিয়মকে অস্বীকার করেই করা হবে। কারণ বিজ্ঞানসঙ্গতরূপে কোমলনিষাদযুক্ত রাগগুলির কোন প্রভাবই তাদের মধ্যে নেই,—কোমল নিষাদ ব্যবহার করলে তা অসতর্ক আকর্ষণ নিয়েই এসে পড়বে এবং তার সঙ্গে ইচ্ছাকৃত মনোভাবও থাকতে পারে। এই সব বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করবার আবশ্যক আছে এবং দায়িত্বও সমধিক। রাগের উপর মিশ্র জাতির বিষয় নিয়ে তু' একটা আরো উদাহরণ,—যেমন আড়ানা রাগ,—এর আরোহণের স্বররূপ সারংরাগ থেকে এবং অবরোহণের স্বরূপ কানাড়া রাগ থেকে নিয়ে তৈরী হয়েছে। সুতরাং একে বর্ণশঙ্কর বা শালঙ্ক শ্রেণীর রাগ বলা যাবে। আবার বেহাগ রাগ ঔড়ব-সম্পুর্ণ জতির রাগ কিন্তু সে তার নিজস্ব রূপের উপর স্বয়ংসম্পুর্ণ, কারণ আরোহণে অন্য কোন রাগের প্রভাবস্পর্শ নেই। অবরোহণে তুই মধ্যমের প্রয়োগে যে সুর উৎপন্ন হয় তাও তার নিজস্ব। এই সমস্ত বিজ্ঞান সম্মত সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে একটি

রাগে দেখা যায় নীতি নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। রাগটির নাম 'তিলককামোদ'। এই ষাড়ব সম্পুর্ণ রাগটির আরোহণের স্বররূপে অন্য কোন রাগের প্রভাবনেই, যেমন-স-র-গ-ম-প-ন-র্স-। কিন্তু অবরোহণের স্বররূপ খাঁটি খাম্বাজের। অথচ আরোহণ অবরোহণের মিশ্রিত স্বরপ্রয়োগ পদ্ধতিতে 'তিলোক' কামোদ রাগ সম্পুর্ণ পৃথক সত্ত্বার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত। একে বর্ণশঙ্কর বা শালঙ্ক শ্রেণীর রাগও বলা চলে না, আবার স্বয়ংসম্পুর্ণ ও নয়। এ এক নূতন তাৎপর্য্য সম্পন্ন রাগ। বিচারে জানা যাচ্ছে মিশ্রজাতির রাগগুলির বহু পরের সৃষ্টি। নিম্নে প্রধান ও মিশ্র নিয়ে নয়টি জাতির নাম দেওয়া হ'ল—

প্রধান	মিশ্র	মিশ্র
১। সম্পূর্ণ	৪। সম্পূর্ণ-ষাড়ব	৭। ষাড়ব-ঔড়ব
২। ষাড়ব	৫। সম্পূর্ণ-ঔড়ব	৮। ঔড়ব-সম্পূর্ণ
৩। ঔড়ব	৬। ষাড়ব-সম্পূর্ণ	৯। ঔড়ব-ষাড়ব

এই প্রসঙ্গে একটা কথা রাগের স্বরগতির উপর কারো কারো ধারণা কেবলমাত্র আরোহণের মধ্যেই রাগরূপের বিকাশ হয়, অবরোহণের স্বর রাগরূপ নির্ণয়ের সঠিক সহায়ক নয়। এরূপ ধারণা সমস্ত রাগের উপর মোটেই সঠিক নয়। যেমন আড়ানা রাগের আরোহণে শুধুমাত্র সারঙ্গ রাগের রূপ এবং কানাড়া রাগের স্বর সংযোজনার নীতি ধারায় অবরোহণের স্বরগুলি নেমে আসে। ওই দুটি রাগ যুক্ত হয়ে 'আড়ানা' নামে পৃথক রাগের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত বিষয় নিয়ে আরো অনেক উদাহরণ দেবার আছে। তারজন্য স্থান পরে রইল-প্রত্যেকটি রাগের পরিচয় জ্ঞাপনের স্থানে॥

ঔড়বের অর্থ

তিনটি জাতির মধ্যে ঔড়ব কথার সংযোজনা ও তার অর্থ রক্ষার জন্য বহুদূরের চিন্তার সন্ধান থেকে এসেছে ভারি সুন্দর ভাবে প্রথম দু'টির সঙ্গে তিন অক্ষরের মিলন ও যথাযথ অর্থের প্রয়োজনে।

সংগীত শাস্ত্রের মধ্যে ব্যবস্থাপক অনেক বিষয়ের কথার অর্থের দিকে খোঁজ রাখিনা, মুখস্তবুলির মত অনুসরণ করে চলি। যেমন' ঔড়ব' এর মানের উপর স্বর নির্দ্ধারণের অর্থটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত। জাতিগুলির ভাষাগত অর্থে সম্পুর্ণ জাতি সহজ বোধগম্য। ষাড়ব কথার অর্থও সহজে বুঝা যায়—যথা ছয়টি স্বরের মধ্যেই রাগের অবয়ব থাকে বলে তাই 'ষাড়ব' নাম হয়েছে। কিন্তু 'ঔড়ব' কথা পাঁচটি স্বরের উপর নির্মিত রাগের জন্য কেন ধার্য্য হল—তার ভাষাগত অর্থ কি আছে তা জানবার যেন আবশ্যক মনে হয় না।

সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যার যে শ্লোক আছে তা এইরূপ—

"বান্তি যান্ত্যড় বোহত্রেতি ব্যোমক্ত মুড়ুবং বুধৈঃ।
প্রঞ্চমং তচ্চভুতেষু পঞ্চসংখ্যা তদুদ্ভবা।
ঔড়বী সাহস্তি যেষাং চ স্বাবাস্তে ত্বৌড়ুবা মতাঃ॥"

এর ব্যাখ্যা, উড়ু শব্দের অর্থ নক্ষত্র এবং 'বা' ধাতুর অর্থ গতি। যেখানে নক্ষত্রগণ গমনাগমণ করেন সেই স্থানের নাম উড়ব অর্থাৎ ব্যোম। পঞ্চভুতের মধ্যে বিলোমক্রমে ব্যোম পঞ্চম ভুত। ওই থেকে পঞ্চম সংখ্যা বুঝাচ্ছে এবং যে রাগে পঞ্চস্বর মাত্র ব্যবহৃত হয় 'ঔড়ব' শব্দের অর্থে সেই রাগ প্রতিপন্ন হয়॥

প্রধান ও কড়ি কোমল স্বরের উপর নামের সম্বোধন—

সংগীত শাস্ত্রকারদের মধ্যে কেউ বলেছেন সাতটি শুদ্ধস্বর এবং বারটি বিকৃত স্বর। আবার অন্যে বলেছেন শুদ্ধস্বর সাতটি এবং বিকৃত স্বর পাঁচটি।

'সংগীত দামোদর' গ্রন্থে আছে,—"শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরাপ্রোক্তাঃ পঞ্চৈব বিকৃতাশ্চতে॥"

'সংগীত দর্পণ' গ্রন্থে আছে,—"ততঃ সপ্তস্বরাঃ শুদ্ধাঃ বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী॥" শাস্ত্রকারদের মধ্যে বিকৃতস্বরের সংখ্যা নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। যাইহোক আমার মতে যুক্তিযুক্তভাবে সহজ বিচারের উপর দিয়ে 'সংগীত দামোদর' গ্রন্থের উক্তিই ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উপযোগী।

সংগীতজ্ঞ সমাজের কাছে প্রধান পরিচিত হয়ে আসছে সাতটি প্রকৃতিগত সৃষ্টিস্বর এবং তাদের মধ্যে থেকে আরো পাঁচটি স্বরের উদ্ভব হয়েছে চারটি কোমল এবং একটি কড়ি স্বররূপে। বারটি বিকৃতস্বর কিভাবে নির্ণীত হল তা বিচারে সঠিক ধরা মুস্কিল। যদি তীব্র কোমল নিয়ে আরো চারটি স্বর সংযোগ করা যায় তাহলেও সংখ্যায় দাঁড়ায় নয়টি। আর তিনটি খুঁজতে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক বলে মনে করি। আর অতিকোমল ধরে যদি চারটি সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয় তাহলেও গণনায় আসে তেরটি। রাগ হিসেবেও কড়ি মধ্যমের শ্রুতির তারতম্য ধরা যায় না।

বিচার্য্য বিষয় নিয়ে এস্থলে একটা কথা,—যথাযথ নির্দ্ধারিত বারটি স্বরের সংখ্যাতত্ত্বে অতিকোমল ও তীব্রকোমল স্বর যোগকরার কোন প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাইনা। কারণ অধিকার লাভে ওই দুরূহ স্বরগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটেই সম্ভবযোগ্য নয়। ওগুলি রাগরূপের স্বভাব অনুভবের উপর যথেষ্ট শক্তিলাভের পর প্রয়োগের জ্ঞান বা অধিকার আসে। স্বররূপ প্রত্যেকটি শ্রুতিরই আছে কিন্তু তার মধ্যে প্রধান ও সহপ্রধানরূপে গ্রহণযোগ্য হয়ে আছে শিক্ষা সাধনার ক্ষেত্রে সাতটি আর পাঁচটি। বাকী অন্যগুলি শ্রুতির অনুভবের সূক্ষ্মতার মধ্যেই ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের স্থান থাকবে। আর যদি রাগরূপের উপর শ্রুতির প্রচ্ছন্ন ব্যবহার ধরে সেগুলিকেও গণনায় এনে স্বরের সংখ্যায় স্থান দিতে হয় তাহলে বাইশটি শ্রুতির মধ্যে সাতটি প্রধান স্বরের সাতটি শ্রুতি ছাড়া বাকী যে পঁনরটি শ্রুতি থাকে তাদের প্রত্যেকটিকেই স্বররূপে গণ্য করতে হয়। অর্থাৎ সঙ্গতরূপে তাহলে স্বর সংখ্যার সম্বোধনে দাঁড়ায়—সাতটি শুদ্ধ স্বর এবং পঁনরটি বিকৃত স্বর। নির্দ্ধারণে এই কথাই যুক্ত হওয়ার আবশ্যক থাকে॥

বিকৃত স্বর নামের বিপক্ষে যুক্তি—

শাস্ত্রকথিত কোন স্বরের নামকে বিকৃত স্বর বলে পরিচয় দেওয়া আমার কাছে যোগ্য বলে মনে হয় না। বিকৃত কথার অর্থ,— বি−কৃ+ক্ত=বি পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়। ভাবার্থ,—যে

বস্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যে রূপ থাকে তার ভিন্নরূপ অবস্থাকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিকৃত হল প্রকৃতির ভিন্নাবস্থা প্রাপ্তি।

আমরা সচরাচর বিকৃত বলতে যা বুঝি তা ভাল বস্তুর উপর ব্যবহার নিয়ে নয়, খারাপের উপরই বলা হয়। যেমন অমুকের মস্তিষ্ক বা আকৃতি বিকৃত অর্থাৎ খারাপ হয়ে গেছে ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাখ্যাকাররা বলেন—বিকৃত কথা ওই অর্থেও ব্যবহার হয় আবার দুগ্ধ হতে দধি কিংবা মৃত্তিকা হতে পুত্তলিকা, রূপের এই ভিন্নবস্থাকেও বিকৃতরূপে বলা যায়। যাই হোক্ এখন বিচার্য্য বিষয়, বিকৃত কথার সংগে কড়ি কোমল স্বরগুলির সম্পর্ক আছে কি-না। প্রথমতঃ দেখা যাচ্ছে খারাপ অর্থে তাদের ধরা চলে না। কারণ ওই স্বরগুলি শুধু সুললিত, সুন্দর ও রসময়ই নয়, রাগসংগীতের উপর তাদের প্রভাব মহিমা অনেক বড়। ওই স্বরগুলি উদ্ভাবিত না হলে রাগ সংগীতের রাজ্য এত বৃহৎ ও ব্যাপ্তিময় হত না। দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক অবস্থার ভিন্নরূপ অর্থেও ধরা চলে না। কারণ বিকৃত গান্ধারের নাম গান্ধারই থাকে—সে তার কোমলরূপ ধারণ কোরে মাত্র, অন্য কোন নামে সে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সব দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে বুঝলাম ওই পাঁচটি স্বরকে বিকৃত স্বর নামে ডাকা অনুচিত। এজন্য ওই পাঁচটির একটিকে কড়ি এবং অন্য চারটিকে কোমল, আর মূল সাতটিকে প্রধান স্বর—এই ভাবে নামের সম্বোধন রাখাই আমার মতে ন্যায় ও যুক্তি সম্মত। অনেকখানি সহজ অর্থে কড়ি-কোমলের পাঁচটিকে মধ্যস্বরও বলা যেতে পারে॥

ত্রিসপ্তকের নাম করণের ব্যাখ্যা

সংগীতে সুরের নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ নিয়ে পর পর সাতটি স্বরের গ্রন্থিমালাকে ত্রিসপ্তক নামে অভিহিত করা হয়েছে। সংগীত শাস্ত্রকারদের ভিন্ন ভিন্ন মতে ত্রিসপ্তকের নাম কেউ দিয়েছেন মন্দ্র, মধ্য, তার,—যথা—"তে-মন্দ্র-মধ্য-তারাখ্যা-স্থান ভেদাত্রিধা মতাঃ।" অর্থ—যে স্বর নিম্নমৃদু এবং গম্ভীর তাকে 'মন্দ্র', যে স্বর নিম্নও নয় এবং উচ্চও নয় তাকে 'মধ্য' এবং যে স্বর উচ্চ তাকে 'তার' এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বৈদিক মতে ত্রিসপ্তকের নাম এইরূপ,—অনুদাত্ত, স্বরিত এবং উদাত্ত। এর অর্থ নিয়ে আছে—নাভি হতে—'অনুদাত্ত', বক্ষস্থল হতে 'স্বরিত', এবং মস্তক হতে 'উদাত্ত'।

আমাদের পরিভাষায় 'উদারা', 'মুদারা' ও 'তারা'র অর্থ সম্বন্ধে স্বর নির্গমনের প্রকৃত পথ উপলব্ধি করে দেখা যাচ্ছে—কণ্ঠস্বরের নিম্নগামী মৃদুও গম্ভীর স্বর প্রকাশ করতে হলে—শ্বাসযন্ত্র হ'তে কণ্ঠনালীতে স্বর বায়ু নির্গত করবার সময় উদরের দিকে উক্ত বায়ুর প্রসারণ ও সঙ্কোচনের প্রয়োজন হয়, এজন্য ওই সপ্তকের নাম 'উদারা' হয়েছে—উদর নাম থেকে। 'মুদারা'র অর্থ,—মুখদ্বার, কথা থেকে চলিত ভাষায় মু-দার এবং পরে কথার মিলন সঙ্গতি রেখে শব্দটির অন্তে আকার যুক্ত হয়ে 'মুদারা'য় পরিণত হয়েছে। এই সপ্তকের স্বরগুলিপ্রায় স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে মুখদ্বার দিয়েই ধ্বনিত হয় বলেই সঙ্গতভাবে উক্ত নামকরণ হয়েছে।

'তারা'র অর্থ,—উচ্চ স্বরগুলি প্রকাশের সময় স্বরবায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়ে চক্ষুর পারিপার্শ্বিক স্থান সমূহে চাপের সৃষ্টি করে এবং যত বেশী উচ্চে উঠতে থাকে ততই চক্ষুরমণি অর্থাৎ তারার দিকে চাপ আরো বেশী পড়তে থাকে,—তার জন্যই 'তারা' নামকরণ হয়েছে।

ত্রিসপ্তকের উক্ত নামার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে যথাযথ লক্ষ্য রেখে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। এই ব্যাখ্যা ছাড়া ওই গুলির আর অন্য কি অর্থ থাকতে পারে তা খুঁজে পাওয়া গেল না। শাস্ত্রীয় সংগীতের সমস্ত কিছুর কথ্য ও সাধু ভাষার সম্ভাব্য এবং প্রকৃত অর্থ থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি· সুতরাং এই সব বিষয়ের গুরু দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া চলে না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এই সব বিষয়ের আলোচনাকালে তাঁর কাছ থেকে স্বকৃত ব্যাখ্যার সমর্থন পেয়েছিলাম॥

আরোহণ—অবরোহণ

কেউ কেউ স্বরের উঠানামাকে উক্ত নামে ব্যবহার না করে বলেন আরোহ—অবরোহ বা আরোহি—অবরোহি। আমার বিচারে স্বরের ওই অর্থ ধরে শেষোক্ত দুই প্রকার নামের মধ্যে অর্থ সঙ্গতির একান্ত অভাব আছে। যদিও কোন কোন ধ্রুপদগানে ওই কথাগুলির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তাই বলে অর্থের শুদ্ধাশুদ্ধের বিচারকে ভুলে গিয়ে ওই ডাক নামকে গ্রহণ করা চলে না। আরোহণ থেকে গানের ভাষার প্রয়োজনে আরোহ বা আরোহি কথার ব্যবহার হয়ত হয়ে পড়তে পারে। এবার কথার অর্থ ধরে তার বিচার করে দেখা যাচ্ছে—'আরোহ, মানে উচ্চতা, দৈর্ঘ, ভার। সুতরাং আরোহণ এবং আরোহ কথা এক নয়। অবরোহ বলে কোন কথা আমি অভিধানেও পাইনি: হিন্দীগানে শুদ্ধি ও অশুদ্ধির বিষয় নিয়ে এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা রাগরূপ রচনার উপরই পরিপূর্ণ আগ্রহ রাখি বলে উচিত অনুচিতের কথা উপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু বাক্যে এবং লিখিতভাবে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার-বোধকে উপেক্ষা করা যায় না। আরোহণ—অবরোহণ এবং আরোহি—অবরোহি, এই দুইএর অর্থ সম্পুর্ণ পৃথক। স্বরবোধজ্ঞ ব্যক্তিদের অজানা নয় যে, কোন স্বরেরই পৃথক সত্ত্বা নিয়ে উঠা-নামা করার ক্ষমতা নেই। বায়ুর দ্বারা স্বরনালীতে পরিমাপ মত চাপ সৃষ্টি করে স্বরের উঠা-নামা হতে থাকে। সুতরাং বায়ুর উপর স্বর নির্ভরশীল হলে সে নিজে কি করে উঠা-নামার অধিকার পেয়ে আরোহি—অবরোহি নামে আখ্যাত হবে? আরোহী মানে কোন বস্তুর উপর যে আরোহণ করতে পারে এবং অবরোহী মানে কোন বস্তুর উপর থেকে যে নেমে আসে। সুতরাং শুদ্ধ অর্থে স্বরের উঠা-নামাকে আরোহণ—অবরোহণই বলা বিধেয়। কারণ আগেই বলেছি বায়ুর উপর স্বর আরোহণ করে এবং বায়ুকে নির্ভর করে নামে। আরোহণ-অবরোহণ কথাই যে 'প্রকৃত অর্থ সঙ্গত কথা সে সম্বন্ধে মাতঙ্গদেবের গ্রন্থনিত শ্লোকেও পাওয়া যাচ্ছে মূর্চ্ছনার কথায় যথা,—"আরোহণাবরোহেণ ক্রমেয় স্বরসপ্তকম্। মূর্চ্ছনা শব্দবাচ্যং হি—বিজ্ঞেয়া তদ্বিচক্ষণৈঃ।"

রাগ ও রাগিণীর আলোচনা

খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত উত্তর ভারতের সংগীত শাস্ত্রের ঔপপত্তিক প্রাচীন গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীত রত্নাকর।' এর প্রণেতা শার্ঙ্গদেব। শার্ঙ্গদেবের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের লোচনপণ্ডিত কর্তৃক 'সঙ্গীত তরঙ্গ' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই গ্রন্থটির পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। এলাহাবাদের সন্নিকট স্থানে এই গ্রন্থটি উদ্ধার করেন দত্তাত্রেয় যোশী। বঙ্গদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থটি আমাদের কাছে এক বিরাট গৌরবের বস্তু। এই গ্রন্থে জাতি গোষ্ঠী নির্ণয়ের উপর বহু সংখ্যক রাগের নামও পাওয়া যায়। তবে সংগীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের নির্দ্ধারণ ও আলোচনার ক্ষেত্রে 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থটি সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়ে নিদর্শন স্বরূপের মত হয়ে আসছে।

রাগ কথার অর্থ সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত রত্নাকরে লিখেছেন—রঞ্জধাতু হ'তে রাগ কথার উৎপত্তি। রঞ্জধাতুর অর্থ রঞ্জন অর্থাৎ চিত্ত বিনোদন। "রঞ্জয়েতীতি রাগ" ইতি ভরতঃ অর্থাৎ যে সুরের রূপে স্বর সমূহ বর্ণ অলংকারে ভূষিত হয়ে মনুষ্যজাতির মনোরঞ্জন করতে পারে তাকে 'রাগ' বলে। স্বরের উপাদান বস্তু নিয়ে প্রকৃতিগত ও মনুষ্যদৃষ্টিগত যে সমস্ত রাগের রূপ উৎপন্ন হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি মূর্ত্তির জন্য পৃথক পৃথক নাম আছে। যেমন—আলাইয়া, খাম্বাজ, ইমন ইত্যাদি।

সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থ রচিত হবার বহুপরে অর্থাৎ এখন হ'তে প্রায় চারশত বৎসর পূর্ব্ব-পর হ'তে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কয়েকটি গ্রন্থে রাগ সমূহের নামকে পুরুষ এবং স্ত্রী, এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, কিন্তু তাদের অবয়বের মধ্যে লিঙ্গের কি পার্থক্য দেখে এবং স্বভাব ও প্রভাবগত ভিন্নতার উপর কি নির্ভর করে গ্রন্থকাররা রাগ সমূহকে স্ত্রী ও পুরুষ জাতিতে বিভক্ত করলেন সে সম্বন্ধে বিচার-যুক্তিসহ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপিত করা আছে—এরূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই নিরাকৃত ব্যবস্থার মধ্যে গ্রন্থকারদের পরস্পর মতের মিলও নেই। তাই মনে হয় যেন তাঁদের মনে যাঁদের যেরূপ ভাল লেগেছে সেই ভাবে লিঙ্গ ধার্য্য করেছেন। কোন গ্রন্থাকার বলেছেন,—ছয়টি পুরুষ রাগ এবং ছত্রিশটি রাগিণী। আবার আর এক গ্রন্থকার ধার্য্য করেছেন বাইশটি রাগ এবং বাকী সমস্ত রাগিণী। যে গ্রন্থাকার সুরের একটি রূপকে বলেছেন পুরুষ রাগ, তাকে অন্য গ্রন্থকার স্ত্রী জাতির রাগিণী বলেছেন। এই মতদ্বৈধের মধ্যে নিজের মতকে সুপ্রষ্ঠিত করার জন্য তেমন কোন যুক্তি উপস্থাপিত করেন নি।

হনুমন্ত মতে হিন্দোল রাগকে ছয়রাগের মধ্যে ধার্য্যকরে তাকে বসন্ত ঋতুতে ব্যবহারের জন্য স্থান দেওয়া হ'য়েছে। আবার ব্রহ্মার মতে ওই রাগকে বসন্তরাগের ভার্য্যা বলা হয়েছে। তাঁর শ্লোকের বর্ণনায় আছে,—"নিতম্বিনী সুন্দর গৌরগাত্রা, বীণাদধনা সুরপুষ্প গন্ধী। স্বর্ণপ্রভা শ্রীকমলায়তাক্ষী হিন্দোলকেয়ং কথিতা মুণীন্দ্রৈঃ।

আশ্চর্য্য লাগে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদের রাগরূপের লিঙ্গ নির্ণয়ে এত পার্থক্য কি করে আসতে পারে? হিন্দোল রাগের রূপ বহুকাল ধরে গুণীপরম্পরা একই ভাবে প্রচারিত হ'য়ে আসছে। সুতরাং লিঙ্গ

বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? হিন্দোল রাগের রূপভাবে যে স্বররস আছে তাতে বরং তাকে পুরুষ রাগ হিসেবে ধরা যেতে পারে, কিন্তু উক্ত শ্লোকের মধ্যে তার যে রূপভাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সংগে তার ওরকম স্বভাব ও আকৃতির কোন সন্ধান মিলে না। এই রাগ-রাগিণী নিরাকরণের বিচারে কোন বাস্তব যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। যাইহোক্ রাগ-রাগিণীর কথা যখন কয়েক শত বৎসর ধরে চলে আসছে তখন তার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দেখা যাক্—সত্যের কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় কি-না।

লিঙ্গবাচক শব্দের অক্ষরের দ্বারা রাগ ও রাগিণী নামের যে প্রভেদ আছে তার মধ্যে আছে শুধু নামের অক্ষরের উপর নির্ভর করে। যেমন কেদার রাগকে শাস্ত্রীয় গ্রন্থে 'কেদারী' নামে স্ত্রীলিঙ্গে ধার্য্য করা হয়েছে। ওই রাগের সুর কেদার বা কেদারী যে নামেই পরিচিত হোক না কেন তার রূপের অঙ্কণ চিত্র একই। সুতরাং অক্ষরের দ্বারা লিঙ্গ করণ অর্থ শূন্য। স্বভাবের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে স্ত্রীজাতির মধ্যে থাকে রূপলাবণ্য, কোমলতা, স্নিগ্ধরস এবং মধুর সরল ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ও প্রকাশ। এইসব গুণাবলীর প্রভাব অস্তিত্বের অনুভব স্পর্শ আছে ভেবে কেদার রাগকে স্ত্রী জাতিতে ফেলে 'কেদারী' বলে পরিচয় দেওয়ার মূলেও কোন তেমন সত্য নেই। কারণ ওর রূপ ও রসে ওই সব বস্তুর সমাবেশ আছে বলে বিচারের দিক দিয়ে অনুভব হয় না। বরং তুলনামূলক ভাবে কেদার নামই তার যোগ্য নাম বলে বিবেচিত হবে। ভুপালী রাগকেও স্ত্রীলিঙ্গের নামে ধরা ঠিক হয় না,—নামের সম্বোধনে তর্ক থাকলে 'ভূপাল' বলে ডাকাই উচিত হবে। কারণ তারও স্বররূপ স্ত্রীস্বভাব সুলভ বলা যায় না-লিঙ্গধার্য্যের নির্ণীত নিয়মের উপর। হনুমন্ত ও ব্রহ্মার মতে 'শ্রী'রাগকে পুরুষ রাগ ধরা হয়েছে। অথচ তার নামে আছে স্ত্রীলিঙ্গের পরিচয়। তাছাড়া বহুকাল হতে তার প্রচলিত ধারা যে রূপাকৃতিতে প্রবাহিত হয়ে আসছে একই ভাবে, তাতে তার স্বররূপ যে মোটেই পুরুষোচিত নয় সে কথা রাগজ্ঞ ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করবেন বলে মনে করি। আলোচনার খাতিরে শ্রীরাগের স্বররূপ বরং স্ত্রীসুলভ কমণীয়তা পূর্ণই বলা যায়। সুতরাং এই দিক দিয়ের বিচারেও কোন যুক্তি আছে বলে মনে করবার মত নয়।

এরপর রাগের গতিভঙ্গী নিয়ে দেখা যাক্ লিঙ্গপ্রভেদের স্বরূপ কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কি-না। কতকগুলি রাগের স্বররূপ সরলগতির দ্বারা উঠা-নামার উপরেই প্রকাশিত হয়, আবার কতকগুলি বক্রভাবে উঠা-নামার উপরই রাগের রূপ নির্ভর করে। এখন দেখা যাক যদি সরলগতির রাগগুলিকে পুরুষ এবং বক্রগতির রাগগুলিকে বলা হয় স্ত্রী জাতির রাগ, তা'হলেও তার মধ্যে বিতর্ক থেকেই যাবে, সমাধান কিছু হ'বে না। দরবারী কানড়া, কেদার, আড়ানা প্রভৃতি রাগগুলি বক্রগতির কিন্তু তাদের রূপভাব পুরুষোচিতই বলা চলে। বাগেশ্রী, তিলোককামোদ, খাম্বাজ, পিলু, সিন্ধু প্রভৃতি রাগগুলির স্বররূপ সরলগতির উপর প্রতিষ্ঠীত কিন্তু তাদের সুরের রূপে মধুর কমণীয়তাই বেশী। এরকম উদাহরণ আরো বহুর মধ্যেই পাওয়া যাবে সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই ব্যবস্থার মধ্যেও কোন নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া শক্ত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিশেষ কথা, রাগের রূপ প্রভাবের স্বভাব রীতি কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে চলবার উপায় নেই। সুরের রূপ নির্ভর করে আওয়াজের তারতম্য এবং সাধনা শক্তিতে ও গায়কী মেজাজের উপর। এমন গলার কণ্ঠস্বর নিয়ে পিলু বা তিলোককামোদের মত রাগ নিয়ে গাওয়া হতে পারে যার মধ্যে তখন থাকতে পারে রাগের পুরুষভাবকেও ছাড়িয়ে যাবার মত অবস্থা। এই রকম অবস্থার পরিচয়ের অভাব নেই। আর একটা উদাহরণ,—সুরবাহার বা স্বরোদ যন্ত্রে যে ধ্বনির শব্দ নিয়ে যে রাগ উৎপন্ন হবে সে রাগ ছোট বাঁশীতে সেই জোরাল ধ্বনির রূপ নিয়ে প্রকাশ হবে না। দরবারী কানাড়া এবং তোড়ীর মত রাগও বাঁশীর ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে ভিন্ন স্বাস্থ্যের আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। সুরের মূর্ত্তি আছে একথা খুবই স্বীকার্য্য কিন্তু শাস্ত্রীয় ওই সব গ্রন্থের শ্লোক বর্ণিত বিলাসাদির দৃশ্যরূপ নিয়ে তাদের ভাব মূর্ত্তির নিদর্শন থাকবে একথা আমার মতে স্বীকার্য্য নয়। রাগরূপের বিভিন্ন রস সৃষ্টি ও তার অনুভব ক্রিয়া সাধক শিল্পীর নিজস্ব ভাবের উপরই একমাত্র নির্ভর করে! এই লিঙ্গ নির্দ্ধারণের আর একটা বিষয় নিয়েও দেখা যাক্,—যদি বলা যায় প্রধান স্বরবিশিষ্ট রাগগুলি হোক্ পুরুষ জাতীয়, আর কোমল কড়ি যুক্ত রাগগুলিকে স্ত্রী জাতিত্বে ফেলা হোক্। তাহলেও এই ব্যবস্থার মধ্যে পৃথকীকরণের জন্য একটা সহজ বোধগম্য বস্তু পাওয়া গেলেও সমস্যার গ্রহণ যোগ্য সমাধান তেমন হবে না। কারণ তোড়ী, কানড়া' আড়ানা, মালকৌশ, বাহার, শুদ্ধ বসন্ত, ভৈরব প্রভৃতি রাগগুলিকে কি স্ত্রীজাতিররাগ বলে স্বীকার করতে পারা যাবে? তাছাড়া এই ব্যবস্থাকে মানতে গেলে শুধু প্রধান স্বর বিশিষ্ট রাগ কয়টিই বা পাওয়া যাবে? কারণ আজকাল দেখতে পাচ্ছি—প্রধান স্বর বিশিষ্ট অকৃত্রিম রাগের উপরও কোমল স্বর ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন ছায়ানটে, মেঘরাগে, সারঙ্গরাগে, আলহইয়ায় কোমল নিষাদ। বিভাসের চেহারা তো কোমল দিয়ে এক বিরাট পরিবর্ত্তনের উপর আঁকা হয়েইছে। বাকী আছে কোমল প্রয়োগ হতে এখন মাত্র মল্লার, দুর্গা, ভুপালী, এই রকম দু'চারটিই। তাও বোধ হয় এদের মধ্যে যদি নিষাদ স্বর থাকত তা'হলে কোমল নিষাদ হয়ত জায়গা করে নিত। মল্লারে নিষাদ স্বর খুব কম ব্যবহার হয় বলে তাকেও ধরা হল। এই সব সংখ্যার হিসেব ধরলে প্রায় সবগুলিই নামের ডাকে রাগিণী অর্থাৎ স্ত্রীজাতিত্বের পর্য্যায়ে এসে যাচ্ছে। পুরুষ জাতির রাগ অতি সংখ্যা লঘুর মত দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং এই ব্যবস্থাও কার্য্যকরী হচ্ছেনা।

গ্রন্থকারদের রাগ রাগিণীর ব্যবস্থা যদি নাট্যকলার প্রয়োজন নিয়েই হয়েছিল বলে মনে করা যায় তাহলে এর মধ্যে উপকারিতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ ছয়রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ইত্যাদিকে কণ্ঠে ও যন্ত্রে আয়ত্ত করে রাগ-রাগিণীর শ্লোক বর্ণিত রূপকে অনুসরণ করে প্রয়োজন মতে নট ও নটীর দ্বারা সেই ভাবকে ধরে অভিনয়ের দ্বারা এবং কণ্ঠে ও বাদ্য যন্ত্রে, সেই সেই রাগ প্রকাশ করে দেখাতে পারলে অবশ্য জনসাধারণ এই বিদ্যার বিস্ময়কর সৃষ্টির উপর অতি সহজে আকৃষ্ট হতে পারে। রাগ-রাগিণীর তাৎপর্য্য এই ভাবে ধরে নিলে দর্শনের মধ্য দিয়ে এর কার্য্যকারিতা যথেষ্ট আছে বলে মনে করি। তাছাড়া কল্পনার এই সব চিত্রাঙ্কিতরূপ সংগীত কলাভবনের দর্শনীয় বস্তুরূপে গৃহীত হয়ে মনকে আকৃষ্ট ক'রবে।

সংগীত বিদ্যার বাস্তবকার্য্যক্ষেত্রে 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থে রাগ সম্বন্ধে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তাকেই আমি যথার্থ গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করি। অবশ্য আজকাল প্রায় সকলেই সুরের রূপকে 'রাগ' নামেই অভিহিত করছেন। তবে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক আছে বুঝেই যথাযথ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করলাম। আমার বিশেষভাবে ধারণা ছিল শার্ঙ্গদেব রাগ-রাগিণীর নাম তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থে স্বীকার করেনি। এই আলোচনার পর হঠাৎ একদিন নজরে পড়তে দেখি তিনিও 'হনুমন্ত' মতের রাগরূপ স্বীকার করে ছয়রাগের নাম দিয়েছেন ;—যথা—

"ভৈরবো মালকৌশশ্চ হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়তে পুরুষাঃ স্মৃতাঃ।"

তাহলে দেখছি শার্ঙ্গদেবের প্রথম ব্যাখ্যার সংগেই আমার বিচার যুক্তির উপর আলোচনার বাস্তব যোগাযোগ থাকছে। উক্ত গ্রন্থের পরে রাগ-রাগিণী কথার সৃষ্টি হয়েছিল একথা লেখাও তাহলে বাতিল রূপে গণ্য হবে।

বাদী—সংবাদীর বিষয়—

(ক) রাগরূপের উপর বাদী-সংবাদী ধার্য্য করা নিয়ে বেশ খানিকটা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা ও নির্দ্ধারণ চিন্তার যথাযথ অভাব আছে। কিছু সংখ্যক খেয়াল গানের এবং কোন দু'একটা ধ্রুপদ গানের সমের উপর যে স্বরকে পাওয়া যায় তাকেই রাগের রূপ প্রদানকারী প্রধান ও শক্তিশালী স্বরভেবে বাদীত্বের অধিকার দিয়ে ফেলা হয়। মনে করা হয় সমের স্বরই বাদীর স্বর। রাগরূপের বাদী নির্ণয়ের জন্য সঙ্গত নিয়মে বিশেষ করে প্রাচীন বহু ধ্রুপদ গানের উপর যথেষ্ঠ পরিচয় থাকার আবশ্যক আছে। যদি শুধু খেয়াল গানের উপর অধিকার নিয়ে বাদী নির্ণয় করতে যাওয়া যায় তাহলে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। তাছাড়া প্রকৃষ্টভাবে এর নির্দ্ধারণ নিরাকরণের জন্য রাগরূপের স্বভাবগত ও প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রভাবের তাৎপর্য্যের উপর চিন্তাশক্তি রেখে তার প্রকৃততত্ত্ব উপলব্ধি করে তারপর বিজ্ঞানতথ্যে কি আছে তা দেখার আবশ্যক আছে। অর্থাৎ রাগরূপের মূর্ত্তিকে ধ্যানগত করে হৃদয়ের অন্তঃপুরে অধিষ্ঠিত করতে পারলে তবে এর সত্য নিরাকৃত হ'বে।

এই বিষয় সম্বন্ধে তার নীতি-নিয়ম ও বিজ্ঞান কি বলে তা আলোচনার মাধ্যমে আসা যাক্। প্রথমতঃ বাদী কথা এসেছে 'বদ' ধাতু থেকে। 'বদ' ধাতুর অর্থ বলা। যার বলবার শক্তি আছে তাকে বাদী বলে। সংগীতের স্থলে রাগের মধ্যে গুরুত্ব নিয়ে যে স্বরটির পুণঃপুণঃ প্রকাশ হয় বা প্রকাশ করবার দায়িত্ব থাকে তাকে বক্তার সমগুরুত্বে 'বাদী' নাম দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রীয় গ্রন্থে রাগকে একটি দেশরূপে কল্পনা করে বাদীকে তার রাজাস্বর বলে বর্ণনা আছে। যথা—

"স্বামিবদ্বদনাদ্বাদী স রাগ প্রতিপাদকঃ। বাদিনা সহ-সংবাদাৎ সম্বাদী মন্ত্রী তুল্যকঃ॥
মুখে তস্যানুবদনাদনুবাদীচ ভৃত্যবৎ। তথা বিবাদান্তে নৈব বিবাদী বৈরবদ্ভবেৎ॥"

(সঙ্গীত-রত্নাবলী)

এবার সবিশেষ ব্যাখ্যায় আসা যাক্—প্রথমতঃ রাগের রূপগঠন হয় যে যে বস্তুদ্বারা তার মধ্যে থাকে দুটি প্রধান উপাদান। একটি হল স্বরসংযোগ, অপরটি হল স্বরের গতিবিধি। ওই দু'টির সংযুক্ত ক্রিয়ার মধ্যে যে স্বরটি রাগরূপ প্রকাশে এবং বিশুদ্ধ পরিচয়ে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং যথাস্থানের কেন্দ্রের মধ্যে থেকে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক স্বরকে পরিচালিত করতে পারে সেই স্বরই হবে 'বাদী' স্বর।

মুদারা সপ্তকই সঙ্গীতের মূল সপ্তক,—তার ষড়জ স্বর বীজ স্বরূপ। তার উপর 'তারা'র ষড়জ স্বর পর্য্যন্ত যে স্বরগুলি নিয়ে সপ্তক সৃষ্টি হয়েছে তাকে দু'টি বিভাগে ধরে দুটি অঙ্গ নির্ণীত হয়ে আছে। এই দুটি অঙ্গের নাম পূর্ব্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ। সা-রে-গা-মা, পূর্ব্বাঙ্গ এবং পা-ধা-নি-সা উত্তরাঙ্গ। মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যস্থলটি সন্ধিযুক্তর মত। অর্থাৎ যেন গ্রন্থিবন্ধনের স্থান। কড়ি মধ্যম স্বরটি সেই সন্ধির মধ্যস্থলে থেকে যেন ওই দুটি অঙ্গকে যুক্ত করে রেখেছে। এই নির্ণয়ের উপর রাগরূপের গঠন প্রণালী নির্ভর ক'রে যে ভাবে তার অঙ্কণ নীতি ধারার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে বিজ্ঞানও যথাযথ ভাবে যুক্ত হ'য়ে আছে॥

(খ) রাগরূপের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্মত 'বাদী' স্বরের নির্দ্ধারণ—

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে মুদারার ষড়জ স্বর সমস্ত স্বরের মূলাধার। এই স্বরের নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ পূর্ব্বাঙ্গের স্বরগুলির ক্রিয়াপ্রকরণের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে যে যে রাগের রূপ অঙ্কিত হতে পারে এবং সেই স্থানের অঙ্কিত রূপের মধ্যে যদি তার মূর্ত্তি প্রকৃতভাবে রক্ষা পাবার উপায় থাকে তাহলে ওই ক্ষেত্রাঙ্গের উপরই তার বাদীস্বর ধার্য্য হবে। রাগরূপের মুখাবয়ব সদৃশ সেই ধার্য্য স্বরটিকে চিনে নিতে অঙ্কণ দক্ষতা সম্পন্নবোধজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে কোন অসুবিধে হয় না এবং ভুল ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনাও থাকে না।

গ) রাগরূপ গঠনে বাদী নির্ণয়ের উপর প্রধান স্বরের প্রভাব সম্বন্ধীয় একটি বিজ্ঞান সম্মত বিচারের কথা,—কোন রাগরূপের উপর যদি মাত্র একটি প্রধান স্বরেরও গমনাগমনে বিশেষ আধিপত্য থাকে তাহলে সেই রাগে কোমল স্বরসংখ্যায় অধিক থাকলেও ওই প্রধান অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বরটিই রাগের উপর বাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই নিয়মকে মনে হয় যেন কারো দ্বারা চেষ্টাকৃত সৃষ্টি নয়—স্বভাবতই যেন সেই স্বর রাগের মূর্ত্তিতে মুখের মত হয়ে গড়ে উঠেছে। উক্ত নিয়ম ও স্বর প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে কয়েকটি রাগের নাম, যথা,—মালকোশ, মূলতান, আশাবরী, ললিত, ভৈরবী ইত্যাদি। এই রাগগুলির প্রধান স্বর অপেক্ষা কড়ি-কোমল স্বরের সংখ্যা অনেক বেশী, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নীতি ধর্ম্মের নিয়মে এদের বাদীস্বর হয়ে আছে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চমটির মধ্যম স্বর এবং দ্বিতীয়টির পঞ্চম, তৃতীয়টির তারাসপ্তকের ষড়জ। আশাবরী রাগের পূর্ব্বাঙ্গের উপর স্বরকে নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখেছি ওই অঙ্গের কোন স্বর যথাযথ বাদীর উপযুক্ত হয়ে অর্থাৎ রাগরূপকে তার স্বভাবগত যথাস্থানের উপর নির্ণয় করার সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হতে চায় না। মধ্যমকে বাদী ধরে যদি তার নিম্নদিকের স্বরগুলি

নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঁকতে যাওয়া যায়, সা, রে, মা, পা, ধা, র্সা, আরোহণের এই স্বরগুলি আগে না দেখিয়ে তাহ'লে আশাবরীকে সহজে চেনা খুব শক্ত হয়ে পড়বে এবং মনে হবে আশাবরীর স্বভাব চরিত্রের যথাযথ পরিচয় দেওয়া হচ্ছে না। এই জন্য রাগরূপ পরিচয়ে 'তারা'র 'সা' 'সুরই' তার প্রথমতঃ আশ্রয় স্থল এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদীরূপে পরিচিত। এস্থলে আর একটা কথা,—আশাবরী জৌনপুরী, প্রভৃতির মত রাগগুলি যে ভৈরবী'র থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তা বিচারের দিক দিয়ে বেশ বুঝা যায়। সুতরাং তাদের প্রত্যেকটির সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিচারের প্রেরণা নিয়ে থাকে মূর্ত্তির বিভিন্নতা রক্ষায় জনক রাগ থেকে পৃথক করে পরিচয় প্রদান স্বরূপ স্বর সংযোজনা ও বাদী-সংবাদীর নানান পরিবর্ত্তনের উপর। এই জন্য—ভৈরবীর রূপ স্বভাবে পূর্ব্বাঙ্গের উপর মধ্যমস্বর যে বাদী হয়ে আছে তাকে আবার আশাবরীতে স্থান দিলে ভৈরবীর প্রভাব খুব বেশী এসে প'ড়ে ওর স্বতন্ত্র রূপ বিঘ্নিত হত। সুতরাং আমাদের জানার খুব বেশী দায়িত্ব থাকে রাগের স্বভাব ধর্ম্ম রক্ষায় প্রকৃত বাদীস্বর কোনটি।

এবার পূর্ব্বোক্ত আলোচনা ধরে একটা প্রশ্ন আসতে পারে—তোড়ীরাগে যখন পঞ্চম ব্যবহার রয়েছে তখন ওতে পঞ্চম স্বর কি বাদী স্বর হবে ?—এর উত্তর,—পঞ্চম ওই রাগে বাদী হবে না, কারণ আরোহণে ব্যবহার হয় না এবং অবরোহণেও অল্প স্থায়ী হয়ে খুব কম ব্যবহার হয়। এজন্য ওই স্বরের তেমন কোন প্রভাব শক্তি নেই বলে কোমলেরই প্রাধান্য এসে গিয়ে গান্ধার হয়ে উঠল তার রূপ গঠনের উপর মুখের মত ওই স্বরের গুরুত্ব নিয়ে বাদীরূপে এবং সংবাদীত্বে এল ধৈবত স্বর তার প্রভাব শক্তিতে।

সংবাদী স্বরের আলোচনা পরে লিখিত হল।

সমের উপর স্বরের বাদী প্রসঙ্গ নিয়ে আর একটা কথা,—যে কোন রাগের গান বা, গৎএর উপর একটা জায়গাতেই তার—'সমতাল' পড়ে না এবং পড়ার বাধ্যবাধকতাও নেই। শিল্পীর ভাবাবেগের দ্বারা বা অনুরাগ নিয়ে রাগরূপের গঠনভঙ্গীর বিভিন্ন তারতম্যের আকাঙ্ক্ষায় ও রস মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তন করার প্রেরণা আসে। এই জন্যই গান ও গৎএর স্বর মূর্ত্তির বিভিন্ন দৃশ্য আকর্ষণমূলকও আনন্দদায়ক হয়। এই নীতিধারা রাগ সংগীতের বিরাট শক্তির দৃষ্টরূপের এক পরিচয়। এই বাস্তব প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে দু'চারটে গানের বা গৎএর কোন একই স্থানের স্বরে সমের তাল দেখে তাকেই বাদী বলে যদি নির্ণয় করা হয় তাহলে যথাস্থানের বাদীস্বর অজানা থেকে যাবে এবং রাগরূপের বাস্তবরূপ ধর্ম্মের পরিচয় আসবে না। বাগেশ্রীর খেয়ালের কোন এক গানে সুন্দরভাবে ঋষভের উপর 'সম' আছে, কিন্তু তা বলে ঋষভ কি বাদীস্বর হ'তে পারে ? ভৈরব রাগের কোন কোন গানে মধ্যমকে স্পর্শ করে ধৈবতের উপর সম আছে কিন্তু সেজন্য ধৈবতকে বাদীস্বর বলা চলতে পারে না। কারণ ভৈরবরাগের স-ম-গ-ঋ—স, স-ঋ-গ-ম,—মধ্যম স্বরের প্রভাব নিয়ে পূর্ব্বাঙ্গের এই চারটি স্বরের প্রয়োগেই রাগের স্বভাবগত মূর্ত্তি ও ভাবরূপ প্রকাশিত হয়ে আছে। সুতরাং নিয়মনীতির ধর্ম্মে অন্য আর কোন স্বর বাদীরূপে ধার্য্য হতে পারে না। স্বরশক্তির প্রভাবধর্ম্মানুযায়ী কোমল স্বর বাদী হবে না। এর যুক্তিমূলক আলোচনা পূর্ব্বে করেছি

ঘ) বাদীস্বরের সংগে বিশেষ সম্পর্ক ধরে সংবাদীস্বর রাগের স্বধর্ম প্রভাব অনুযায়ী বাদীস্বর হতে সংখ্যায় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম স্থানের স্বরে সংবাদী হয়। সংবাদী কথার অর্থ, বাদী স্বরের গুরুত্বের পর যে স্বরটি রাগরূপের বিস্তৃত পরিচয়ে প্রধান রূপে গণ্য হয়ে বহুবিধ সংবাদ জ্ঞাপন করে সেই স্বরটিকে বাদীর সমপর্য্যায়ের গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় সংবাদী স্বর।

বাদীস্বর পূর্ব্বাঙ্গের হলে সংবাদীস্বর উত্তরাঙ্গেই হয় এবং এই প্রথা বিপরীত ক্রমেও নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সমস্তরাগের উপর নির্ভর করে নেই বলে একেবারে যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারেনি। কারণ মালকৌশ রাগের বাদী সংবাদী পূর্বাঙ্গের মধ্যেই আছে মধ্যম ও ষড়জ রূপে। এ রকম উদাহরণ আরো কিছু রাগের মধ্যেও পাওয়া যাবে।

ঙ) বাদী-সংবাদীর নির্ণয় বিষয় নিয়ে আর একটা কথা— প্রধানস্বর বাদী হলে কোমল স্বর সংবাদী হয়না এবং কোমল স্বরের বাদী সম্বন্ধেও তাই। এই নিয়ম রাগরূপের উপর যথারীতি বিচার পূর্ব্বক ধার্য্য হয়ে আছে। রাগরূপের গঠন প্রণালীতে বাদী-সংবাদীর প্রভাব খুবই বেশী। তাছাড়া বিজ্ঞানের দিক দিয়েও গুরুত্ব সমধিক। ওই দুইটির মিলন সম্পর্ক হর্মোনির সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টির কারণের মূলস্বরূপ হয়ে থাকে রাগের সভাব ধর্মানুযায়ী বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বাদী-সংবাদীর সা-মা, সা-পা, সম্পর্কের প্রভাবেই। কোন এক গ্রন্থকার লিখেছেন "ষড়জ স্বর সকল স্বরের মূলাধার স্বরূপ কিন্তু তাকেও কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ রাগে বাদীস্বর রূপে ধার্য্য করেন। ষড়জ স্বর কখনই বাদী স্বর হতে পারে না।" এর উত্তরে আমি বলতে পারি লেখকের এই ধারণা চিন্তাশক্তির অভাব নিয়ে ঘটে থাকবে কিংবা হয়ত নিজের জানা রাগগুলির চেহারার দিকে দৃষ্টি দিয়ে অজানাগুলির সন্ধান না জানার জন্যও হতে পারে। মুদারার ষড়জ স্বর বাদী হয় না সত্য কিন্তু তারা সপ্তকের ষড়ঙ্গ স্বর বিচার সম্মত ভাবে কয়েকটি রাগের উপর বাদীরূপে ধার্য্য হয়ে আছে। যেমন আলাইয়া, আড়ানা, এবং যাকে এখন অনেকে বসন্ত বলেন সেই বসন্ত ইত্যাদি। এই রাগগুলি 'তারা'র ষড়জের উপর বাদীর মত নির্ভর করেই তাদের রূপকে অন্য স্বরগুলিরদ্বারা বিস্তৃত করে। ওই রাগগুলিতে ওই স্বর বাদী ছাড়া অন্য কোন স্বরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদীর স্থানে ধার্য্য করার কোন অবকাশ নেই।

এই রকম রাগ সৃষ্টি হওয়ার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটি উপমার মত উদাহরণ দেওয়া যায়,—যেমন সৃষ্টিকর্তা লতাজাতিদের ধরিত্রীর বক্ষে লুটিয়ে দিয়ে বর্দ্ধিত করার ব্যবস্থা রেখে পত্রে, পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করে রেখেছেন তদ্রূপ প্রকৃতিগত কিংবা কোন রাগ স্রষ্টার স্বভাবগত প্রেরণায় কোন রাগ আদি ষড়জ স্বরের ঊর্দ্ধস্থানের ষড়জের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

আর একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায়,—যেমন তাল, খেজুর, নারিকেল, সুপারী ইত্যাদির মত বৃক্ষের রূপ গঠনে আছে কাণ্ড ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধস্থানেই তাদের শাখা, পল্লব ইত্যাদি তেমনি উক্ত রাগগুলির সৃষ্টি ব্যবস্থার মধ্যেও সেই দৃশ্যরূপ আছে সৃষ্টির নূতনত্ব তাৎপর্য্য নিয়ে এবং সেখানেই পাওয়ার বস্তু হয়ে আছে রাগের যথার্থ চিহ্নিত রূপ, স্থায়িত্ব এবং বাদীস্বর। সুতরাং ষড়জ স্বরবাদী নামে পরিচিত হ'তে পারেনা, একথা, রাগজ্ঞ ব্যক্তিরা উক্ত প্রমাণ ধরে কেউই স্বীকার করতে পারেন না।

রাগরূপের উপর বাদী নির্ণয়ের কথায় বলেছি যে কোন রাগের মধ্যে যে কোন প্রধান স্বরের গতায়াতে যদি তার প্রভাবশক্তি থাকে তাহলে রাগবিজ্ঞানঅনুযায়ী সেই স্বরই বাদীস্বর হ'বে, এমন কী কোমল স্বরের যথেষ্ট প্রভাব ও সংখ্যাধিক্য থাকলেও। এই নিয়ম-নীতির ব্যবস্থার উপর লক্ষ্যরেখে কেউ যদি বলেন, তোড়ীরাগে নিষাদস্বর যখন যাতায়াতে ব্যবহার হচ্ছে তখন ওই স্বর বাদী হল না কেন? এর উত্তর,— ওই রাগে নিষাদ স্বরটি যাতায়াতে ব্যবহার হ'লেও তার তেমন কোন গুরুত্ব ও প্রভাব নেই। আরোহণে নিষাদ ব্যবহার না করেও তোড়ীর রূপ উত্তমভাবে অঙ্কিত হ'তে পারে। যেমন :—
স-ঋ-জ্ঞ-ঋ,-ঋ-জ্ঞ-ঋ-স, ন্-দ্স,ঋ-জ্ঞ, হ্মা-ঋ-জ্ঞ-ঋ-স, স-দ-প, প-হ্মা-দ-হ্মা-জ্ঞ, দ-হ্মা-জ্ঞ, ঋা-জ্ঞ-জ্ঞ-ঋ,-স,
হ্মা-দ-ন-দ-র্স, র্স-র্ঋ-র্জ্ঞ,-র্ঋ,-ন-দ, হ্মা-দ-র্স, র্স-ন-দ-প, হ্মা-দ হ্মা-জ্ঞ-ঋ-জ্ঞ-ঋ, স, ইত্যাদি।

রাগের সৃষ্টিগত রূপের উপর দৃষ্টি দিয়ে এবং তার তাৎপর্য্যের উপর বিচার রেখে এ কথাই সত্যবলে মনে হয় যে তোড়ীরাগে আরোহণের উপর নিষাদ স্বরের ব্যবহার প্রথমাবস্থায় ছিলনা; প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের মধ্যে আরোহণে যেটুকু ক্ষণস্থায়ী হয়ে নিষাদের ব্যবহার আছে তাতেও বেশ লক্ষ্য করা যায় কিভাবে এসে পড়েছে ওই স্থানে। তাছাড়া এ সম্বন্ধে আর একটা বিশেষ কথা, তোড়ীর আরোহণ—অবরোহণে যে নিষাদ স্বর ব্যবহার হয় বা ব্যবহার করতে হয় তা ঠিক প্রধান নিষাদ নয়, রাগের স্বভাব-ধর্ম্মানুযায়ী তীব্র কোমলরূপে আনতে হয়, সুতরাং তোড়ীর নিষাদ ব্যবহারে প্রধান নিষাদ বলে পরিচিতই হবে না। এই সব সঙ্গত কারণ ধরেই নিষাদের বাদীত্বের অধিকার নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা, স্বরলিপিতে রাগরূপের স্বভাব প্রকাশের জন্য যেখানে অতি কোমল বা তীব্র কোমলের প্রয়োজন হয় সেখানে তার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন নির্দিষ্ট করে দিলেও তাতে বিশেষ কোন উপকার হবে না। এ জিনিষের প্রকাশ সম্পূর্ণ জ্ঞান-বোধ ও দখলের উপর নির্ভরশীল।

অনুবাদী ও বলীস্বর সম্বন্ধে

বাদী-সংবাদীর পর আর যে সকল স্বর রাগে ব্যবহৃত হয় তাকে অনুবাদী স্বর বলা হয়। অনু-কথার সহজ অর্থ অল্প, কিন্তু রাগ তত্ত্বের বিচারে তাদের বাদীর অনুগত অর্থেই ধরা সঙ্গত।

শাস্ত্রকাররা বলেছেন,— রাগরূপের রাজ্যে বাদীস্বর রাজা বিশেষ, সংবাদীস্বর তার মন্ত্রী এবং অনুবাদীরা ভৃত্যবৎ। আমার বিচারে অনুবাদী স্বরেরা ভৃত্য নয়, তারাও রাজার বিশেষ সহকারী এবং স্বশক্তির অধিকারী। রাজার যেমন পরমাত্মীয়ের মতদেখা যায় অনুবাদী স্বরগুলির মধ্যেও এক এক রাগের উপর কোন একটি বা দু'টির এমন প্রভাব শক্তি আছে যে তাদের বলীস্বর অর্থাৎ বিশেষ বলবান স্বররূপে গণ্য করতে হয়। মনে হয় যেন রাজাবিশেষ বাদীস্বরের তারাও নিজ প্রভাবে উজ্জ্বল অংশীদার যেমন,— কেদার রাগে পঞ্চম, দেশরাগে 'তারা'র ষড়জ, কানড়া রাগে গান্ধার ও ধৈবত, ভূপালী এবং

ইমন রাগে পঞ্চম, ইত্যাদি। অবশ্য এ স্থলে উল্লেখ যোগ্য যে, রাগ হিসেবে অন্য কোন স্বরের প্রভাব শক্তি ও আধিপত্য যথেষ্ট থাকলেও বাদীস্বরই রাগরূপের মুখাবয়ব সদৃশ। যেমন যে কোন প্রাণীর দেহাবয়ব বা দেহাংশ থেকে মুখাবয়ব যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন সমগ্র শরীরের মধ্যে সেই যেমন সর্ব্ব প্রধান, তেমনি রাগরূপের ক্ষেত্রে বাদীস্বরই সর্ব্ব-প্রধান। কোন প্রাণীর মুখাবয়ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তার যেমন মুখ না থাকা নয়, তেমনি কোন রাগের বাদীস্বর নির্ণয় করতে সঠিকভাবে পারা যাচ্ছে না বলা চলে না। সংবাদীস্বর সম্বন্ধেও তাই। উপমায় ওই স্বরকে রাগরূপের হৃৎপিণ্ড বলা যেতে পারে। অর্থাৎ বাদী-সংবাদী স্বর দু'টি রাগরূপের মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের মত। তাছাড়া রাগরূপের উপর তাদের সংযোগসমন্বয়ের উপরই হার্মোনি অর্থাৎ শ্রুতিসুখকর রসময়প্রাণ নির্ভর করে আছে। সুতরাং বাদী-সংবাদী স্বরের উপর যথাযথ দৃষ্টি না রেখে যদি রাগরূপ গঠন করা যায় তাহলেতার প্রকৃতি বা স্বভাবগত অঙ্গসৌষ্টবের এবং প্রাণ-শক্তির ক্ষতি হ'বেই। যদি নিতান্তই এমন কোন রাগরূপ থাকে যার মধ্যে বাদী-সংবাদী নিরাকরণ সম্বন্ধে যথাযথ নীতি নিয়মে খুঁজে পাওয়ার একান্ত উপায় নেই এবং স্বরগতির মধ্যে শৃঙ্খলা নেই তাহলে বুঝতে হ'বে সে রাগ যথার্থ নীতি জ্ঞান-বোধ নিয়ে এবং তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে সৃষ্টি হয়নি।

বিবাদীস্বর সম্বন্ধে

অভিধানগত 'বি' কথার অর্থ অনেক প্রকারের মধ্যে আছে,— ঈষৎ, নিয়োগ, নিশ্চয়ই, বিরোধ ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন বিবাদীস্বর বর্জিত বা শত্রু। যে স্বর রাগের উপর এসে পড়লে শত্রুর মত বিবাদ সৃষ্টির দ্বারা রাগের ক্ষতি সাধন করে তাকে বিবাদীস্বর বলে তাঁরা ধরে নেন এবং মনে করেন সেই অর্থেই সেই স্বরের নাম বিবাদীস্বর। আমার মতে কিন্তু তা মোটেই নয়। 'বি' কথার ভাষাগত উক্ত প্রথম তিনটির অর্থের প্রভাব ধরেই রাগরূপে বিবাদী কথার প্রয়োজন হয়েছে। বিবাদ থেকে বিবাদী কথার অর্থ ধরেও তার উপমা দিয়ে বলতে পারা যায়,— গোষ্ঠীভুক্ত কোন ব্যক্তির সহিত যদি বিবাদ থাকে তাহলে তার সংগে বাক্যালাপ না থাকতে পারে কিন্তু অন্তরের টান একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না, হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ ঘটে গেলে মায়ার আকর্ষণ যেমন এসে যায়, তেমনিভাবে কোন রাগের উপর স্বভাবগত আকর্ষণ নিয়ে বিবাদীস্বর উঁকি মেরে স্পর্শ সম্পর্ক রাখতে আসে, অবশ্য সে বেণীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না; একই গোষ্ঠীর বলে যখন সে সরল অন্তঃকরণে এসে ছোঁওয়া দেয় তখন তার মধ্যে স্নেহ ভালবাসা থাকে এবং মনে হয় উপকার প্রবৃত্তি নিয়েই এসেছে। তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা বিচার করে দেখতে হয় ছদ্মবেশী হয়ে শত্রুর মত মন নিয়ে এসে পড়ল কি-না, অর্থাৎ রাগরূপের স্বভাব ধর্ম্মের ক্ষতি করল কি-না। যদি সত্যই প্রয়োজন নিয়ে সাহায্যকারীরূপে আসে তাহলে তখন রাগরূপ তাকে গ্রহণ না করে পারে না। উদাহরণ যেমন ভৈরব রাগে কোমল নিষাদের বক্রভাবে আবির্ভাব। ভৈরবরাগে

কোমল নিষাদ ব্যবহার না করলেও কোন অঙ্গহানি হবে না সত্য কিন্তু স্থান বিশেষে ওই কোমল নিষাদের প্রয়োগ ব্যবস্থায় মনে হয় যেন 'ভৈরব' তার স্বভাব শক্তির টানে কোমল নিষাদকে আকর্ষণ করে সুন্দর এক ভাবময় রূপ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করে। এজন্য ওই স্বরকে বিবাদীরূপে গণ্য করলেও সে সম্পর্কের তালিকায় থেকে গেছে। তাকে অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া ওর মধ্যে এক অপূর্ব্ব তাৎপর্য্যও আছে। সেই তাৎপর্য্য রাগরূপের উপর দর্শন শক্তি রেখে বেশ বুঝা যায়। নিশা অবসানের পর ব্রহ্মমূহুর্ত্তের সময় কালীন রাগ হিসেবে 'ভৈরব'কে ধার্য্য করা হয়েছে,— তার সুরের ভাবরূপ সেই সময় কার প্রকৃতির রূপভাবের সংগে অপূর্ব্ব মিলন সম্পর্ক আছে বুঝতে পেরে। প্রাতঃকালের সেই সময় সূর্য্যদেব যখন লোহিতবরণে পূর্বাকাশে দিগ্‌বলয়ের মত মূর্ত্তি নিয়ে উদিত হতে থাকেন তখন মনে হয় যেন ধরিত্রীররূপ গৈরিক বসনা ধ্যান মগ্না দেবীর মত, এবং ক্রমশঃ যেন তাঁরও নয়ন উন্মিলিত হ'য়ে প্রস্ফুটিত কমলের মত হাস্য বিকশিত হ'য়ে উঠে। ভৈরব রাগের রূপ রচনায় সেই সময় ভাবাবেগে এসে যায় ভক্তিভরে প্রণিপাত করার আকাঙ্ক্ষায় সুরের উপর কোমল নিষাদকে আকর্ষণ করে মীড়যুক্ত হয়ে ম-ণ-দ-প,— এই সুরের রূপ। ভৈবররাগের ওই সুরের রূপটি ইচ্ছাকৃত কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ স্বভাবগত এবং সত্যের রূপে আগত। বিবাদীর 'বি' কথাটির বহু অর্থের মধ্যে এখানে স্থান পেয়েছে,— নিশ্চয়ই, নিয়োগ, ঈষৎ, জ্ঞান, হেতু,— এই বাক্যগুলির সত্যের রূপ নিয়ে। এই সব হেতু ধরে সংগীতে বিবাদী কথার অর্থে শত্রু পরিচয়ে থাকা উচিত বলে মনে করি না। ওর উক্ত বাক্যার্থগুলিই রাগের উপর যথার্থতার সংগে সম্পর্ক আছে। অবশ্য এই বিষয়ে অর্থাৎ বিবাদীস্বর সম্বন্ধে খুব সতর্ক হয়ে বিচার দৃষ্টি রাখতে হয়, অহেতুক ও অপ্রয়োজনে যেন কোন অনির্দিষ্ট স্বর বিবাদীরূপে স্থান না পায়. অর্থাৎ রাগের স্বভাবগত রূপভাবকে বিঘ্নিত না করে। এর নীতি-নিয়মের পরিচয়ে যেমন— আলাইয়া, ছায়ানট, কেদার, মেঘ, সারঙ্গ এই ধরণের প্রধান স্বরের উপর নির্মিত রাগগুলির মধ্যে স্বররূপের যে স্বভাব সুন্দরের মত বস্তু আছে এবং তাদের গঠনের বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষ তাৎপর্য্যের উপর, সেই রূপের উপর কোমল নিষাদ ব্যবহার করতে গেলে নীতি-নিয়মের বিচারে অত্যন্ত ভুল হবে।

প্রাচীনকাল হতে ধ্রুপদ খেয়ালের মধ্যে এবং যন্ত্রীদের বাদন ক্রিয়ায় ওই সব রাগের রূপ প্রধান স্বর নিয়েই প্রকাশিত হয়ে এসেছে। এগুলির স্বররূপে যথার্থভাবে অনুধাবন করে বুঝা যায় প্রধান স্বরগুলিতেই তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং তার মধ্যেই আছে তাদের স্বভাবগত হয়ে সুরের গঠন তাৎপর্য্য। তথ্যের সন্ধান ধরে এবং নিজের সাধনার ক্রিয়াসিদ্ধির মধ্যে দিয়ে বেশ বুঝতে পেরে এ সম্বন্ধে একটা কথা বলবার আছে,— প্রধানস্বরবিশিষ্ট সরলগতির রাগগুলির জন্ম বিষয়ে বেশ বুঝা যায় তারা স্বভাবের উপরই সৃষ্টি হয়েছে বলে। ওই স্বরের ঔড়ব জাতির রাগগুলির জন্ম সম্বন্ধে সৃষ্টিতত্বের সিদ্ধান্তে দেখা যাচ্ছে আদি জাতিদের স্বভাবগত কণ্ঠস্বর হ'তে উদ্ভব হয়েছে, — যখন মনুষ্য কণ্ঠে সাতটি সুর ধরা দেয়নি তারও বহু পূর্ব্বে। সুতরাং ওই রকম স্বর বিশিষ্ট রাগগুলিতে কোমল স্বর জোর করে আনা বা অসাবধানতায় এসে পড়া দুই ই অন্যায় হয়ে পড়বে এবং সাতটি প্রধান স্বর বিশিষ্ট সরলগতির রাগগুলির

সম্বন্ধেও ওই বিচারবোধ থাকবে। প্রধান স্বর নিয়ে গঠিত রাগরূপের বহু প'রে যে কড়ি-কোমল যুক্ত রাগের রূপ সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে বোধ হয় কারো দ্বিমত থাকবে না। কারণ কড়ি-কোমল স্বর মানুষের চিন্তাধারায় এবং নানান আবেগময় অবস্থায় এসেছে। মানুষের ইচ্ছাকৃত চেষ্টায় শুধু মাত্র প্রধান স্বর নিয়ে রাগ সৃষ্টি অত্যন্ত কম। আমার চিন্তাধারায় মনে হয় একমাত্র বক্রগতির ছায়ানটের মত রাগকেই পাওয়া যাবে। এর মূলে যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি তাতে স্বরের বক্রগতি নিয়ে যে যে রাগের রূপ গঠিত হয়েছে সেগুলি প্রকৃতি বা স্বভাবগত হয়ে সৃষ্ট নয়। এর কারণে একটা উপমা ধরে আমার জ্ঞান মত ধারণার কথা এই,— সৃষ্টির স্বভাব ক্রিয়ায় বায়ুর উপর যে হিল্লোল প্রবাহিত হয় তা সরল গতিতেই। সেই তরঙ্গের গতির লঘু গুরুর অনুপাতে বায়ু মধ্যস্থিত যে সুরের রণন আছে তারাও চলে সেই ভাবেই গতি ধরে, অর্থাৎ সরল স্রোতের উপরই থাকে প্রকৃতিগত সুরের রণন। প্রকৃতির এই স্বভাব ক্রিয়ার তাৎপর্য্য উপলব্ধির দ্বারা মনে হয় সমস্ত সরলগতির মধ্যেই প্রকৃতির স্বভাব ক্রিয়াই প্রধান হয়ে থাকে। প্রধান স্বর বিশিষ্ট সরলগতির রাগগুলির সৃষ্টরূপের মধ্যেও ওই সত্যের বীজকেই খুঁজে পাই।

যাই হোক ছায়ানটের বিষয়ে আর একটা কথা,— অঙ্কন দক্ষতা রেখে ভাব-নিষ্ঠার দ্বারা ছায়ানটের রূপ তাৎপর্য্য বুঝতে চেষ্টা করে দেখেছি যেন তার স্বভাবে আছে নিবিড় এক ধ্যানমগ্ন আকুলতা। তার উপর যখন কোমল নিষাদকে যথাস্থানে ধরে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করতে গেছি তখন মনে হয়েছে ওই ধ্যানস্থ মূর্ত্তি কোমলের তরলতা সহ্য করতে পারছে না,— তার সেই যথাযথ রূপের আকর্ষণীয় স্থান থেকে মনকে নামিয়ে দিচ্ছে। পূর্ব্ব কথিত যে কয়টি প্রধান স্বর বিশিষ্ট রাগের উপর কোমল নিষাদের অপপ্রয়োগ ঘটেছে সেই গুলির উপরও উক্ত ন্যায় বিচারে আসে। কেদার রাগের স্বর মূর্ত্তিতে আছে নিবিড় ভাব গাম্ভীর্য্য এবং তার মধ্যেই তার রসমাধুর্য্য আছে এবং স্বররূপের স্বভাবও। সুতরাং কোমল নিষাদ তার স্বভাবের সংগে কদাচই খাপ খেতে পারে না। এই সব বিষয়ে অনুধাবনা নিয়ে রাগরূপের নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যের মধ্যে তার স্বভাব সত্যকে ধরতে পারলে তখন তাদের উপরে কোন স্বর অহেতুক ব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ ঘটবার সম্ভাবনা আসবে না। এই সব চিন্তাধারা রাখার উপর আমাদের গুরুতর দায়িত্ব আছে বলে মনে করি। রাগের উপর স্বরের ক্রিয়া নিয়ে বিবাদীস্বর সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার আছে। কোন কোন রাগের স্বর স্বরসংযোগের নিয়মে জাতিত্ব প্রথা লঙ্ঘন করে বিবাদীর পরিচয় সম্বন্ধ নিয়ে এসে পড়ে স্বাভাবিকের মত শিল্পীর ভাবাবেগে। যেমন খাম্বাজ রাগের আরোহণে ঋষভ ব্যবহার হয় না কিন্তু দ্রুত বিস্তারের সময় ন-র্স-র্র-র্গ-র্ম-র্র-র্গ-র্স-র্র·র্ন·র্স·ধ-র্স-ণ-ধ, এই রকম স্বর সংযোগের ক্রিয়া এসে পড়লেও রাগ ভ্রষ্ট হয় না। আরোহণে ওই ব্যবহৃত ঋষভ পূর্ব্ব বর্ণিত বিবাদীর অর্থ ধরে রাগের মধ্যে দেখা দেয়। তবে এই রকম গতি বিরুদ্ধ স্বর বিবাদীরূপে এলেও তার স্থান ধার্য্যস্বরাক্ষরের সংখ্যার মধ্যে থাকবে না,— আশ, মীড় ও স্পর্শের উপর ক্ষণস্থায়ী রূপেই ব্যবহার চলতে পারে। যাই হোক্ আমি কিন্তু রাগের আরোহণ অবরোহণের উপর নীতি নিয়ম নিয়ে ধার্য্য স্বর ব্যতীত ওই রকমভাবে স্বরের প্রয়োগ ব্যবস্থা না থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। কারণ যে স্বরের প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিতভাবে এবং

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশ করা চলে না,— সে স্বর আমরা যদি রাগরূপের মধ্যে ব্যবহার করি তাহ'লে সেই দৃষ্টান্তে শিক্ষার্থীরা যথেচ্ছভাবে অপপ্রয়োগ করে রাগরূপের বিশুদ্ধতা নষ্ট করতে পারেন। ধ্রুপদ ও আলাপে যেমন রাগের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার দায়িত্ব থাকে তেমনি খেয়ালগানেও থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। শাস্ত্রীয় সংগীতের এখনকার এই খেয়ালের যুগে খেয়ালের চর্চ্চা নিয়ে যদি এই সব বিষয়ের গুরুত্বকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে চলি তাহলে শাস্ত্রীয় রাগসংগীতের কৌলিন্য নষ্ট হয়ে গিয়ে এই শ্রেষ্ঠ-বিদ্যার সমূহ ক্ষতি করবে।

বর্জ্জিত স্বর

রাগরূপের যে স্বর কদাচ ব্যবহার হয় না এবং হতে পারে না তাকে বর্জিত স্বর বলে। যেমন ভূপালীর মধ্যম, নিষাদ, মালকৌশের ঋষভ-পঞ্চম।

আগে জানিয়েছি—প্রত্যেক রাগে যে স্বরটি বাদীস্বর হবে তার থেকে স্বরের গণনায় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম স্থানীয় স্বরের মধ্যে যে স্বরটি বাদীস্বরের প্রধান সহায়ক হয়ে রাগরূপকে উভয়ে যথাযথ নিয়মে অঙ্কিত করতে পারবে, বাদীর সাহায্যকারী সেই স্বরটিই হবে সংবাদী স্বর। এ সম্বন্ধের নির্দ্ধারণ নিয়ে একটা জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, প্রধান স্বর কিংবা কোমল স্বর যদি বাদী হয় তাহলে প্রথমটির নিয়মে সংবাদী স্বর প্রধান স্বরই হবে, কোমল স্বর হবে না। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম।

প্রধান স্বরের বাদী-সংবাদী

বাদী	সংবাদী
সা	মা, কিংবা পা
রে	পা — ধা
গা	ধা — নি
মা	× সা
পা	রে — সা
ধা	গা — রে
নি	× গা

মধ্যস্বরের (কোমল) বাদী-সংবাদী,

বাদী	সংবাদী
রে	ধা
গা	ধা
ধা	রে

কোমল নিষাদ ও কড়ি মধ্যম বাদী স্বর হয় না। এই নিয়ম ব্যবস্থা রাগরূপ গঠনের উপর দর্শন ও বিজ্ঞানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি দ্বারা করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থার প্রসঙ্গে আরো দু'চারটি কথা—মধ্যম বাদীর চতুর্থ স্বর নিষাদ সংবাদী হয় না এবং নিষাদ স্বর বাদী হ'লে মধ্যম সংবাদী হবেনা। পূর্ব্বেই বলেছি এই সমস্ত বিষয়ের বিধি ও নিষেধের উপরে যথেষ্ট বিচার যুক্তি আছে। কোন রাগে মধ্যমকে বাদী ধরে তার সংবাদী যদি নিষাদকে করা যায় তাহলে রাগের রূপ যথাযথ রস সৃষ্টির বস্তু নিয়ে তার বিকাশ মাধুর্য্য রক্ষা পারে না। সহজ অর্থে,

বাদী-সংবাদীর উপরে রাগরূপের যে হার্ম্মোণী সম্পর্ক আছে সেই বিজ্ঞান সম্মত সম্পর্কের বিচারে মধ্যমের নিষাদ সংবাদী হয়না। 'মা' এবং 'নি' এই দুই স্বরকে নিয়ে 'নি' এর উপর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে দেখলেই বুঝা যাবে কেন হয় না। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে রাগরূপের উপর বাদী-সংবাদী নিরাকরণের ব্যবস্থা খুবই অনুধাবন ও চিন্তাশক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়ে নীতির নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই নীতি নিয়ম ধরেই রাগরূপের উপর কোমল নিষাদ ও কড়ি মধ্যম, এই দু'টি স্বরও বাদী-সংবাদী হয় না।

রাগরূপের বিস্তার রচনা

আজ কাল দেখা যায় রাগের যে স্বরের উপর বিশেষ স্থায়িত্ব রাখা বা তাকে কেন্দ্র করে বিস্তার রচনা করা চলে না, তাকেও ওইভাবে ব্যবহার করে স্বর বিস্তার দেখান হয়। এ রকম স্বরাঙ্কনের দ্বারা রাগের রূপভাব ও তার নীতি নিয়মে গঠিত রূপের ভাবময় মূর্ত্তির ক্ষতি হয়ে পড়ে। উদাহরণ—যেমন ললিতরাগ। এই রাগটির মধ্যমের বাদীত্ব শক্তিকে ধরে অন্যান্য স্বর রচনার উপরই তার সব কিছু ভাব, রস ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে, কিন্তু দেখি এখন অনেকেই অনেক সময় গান্ধারের উপর বিশেষ স্থায়িত্ব রেখে পারিপার্শ্বিক স্বুরকে প্রকাশ করে রাগের বিশুদ্ধ রূপভাবকে নষ্ট করেন। বর্ত্তমানে আলাপের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে যে উন্নততর ব্যবস্থায় বিলম্বিত খেয়ালের উপর রাগ বিস্তার করা হয়, তাতে রাগের ব্যবহার্য্য প্রত্যেক স্বরকে কেন্দ্র করে সামর্থমত অঙ্কন দক্ষতা দেখানর প্রয়াস থাকে; কিন্তু সব রাগের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য স্বরকে নিয়ে ওভাবে স্বর রচনা চলে না। এ বিষয়ে বিশেষভাবে বোধ দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব আছে। প্রত্যেকটি বৈশিষ্টপূর্ণ রাগরূপের মধ্যে তাদের প্রকৃতিগত যেরূপ স্বভাব সুন্দর ভাব তাৎপর্য্য আছে, তাকে বিশেষভাবে জানবার বাসনা রেখে এবং অনুধাবন করে রাগরূপের চর্চ্চা করে গেলে তবেই এত বড় বিরাট শাস্ত্রীয় সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং শাস্ত্রীয় সংগীত অনুশীলনের মধ্যে সজাগ ও সচেতন থেকে যথাযথভাবে কর্ত্তব্য পালন করে যাবার আমাদের খুবই দায়িত্ব আছে।

নাদ-বা-শব্দ

নাদের অর্থ—ধ্বনি,-শব্দ। নাদ দুই প্রকার, বর্ণাত্মক নাদ এবং ধ্বন্যাত্মক নাদ। বাক্য, কথন, কণ্ঠের গীত, পুস্তক পাঠ ইত্যাদি বর্ণাত্মক নাদ, এবং কোন দুটি বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ বলে; যেমন, তব্‌লার শব্দ, মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ধ্বনি ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গ্রন্থে নাদের এই দুই বিভাগ নিয়ে যে অর্থ উক্তভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে আমার মনে হয় কেবলমাত্র সামগ্রিক সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়া বস্তুর উৎপন্ন ধরেই। এর উপরে এবং আভ্যন্তরিক স্থানে যে

বিরাট সৃষ্টি তত্ত্বের অর্থ আছে—তার সম্বন্ধে আমার জানা বিষয়ের কিঞ্চিত উদ্ধৃত করলাম। "নাদ-বা-শব্দ-চিরন্তনী-শাশ্বত-অমর,—যাকে মহাজ্ঞানীরা বলেছেন,—"শব্দব্রহ্ম"। ওঁকার প্রথম শব্দ। ওঁকারই শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্ম থেকেই শব্দ তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। শব্দ বা বাক্ থেকেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন। কি অমৃত, কি মর্ত্য, সবই বাক্ বা শব্দ সম্ভূত। বেদান্ত দর্শন ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন,—দেবতা প্রভৃতি যা-কিছু সমস্তই বৈদিক শব্দ থেকে উৎপন্ন। শব্দের দ্বারাই শব্দ ব্যবহারের যোগ্য পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। যা-কিছু সৃষ্ট বস্তু সমস্তই শব্দ পূর্ব্বক। অনাদি স্ফোট শব্দই বাঙ্ময় জগতের উৎপত্তি স্থান। শাস্ত্র বলেছেন— প্রাণ-স্পন্দন। তা হলে স্পন্দনই বিশ্বের মূল— স্পন্দনই ব্রহ্মের সংকল্প বা জ্ঞান-ক্রিয়া। 'কাল' নামক ভগবচ্ছক্তি যখন পরমাণু অবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি পরমাণু শব্দে এবং যখন অবিশেষ (সাকল্য) অবস্থা ভোগ করেন, তখন তিনি 'পরম' 'মহান্' শব্দে বর্ণিত হন। তাই প্রকৃতি, পরমাণু, কাল ইত্যাদি শব্দেরই নানা ব্যাখ্যা। শব্দ প্রকার,— পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। পরাবাক্—মূলাধার থেকে প্রথমে উদিত হয় ;—যখন সেই বাক্য নাভিমূলে আসে তখন পশ্যন্তী ; যখন হৃদয়গত হয় তখন মধ্যমা ; যখন কণ্ঠগত হয় তখন বৈখরী। সৃষ্টিক্রমে শব্দের গতি পরাবাক্ থেকে বৈখরী বাকের দিকে, কিন্তু সাধনক্রমে প্রত্যাহারের ধারা অবলম্বিত হয় ; তখন শব্দের গতি হয় ক্রমশ বৈখরী থেকে মধ্যমা ও পশ্যন্তীর দিয়ে পরাবাকের দিকে। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে শব্দের উচ্চারণ হয় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা শ্রুত হয়, তা হ'ল শব্দের বৈখরী অবস্থা এবং এই হ'ল শব্দের স্থূল রূপ। এই অবস্থার মাধ্যমেই সংগীতাদির উৎপন্ন শক্তি নিহিত। মৈত্র্যপনিষদ (৬।২২) বলেন,— ব্রহ্মের দুইরূপ—শব্দ ও অশব্দ। এই দু'য়ের মধ্যে ওঁকার (অর্থাৎ যিনি ওঁ এই অক্ষর ব্রহ্ম) শব্দ ব্রহ্ম ; আর অশব্দ-পরব্রহ্ম। "দ্বেব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দ ব্রহ্ম পরং চ-যৎ। শব্দ ব্রহ্মণী নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" কোন শব্দব্রহ্ম বাদী বলেন যে, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করে অন্তর-হৃদয়াকাশে যে শব্দ শ্রুতি গোচরে আসে, তাই শব্দব্রহ্ম।" এ রকম আরো অনেকগুলি উদাহরণ আছে শব্দব্রহ্মের স্বরূপ সন্ধানকে বুঝবার জন্য। এ স্থলে অধিক বিস্তারের প্রয়োজন মনে করলাম না। 'শব্দব্রহ্ম' কে বৈজ্ঞানিকরা বলেন,—"Storage of vibration is Eternal শব্দ মণ্ডল বহু যুগ যুগ পূর্ব্বের আভ্যুদয়িক সংগীত পর্য্যায় ভুক্ত, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'Absolute music is Rhythm. বৈজ্ঞানিকের মন্তব্যে এ-ও জানা যায় টেলিভিশন্ পর্দায় সপ্তবর্ণী রামধনুর চিত্র-রেখায় চার হাজার বৎসর আগেরও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের স্তোত্রসংগীত ভেসে উঠতে পারে। মহাকাশের ফাঁকে ফাঁকে এমনি ভাবে ব্যোমতরঙ্গের বাহির মণ্ডলে যে ইলেক্‌ট্রনের (Electron) পথ রেখা বিদ্যমান রয়েছে, যা Pluto অথবা মহারুদ্রের ছান্দিক জ্যোতি অর্থাৎ Cosmic Rays কেও ছাড়িয়ে চলে গেছে।"

'নাদ' সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় মহামুনিরা বলেছেন—"সচ্চিতানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদস্তস্মাদ্বিন্দু সমুদ্ভবাঃ।" আর একটি শ্লোকে নাদের এইরূপ মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে, যথা,— "ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবম্; নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদ-রূপী স্বয়ং হরিঃ।"

নাদব্রহ্মের তাৎপর্য্যকে শাস্ত্রীয় সংগীতের মাধ্যমে বুঝতে হ'লে আধ্যাত্মিক ভাব ধারায় যথাযথ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তপস্যাগত সাধনায় নিযুক্ত থাকলে তবে উপলব্ধি হতে পারে। শাস্ত্রকাররা 'নাদ'কে পরম বিদ্যার-স্থানেও নির্ণীত করেছেন। এর অর্থ সম্বন্ধে আমার এই ধারণা,—রাগ সংগীতের দ্বারা যে পথ অনুসরণ করলে নাদজ্ঞান লাভ হবে তার জন্য সাধন ক্রিয়ার মাধ্যমে যে নীতি-নিয়ম-দর্শন ও বিজ্ঞান রচিত আছে তাকেই শিক্ষণীয় পরম বিদ্যার স্থানে তাঁরা ধার্য্য করেছেন।

সঙ্গীত

সংগীত শাস্ত্রে বলা হয়েছে—গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রিভিঃ সংগীত মুচ্যতে। "অর্থ— গীত-বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনের একত্র সমাবেশকে সংগীত বলে। আবার একথাও বলা হয়েছে, শুধু গীত বা বাদ্যকেও সংগীত বলে। এই তিনটির মধ্যে গীতই প্রধান।" সংগীত শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যার উপর আমার অভিমত ও প্রশ্ন ;—শাস্ত্রের মধ্যে আছে রাগসংগীত স্রষ্টা মহাদেবের পাঁচ শিষ্য,—যথা, ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু, তম্বুর (তম্বুরা যন্ত্রের স্রষ্টা)। শ্লোক— "ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তম্বুরুমেবচ। পঞ্চ শিষ্যং স্ততোধ্যাপ্য সংগীতং ব্যাদিশদ্বিধি।" ভরতের দ্বারা ভারতবর্ষে সংগীতের প্রচার হয়, হুহু গন্ধর্ব্বের আচার্য্য হন, রম্ভা স্বর্গে সংগীত প্রচার করেন, নারদ বীণাযন্ত্রের সহিত রাগালাপাদির দ্বারা ত্রিভুবনে সংগীতের মহিমা কীর্ত্তন করে সাধন-ভজনের এই শ্রেষ্ঠ পথের নির্দেশ দেন। তম্বুরমুনি নিরালায় রাগ-সংগীতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক তপস্যায় রত থাকেন। এই উক্তির সত্যতাকে অস্বীকার করা না হ'লে প্রমাণে আসছে উক্ত মহাত্মারা এককভাবেই সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধির প্রচার করেছেন,—গীত-বাদ্য ও নৃত্যের সমষ্টি নিয়ে নয়। প্রত্যেক সাধকরাই তাই করে এসেছেন ও আসছেন। সুতরাং গীত-বাদ্য ও নৃত্যের একত্র সমাবেশকে সংগীতের প্রতীক কি করে বলা যেতে পারে ? গীত বা বাদ্য এ দুটির পৃথক সত্বাও সংগীতের প্রকৃত নির্দ্ধারিত অর্থের প্রতীক বলেও ধরা যায় না। উক্ত তিনের সমাবেশকে এই ভাবে নিলে কিছু অর্থ থাকবে,—কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগালাপ ইত্যাদি প্রকাশের সময় প্রেমিক সাধকের চিত্তে যে ছন্দ ও নৃত্যের আন্দোলন জাগায় তাকে বলা যেতে পারে একত্র সমাবেশের এক প্রতীক রূপ। কিন্তু শাস্ত্রকাররা ওই অভিব্যক্তিকে ধরে লিখেছেন বলে মনে হয় না। কারণ তাহলে গীত বা বাদ্যকে পৃথক ভাবে সংগীত বলার আবশ্যক হতনা এবং প্রথমটির উক্ত অর্থও দেওয়া হত। যাই হোক্—সংগীত বলতে তার যথাযথ যা অর্থ হওয়া আবশ্যক তাতে সুর এবং রাগরূপ ইত্যাদির সমগ্র মহিমাকে অধিগত করে থাকাকেই কেবল বুঝতে হয়। সুতরাং সংগীতের বিরাট ও অনন্তবিস্তারি রূপকে কোন ছকে আঁকা বস্তুর মধ্যে প্রকৃষ্ট ভাবে নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে বলে মনে করা যায় না। সংগীতের রূপ বিশ্বব্যাপ্তিময়, পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপরই সে প্রতিষ্ঠিত। আগের নাদ সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ করে বিজ্ঞানের অর্থে স্পষ্ট হয়ে গেছে। গীতে থাকে কাব্যরূপ, সেখানে তার অধিকার অনেক খানি। সুতরাং শুধু সংগীত

সে নয়। সংগীতের অপার মহিমার প্রতিফলন কিছু উপলব্ধি করতে পারি শাস্ত্রীয় রাগ সংগীতের রূপ গঠনের উপর তার বিরাট বিস্তৃত অঙ্কন রচনা কৌশলের মাধ্যমে। কিন্তু গীতে তার যে টুকু প্রতিফলন রূপ থাকে, তাকে কি আমরা সংগীতের প্রতিষ্ঠিত স্থানের অর্থে সংগীত বলতে পারি? গীতে বা গানে থাকে সংগীতের অংশ বিশেষ নিয়ে বাণী, সুর ও তাল নিয়ে গঠিত ছকে আঁকা বস্তু। শাস্ত্রীয় সংগীতের গানে বাণীকে গৌণ ভেবে সংগীতের বস্তুই প্রধানতম হয়ে আছে দেখে যদি আমরা সেই গানকে সংগীত বলি তাহ'লে যন্ত্রের গৎকে বেশী করে ঐ নামে আখ্যাত করতে হয়; গৎ বলা চলে না। সুতরাং বুঝতে হচ্ছে ভাষার ভাবের গুরুত্বর উপর গীতের অর্থ নিহিত হয়ে আছে। শাস্ত্রীয় সংগীতের জন্য কণ্ঠের এবং সাত সুর প্রকাশক যন্ত্রের রাগালাপকেই যথার্থ ভাবে সংগীত নামে অভিহিত করাই সঙ্গত বলে মনে করি। এই জন্যই যন্ত্রে তাল যুক্ত হয়ে ছকে বাঁধা যে সুর গঠিত হয় তাকে 'গৎ' এবং ভাষার ভাব ও তালকে নিয়ে সুরের দ্বারা গঠিত বস্তুকে ন্যায় সঙ্গত ভাবে বলা হয় 'গান'। যেমন—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী ইত্যাদি শাস্ত্রীয় সংগীতের শ্রেণীগত বস্তু গান নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। যদিও সংগীতের স্বাধীন প্রভাবশক্তি ওগুলিতে যথেষ্ঠ আছে এবং সাধনার সম্পদরূপে আসে শিল্পীর কাছে। সাধারণ শ্রেণীগত গানও ন্যায় সঙ্গতভাবে গান নামেই পরিচিত। অর্থ ছাড়া হয়ে দু'একটিতে হয়ত নাম সম্বোধনে ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিচারের আর একটা দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গীতের যে অর্থ সেই অর্থের স্থানে পৃথকভাবে তাল ও ছন্দ ঘটিত বাদ্য প্রকরণকে এবং নৃত্যকে ধরা চলেনা। নৃত্যের আঙ্গিক ক্রিয়া এবং চর্ম্মবাদ্যের ঠেকা, বোল ইত্যাদিকে সঙ্গীত হচ্ছে বলা কি করে যাবে? গান কথার যে অর্থ ধরে আমরা বলি গান শুনছি বা গান হচ্ছে তার পরিবর্ত্তে সঙ্গীত শুনছি বা সংগীত হচ্ছে বললে যখন গানবস্তুরও স্বরূপ নির্দ্ধারণ হয়না তখন চর্ম্মবাদ্য ও নৃত্যের বস্তুকে সংগীত হচ্ছে একথা তো একেবারেই বলা চলে না। গীত-বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটির প্রত্যেকটিই ওই নামেই পরিচিত হয়ে থাকাই বিচার সম্মত বলে মনে করি। সঙ্গীতশাস্ত্রে গীতের যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে শ্লোকের মাধ্যমে তাকে সঙ্গীত বলা হয় না। বলা হয়েছে "ধাতু মাত্রা সমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। তত্রনাদাত্মকো ধাতুর্মাত্রা চাক্ষর সঞ্চয়ঃ ॥"

আমার মনে হয়—গীত-বাদ্য ও নৃত্য এই তিন পৃথক বস্তুর একত্র সমাবেশকে যে সময় সঙ্গীত বলা হয়েছিল তখন হয়ত ওই ভাবেই সংগীতের প্রচলন বেশী ছিল। যদিও এ ধারণাও আমার কাছে অতি দুর্ব্বল বলেই মনে হয়।

এই আলোচনার অংশ ধরে যদি কেউ বলেন—পাখোওয়াজে, তবলা ইত্যাদি চর্ম্মবাদ্যে যে সুর প্রকাশ পায় এবং নুপূরের ঝঙ্কারে যে সুর উৎপন্ন হয়—সে-ও তো সঙ্গীতেরই সুর, তাহলে ওইগুলির মধ্যে সংগীত নেই কি করে বলা যাবে? এর উত্তর, ওগুলিতে সুর উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তাকে সঙ্গীতের অর্থে স্থান দেওয়া যেতে পারেনা, শুধু একটি কোন সুর মাত্র। চর্মবাদ্যযন্ত্রে গান বা গৎএর প্রয়োজনে

কোন একটি নির্দ্ধারিত সুরে বাঁধা হয় বলেই তখন তার মধ্যে সুরের নাম থাকে, নচেৎ ওগুলি এক একটি শব্দ বা ধ্বনিই মাত্র। যেমন ঘণ্টার ধ্বনি, শঙ্খের ধ্বনি. মেঘের ধ্বনি, কোকিলের ধ্বনি ইত্যাদি।

উক্ত সমষ্টিগত বিষয়ের সাধারণ একটি চাক্ষুষ উদাহরণ, যেমন, বীণা ও তম্বুরা হস্তে দু'টি অঙ্কিত মূর্ত্তি, অনুরূপ পাখোওয়াজ ক্রোড়ে একটি মূর্ত্তি এবং নৃত্যরত একটি মূর্ত্তি। এই চারটিকে দেখলে সহজেই ধরে নিতে পারা যায়, প্রথম দুটি সঙ্গীতের সুর সাধনার প্রতীক, পরেরটি তাল ও ছন্দ প্রকাশকের প্রতীক এবং শেষেরটি আঙ্গিক নৃত্যের প্রতীক। পাখোওয়াজ বাদ্যযুক্তমূর্ত্তিকে এবং নৃত্যরত মূর্ত্তিকে দেখে কখনই মনে আসতে পারেনা তারা সংগীতের সুর প্রকাশক বলে। সুতরাং সুরের মহিমা প্রকাশই সংগীতের একমাত্র সত্যরূপ একথা পরম সত্যরূপে স্বীকৃত হয়ে থেকে কি করে চর্ম্মবাদ্যের ছন্দ বোলকে এবং নৃত্যকে সংগীত বলা চলতে পারে? ওদুটি প্রথম থেকে সংগীতকে আশ্রয় করেই এসেছে বলা যায়, অবশ্য পরে সংগীতকে আশ্রয় না করেও সাধনার দ্বারা উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গীত দুই প্রকার

শাস্ত্রীয়গ্রন্থে আছে সংগীত দুই প্রকার—যথা মার্গ ও দেশী। আমি পূর্ব্ব মন্তব্যের উপর সংগীত কথার পরিবর্ত্তে গীত দুই প্রকার বলাই যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করি। ভাববাক্য রচনা দিয়ে শাস্ত্রসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত শুদ্ধরাগ ও তালযুক্ত যে গীত তাকে 'মার্গ গীত' বলে। মার্গ অর্থে পথকে বুঝায়। সংগীতের জন্য এই কথার উদ্দেশ্য ধরে এর প্রকৃত অর্থ হল, উচ্চাঙ্গ সংগীতকে অর্থাৎ সংগীত-বিদ্যাকে লাভ করবার জন্য যে প্রকৃষ্ট পথ অনুসরণ করে শিক্ষা ও সাধনা করতে হয়, সেই পথের সম্বল-বস্তুরূপে যে গান সেই গানকেই বলা হয় 'মার্গ-গীত'॥

দেশী গীতের অর্থ,— দেশে দেশে লোক সকলের অভিরুচি অনুসারে যা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করে সেইরূপ ভাষায় রচিত গীতকে দেশীগীত বলে। যেমন— বাউল, ভাটিয়ালী, গ্রাম্যগীত, গজল্, ঝুমুর ইত্যাদি।

স্বরাঙ্গ ও রাগাঙ্গ

পূর্ব্বে এক স্থানে জানিয়েছি—সা-রে-গা-মা এবং পা-ধা-নি-সা, এই সীমার আটটি স্বরের প্রথম চারটিকে পূর্ব্বাঙ্গ এবং তার পরের চারটিকে উত্তরাঙ্গ বলে। রাগ সমূহের মধ্যে যে যে রাগে পূর্ব্বাঙ্গ স্বরের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে তার রূপ প্রকাশিত হয় তাদের পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান রাগ বলে এবং যে-যে রাগে

উত্তরাঙ্গ স্বরের স্থায়িত্বের দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মে তাদের রূপ প্রকাশিত হয় তারা হ'ল উত্তরাঙ্গ প্রধান-রাগ। যে অঙ্গে রাগের বাদীস্বর ধার্য্য হয় সেই অঙ্গেই তার স্বভাবগত রূপ থাকে, এই কথাই সত্য বটে কিন্তু দু'একটি রাগের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্তিক্রম আছে। যেমন বাহার রাগের বাদী মধ্যম, কিন্তু তার স্বাভাবিক গতিমুখ উত্তরাঙ্গের দিকে।

স্বরগুলির দুটি অঙ্গ নামের মূলে কি যুক্তি আছে এবং সাতটি স্বরের প্রকাশোৎপত্তি কি ভাবে হল তার সম্বন্ধে আমার গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তাদ্বারা এই ধারণায় আসে যে,—মনুষ্য সৃষ্টির আদিতে যে সংগীত ছিল তা স্বভাবতই খুব সংক্ষিপ্ত স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে। বেশ বুঝা যায় কণ্ঠে তার উচ্চতা সা-রে-গা-মা-সুরের সীমা পর্য্যন্তই ছিল, তার বেশী প্রকাশ করার সামর্থ্য ও জ্ঞান-চিন্তা ছিল না। এই সম্ভাব্য সূত্রের উপর বিচার ধরে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় যে, পুরুষরা ওই উচ্চতার মধ্যে দিয়ে তাদের সামর্থ্যের উপর কণ্ঠে যে গান বা সুর প্রকাশ করতে পারত নারীরাও স্বভাবগত সামর্থ্যের উপর সেই উচ্চতার পরিমাপের মধ্যেই গানের সুর নির্গত করতে পারত। পুরুষ-নারী উভয়ে মিলিত হয়েই যে তখন সংগীতের রূপ প্রকাশ করত তার প্রমাণ আদি জাতিদের মধ্যে আছে। পুরুষদের মোটা গলায় যে চারটি সুর প্রকাশ পেত সেই চারটি সুরের মতই উচ্চতার দূরত্ব নিয়ে নারীদেরও কণ্ঠে প্রকাশিত হত। পুরুষদের স্বভাবগত আরম্ভিক সুর থেকে যে বাকী তিনটি সুর আসত তাকে বহু পরে শাস্ত্রীয় স্বরার্থের নামগুলির আদ্যক্ষর ধরে সা-রে-গা-মা,-নামে এবং নারীদের সেই চার সুর পা-ধা-নি-সা, নামে রূপ দান করা হয়। পুরুষ-নারীর স্বভাবগত কণ্ঠস্বরের ব্যবধানের যে সমভাব উচ্চতা আছে তার যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের ওজন যেখানে থাকে তার থেকে নারীদের স্বভাবগত কণ্ঠের ওজন ধরে উচ্চতার পরিমাপে থাকে চারটি সুরের ব্যবধানের মত উভয়ের মধ্যে চারটি সুরের ব্যবধান সম্বন্ধে প্রামাণিক নিদর্শন রয়েছে যথা,— সা-রে-গা-মা,-র উচ্চতার শ্রুতি ব্যবধান প্রত্যেক স্বরে যেরূপ আছে,— পা-ধা-নি-সা, এই চারটিরও তদ্রূপ। সেই আদিকালের সময়ের পুরুষ নারীরা মিলিত হয়ে ওই ভাবে গেয়ে আসার পর ক্রমশঃ যত জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হ'তে লাগল ততই উভয়ের মধ্যে চেষ্টা আসতে লাগল কণ্ঠে আরো সুরের উচ্চতা ও নিম্নতার রূপে তাদের আনবার জন্য। এইভাবে নারী ও পুরুষ কণ্ঠের ওজন উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি দত্ত স্বভাবের আকর্ষণে আদান-প্রদান হ'য়ে স্বর সৃষ্টির সীমা নিরাকরণ হ'য়ে গেল এক থেকে আট পর্য্যন্ত অর্থাৎ শাস্ত্র সৃষ্টির সময়ের কথায় মুদারার 'সা' হতে 'তারা'র 'সা' পর্য্যন্ত। আমার অভিজ্ঞতায় এই ভাবেই স্বর সৃষ্টির সন্ধান ও তার সীমা নিরাকরণ করা হল স্বভাবগত আদি সৃষ্টির উৎসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথায় আমার মনে হয়,—উচ্চতার উপর এক একটি সুরের মধ্যে ভাব-রস, ও শক্তির ক্রিয়া কিরূপ আছে তা গভীরভাবে অনুশীলন এবং অনুসন্ধানের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করে সাতটি সুরের নামকরণ করেন মুনি, ঋষির মত শাস্ত্রকাররা ষড়জ, ঋষভ ইত্যাদির রূপে এবং ওই গভীর অর্থসঙ্গত নামকরণের আদ্যক্ষর নিয়ে সা-রে-গা-মা'র প্রচলন হয়। তারপরে শাস্ত্রীয় সংগীতের গোড়াপত্তনের

সময় থেকে ক্রমশঃ বিবিধ বিষয়ের উপর বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতির সৃষ্টি হ'তে থাকে গভীর ভাবে দর্শন শক্তির মধ্যে দিয়ে। সাতটি স্বর যেন সৃষ্টির আদি শক্তির জ্যোতিতে থাকা সপ্তবর্ণের রংএর মত।

সুরের এবং সঙ্গীতবিদ্যার অনেক বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও আবিষ্কার করবার আছে। আলোচ্য বিষয়টির উপর গভীর চিন্তা নিয়ে যে যুক্তি ও বিশ্বাসের সন্ধান টুকু পেয়েছি বলে মনে হল তাকে লিপিবদ্ধ করে রাখার আবশ্যক আছে ভেবে উপেক্ষা করতে পারলাম না। মনুষ্য কণ্ঠে স্বরোৎপত্তির বিয়ব সমূহ নিয়ে যেভাবে তার তত্ত্বের আলোচনা করে দেখালাম সে বিষয়ের আরো যোগ্য বিচার যদি থাকে তা হলে তার অনুসন্ধানের সুযোগ-সুবিধা হতে পারবে বলে মনে করি।

শ্রুতি

শ্রুতির অর্থ শ্রবণ অর্থাৎ যা শুনতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতের ষড়জস্বর হতে তার অষ্টমস্বর ষড়জকে ধরে মোট যতগুলি স্বর বা সুর আমরা শুনতে এবং বিশেষভাবে অনুভবের দ্বারা পাই সেই গুলিকে শ্রুতি বলে। এই শ্রুতি মোট বাইশটি। এই বাইশটি শ্রুতির মধ্যে সাতটি শ্রুতি সা,-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, রূপে প্রধান স্বরে প্রকাশিত হয়েছে।

শাস্ত্রকাররা স্বরের সূক্ষ্ম অংশকে শ্রুতি বলেছেন। স্বরের অর্থাৎ সা-রে-গা-মা, ইত্যাদির সূক্ষ্ম অংশকে শ্রুতি বলার মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আসে। কারণ, দেখা যাচ্ছে বাইশটি শ্রুতির মধ্যে বারটি স্বর যে যে স্থানে আছে, তাদের প্রত্যেকটিকে সেই স্থান হতে অতি সামান্য উচ্চে কিংবা নিম্নে যদি কণ্ঠে বা যন্ত্রে প্রকাশ করা যায় তাহলে তারা স্থানচ্যুত হয়ে অন্য স্বরের রূপে এসে যাবে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর সহজেই বুঝা যাচ্ছে প্রত্যেক স্বরের প্রত্যেক একটি শ্রুতির মধ্যেই তাদের স্বররূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এবং ন্যায় সঙ্গত বিচারে সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠরূপে আছে বাইশটি শ্রুতিতেই বাইশটি স্বর। প্রত্যেক শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবক্রিয়া ও স্বর রূপ আছে বলে যথার্থ অনুভব করেই যখন শাস্ত্রকাররা প্রত্যেক শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন, তখন শ্রুতি, স্বরের সূক্ষ্ম অংশ একথা কি করে আবার বলা চলে? শাস্ত্রোল্লিখিত নিম্নের শ্লোকেতে রয়েছে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

যথা,—

তীব্রা-কুমদ্বতী-মন্দা-ছন্দোবত্যাস্তু ষড়জগাঃ।
দয়াবতী-রঞ্জনী চ রতিকাচর্ষভে-স্থিতা॥
রৌদ্রী-ক্রোধী চ গান্ধারে বজ্রিকাথ প্রসারিণী।
প্রীতিশ্চ মার্জ্জনী চৈব শ্রুতয়ো মধ্যমেস্থিতা॥—

ক্ষিতি-রক্তাশ্চ সন্দীপন্যালাপিন্যপি পঞ্চমে।
মদন্তী, রোহিণী রম্যেতাতিস্রস্তু চ ধৈবতে॥
উগ্রাচ ক্ষোভিনীতি দ্বে নিষাদে কথিতে-বুধৈঃ।
(সঙ্গীত-শাস্ত্র)

সহজে বুঝবার জন্য শ্লোকের মধ্যে শ্রুতির নামগুলি স্বরের·যে যে স্থানে অধিকার করে আছে তা এইরূপ,—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দবতী, এই চারটি শ্রুতির রূপ নাম ষড়জ স্বরের আরম্ভ হ'তে ঋষভ স্বরের উপর যে শ্রুতি আছে তার পূর্ব্বের ব্যবধানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে। দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, এই তিনটি শ্রুতি ঋষভ থেকে গান্ধারের ব্যবধানে আছে। রৌদ্রী, ক্রোধী, এই নামের দুই শ্রুতি গান্ধার থেকে মধ্যমের মধ্যে অবস্থিত। বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, এই চারটি মধ্যমের উপর থেকে পঞ্চমের আগে পর্য্যন্ত স্বররূপে আছে। ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপ, আলাপিনী, এই চারটি পঞ্চমের উপর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মদন্তী, রোহিণী, রম্যা,—এই তিনটি ধৈবতের উপর হ'তে। উগ্রা, ক্ষোভিনী, এই দু'টি নিষাদ থেকে। চার শ্রুতির রূপ গোষ্ঠীতে আছে,—ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম, তিন শ্রুতির রূপ গোষ্ঠীতে ঋষভ ও ধৈবত, এবং দুই শ্রূতির রূপ গোষ্ঠীতে গান্ধার ও নিষাদ।

সাতটি প্রধান স্বরের শ্রুতির দূরত্ব সংখ্যা,—যথা, সা-৪, রে-৩, গা-২, ম-৪, পা-৪, ধা-৩, নি-২। 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থের শ্লোকে আছে—

চতুস্রঃ পঞ্চমে-ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়োমতাঃ
ঋষভে ধৈবতে ত্রিস্রো দ্বে গান্ধারে নিষাদয়োঃ॥

নিজ অভিজ্ঞতায় বলতে পারি,—বহু সাধনা ও অনুভূতির দ্বারা বাইশটি শ্রুতির স্বররূপকে বিলম্বিত ও দ্রুত গতিতে দেখাতে পারা যায়; এ ছাড়া ছোট, বড় বাইশটি তানপুরায় (তম্বুরা) মোটা ও সরু বাইশটি তার সংযোজনা করে বাইশটি শ্রুতিকে ক্রমান্বয়ে বেঁধেও দেখিয়ে দেওয়া যায়। এমনকী সুরবাহার কিংবা সেতারের পর্দ্দার টানের উপরও তা উৎপন্ন হ'বে। সুতরাং এই সমস্ত প্রমাণ যখন আছে দেখাবার উপায় হয়ে তখন শ্রূতিকে স্বরের সূক্ষ্ম অংশ বলা যাবে কি করে?

শ্রুতির এই নীতি বিচারের মধ্যে অন্য স্বরের উৎপত্তির কথা,—

প্রধান যে শ্রুতিটির উপর ষড়জ স্বরের রূপ নিহিত আছে সেই শ্রুতি হতে বাইশটির যে যে স্থানে আরো ছ'টি স্বর আছে' তাদের পরস্পর দূরত্বের মধ্যে যেগুলির ব্যবধান বেশী তাদের ভিতর হতে আরো পাঁচটি শ্রুতি পাঁচটি স্বররূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই পাঁচটির মধ্যে চারটি কোমল এবং একটি কড়ি বা তীব্র স্বররূপে পরিচিত। মোটের উপর বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যে শ্রুতিগুলি স্বরশক্তিতে প্রবল তারাই মোট বারটি স্বর সৃষ্টি করেছে। এই প্রবলত্ব কোন নির্দ্দিষ্ট স্বরের ষড়জ থেকে নির্ভর করে নেই, যেখান থেকেই সুরকে নিয়ে ষড়জ নির্মিত হবে সেখান থেকেই স্বভাব ক্রিয়ায় যথাস্থানে শ্রুতির প্রবলত্ব এসে গিয়ে স্বর যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হ'বে। বাকী যে দশটি শ্রুতি থাকে সে দশটি পূর্ব্বের শ্রুতিগুলির

মত স্বরসৃষ্টির স্থানে এসে দাঁড়াতে পারে না, এজন্য ঐ দশটি শ্রুতিকে বিশেষ করে স্বরের ব্যবধান রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। তবে ওই দশটি শ্রুতির মধ্যে গান্ধার-মধ্যমের এবং নিষাদ-ষড়জের মধ্যস্থলের একটি করে শ্রুতি ছাড়া বাকী আটটি শ্রুতি রাগরূপের স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী স্থায়ীরূপে এবং মীড়ের দ্বারা ও স্পর্শিতভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন কানড়ার কোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ স্বাভাবিক থেকে এক শ্রুতির উপরে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলেছি রাগের স্বভাব ধর্ম্মানুযায়ী শ্রুতির উপর যে তারতম্য নিয়ে স্বর সৃষ্টি করতে হয় তা বিশেষ জ্ঞান ও সাধনার শক্তিতে বুঝা সম্ভব হয়।

কোন গ্রন্থকার তাঁর এক বৃহৎ গ্রন্থে শ্রুতির সংখ্যা বাড়ানর জন্য যে যুক্তি দিয়েছেন তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নয়। গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ঋষভ-গান্ধার এবং ধৈবত নিষাদের ব্যবধান তিন শ্রুতির উপর নয়,—চার শ্রুতির উপর হবে। কারণ—তিনশ্রুতির ব্যবধানকে স্বীকার করতে গেলে ষড়জ পরিবর্ত্তনে স্বরের নিয়ম সঙ্গত উচ্চতার ক্ষতি হ'য়ে স্বরের যথাযথ রূপ বিঘ্নিত হবে। উদাহরণ—যেমন ঋষভকে 'সা' করলে গান্ধার যখন 'রে' হবে তখন তার উচ্চতা এক শ্রুতি কম হ'য়ে পড়বে, এবং তাতে স্বরের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে তিন শ্রুতির ব্যবধানকে মানতে হ'লে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে ওই দুটির ব্যবধানে আর এক শ্রুতি করে বাড়বে এবং সপ্তস্বরের শ্রুতির দূরত্ব সংখ্যা বাইশ হবেনা, চব্বিশ হতে হবে। ৪-৪-২-৪-৪-৪-২- এই ভাবে সাতটি স্বরের শ্রুতি সংখ্যা ধার্য্য হবে।" গ্রন্থে উল্লিখিত এই যুক্তি আমার কাছে মোটেই গ্রহণ যোগ্য কেন হতে পারল না সে সম্বন্ধে আমার বিচার যুক্তি দেখাই। প্রথমতঃ ষড়জ পরিবর্ত্তনের জন্য ঋষভের শ্রুতি বাড়াতে হবে এর মূলে কোন যুক্তি নেই। কারণ যার যেখানে স্থান তার থেকে এক চুলও কাউকে উচুতে তুলবার উপায় নেই। তা করতে গেলেই অন্য স্বরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। এখন দেখা যাক—সত্যই ওই স্বরগুলির অন্তর্বর্ত্তীতে আর একটি করে শ্রুতি বাড়ানর মত স্থান আছে কি-না। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করে দেখেছি তাদের দূরত্বে তিন শ্রুতির বেশী পাওয়া যায় না। স্বরের উপর শ্রুতির ক্ষমতা দেখে যেভাবে স্বর স্থাপন করা আছে তার অতিরিক্ত কিছু করতে গেলে অন্য শ্রুতির মত অর্থাৎ শ্রুতি কথার যে অর্থ আছে সেই অর্থ ধরে তার প্রকাশ পাবার যোগ্যতা থাকবে না। কণ্ঠে বা যন্ত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে বুঝেছি, ঋষভ হতে গান্ধার এবং ধৈবত হতে নিষাদের ব্যবধানে চারশ্রুতি প্রকাশ পাচ্ছেনা সুরের রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে। ওতে তিনটি করে শ্রুতিই স্বররূপে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়।

পর্দ্দাযুক্ত বীণাদি যন্ত্র নিরীক্ষণ করলে সহজেই বুঝা যাবে ষড়জ হতে ঋষভ, মধ্যম হতে পঞ্চম এবং পঞ্চম হতে ধৈবতের পর্দ্দা যে দূরত্বে বাঁধা থাকে তা অপেক্ষা ঋষভ-গান্ধার, এবং ধৈবত-নিষাদের পর্দ্দার দূরত্ব থাকে কিছু কম নিয়ে, অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ কমের মধ্যে। যদি ওইগুলির ব্যবধান পূর্ব্বের স্বরগুলির মত সমদূরত্বে রাখা হয় তা হলে গান্ধার ও নিষাদের সুর কখনই যথাযথভাবে হ'বে না। সুতরাং ষড়জ পরিবর্ত্তনের কথা এনে শ্রুতি বাড়াতে যাওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে মনে করি। সংগীত সম্বন্ধে যা কিছু ব্যবস্থা, বিচার ও আলোচনা তার সমগ্র বিষয়ের মূলেই কণ্ঠ সংগীত। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের মধ্যেও

সংগীত সম্বন্ধে যা কিছু বিধি ব্যবস্থা আছে তা মূলতঃ কণ্ঠসংগীতের উদ্দেশ্যেই নিহিত হয়ে আছে।

বহুপরের যুগে কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকার কণ্ঠসংগীতের শাস্ত্রর সংগে যন্ত্রসংগীতের বা নাট্য-কলার ব্যবহারিক বিষয়কে জড়িয়ে দিয়েছেন,— যেমন যন্ত্রসংগীতে ঠাট ইত্যাদির কথা এবং নাট্য-কলার রাগ-রাগিণী ইত্যাদি।

ষড়জ পরিবর্ত্তনের শুদ্ধি অশুদ্ধির ব্যাপারটি আধুনিক যুগের স্থায়ীবদ্ধ সুরযন্ত্রের অর্থাৎ হার্মোনীয়ম শ্রেণীর যন্ত্রের ব্যবহারিক ক্রিয়া থেকেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। এ কথা বলাই বাহুল্য,—কণ্ঠসংগীতের বিচার তার নিজস্ব শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কণ্ঠসংগীতের জন্য ষড়জ পরিবর্ত্তন করার বিষয়ে স্বরের শুদ্ধি অশুদ্ধির কোন প্রশ্ন আসতেই পারে না। গায়ক যেখানে যে স্বরকেই ষড়জ করে গান করুন না কেন কণ্ঠে সেই স্থান হ'তেই নিয়মিতভাবে স্বর প্রকাশিত হ'বে। যন্ত্রের কথাতেও বলা যায়— পর্দাযুক্ত যন্ত্রে যদি ষড়জ পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকই হয় তাহলে স্বরকে শুদ্ধ করে নিতে যে কোন পর্দ্দাকে এক আধ টুকু সরাসরি করে নিলেই ঠিক হয়ে যায়।

হার্মোনীয়মের মত যন্ত্রে আমাদের শাস্ত্রীয়সংগীতের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। ঐ শ্রেণীর যন্ত্রের সা 'C' সুর ছাড়া অন্য সুরের পর্দায় ষড়জ পরিবর্ত্তন করলে স্বরের শ্রুতির ব্যবধান যে নষ্ট হয়ে যাবে একথা স্বরবোদ্ধা মাত্রেরই জানা আছে। তা ছাড়া আর একটা কথা,— যে যন্ত্রে সমস্ত শ্রুতির প্রকাশ হয় না তাকে ধরে শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে কোন বিচারই চলে না।

শ্রুতিতে স্বরের স্থান নির্ণয়--

তারা সপ্তকের ষড়জ ——————— প্রবল শ্রুতির মধ্যে—
——————— ২২—
নিষাদ ——————— ২১ প্রবল
0 ——————— ২০—
কোমল নিষাদ ——————— ১৯— প্রবল
ধৈবত ——————— ১৮ প্রবল
0 ——————— ১৭—
কোমল ধৈবত ——————— ১৬ প্রবল
0 ——————— ১৫—
পঞ্চম ——————— ১৪ প্রবল
0 ——————— ১৩—

কড়ি মধ্যম	১২ প্রবল
O	১১—
মধ্যম	১০ প্রবল
O	৯—
গান্ধার	৮ প্রবল
O	৭—
কোমল গান্ধার	৬ প্রবল
ঋষভ	৫ প্রবল
O	৪—
কোমল ঋষভ	৩—প্রবল
O	২—
মুদারার ষড়জ	১ প্রবল

যে যে শ্রুতির উপর কোমল স্বরের প্রকাশ আছে তাদের মধ্যে ঋষভের পরের দ্বিতীয় শ্রুতিতে কোমল গান্ধার এবং ধৈবতের পরের দ্বিতীয় শ্রুতিতে কোমল নিষাদের স্থান দিয়েছি। এই স্থান নির্ব্বাচন আমি কণ্ঠে ও তারের যন্ত্রের উপর অভিনিবেশ সহকারে বিশেষ চিন্তা দ্বারা বিশেষ রূপে প্রকাশ করে দেখে স্থান ধার্য্য করেছি। বারম্বার সুর উৎপাদন করে বুঝেছি স্বভাবিক কোমল গান্ধার ঋষভের পরের দ্বিতীয় শ্রুতিতে এবং কোমল নিষাদ ধৈবতের পরের দ্বিতীয় শ্রুতিতেই প্রকাশ পাচ্ছে। এই স্বাভাবিক কোমল, ভৈরব, ভৈরবী, আশাবরী, যোগীয়া, রামকেলী প্রভৃতি এই সকল শান্ত স্বভাবের রাগে অর্থাৎ প্রাতঃকালের রাগে ব্যবহার হয়। তারপর স্বভাবতই দিবাযামের প্রথমের পর থেকে ক্রমশঃ বেশীর ভাগ রাগের উপর তীব্র কোমল তাদের রূপ স্বভাব অনুযায়ী ব্যবহার হ'তে থাকে। যেমন মুলতান, পুরিয়া, পুরবী, শ্রী, কানড়া, বাগেশ্রী, আড়ানা, মালকোশ ইত্যাদি। কোমল স্বরের প্রয়োগ নিয়ম রাগরূপের স্বভাবের উপর নির্ভর করে।

ঠাট

'ঠাট' কথার যা সহজ সরল অর্থ আছে তাতে কোন বস্তুর কাঠামো (Structure)কেই বুঝিয়ে আসছে। পূর্ব্বাপর হতে এখনও সাধারণ ক্ষেত্রে ঘর, বাড়ী, মঞ্চ, তোরণ ইত্যাদি তৈরী করার প্রয়োজনে প্রথমতঃ তার রূপটাকে আগে প্রধানতঃ কাঠের দ্বারা বেঁধে দাঁড় করান হয়, সেই দাঁড়ান আকৃতিকে দেখামাত্র বুঝতে পারা যায় সত্যই সেটা কিসের রূপ। তেমনিভাবে রাগরূপের গঠনে যে

সমস্ত ব্যবহার্য্য স্বরাদি আছে সেগুলির প্রয়োগ পদ্ধতির নীতি-নিয়ম নিয়ে আরোহণ-অবরোহণে রাগের স্বভাবধর্মানুযায়ী যেভাবে নির্মাণ করলে তার নির্দিষ্ট স্বরূপকে চিনতে পারা যায় তাকেই ন্যায়সঙ্গতভাবে ঠাট নামে অভিহিত করতে হয়। এবং বিচারগতভাবে ঠাট কথার অর্থই তাই। যেমন খাম্বাজের ঠাট, এররূপে আরোহণে ঋষভ স্বরকে বাদ দিয়ে স-গ-ম-প-ধ-ন-র্স এইভাবে এবং অবরোহণে র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-র-স, এই স্বর সংযোজনা নীতি-নিয়মের উপর আছে এবং খাম্বাজের এই হল নিজস্ব ঠাট। আরোহণ-অবরোহণে এইরূপ স্বর সংযোজনা অন্য আর কোন রাগে থাকবে না বা থাকতে পারে না। ঘর-বাড়ীর কাঠামোর ঠাট ইচ্ছামত কিছু পরিবর্ত্তন করা চলে কিন্তু প্রত্যেকটি রাগরূপের একই নীতি-নিয়মে ঠাট বাঁধা হ'য়ে থাকবে। খাম্বাজের আরোহণে 'রে' স্বরকে ত্যাগ না করলে তার ঠাটের কাঠামো ভুল হয়ে পড়বে। আগেই বলেছি ন্যায়সঙ্গতভাবে রাগরূপে যেভাবে স্বর সংযোজনা আছে সেইভাবেই তার ঠাট নির্মিত হবে। ঠাটের উপর রাগরূপের কাঠামো রচনার মধ্যে আমার যতদূর মনে আসছে তাতে দেখছি পর পর সাতটি স্বরের উঠানামার উপর ভৈরব, ভৈরবী এবং ইমন এই তিনটিই নির্ভর করে আছে, অন্য আর কোন রাগ এইরূপ স্বর রচনার উপর ঠাট ও নিজস্বরূপে পরিচিত হ'য়ে নেই।

ঠাটের বিষয়ে আলোচনা :—

রাগ সমূহের মধ্যে কোন একটিকে প্রধান বা জনক ধরে তার সংগে কতকগুলি রাগের সম্পর্ক আছে বুঝে এবং সেই তাকেই অবলম্বন করে সেই রাগগুলি সৃষ্টি হয়েছে এই নির্দ্ধারণে এনে গ্রন্থকাররা খুঁজে বের করেছেন ঠাটরূপে কেউ দশটি, কেউ বারটি, কেউ বাইশটি, আবার কেউ বাহাত্তরটি ইত্যাদি। এই নিরাকরণ বস্তুগুলিকে কেউ কেউ ঠাট নামে আবার কেউ মেল নামেও অভিহিত করে গেছেন। এই নির্দ্ধারণ নিয়মের উপর যে বিচার যুক্তি আসে তাতে ঠাট কথার পরিবর্ত্তে মেল কথারই সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। কারণ আগেই বলেছি ঠাট বলতে বুঝায় পূর্বোক্ত নিয়মের উপর এক একটি বস্তুর বিহ্নিত রূপের প্রতীককেই, আর মেল অর্থে বুঝায় পরস্পরের মিলন সম্পর্ককে। যেমন— অষ্টাদশ কানাড়া, দ্বাদশ মল্লার, সপ্তসারঙ্গ প্রভৃতি এক একটির গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান রাগের সংঙ্গে অন্যগুলির সম্পর্কের উপর মিলনের খুব বেশী যোগাযোগ না থাকলেও সম্পর্কের মেল আছে বলে বেশ বুঝতে পারা যায়— তদ্রুপ। অর্থাৎ মেল কথার অর্থ তাতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি কালের মধ্যে কেউ কেউ ঠাট কথাকে ধরে রাগ সমূকে নিয়ে ভিন্ন প্রকারে গোষ্ঠীভুক্ত করায় তাতে বিতর্ক আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ থেকে গেছে। আগের দেওয়া পরিচয় ধরে আর একবার জানাতে হচ্ছে, ঠাট বলতে কোন এক বস্তুর নিজস্ব গঠনভঙ্গীর কাঠামোকেই বুঝায় এবং তার মধ্যেই থাকে তার অবয়বের এক নির্দিষ্ট চিহ্নরূপ। এই নির্ম্মাণ করার বস্তু প্রধানতঃ কাঠ দিয়েই তৈরি হয়ে এসেছে বলে কাঠামো নামে পরিচিত হ'য়ে থাকে। রাগরূপের জন্যও ঠাট কথার অর্থ এই নীতি নিয়মের উপরই থাকবে। অর্থাৎ ঠাটের গঠন আমাদের বুঝিয়ে দেবে তার নিজস্ব মূর্ত্তির স্বরূপকে যথাযথভাবে।

যদি তার সেই গঠিত রূপকে চিনতে আমরা অপারগ হই তাহলে বুঝতে হবে রাগরূপের কাঠামোর স্বর সংযোজনা যথাযথ হয়নি এবং তাকে আমরা রাগের ঠাট বলে গণ্যও করতে পারব না। প্রত্যেক রাগের-রূপ ভিন্ন, সুতরাং ঠাটও ভিন্ন হবে। ঠাট মানে যে, রাগ অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয় একথা বুঝবার পক্ষে কোনই অসুবিধে নেই। আগেই বলেছি এক রাগের সংগে যদি আর এক রাগের কিছু রূপসম্পর্ক থাকে তাহলে তাকে 'মেল' নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

ঠাট কথার এই প্রকৃত অর্থকে ও তার নিয়মকে সরিয়ে দিয়ে এক গ্রন্থকার সমস্তরাগকে নিয়ে তাদের মধ্যে দশটিকে প্রধান বা জনকরূপে নির্বাচন করে এক একটির উপর অন্য রাগগুলিকে বণ্টন করে দশটি ঠাট নির্ম্মাণ করেছেন এবং সেই নির্মাণ ব্যবস্থাকে এখন অনেকেই বেশ গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করে নিয়েছেন দেখে তার সম্বন্ধেই সবিশেষ আলোচনা করব।

দশটি ঠাট নিম্নলিখিতভাবে আছে :—

(১) স-র-গ-ম-প-ধ-ন-র্স, এই ঠাট থেকে প্রধান বেলাওল রাগের উৎপত্তি। (২) কোমল নিষাদ আরোহণে দিয়ে স-র-গ-ম-প-ধ-ণ-র্স, এই ঠাট থেকে প্রধান খাম্বাজ রাগের উৎপত্তি। (৩) কড়ি-মধ্যম দিয়ে স-র-গ-হ্ম-প-ধ-ন-র্স, এই ঠাট থেকে প্রধান কল্যাণ রাগের উৎপত্তি। (৪) কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ দিয়ে স-র-জ্ঞ-ম প-ধ ণ-র্স, এই ঠাটে প্রধান কাফীরাগের উৎপত্তি। (৫) কোমল ঋবভ, ও কড়ি মধ্যম দিয়ে স-ঋ-গ-হ্ম-প-ধ-ন-র্স, এই ঠাটে প্রধান মারওয়া রাগের উৎপত্তি। (৬) কোমল ঋষভ-ধৈবত এবং কড়ি-মধ্যম দিয়ে স-ঋ-গ-হ্ম-প-দ-ন-র্স, এই ঠাটে প্রধান পূরবীরাগের উৎপত্তি। (৭) কোমল গান্ধার—ধৈবত ও নিষাদ দিয়ে স-র-জ্ঞ-ম-প-দ-ণ-র্স, এই ঠাটে প্রধান আশাবরী রাগের উৎপত্তি। (৮) কোমল ঋষভ-ধৈবত দিয়ে স-ঋ-গ-ম-প-দ-ন-র্স; এই ঠাটে প্রধান ভৈরব রাগের উৎপত্তি। (৯) কোমল ঋষভ-গান্ধার-ধৈবত ও নিষাদ দিয়ে স-ঋ-জ্ঞ-ম-প-দ-ণ-র্স, এই ঠাটে প্রধান ভৈরবীরাগের উৎপত্তি। (১০) কোমল ঋষভ-গান্ধার ধৈবত ও কড়ি মধ্যম দিয়ে স-ঋ জ্ঞ-হ্ম প দ ন-র্স, এই ঠাটে প্রধান তোড়ী-রাগের উৎপত্তি। দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ জাতির উপরই দশটি ঠাট নির্মিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের উপর বলা যায় কেবলমাত্র আরোহণের উপর সরল গতিতে স্বর সংযোজনা করে যে দশটিকে ঠাটের নাম দিয়ে তার প্রত্যেকটিতে উক্ত দশটি রাগকে প্রধান উৎপত্তির স্থল বলা হল, সেগুলির প্রত্যেকটিই যে ওই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার পরিচয়ে যথেষ্ট ত্রুটী আছে। যেমন—পূরবীরাগে যখন প্রধান মধ্যম ব্যবহার হয় তখনই তার স্বরূপকে প্রকৃষ্টভাবে চিনিয়ে দেয়। সুতরাং প্রধান মধ্যমকে ত্যাগ করে দিয়ে উক্ত স্বরের আরোহণের মধ্যে পূরবীর স্বররূপের কি পরিচয় আসে? ওই স্বর-সংযোজনাকে কেউ তো পুরিয়া-ধানশ্রীও বলতে পারেন। বরং প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের পরিচিত মতে প্রধান ধৈবত দেওয়া থাকলে পূরবীকে চেনা অনেকখানি সহজ হত, এই রকম উক্ত ঠাট নামের উপর। উৎপত্তি রাগ সম্বন্ধে তার নির্দ্ধারণ ব্যবস্থার কয়েকটির মধ্যেই ত্রুটির প্রশ্ন আছে, যা যুক্তি দিয়ে সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই ব্যবস্থার বিষয়ে এবার প্রকৃত আলোচনায় আসা যাক্ ;—আগেই ঠাটের প্রকৃত অর্থ কি সে সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানিয়েছি। প্রধান কিংবা কড়ি অথবা কোমলস্বর নিযুক্ত করে সাতটি স্বরকে সরল গতির উপর রেখে ঠাট নামে পরিচিত করে তার ঘেরার মধ্যে কতকগুলো রাগকে স্থান দিয়ে এক একটির উপর কোন একটি রাগকে প্রধান বা জনকরূপে ধার্য্য করার আবশ্যকতার গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বিতর্কহীন সঠিক যুক্তি এবং সুব্যবস্থার একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। অমুক রাগ বেলাওল ঠাটের, অমুক রাগ কল্যাণ ঠাটের ইত্যাদি বলে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র উপকার আছে বলে মনেই আসে না। সুরট বা দেশরাগকে খাম্বাজ ঠাটের রাগ বলে তাতে কি লাভ হবে,—শুধুমাত্র কোমল নিষাদের ব্যবহারটুকু জানা ছাড়া ? সেই জানাটুকু এবং রাগরূপ পরিচয়ের জন্য যা কিছু জানবার তা প্রত্যেকটি রাগকে শিখবার সময়েই জানা হয়ে যায় বা জানতে হয়। যদি বুঝতাম খাম্বাজের সংগে দেশ বা সুরট রাগের স্বররূপের কিছুও সম্পর্ক আছে তাহলে ঠাট নামের পরিবর্ত্তে বরং মেল নাম দেওয়া চল্‌ত।

আর এক প্রশ্ন,—উক্ত দশটি ঠাট নির্ম্মেতার নিয়ম নির্দ্ধারণে দুই মধ্যমযুক্ত কেদার, বেহাগ, গৌড়সারঙ্গ এবং ঔড়ব জাতির হিণ্ডোল, মালকৌশ, সারঙ্গ ইত্যাদি এবং জয়জয়ন্তী, গান্ধার-ধৈবত-কোমলযুক্ত পিলুরাগ, ঋষভ কোমল দুই মধ্যম এবং পঞ্চমবর্জিত শুদ্ধ বসন্ত, পঞ্চমবর্জিত—দুই মধ্যম, কোমল ঋষভ-ধৈবতযুক্ত যে ললিতরাগের রূপ প্রায় সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞই জানেন এবং সেইভাবে প্রকাশ করেন, সেই ললিতরাগ ইত্যাদি এইগুলি ন্যায়সঙ্গতভাবে উক্ত কোন ঠাটের অন্তর্গত হতে পারে কি ?

আমার মতে ওইরকমভাবে ঠাট অঙ্কের দ্বারা বুঝাতে না গিয়ে যদি তিনি বলতেন—কেবলমাত্র প্রধান সাতটি স্বরের দ্বারা এই এই রাগের উৎপত্তি, কোমল নিষাদ দিয়ে এই এই রাগের উৎপত্তি, দুই মধ্যম দিয়ে এই-এই রাগের উৎপত্তি হয়েছে ইত্যাদি, তাহলে বরং সহজ হত এবং বিতর্কের কোন প্রয়োজনই থাকত না।

পূর্ব্বেই বলেছি রাগরূপকে যদি চিনতে না পারা যায় এবং ব্যবহার্য্য স্বরসমূহ ঠিকভাবে অঙ্কিত হয়ে না থাকে তাহলে কেবলমাত্র আরোহণে পর পর সাতটি স্বরকে স্থাপন করে সেই স্থাপিত বস্তুকে কদাচ কোন রাগের ঠাট বলা যেতে পারে না। উক্ত ঠাট নিরাকরণের উপর বেলাওল রাগ সম্বন্ধে ;—বেলাওলের শাস্ত্রীয় নাম 'বেলাবলী'। আমাদের কাছে এই রাগের রূপ বিভিন্ন প্রাচীন ঘরাণা হতে ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে দিয়ে পরিচিত হয়ে আছে দুই মধ্যম যুক্ত হয়ে পূর্ব্বাঙ্গে কল্যাণের রূপ এবং উত্তরাঙ্গে আলাইয়া রাগের রূপ নিয়ে। এই স্বররূপ ধ্রুপদ-খেয়ালের মধ্যে দিয়ে যে সময় বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এসেছিল সে সময় ভারতের প্রাচীন ঘরাণাসমূহে রাগরূপের অঙ্কন-নীতিধারার সমন্বয় প্রায় একই ছিল। বাল্যকাল হ'তে অর্থাৎ প্রায় ষাট বছর আগে বহুগুণীপরম্পরা এই প্রামাণিক সত্যের পরিচয় আমি পেয়ে এসেছিলাম। প্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয়ে ওই দুই রাগে মিশ্রিত হ'য়ে বেলাওলরাগ শালঙ্ক শ্রেণীরূপে পরিচিত হয়ে আছে। এখন বেলাওল বলে যে সুর অঙ্কিত হচ্ছে এবং যিনি তাকে

ধরে একটি ঠাটের পর্য্যায়ে ফেলেছেন, সেই সুরের রূপ প্রকৃতপক্ষে আলাইয়া রাগেরই। (শাস্ত্রীয় নাম 'অলৈয়া')। সেই প্রকৃত আলাইয়া রাগের উপর অবরোহণে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বক্রতার মধ্যে মাত্র অল্প পরিমাণে কোমল নিষাদ ব্যবহার দেখিয়ে তাকে বলা হচ্ছে আলাইয়ারাগ। অথচ রাগরূপ গঠনে আরোহণের উপর যে সুর উৎপন্ন হয় তারমধ্যে ওই দুইটি রাগের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ ও প্রধানের বিচারে আল্যাইয়া রাগকে তিন স্বরের দ্বারা চিহ্নিত করে কিন্তু বেলাওল রাগকে পারে না চিহ্নিত করতে। রাগরূপের বিচার নিয়ে দেখা যায়, শুদ্ধ শ্রেণীরাগ যদি হয় তাহ'লে স্বররূপ কোনমতেই একইভাবে দুটি রাগের আরোহণে স্বর সংযোজনা হতে পারে না, বা তা করা চলে না ;— প্রত্যেকটির মধ্যেই পার্থক্য থাকবে। তা না থাকলে বুঝতে হ'বে রাগরূপের গঠনে যথার্থ নীতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্য কিছু নেই।

কোন রাগের আরোহণ এবং অন্য কোন রাগের অবরোহণ নিয়ে নূতন নামে অনেক রাগ আছে এবং হ'তে পারে কিন্তু যে রাগকে বিশেষ করে বিজ্ঞানসম্মত অঙ্কন ব্যবস্থায় অর্থাৎ স্বরসমূহের আরোহণের উপর চেনা যায় সেই রাগ সেই নীতিধারায় তার রূপের সম্পূর্ণ প্রভাব নিয়ে আর এক ভিন্ন নামে পর্য্যবশিত হ'তে পারে না।

কেউ যদি উক্ত ঠাট নির্ম্মেতার গ্রন্থের নিদর্শন ধরে বলেন—বেলাওল রাগের আরোহণ শুধুমাত্র স-র-গ-ম-প-ধ-ন-র্স এই সাত স্বরের সুররূপের উপর পরিচিত হয়ে আছে। এর উত্তরে আমি বলব, এই পরিচয় রাগরূপ নিদর্শনের জন্য কোনমতেই নয়। কারণ প্রধান স্বরকে ধরে সহজ সরল আরোহণের স্বরসাধনের সুর কখনও কোন নির্দ্ধারিত রাগের নামে আসতে এবং থাকতেই পারে না। অর্থাৎ তাতে রাগকে চেনা যায় না। সুতরাং তাকে কোন রকমেই যে রাগের ঠাট বলা চলে না,— এ কথা আগেই জানিয়েছি।

আলাইয়া রাগে কোমল নিষাদের প্রয়োগ ঘটিত ব্যাপার নিয়ে বলা যায়,—আগে কোন কোন গায়কের এবং তাঁরযন্ত্র বাদকের কাছে শুনা যেত অবরোহণের মধ্যে রেখে 'ধা' সুরের সংগে কোমল নিষাদের স্পর্শ আন্দোলন মাত্র। পরিষ্কার ভাবে কোমল নিষাদের উপর তাঁরা জোর দিতেন না। তাছাড়া আগে লিখিত ভাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কোমল নিষাদ ধার্য্য হয়ে থাকার পরিচয় আমি পাইনি। এই পরিচয় যদি কোন গ্রন্থে থাকে তাহলে আমি বিচারগত ভাবে বল্‌ব—উক্তরাগের স্বভাবগত নীতি নিয়মের উপর যথাযথ লক্ষ্য রাখা হয়নি।

রাগরূপের উপর অব্যবহার্য্যস্বর খেয়াল গানের কোন কোন রাগে এসে পড়ার মধ্যে থাকে রূপ-অঙ্কনকারীর নিজস্ব ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য কোন কোন ধ্রুপদীর মধ্যেও দেখাযায়। রাগ বিজ্ঞান ও তার নীতি-নিয়ম রক্ষার উপর সচেতন দৃষ্টি না থাকার জন্যই মনে হয় ওইরূপ অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে। রাগরূপের সৌন্দর্য্য বোধই তার প্রধান বস্তু এ কথা খুবই স্বীকার্য্য কিন্তু তার স্বভাবগত রূপের বিন্নতা সৃষ্টি করে নয়। প্রত্যেক রাগের স্বভাবগত রূপের মধ্যেই তার প্রকৃত সৌন্দর্য্য থাকে। যাই

হোক্ মোটের উপর যাঁরা আলাইয়াতে কোমল নিষাদ ব্যবহার আছে বলে ব্যবহার করেন, তাঁদের ধ-ণ-প এই রকম বক্রভাবে ক্ষণস্থায়ী রূপেই করতে হয়; স˙-ণ-ধ, এই রকম ভাবে কোমল নিষাদকে দেখাতে পারেন না। কোমল নিষাদ যদি আলাইয়া রাগের স্বভাবধর্মী স্বর হত তাহলে সরল গতিতে এবং স্থায়ীভাবে ব্যবহার হত। যেমন— খাম্বাজ, সুরট, দেশ প্রভৃতি রাগে কোমল নিষাদ প্রকৃত প্রয়োজন নিয়ে আছে।

আমার বিশ্বাস ধ্রুপদ এবং প্রাচীন খেয়ালের উপর বেলাওল-রাগের যথাযথ সন্ধান না জানার জন্য সামান্য একটু পার্থক্য রক্ষার ইচ্ছে নিয়েই হয়ত কোন খেয়াল গায়কের প্রচার মারফত্ এই রকম অবস্থা ঘটেছে। অবশ্য যথাযথ বিচারবোধ না রেখে কোন কোন ধ্রুপদ গায়কের দ্বারাও হতে পারে। প্রথমাবস্থায় রাগরূপ শিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল ভিত্তি তৈরির আবশ্যক নিয়ে সুন্দর তথ্য আছে আলাইয়া রাগটির সৃষ্টি সম্বন্ধে। প্রাতঃকালে কণ্ঠ সাধনায় প্রধান স্বর সমূহের দ্বারা কণ্ঠস্বরে অঙ্কন করে কেমন ভাবে একটি সুরের চেহারা সহজে উৎপন্ন হয় এবং তার মধ্যে দিয়ে প্রধান স্বরগুলি আরো কত বেশী করে কণ্ঠে পাকাপোক্ত হবার জন্য আবশ্যক থাকে সে বিষয়ে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বোধের জন্য প্রাতঃকালের প্রথমে ক্ষুদ্রাকৃতিতে লুমরাগ এবং পরে আলাইয়া রাগের সৃষ্টি যে হ'য়ে ছিল স্বভাবের ক্রিয়া থেকেই তা বেশ বুঝা যায়। তারপর সেই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব ধরে আসে আদি অকৃত্রিম প্রধান স্বর যুক্ত বিভাস রাগের রূপ। মধ্যম বর্জিত ষাড়ব জাতির এই রাগটিকে সেই সময়ের উপযোগী করে ধার্য্য করার আবশ্যক হয়ে ছিল। দুই মধ্যম দিয়ে আলাইয়া ও কল্যাণের সুর নিয়ে তৈরি হয়ে প্রকৃত বেলাওল রাগ তার রূপ স্বভাব অনুযায়ী প্রকৃতির সংগে সম্পর্ক রেখে দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গৌড়সারঙ্গের পূর্ব্বে ব্যবহারের স্থান থেকে এসেছে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি রাগরূপের পরিচয়ে জানা হ'য়ে আছে,—আলাইয়া রাগের উপর বহু পরে রাত্রের খাম্বাজ, সুরট, দেশ, তিলককামোদ, কল্যাণ প্রভৃতি রাগগুলি নিয়ে যে-যে রাগের নূতন নাম সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির প্রকাশের স্থান হ'য়ে আছে শাস্ত্রীয় শ্লোকে আলাইয়া রাগের পর এবং বেলাওল সর্ব্বশেষে দিবা দ্বিতীয় প্রহরে। শাস্ত্রীয় শ্লোক.—"অ'লৈয়া-দেবগিরিয়া-লঙ্কশাখঃপুণস্তথা। রামগিরি-দেবক্রিচ দিনে প্রথম যামকে। দ্বিতীয় প্রহরার্দ্ধেচ সুহা-বেলাবলীতথা।"

এইসব প্রমাণের দ্বারা বলা যেতে পারে ঠাট ব্যবস্থার গুরুত্ব কিছু না থাকলেও নামকরণে বেলাওল না হ'য়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে আলাইয়া হ'তে হত। আলাইয়া রাগের প্রাচীন ধ্রুপদ খেয়াল বহু আছে। শেষোক্ত মতেও ওই দুটি রাগের মধ্যে আলাইয়ারই প্রচলন বেশী। এর দ্বারাও আলাইয়ার প্রাধান্য ও শক্তি প্রমাণিত হয়।

কোমল নিষাদ ও গান্ধারকে যুক্ত করে তথাকথিত ঠাটে কাফীরাগের উৎপত্তি বলায় আশ্চর্য্য লাগে। ওই রাগটির রূপ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে স্বরাঙ্কন পদ্ধতির নিয়ম বহুকাল হ'তে যেভাবে চলে আসছে এবং সঙ্গীতজ্ঞদের অনুসরণীয় হয়ে আছে তাতে ওর রূপের মধ্যে আছে সিন্ধু ও খাম্বাজ রাগের মিশ্রিত রূপে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদযুক্ত হ'য়ে। কোমল গান্ধার ও নিষাদ দিয়ে সৃষ্ট সিন্ধু

(শাস্ত্রীয় নাম সৈন্ধবী) রাগই প্রাচীনত্বে আদি এবং বিস্তার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই রাগের প্রাচীন বহু ধ্রুপদ আছে, কিন্তু কাফীরাগের ধ্রুপদ অতি অল্পই পাওয়া যায়। যাই হোক্ গ্রাম্য হোলীগানের কাফী রাগটি উক্ত দুই কোমলের উপর প্রথম উৎপত্তি রাগ বলে ঠাট নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে কেন বিবেচিত হল তা যুক্তি দিয়ে বুঝা যায় না। কাফীরাগের রূপ যেন দেশভেদে গ্রামীণ মানুষের কণ্ঠে তাদের হোলীগানের জন্য স্বভাবগত হয়ে উক্ত দুটি রাগের মিশ্রণে এসে এক নূতনত্ব স্বরভঙ্গীর রূপে ধরা দিয়েছিল বলেই মনে হয়। দুই গান্ধার ও দুই নিষাদের প্রয়োগ কৌশল ওই গানের নিজস্ব সুরের প্রতীক হয়ে আছে এবং কাফীর রূপ তাৎপর্য্য এবং সিন্ধু হতে বিশেষ পার্থক্য ওর মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে। তার প্রমাণ এইভাবে নির্দ্ধারিত স্বরাঙ্কণে পাওয়া যাবে, যথা,—স-র-জ্ঞ-র গ-ম-প-ম-প, গ-ম-ধ-ধ ণ ধ-প-গ, স-গ-ম-ণ-প-জ্ঞ র-গ-ম-প,—চিরপরিচিত সুরের এই আংশিক উদাহরণেই দেখা যাচ্ছে প্রধান গান্ধার কি রকম প্রাধান্য নিয়ে আছে। চড়ার দিকে দুই নিষাদের প্রভাব নমুনা,—যথা,—র́-র́-র́-জ্ঞ́ র́-স́- স́ র́ ন-ন-ন--স́ র́ স́-ণ-ণ-ধ-ম-প-ধ-ন-স́,—ন-ন-ন-স́,—ন-স́-ণ-ধ-ন-স́,—ধ-ধ-ধ-গ-ম-প-ণ-প-ধ-প প-ধ-ন-স́,—ইত্যাদি। কাফীরাগের বৈশিষ্ট্যমূলক সুরের উক্ত অঙ্কিত রূপ বিচারগতভাবে কারো অস্বীকার করবার উপায় নেই,—যাঁরা এই রাগ সম্বন্ধে অবহিত আছেন। সুতরাং বুঝতে হবে দুই নিষাদ কাফীরাগের অপরিহার্য্য স্বর। দেখতে পাই—যাঁরা উক্ত ঠাট নিরাকরণের আইন মেনে কাফীরাগে কোমল গান্ধার ও নিষাদই শুধু ব্যবহার হবে বলে ব্যক্ত করেন তাঁরাও কার্য্যক্ষেত্রে যখন এইরাগ প্রকাশ করেন তখন চিরপরিচিত সুরের প্রভাব ও আকর্ষণকে কাটিয়ে উঠতে পারেন না, প্রধান গান্ধার, নিষাদের প্রয়োগ বেশ ভাল ভাবেই ব্যবহারে এসে পড়ে। সুতরাং বুঝতে হচ্ছে কোন কিছুর স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ স্বভাবই সহ্য করতে পারে না। যে সকল স্বরের অধিকার পেয়ে কাফীরাগের রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তাকে তার স্বররূপ থেকে তফাৎ করে গান্ধার, নিষাদ কোমল যুক্ত রাগ সমূহের জনক ধরে কাফীঠাট নামকরণের মধ্যে সত্য নির্ণীত হয়নি। আগেই বলেছি গান্ধার ও নিষাদ কোমল যুক্ত রাগগুলির মধ্যে পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান হয়ে স্নিগ্ধ-সরস ও সুন্দররূপে সিন্ধুরাগই প্রধান ও আদি। কাফীরাগের সুর নিজস্ব শক্তিতে বিস্তার বহুল নয় বলে তাই তার ধ্রুপদ গানের সংখ্যা এত অল্প। বহু ধ্রুপদ ছাড়াও সিন্ধুরাগের উপর খেয়াল গানের সবকিছু বন্দেজ ও গায়কী বজায় রেখে গাওয়া যেতে পারে কিন্তু কাফীর উপর তা করতে গেলে হোলী ঠুম্‌রীর রূপ এসে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। এজন্য কাফীরাগের যে টুকু প্রাধান্য তা বিশেষ করে হোলী গানের মধ্যেই পাওয়া যায়।

মারওয়া ঠাট :—

বলা হয়েছে দশটি ঠাটই সম্পূর্ণ জাতি। কিন্তু পঞ্চম বর্জিত ষাড়ব জাতির মারওয়া রাগকে উক্ত জাতির মধ্যে ধরে ঠাট নামে স্থান দেওয়ায় স্বভাবতই এই নিরাকরণের উপর ভীষণ আশ্চর্য্য লাগে। দশটি ঠাটই সম্পূর্ণ জাতি বলে নির্ণয় করে নিয়ে তাতে ঠাটের নামে মারওয়ারাগকে সাতটি স্বরে স্থাপিত করা কি করে চলতে পারে তার উত্তরে একটা গোঁজামেল দিয়ে সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে বুঝিয়ে

দেবার চেষ্টা করা ছাড়া সত্যের কোন যুক্তিতে আসবে না। তর্কের বিষয়ই নয়, তবুও বলতে পারা যায় পুরিয়ারাগের মত অত বড় রাগ, ঠাট নামের যোগ্য না হয়ে পুরিয়ার রূপের উপর ধৈবত ও কোমল ঋষভের অসামঞ্জস্য মিলনের প্রাচুর্য্য দিয়ে কড়াপাকে তৈরি করে নূতন মারওয়া নাম দিয়ে যে রাগ প্রচলিত হয়েছে তাকে প্রাধান্য দিয়ে ঠাটের নামে কি করে আসতে পারে তারও কোন সঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। মারওয়া রাগের মূর্ত্তির উপর তার দু'একটি রূপাঙ্গকে নিয়েই পুণরাবৃত্তির আধিক্য ঘটাতে বাধ্য হতে হয় কিন্তু পুরিয়ারাগে আছে তার বিরাট রূপের মধ্যে বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্র। পুরিয়ার ধ্রুপদ, খেয়াল যত সংখ্যক আছে তার শত সংখ্যার মধ্যে পঞ্চমাংশও মারওয়ায় আছে কিনা সন্দেহ। যে কয়েকটি ওই রাগের গান আছে তার প্রায় সবগুলিতেই দেখা যায় রচনাভঙ্গীর স্বররূপ প্রায় একই। এর কারণ,—একটি বড় রাগ থেকে নানান রাগ তৈরি করার মধ্যে তাতে তার সবলশক্তি এবং বিস্তারের নিজস্ব ক্ষেত্র বিশেষ থাকে না। সেগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই কেবল রাগ সংখ্যা বৃদ্ধি করে খেয়াল মিটান ছাড়া আর কিছু নয়। রাগরূপের সৃষ্টতত্ত্ব অনুধাবন করে যে সত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে এই সিদ্ধান্তে আসে, যে, দু' একটি ছাড়া পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান রাগগুলির সৃষ্টির স্থান পুরোভাগে এবং তাদের জনক রাগও বলা যেতে পারে। এ ছাড়া আমার কাছে সৃষ্টি তত্ত্বের আর এক সন্ধানের কথা আছে,—বিশেষভাবে একশ্রেণীর আদি জাতিদের ক্রমবিকাশের এক সময়ে যে সুর কণ্ঠে উদ্ভব হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখনও তা প্রকৃতির পরিবেশে যে সন্ধানের মাধ্যমে অনুভূত হয়েছে সেই সুরের রূপ যথা,—স-গ-ম-ধ-র্স,-র্স-ধ-ম-গ-স,— এই স্বরসমষ্টির উপর তাদের গানে থাকে—স-গ-স, স-গ ম-ম-স, স-গ-ম-ধ-ম-গ-স—এইরকম পূর্ব্বাঙ্গ স্বরেরই বেশী পুনরাবৃত্তি নিয়ে। রাগরূপের উপর আমার ধ্যান-চিন্তার দ্বারা গবেষণা করে মনে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, উক্ত আরোহণ-অবরোহণের সুর থেকে তার ছন্দনৃত্যের দোলনে একসময় হিন্দোল নামে রাগের সৃষ্টি হয়। হিণ্ডোল বা হিন্দোল মানে দোল্না। প্রাচীন রচিত গানেও হিণ্ডোলের এই অর্থ আছে। তারপর ক্রমশঃ তিনটি জাতি-নির্ণয়ের সময় ওই রাগকে শাস্ত্রে সংরক্ষিত করবার জন্য নিষাদস্বর সংযোজিত করে ঔড়বত্বে পরিণত করা হয়, পরে আবার প্রধান মধ্যম কড়িমধ্যমে এসে যায়। এই সুরের রূপ থেকেই বহুপরে অর্থাৎ কোমল স্বরের প্রচলন সময়ে কোমল ঋষভ যুক্ত হয়ে সময়োপযোগীরূপে দিবা চতুর্থ প্রহরের পুরোভাগে স্থাপিত হয় পুরিয়ানাম দিয়ে রাগটির। এরই রূপের উপর দিয়ে স্বরের বিভিন্ন প্রকরণের দ্বারা কুমারী, মাল্শ্রী, ইত্যাদি এবং তারপর পুরবী, ধানশ্রী, ত্রিবেণী, শ্রী, গৌরী প্রভৃতি রাগের রূপ সৃষ্টি হতে থাকে। আমি মনে করি এই সৃষ্টিতত্ত্বকে উপলব্ধির মধ্যে আনতে রাগরূপের উপর ধ্যানস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে হয়ত অসম্ভব হ'বে না। এই আলোচনার স্থলে যে সব যুক্তি দিয়ে পুরিয়ারাগ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হল তাতে ঠাটের উপর আমার মতে মারওয়া নাম থাকার কোন অর্থ আছে বলে মনে করবার নেই। যদিও সম্পূর্ণ জাতি ধরে পুরিয়াকে স্থাপন করলেও সম্পূর্ণ ন্যায়-নীতি বর্জিত হত।

পূরবী ঠাট :—

বিষ্ণুপুরের মত এক প্রাচীন ঘরাণায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিশেষ বিশেষ ঘরণা হ'তে যত সংখ্যক পূরবী রাগের ধ্রুপদ, খেয়াল এসেছিল—বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের মাধ্যমে তারমধ্যে কোন গানেই কোমল ধৈবতের ব্যবহার নেই এবং বাল্যকাল হ'তে ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীতগুণীদের কাছে ধ্রুপদে এবং বীণাদিযন্ত্রে পূরবীর রূপ যেভাবে শুনে এসেছিলাম তাতে প্রধান ধৈবতকে আশ্রয় করেই সুরের রূপ রচনা ছিল। আমার মনে হয় প্রকৃত ঘরাণা গুণীদের প্রাচীন ধ্রুপদ গানে কোমল ধৈবত ব্যবহারের নজির পাওয়া বিরল হ'বে। যাই হোক্ ব্যবহার হওয়া না হওয়ার নজিরই বিচারের সম্যক প্রমাণ বলে মানতে না চাইলেও রাগরূপের বিজ্ঞানগত তথ্যকে নিয়ে বিচার করে দেখতে হ'বে কোমল ধৈবত ব্যবহার থাকা যুক্তিযুক্ত কি-না। এই বিচার প্রত্যেক রাগের উপরই সমান প্রযোজ্য। পূরবীরাগের রূপ পরিচয়ের স্থানে এই বিষয়ের বেশকিছু আলোচনা করেছি। এ স্থলে একটা কথা জানাই, পূরবীর উপর যদি দুই মধ্যম যুক্ত করে তার রূপকে দেখান না যায় তাহলে ঠাটই হোক আর যেভাবেই হোক পূরবীর কোন পরিচয়ই আসবে না। সুতরাং শুধুমাত্র কোমল ধৈবত-ঋষভ এবং কড়িমধ্যম দেখিয়ে তাকে পূরবী ঠাট বললে কি করে গ্রাহ্য করা যেতে পারে? বরং তার স্বররূপকে যদি কেউ পুরিয়া-ধানশ্রী বলেন তাহলে সঙ্গত বলাই হ'বে এবং ঠাটের পরিচয়ে তারই নাম থাকতে হয়।

তোড়ী ঠাটের রাগভুক্তিতে মূলতান রাগ ছাড়া আর কেউ নেই। এ সবই অহেতুক তবুও বলতে হয় দু'একটি রাগের জন্য যদি ঠাট সংখ্যা গড়তে হয় তাহলে সংখ্যার নিয়মে আরো অনেক সংখ্যা ন্যায়তই বেড়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আছে,—তোড়ীর রূপ এখন যে নিয়মে আমরা অঙ্কন করি, সেই নিয়ম লেখকের সময়কালেও ছিল এবং মনে হয় তাঁর দেওয়া গানেও সেই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে, অর্থাৎ আরোহণে পঞ্চম ব্যবহার না করার রীতিতে। সুতরাং আরোহণে পঞ্চম স্থাপন করে সেই জাতিস্বরের উপর ঠাট নামে তোড়ী রাগ কি করে থাকতে পারে? বরং মূলতান হ'তে পারত। দেখেছি আগের কোন কোন গানে ও গ্রন্থে তোড়ীরাগের উপর আরোহণে পঞ্চম ব্যবহার ছিল এবং স্বভাবের আকর্ষণে আরোহণ থেকে টেনে এনে কোমল নিষাদকেও প্রকাশ করা হত। কিংবা প্রাতঃকালের প্রভাব রাখবার জন্য উক্ত স্বরকে প্রয়োজন নিয়ে ব্যবহার হত। এই প্রচারিত সুরের রীতিতে আরোহণে পঞ্চমের স্থান থাকলেও তার বাদীস্বর হবার মত প্রয়োগশক্তি ছিল না। যত প্রকারের রাগরূপ আছে তার প্রত্যেকটিতেই দেখতে পাওয়া যায় তাদের পরিচয়ের প্রধান শক্তিরূপে আছে প্রধান স্বর এবং প্রধান স্বর যুক্তথেকেই তাদের রূপমাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়ে আছে, তা যে কোন রাগে যত বেশীই কোমল স্বর থাক না কেন। স্বভাবেরদ্বারা সৃষ্টরাগই হোক আর সুরসাধকদের দ্বারাই হোক্ এই নিয়মই প্রত্যেক রাগের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর দ্বারা বেশ বুঝা যায় প্রধান স্বর থাকলে কেন তার বাদীত্বশক্তি থাকে এবং বিচারবোধ রেখে ন্যায়ত তাকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই নীতি-নিয়ম ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে তোড়ীরাগে। এরকম

ব্যতিক্রমের রাগরূপ আমার দৃষ্টিতে আর অন্য কোন রাগের উপর আসেনি। অর্থাৎ আরোহণ অবরোহণে প্রধান স্বরের প্রভাববর্জিত কোন রাগ আছে বলে মনে হয় না। রাগ-সংগীতের যে বিরাট দর্শনরূপ ও বিজ্ঞানশক্তি আছে তাকে যদি জ্ঞান-বোধ নিয়ে স্বীকার করা হয় তাহলে এ কথাই বলতে হবে তোড়ীরাগের প্রথম সৃষ্টিরূপ বর্ত্তমানের আকারে হয়ত ছিল না ; উক্ত নীতি-নিয়ম ধরেই রচিত হ'য়েছিল এবং তার বাদী-সংবাদী প্রধান স্বরই ছিল। তারপর পঞ্চমের বাদীত্বশক্তির আধিপত্য ক্রমশঃ কমিয়ে দিয়ে তাকে আরোহণ থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। কোমলগান্ধার-ধৈবত এবং কড়িমধ্যম এই তিন স্বরকে নিয়ে মুদারা সপ্তকে অত্যধিকভাবে ব্যবহার করার জন্যই মনে হয় এই অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে। এখন যেমন কেউ কেউ মারওয়ারাগেব উপর 'রে' ও 'ধা' সুরকে নিয়ে এমনভাবে মাতওয়ারা হয়ে থাকেন যে মনে হয় 'সা' সুরকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত কিছু দিন পরে এমনও শুনতে পাওয়া যেতে পারে মারওয়া 'সা' বর্জিত রাগ।

তোড়ীরাগের আরোহণে পঞ্চমকে কেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার অবশ্য একটা কারণও এইভাবে পাওয়া যায় ;— রাগরূপ সৃষ্টি করার নীতি নিয়ম ধরে পঞ্চমকে আরোহণ অবরোহণে বিশেষভাবে স্থাপন করে বাদীত্বের অধিকার দিয়ে বা স্বভাবতই বাদীত্ব শক্তিতে এসে গিয়ে যেভাবে এর সুরের রূপ দাঁড়িয়ে যায় তাতে কড়ি মধ্যম, পঞ্চমে ও ধৈবতের নিকটবর্ত্তী ক্রিয়ায় এবং আরোহণেরও মাধ্যমে স্বভাবতই প্রকৃতির বৈকালিক রূপের সংগে সম্পর্ক এসে গেছল। তার জন্যই মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে দিবা-কালের নিয়ভাবে উক্তরাগকে অতি সঙ্গত ভাবে রাখবার আবশ্যক হেতু সাধক শিল্পীরা আরোহণে পঞ্চমকে সরিয়ে দিয়ে পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান রাগরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাই হোক্ মোটের উপর তোড়ীরাগের প্রচলিত রূপ এত বিরাট ও বিস্তৃত ও মহিমময় যে তার রূপ গঠনের উপর নীতি নিয়মের বিতর্ক থাকলেও তাকে ত্যাগ না করে পারা যায় না। আমি আরোহণের উপর পঞ্চমকে বিশেষভাবে স্থাপন করে সুর রচনা করে দেখেছি কিন্তু মনঃপূত হয়নি। অর্থাৎ বৈকালিক প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না। সেখানে যথা সঙ্গতভাবে মূলতানরাগই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যথেষ্ঠ প্রভাব নিয়ে।

পূর্ব্বে বাদী, সংবাদীর আলোচনায় তোড়ীরাগের বিষয় ধরে যা বলা হয়েছে তা ব্যাপক প্রচারিত ও আমাদের সকলের চর্চার রূপকে গ্রহণ করে। আগে গুণীদের মুখে শুনেছি তাঁরা বলতেন বাদী, সংবাদী কোন রাগেই কোমল স্বর হবে না—কারণ ইহা রাগ বিজ্ঞানের নিয়ম ও ধর্ম্ম। কয়েক বছর আগেও একজন নাম করা ধ্রুপদ গায়ক এ কথা বলায় আমি বলেছিলাম তোড়ীরাগের গান্ধার-ধৈবত বাদী, সংবাদী ছাড়া প্রধান স্বর কি করে হ'বে ? তিনি এর যথাযথ জবাব দিতে না পেরে চুপ করে থেকে যান, কিন্তু বহুপরে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বুঝে ছিলাম সত্যই এ কথার যথার্থ অর্থ আছে এবং তোড়ীরাগ যেন এখন এই বিষয়ে এক বিরাট ব্যতিক্রমে এসে গেছে। এখন বেশ বুঝতে পারা যায় গুণীদের মুখে শুনা ওই কথা রাগরূপ সৃষ্টির এক বিরাট নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

আশাবরী ঠাট ঃ—

সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের প্রায় পঁনরআনারও বেশী আশাবরীতে প্রধান ঋষভ ব্যবহার করেন না এবং প্রাচীন ধ্রুপদ খেয়ালের মধ্যেও আমরা পাইনি। তত্রাচ প্রধান ঋষভের উপর আশাবরীর উৎপত্তি ও ঠাট বলা, এ যেন এক অনুপযুক্ত ও অহেতুক নির্দেশ। ওই স্বর সংযোজনাকে বরং জৌনপুরী ঠাট বলতে পারতেন। অবশ্য তাতেও ভুল থাকত। কারণ—জৌনপুরী ষাড়ব সম্পুর্ণ রাগ, আরোহণে গান্ধার নেই। বিশেষ ভাবে জানি—যাঁরা এই ঠাট ব্যবস্থা মেনে চলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উক্তরাগে কোমল ঋষভই ব্যবহার করেন এবং তাই যথার্থ। তাছাড়া আরোহণে গান্ধার নিষাদ বাদ না দিলে আশাবরী নাম উচ্চারণেই আসবে না বা আসতে পারে না

কল্যাণ ঠাট ঃ—

প্রাচীন ধ্রুপদের প্রত্যেক গানের আরোহণে কল্যাণ রাগের রূপে কড়ি মধ্যম ও নিষাদ আছে সত্য কিন্তু তা অল্প মাত্রায় এবং অস্থায়ীরূপে। দশ ঠাট নির্ম্মেতার প্রায় সময় কাল থেকে দেখে আসছি অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞরা আরোহণে কড়ি মধ্যম এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিষাদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে এই রাগ প্রকাশ করে আসছেন। যাই হোক্ মোটের উপর আরোহণে কড়ি মধ্যমের উপর প্রধান কল্যাণ ঠাট বলে পরিচয় না দিয়ে ইমন ঠাট বলাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কল্যাণকে প্রধান বা জনকরাগ ধরে ভূপালীকে যদি তার অধীনস্থ রাগ বলে পরিচিত করা হয় তাহ'লে রাগসৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অজানা বশতঃ হয়েছে বলতে হ'বে। ভূপালী নামের রাগরূপটি এসেছে প্রকৃতির দ্বারা স্বভাবগত হয়ে এক শ্রেণীর আদি জাতিদের গানের সুর থেকে।

বাংলার বাইরে পাহাড়ী অঞ্চলে আমি বহুবার সেখানকার আদিবাসীদের কণ্ঠে শুনেছি এই রকম সুর, যথা—সারে্ গাপা্ গারে্ সা, ধাপা্ গাপা্ গারে্ সা···।” এই বাস্তব প্রমাণের দ্বারা স্বীকারে আসছে ভূপালীর সুর থেকেই পরে কল্যাণ রাগের সৃষ্টি এবং তার বহু পরে হয় ইমন রাগের সৃষ্টি। সুতরাং প্রধান বা জনকরাগ ভেবে যদি ঠাট নাম করণের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেই নামপদবাচ্য ভূপালীরই থাকবে। অবশ্য ঠাটে কড়ি মধ্যম দেখানর ইচ্ছে নিয়ে থাকবে না। সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে দেখা যাচ্ছে ভূপালীরাগের রূপপ্রভাবের মধ্যেদিয়েই যেন ক্রমশঃ ভাবের প্রেরণায় মন আন্দোলিত হ'য়ে ষড়জের নিম্নে নিষাদ এবং পঞ্চমের নীচে কড়িমধ্যম এসে গিয়ে এক সুন্দর ভাবতাৎপর্য্য সুরের রূপ প্রকাশিত হওয়ায় সেই সুরকে রাত্রের প্রথমে ভগবৎ প্রার্থনার উপযোগী ধরে তার রূপকে কল্যাণ নামে পরিচিত করা হয়। বহুপরে কল্যাণের সুর থেকে যখন ইমন রাগের সৃষ্টি হয় তখন এক সময় ওই দুই-এর যুক্তরূপের উপর প্রেমিক ভাবুকশিল্পীসাধকের অন্তরে ভক্তির প্রেরনায় কণ্ঠে এসে যায় গান্ধারের সংগে উপর দিকের প্রধান মধ্যমের আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে আবেগ-আবেদনের মিলন মধুর রূপ এবং সেই স্বরের প্রকাশ নিয়ে ইমন-কল্যাণ নামে পরিচিত হয়। এই প্রসঙ্গে আমার এক উপলব্ধির কথা,—

যখন স্বরের সাধনায় বসি তখন আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় ওঁ শব্দ ধরে মীড় যুক্ত করে এইভাবে—

স-র-ধ্-র, স-ধ্-প্-স, স-গ-র-স-ধ্-প্, প্-স, গ-প,-গ-স-গ, ধ্-র, স-ধ্-স
ও ম্ ও ম্ ও ম্ ও ম্ ও ম্ ও ম্ ও ম্

ইত্যাদি স্বরের রূপ গাওয়া যায় তখন যেন অন্তরে উদয় হয় দর্শনের এক গভীরতম সুরের রূপ এবং ভাব-ভক্তির দ্বারা মনকে উর্দ্ধগামী করে দেয়। পাঁচসুরের এই রূপপ্রভাব যেন সামগানের শাশ্বত মূর্ত্তিরই এক প্রতীক বলে মনে এসে যায়। যাই হোক্ এই সুর ভূপালীনামের মধ্যে দিয়েই প্রচারিত হয়ে এসেছে এবং কল্যাণ প্রভৃতি রাগের জনকরূপেই চিরধার্য্য হয়ে থাকবে।

ঠাট রচনার প্রসঙ্গ ধরে এখনও অনেক কিছু বলবার আছে। পূর্ব্বেই জানিয়েছি স্বর সংযোজনার সম্বন্ধ ধরে রাগের বর্ণ নিরাকরণের মধ্যে কোন সঙ্গত ব্যবস্থা হতেই পারেনা,। অর্থাৎ গোষ্ঠিভুক্তর কোন অর্থ হয় না। যেমন সাদা, লাল, নীল, হলদে বললেই ফুলকে চেনা যায় না। যুঁই, পদ্ম, কেতকী, মালতী, কুন্দ, বেল,—এগুলি সাদাফুল, কিন্তু এই সাদা কথার পরিচয়টুকু পেয়েই কি তাদের সমন্ধে কিছু জানা হতে পারে,—যতক্ষণ না গাছের আকৃতি, গঠন, তার শাখা-পল্লব, ফুলের আকৃতি ও গঠনরূপ এবং সৌরভ জানা যায়। এস্থলে ওই রং-এর নিয়ম ধরে—এক কোমল যুক্ত, দুই, বা তিন কোমল যুক্ত, চার কোমল যুক্ত, প্রধান স্বর যুক্ত ইত্যাদি ধরে রাগ সমূহের উপর ঠাট গোষ্ঠির ব্যবস্থাও তেমনি অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয়। আর একটা কথা—শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বুঝে রাগ নির্ব্বাচন করতে হয়। যেমন মনে করা যাক্—কারো ইমন রাগটি শিক্ষার পক্ষে সে সময় উপযোগী,—কল্যাণ রাগ নয়। সুতরাং তখন শিক্ষার্থীর কল্যাণ রাগ না জানার অবস্থায় ইমন,—কল্যাণ ঠাটের রাগ, এই কথা বলে দিয়ে কি তার উপকার হবে?

শাস্ত্রীয় সংগীতে মিশ্ররাগের সংখ্যাও বড় কম নেই, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তথাকথিত কোন ঠাটের মধ্যেই পড়তে পারে না। ঠাট নিরাকরণের এই ব্যবস্থা চোখ বুজে মেনে না নিলে বুঝতে দেরি হবে না শিক্ষার ক্ষেত্রে এ এক বিভ্রান্তিকর গোলকধাঁধা ছাড়া আর কিছু নয়। বহুল প্রচারিত ললিতরাগকে যদি মারওয়া ঠাটের রাগ বলতে হয় তাহ'লে নিজের বিচারবুদ্ধির উপর অন্ধ হ'য়েই বলতে হ'বে। আর একটা সহজ কথা—ভূপালীরাগ শিক্ষার সময় শিক্ষার্থীর বয়েস বুঝে রাগের বর্জিত স্বর, ব্যবহৃত স্বর, বাদী, সংবাদী এবং বলীস্বর ইত্যাদির বিষয় জানিয়ে দিতে হয়, তেমনি ইমন, কল্যাণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি রাগ শিক্ষার সময়েও অনুরূপভাবে জানতে হয়। ঠাট কথার উচ্চারণের কোনরূপ অর্থনিয়ে প্রয়োজনেই আসে না। সুতরাং যুক্তিযুক্তমতে ঠাট নিরাকরণ করার মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছু নেই, বিশেষ করে সঙ্গত বিচারের এত অভাবের মধ্যে। আগে বহু সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে দু'টি ধারায় স্বীকৃত হ'য়ে ঠাট নাম দিয়ে রাগ বিভাগের এক ব্যবস্থা বহুকাল ধরে চলে এসেছিল। সে দুটির নাম স্বাভাবিক এবং বিকৃত ঠাট। এর অর্থ—যে সমস্ত রাগে কড়ি-কোমলাদি ব্যবহার হয় না সেগুলি স্বাভাবিক ঠাট এবং যেসব রাগে উহা ব্যবহৃত হয় তারা বিকৃত ঠাট বলে পরিচিত হ'য়ে

এসেছিল। এই নিরাকরণের মধ্যে মোটামুটি একটা চিহ্নিতকরণ ছিল, তবে এই দু'টি নাম নেওয়া হ'য়েছিল বীণাদি যন্ত্র থেকেই। পর্দ্দাযুক্ত যন্ত্রে আগে পর্দ্দা বা ঘাটের সংখ্যা ধরে দুটি নাম প্রচলিত হু'য়ে এসেছিল। যেমন, যে যন্ত্রে কোমল-কড়ির জন্য পর্দ্দা সরাসরি করতে হত তাকে বলা হত সচল ঠাটের যন্ত্র, আর যে-যে-যন্ত্রে কড়ি-কোমলের পর্দ্দা থাকত, সরাসরি করতে হত না তাকে বলা হত অচল ঠাটের যন্ত্র। যন্ত্রে সচল ঠাটই প্রথমে ছিল, বহুপরে 'অচল ঠাট' হয়। অবশ্য প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিচার করলে এগুলির কোনটিই যথাযথ গ্রহণযোগ্য নয়।

আজকাল কথায় কথায় রাগের নামের পূর্ব্বে অহেতুক ঠাট কথা শুনতে হয় বলেই এত বিশদ করে লিখবার আবশ্যক হয়ে পড়ল। ঠাট নিরাকরণের মধ্যে যদি সঙ্গত যুক্তি থাকত তাহলে আমি সাগ্রহে সমর্থন করতাম।

সময়ের সঙ্গে রাগের সম্পর্ক বিচার

কেউ কেউ বলেন সময়ানুযায়ী রাগ গাইবার মুলে বিজ্ঞান সম্মত কোন যুক্তি ও অর্থ নেই, এ কেবল একটা অভ্যাসগত সংস্কার মাত্র। প্রাতঃকালের নির্দ্ধারিত ভৈরবীরাগকে যদি রাত্রে গাওয়া হয় তাহলে কি তার রূপ পৃথকভাবে প্রকাশিত হবে? এবং রসাস্বাদানে কি কোন পার্থক্য আসতে পারে?

এইসব কথার উত্তরে অনেক কিছু বলবার আছে, তবে এ স্থলে যতটা সম্ভব স্বীয় মত ব্যক্ত করলাম।

সময়ের রাগ অসময়ে গাইলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, তা সত্য কিন্তু সময়ের রাগকে সেই সময়ে গাওয়ার মধ্যে যে সুন্দর ব্যবস্থাও বিজ্ঞান সম্মত অর্থ আছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। সময়ানুযায়ী রাগের মধ্যে যে সকল স্বর ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ কড়ি, কোমল, তাদের রূপের উপর শ্রুতির তারতম্যানুসারে স্বর প্রয়োগের দ্বারা সময়ের সংগে রাগসম্পর্কের নিবিড়তা আনয়ণে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। উদাহরণ,— যেমন কানড়া এবং জৌনপুরীরাগ ;— কানড়া রাত্রের রাগ, জৌনপুরী দিবাকালের প্রথম অংশের রাগ। কানড়ার রূপে কোমল-গান্ধার মধ্যমকে স্পর্শ করে তীব্র কোমল এবং কোমল নিষাদ স্পর্শ করে তীব্রকোমল ধৈবত এবং কোমল নিষাদকে প্রকাশের সময়ও তীব্র কোমল করতে হয়। উক্ত কোমলগুলির যথাস্থানের কোমল হতে একশ্রুতি উচ্চে প্রকাশ করতে পারলে তবেই কানড়ার যথার্থ রূপ প্রকাশিত হয়ে রাত্রের গাঢ় ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সময়ের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। এই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কণ্ঠের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় সেই সময়টিই উপযুক্ত রূপে নিরাকৃত হয়ে আছে। আজ কাল অনেকে খেয়াল গানের সময় সা রে গা মা পা ধা নি- কে সহজ স্বরের উপর সরল গতিতে প্রয়োগ করে কানড়ার রূপভাবকে অনেকখানি তরল করে ফেলেন। মিষ্টত্বের প্রয়াসে তখন সিন্ধু-ভৈরবীর মিশ্রিত রূপভাব এসে হঠাৎ উক্ত রাগরূপে প্রকৃত রস সৌন্দর্য্যের গাঢ়ত্ব বিঘ্নিত হয়ে

যায়। রাগরূপের স্বভাব অনুযায়ী স্বর প্রয়োগের প্রতি সর্ব্বদা সচেতন থেকে রাগের যথার্থরূপ ও প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার বিশেষ দায়িত্ব আছে।

জৌনপুরির মধ্যে স্বর প্রয়োগের নীতি নিয়ম উক্ত রাগের মত বক্রগতিতে স্বর সংযোগ এবং শ্রুতির তারতম্য নিয়ে নেই। কোমলস্বর তাদের যথাস্থানে প্রকাশিত হ'য়ে প্রাতঃকালের রূপভাব উৎপন্ন করে। প্রাতঃকালের যে সমস্ত রাগ আছে, তাদের স্বর প্রয়োগের সময় শ্রুতির মধ্যে স্নিগ্ধভাব প্রকাশ পেলে তবেই সেই সময়ের প্রকৃতির সংগে তাদের রূপপ্রভাব সম্পর্ক বজায় থাকবে এবং সেইভাবেই প্রকাশ করতে হয়। সময়ের পরিবর্ত্তিত অংশের সংগে প্রকৃতির রূপের পরিবর্ত্তন যেভাবে হয় সেই তার সংগে মিলন সম্পর্ক রক্ষা করে প্রধান রাগসমূহের ব্যবহার নির্দ্ধারণ হয়ে আছে এবং সেই মিলন সম্পর্ক যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে একান্ত দৃষ্টি রাখার আবশ্যক রাখতেই হয়। রাগসমূহের সংগে সময়ের সম্পর্ক এত বেশী দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তি নিয়ে উন্নত, যে মনে হয় এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা বোধহয় আর কোন দেশের সঙ্গীতে নেই।

সময়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো আলোচ্য বিষয় এই,—দীর্ঘ বিশ্রাম ও নিদ্রার পর প্রাতঃকালে আমাদের শরীর ও মন থাকে প্রাতঃপ্রকৃতির মতই উগ্রতাশূন্য অর্থাৎ সরস ও কোমল। কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত স্নায়ু সমস্ত তখন তেমন সজীবসত্বার শক্তি নিয়ে থাকে না। এজন্য কণ্ঠের স্নায়ুসকলকে তখনকার সেই অবস্থানুযায়ী পরিচালনা করবার আবশ্যক থাকে এবং কণ্ঠস্বরের স্থায়ীত্ব ও মিষ্টত্ব রক্ষা করার জন্য প্রাতঃকালের শান্ত ও কোমল প্রকৃতির রাগগুলিই বিশেষ করে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য ধার্য্য হয়ে আছে। সুতরাং আমাদের সবদিক দিয়ে প্রয়োজন আছে বলেই সময়োপযোগী রাগ গাইবার দায়িত্ব আছে একথা মনে রাখতে হয়। দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক দিয়ে এই রাগ নির্ব্বাচনী ব্যবস্থা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিসম্মত বিজ্ঞান।

গভীর রাত্রের বেহাগকে প্রাতঃকালে গাইলে স্বরনালীর তখনকার স্নায়ুসকলের উপর চাপ পড়ে। সুতরাং বেহাগ রাগের স্বাভাবিক রূপভাব যেরূপ তাতে তাকে ওই সময়ে আনবার উপযুক্ত নয়। এ ছাড়াও রাত্রের প্রকৃতিগত ভাবরূপের অভাব ঘটবেই। ওই রাগ গান্ধার ও নিষাদের বাদী-সংবাদীত্বে পঞ্চমকে নিয়ে দুই মধ্যমের গড়ান ভাব তার যথার্থ রূপের মধ্যে যেভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার সুরের মধ্যে শ্রুতির তীব্রতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় সেই অবস্থার সুর যদি প্রাতঃকালে প্রকাশ করা যায় তাহলে স্নায়ুসকলের ক্ষতি হতে পারে।

বেহাগের সুর করুণ রসাত্মক। মধ্যরাত্রির সংগে শরীরের যে সম্পর্ক থাকে তাতে তখন আসে পরিশ্রান্ত অবস্থার কাঠিন্য ভাব। জেগে থাকতে হ'লে কেবলমাত্র কোন বিশেষ প্রয়োজনেই হয়, কিন্তু মানসিক অবস্থায় তখন পরিশ্রান্ত ও কাঠিন্য ভাবের সৃষ্টি করে। এজন্য শরীরে তখন ক্লান্তি এলেও স্নায়ুসকল উত্তপ্ত থাকে, এই কারণ ধরে শরীরের স্বভাব ধর্ম্মে বেহাগের যথার্থ রূপ ভাব রক্ষার জন্য

তার স্বরের শ্রুতিগুলিকে যেভাবে কণ্ঠে প্রকাশ করবার আবশ্যক থাকে তা প্রাতঃকালের উপযোগী নয়, স্নায়ুসকল তখন শান্ত ও স্নিগ্ধরস উৎপাদনেরই উপযুক্ত থাকে। বেহাগের প্রকৃত যা রূপ তাতে সময় ও তার স্বভাব অনুযায়ী স্বরের শ্রুতির মধ্যে উত্তপ্ত ভাব থাকে। সুতরাং প্রাতঃকালের কণ্ঠের অবস্থা ধরে তার উপর তীব্র বা বিপরীত রস উৎপাদন করতে গেলে কণ্ঠের ও মনের উপযোগী হবে না। শরীর, স্বাস্থ্য ও মনের সংগে রাগরূপের সম্পর্ক কিভাবে সংযোজিত করে রাখা প্রয়োজন সে বিষয়ে গভীর চিন্তা রেখেই প্রকাশের সময় নিরূপিত হ'য়ে আছে এবং নিজস্ব অনুভব শক্তির অভিজ্ঞতায়ও নিরূপণ করতে হয়। রাত্রি অধিক হয়ে গেছে, প্রতীক্ষায় মনে অস্থিরতা এনে দিয়েছে,—বেদনায় চক্ষু বাষ্পাকুল, আশার আলো প্রায় ক্ষীণাবস্থা, এই যে মানসীক ভাবের অবস্থা একে প্রকাশ করতে তখন বিশেষ করে পারে বেহাগের করুণ উদ্বেলিত সুরই। সুতরাং বেহাগকে অসময়ে প্রকাশ করতে গেলে (বিশেষ করে দিবা কালে) বেহাগের রূপ প্রকাশ হবে বটে কিন্তু তার স্বভাব ও ভাবের ঘরে শূন্যতা এনে দেবে। রাগরূপের রসনির্ণয় ধ্রুপদ গানের মাধ্যমেই স্বাভাবিকভাবে করতে পারা যায় এবং তাই করতেও হয়। অর্থাৎ স্বভাবধর্মে রাগের ভাব ও রস যেভাবে প্রকাশ পায় তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে ধ্রুপদ গানের অবয়বের প্রতি একান্তভাবে দৃষ্টি দেবার আবশ্যক আছে। আমার সাধনার অভিজ্ঞতায় বল্‌ব ধ্রুপদগান যদি জানা না থাকে তাহলে রাগরূপের ভাব ও রসের বিচার যথার্থভাবে করতে পারা খুব শক্ত হবে। অবশ্য যদি সাধনায় রাগরূপের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তা হলে স্বতন্ত্র কথা।

অনেকের ধারণা আছে যে, সমস্তরাগেই যখন তাদের রূপ বিলম্বিত ক্রিয়ায় প্রকাশ পায় তখন সুকণ্ঠ দরদী গায়কের দ্বারা করুণ ও মধুর রসেরই সৃষ্টি হয়; দ্রুতগতিতে এবং যখন জোরাল তান সমূহ সংযোজিত হয় তখন আসে সমস্ত রাগের মধ্যেই দীপ্ত ও বীর রস। এ ধারণাটি সহজভাবে গ্রহণ যোগ্য বটে কিন্তু যথার্থ বিচার সম্মত নয়। কারণ বিচার ও অনুভবের দ্বারা দেখতে পাই প্রত্যেক রাগের মধ্যেই নিজস্ব একটি ভাব-রস আছে। এইভাব ও রস সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ খেয়াল এবং টপ্পা বা ঠুম্‌রী ইত্যাদির মত তান বহুল গানে যথাযথ হওয়া সম্ভবপর নয় এ কথা আগেই জানিতেছি। এ সম্বন্ধে একটি সহজবোধ্য উদাহরণ ভৈরবীরাগকে নিয়ে দেখান যায়। এই রাগে খেয়াল প্রায় কেউই গান না। কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, উক্তরাগে খেয়ালের সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করা চলেনা—অর্থাৎ খেয়ালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ দেখাতে গেলে ঠুম্‌রীর গায়কী (ষ্টাইল) এসে যায়। অবশ্য আমি এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিনা, তবে এস্থলে সাধারণমতটিকে গ্রহণ করে তার সম্বন্ধে ভাব-রসের যে আলোচনা আছে তাতে দেখা যায় ওই রাগের শ্রেণীগত গানের মধ্যে তান ও গমকে তার ভাব ও রস এক ধরণের ভাব-নিয়ে সৃষ্টি করে, আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিয়ার দ্বারা এবং প্রয়োজনানুসারে দ্বাদশটি স্বরের প্রয়োগ কৌশলের দ্বারা আর এক প্রকার ভাব ও রসের সৃষ্টি হয়। শ্রেণী পর্য্যায়ে প্রথমটিকে টপ্পা অঙ্গের সুর এবং দ্বিতীয়টিকে ঠুম্‌রী অঙ্গের সুর বলা হয়। এই দুটির মধ্যে প্রথমটিতে পাওয়া যায় সুরের সংমিশ্রনে

গানের রচনানুযায়ী ভক্তিরস এবং প্রেমানুরাগের উদ্বেলিত ভাব ও রস। দ্বিতীয়টিতে আসে অতি মধুর করুণ রসযুক্ত প্রেমের আত্ম নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা এবং রচনাক্ষেত্রে লাস্য ভাবও। এই যে ভাব ও রসের ভিন্নাকৃতি, একে আনে রাগের মধ্যে ওই শ্রেণীর গানের উপর নির্দ্ধারিত ও ব্যবহৃত স্বর সমূহের নানান বৈচিত্র্যের উপর চঞ্চল ভঙ্গীর রচনা। কিন্তু সুরের ওই রচনা বস্তুকেই ঐরাগের যথার্থ ভাব ও রসের প্রতীক বলা যেতে পারে না। কারণ সাজ-সজ্জা ও অলঙ্কার দিয়ে রাগ-রূপের অন্তর্নিহিত ভাবকে যথাযথভাবে বিচার করা যায় না। পুণরোক্তি করে বলতে হচ্ছে রাগকে সঠিকভাবে তার রূপ ও রসকে বুঝবার জন্য প্রয়োজন আছে অনাড়ম্বর সাবলীল-গতী-ভঙ্গী যুক্ত পূর্ণাবয়ব ধ্রুপদের শান্ত ও সমাহিত মূর্ত্তিরদিকে তাকাবার। এই দৃষ্টানুভবের দ্বারাই বুঝা যায় রাগের ভাব ও রস বস্তুটি কিরূপ। ভৈরবীর প্রত্যেকটি ধ্রুপদ গানের মধ্যে রাগের রূপকে উপলব্ধি করি যেন ভগবৎচিন্তামগ্ন ধ্যানস্থ প্রফুল্লভাবযুক্ত শান্ত, স্নিগ্ধ এবং স্মিত হাস্যময় রূপ ;— করুণ রসের কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। এমনিভাবে বেহাগরাগের ধ্রুপদের মধ্যে পাই ভিন্নভাবে তার পূর্ব্বোক্তভাব বর্ণনার মতই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা, রাগের মধ্যে সংযোজিত স্বরসমূহ, বাদী, সংবাদী, স্বরগতির নিময় এবং পূর্বাঙ্গ ও উত্তররাঙ্গ সমস্ত বস্তুকে নিয়ে রাগরূপের স্বভাবগত ভাবতাৎপর্য্যকে সযতনে ধরে স্থিরভাবে নিষ্ঠা পূর্বক সুঅঙ্কিত করে বীণাদি যন্ত্রের আলাপে প্রকাশ করতে পারলেও রাগের স্বাভাবিক রূপ, রস ও ভাব উপলব্ধি হতে পারে। এসব বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ধ্রুপদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলাম বলে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, প্রত্যেক রাগের প্রত্যেক ধ্রুপদ গান একই নিয়মে সুরের অঙ্কন এবং উত্থান ও স্বর সংযোজনা নিয়ে তার সঙ্গে ভাষার ভাব রচনা একই প্রকারের কৈ নেই তো? সুতরাং ওকেই বা কি করে রস-বিচারের আদর্শ স্থল বল্‌ব? এর উত্তরে আমার যুক্তির মধ্যে বলার কথা এই—যে ধ্রুপদগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় রাগের প্রকৃত দর্শন রূপ এবং বিজ্ঞান যুক্ত হয়ে স্বর প্রণালীর মধ্যে রচিত হয়েছে সেইগুলির মধ্যেই সবকিছুর সন্ধান লাভের উপায় নির্দ্দেশিত হয়ে আছে। এই বিষয়ের বোধজ্ঞান গভীর-মনোনিবেশ সহকারে সাধনা করে যেতে পারলে তবে আসে, এবং সব কিছুর উপর ঝাপ্‌সা দৃষ্টি সরে গিয়ে স্বচ্ছতা আনে।

রাগগুলির সময়ের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে কত বেশী সে সম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ,—রাগটির নাম ললিত, এই রাগটিকে একেবারে শেষ রাত্রে প্রকাশের জন্য নির্দ্ধারণ হয়ে আছে এজন্য যে, তার রূপভাব অত্যন্ত কোমল-করুণ-বিয়োগ বেদনাকুল। অর্থাৎ নিরাশার অবসাদে এলিয়ে পড়ার মত ভাব সৃষ্টি করে। ন্ ঋ গ ম হ্ম ম, দ-হ্ম-দ-হ্ম-ম-গ ঋ-স, এই স্বরগুলি অনুরাগের রসাবেগে মীড়যুক্ত হয়ে যখন প্রকাশ পায় তখন মনে হয় যেন সমস্ত রাত্রি প্রতিক্ষার পর আশা-আকাঙ্ক্ষায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আকাঙ্ক্ষিত জনের উদ্দেশে হতাশার করুণ বিলাপের মত সুর লুটিয়ে মূর্চ্ছিত হচ্ছে। স্বরনালীর স্নায়ুসকলের অবস্থাও তখন ওইরূপ অবসাদগ্রস্ত থাকে বলে মনের অবস্থাও থাকে তখন ঐ রকম সুর-প্রকাশের মত সামর্থ্য।

ললিত রাগটি যথাসময়ে গাওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা থাকায় বাধ্য হয়ে আমরা প্রাতঃকালের রাগের মধ্যে এনে ফেলেছি। এমনিভাবে এবং সময়ের সহিত সংযোগ ধারণার অভাবহেতু আরো কয়েকটি রাগ তাদের প্রকাশের যথাসময়ের স্থান থেকে নিয়মভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। যাই হোক্—এ কথা সত্যই উপলব্ধি করতে পারা যায়,—ললিত রাগকে তার যথা নির্ণীত সময়ের স্থানে প্রকাশ করলে তার যেরূপ প্রকৃত ভাব, রূপ ও রস সৃষ্টি হবে সেরূপ অন্য সময়ে হওয়া সম্ভব বলে মনে করতে পারি না। একেবারে ভোর রাত্রের শরীরের স্নায়ুর অবস্থা এবং সকালের রৌদ্রময় অবস্থার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ থাকে, অর্থাৎ প্রথমোক্ত সময় অপেক্ষা তখন স্নায়ুসকল সতেজ ও সবল হয় এবং মনের অবস্থাও ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। এজন্য অতি সংযত হয়ে গভীর লক্ষ্য রেখে তখন ললিত রাগকে প্রকাশ করতে পারলে তবে অনেকখানি তার স্বাভাবিক রূপভাব প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। পূর্ব্বেই বলেছি সময়ের রাগ অসময়ে গাইলে তার চেহারার কোন ব্যতিক্রম হবে না এবং বড় শিল্পীর পক্ষে বড় করে সুর অঙ্কন করবার এবং বড় শ্রোতাদের প্রাণভরে শুনবার কোন বিঘ্ন হবে না সত্য কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীত-সাধকদের অন্তরে ঠিক তৃপ্তি ও মেজাজ নিয়ে প্রকাশ করবার পক্ষে স্বভাবের ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি হবে বলে আমার অভিজ্ঞতায় বলে। রাগের রূপভাবের সংগে শরীর, মন, স্বভাব ও প্রকৃতি, এগুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ যদি না থাকত এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি যদি না থাকত তাহলে এত কাল ধরে ভারতের সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ এই ব্যবস্থা মেনে চলতে পারতেন না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এর প্রভাব সত্যকে মনে-প্রাণে স্বীকার করতেন। এজন্য তিনি প্রাতের বর্ণনে প্রাতঃকালের রাগ, সন্ধ্যার বর্ণনে সে সময়ের রাগ, রাত্রের ভাব বর্ণনে রাত্রের রাগ, বর্ষায়-বর্ষার রাগ, বসন্তে বসন্তকালের রাগকে অবলম্বন করে বেশীর ভাগ গানের সুর দিয়েছেন। সুতরাং সবদিক দিয়ে বিচারে সময়ের সম্পর্ককে তরল করে দেখলে তরলমনের পরিচয় আসবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য এই যে, সময়ের এবং শরীরের স্বভাবিক নিয়মানুযায়ী রাগ সমূহের যথার্থ রসোৎপাদন করবার জন্য রাগের স্বভাব অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের ষড়জ নির্দ্ধারণ করবার আবশ্যক থাকে নিম্ন ও উচ্চে। অর্থাৎ কণ্ঠে বা যন্ত্রে প্রাতঃকালের রাগ প্রকাশের সময় ষড়জ স্বরের ওজন কিছু নিম্নে এবং মধ্যাহ্নকাল হতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কিছু উচ্চে বাড়িয়ে দেওয়া অতি সঙ্গত বলে মনে করি। এর দ্বারা রাগের স্বভাব ধর্ম্ম অনুযায়ী শ্রুতি প্রকাশে সহায়তা হয়, বিশেষতঃ উচ্চস্তরের শিল্পী ছাড়া অন্যান্যদের পক্ষে ত বটেই। সকালে বেশী চড়া সুরে ভৈরব, ভৈরবী, যোগিয়া, ললিত ইত্যাদি রাগ যে বেশ নমণীয় ও যথাযথ ভাব প্রকাশে সহায়তা করে না এবং প্রকৃতির স্বভাবের সংগে মিলন সম্পর্কের বিঘ্নতা আনয়ন করে তা আশাকরি রাগজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করে থাকবেন। এস্থলে আর একটা কথা, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাগের যথার্থ রূপ ও ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য যে মেজাজ ও সামর্থ্যের দরকার হয় তা অনেকখানি বয়স সাপেক্ষ। যথার্থ মেজাজীগান অর্থাৎ রাগের সুন্দর রূপ, রস ও বলিষ্ঠ রূপভাবকে উপলব্ধি করতে পারা পরস্পর সম শ্রেণীর শিল্পীরাই যথোপযুক্তভাবে পারেন।

তম্বুরা (তানপুরা) যন্ত্রে নিষাদ স্বুর—

আজকাল অনেক গায়কের কাছে তানপুরার জুড়ির তারের স্বর পরিবর্ত্তন দেখে খুবই আশ্চর্য্য বোধ করছি। এই পরিবর্ত্তনে থাকে জুড়ির একটি তার 'সা'-এ এবং অপরটি 'নি'-এ বাঁধা। ওই যুগ্ম তারের মধ্যে দিয়ে ষড়জের সংগে 'নি'-এর তু' শ্রুতির ব্যবধানযুক্ত স্বরের উৎপন্ন ধ্বনি যখন কানে আসে তখন তার অসামঞ্জস্য ও অদ্ভূত স্বররূপ আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়। স্বুর বাঁধার এই রকম পরিবর্ত্তন আনার মধ্যে আমি কোন বিচার-যুক্তি এবং বিজ্ঞান ও রসের মিলন সমন্বয়ের সন্ধান খুঁজে পাই না। ভাবি, কানের কাছে ঐরূপ একটি তীক্ষ্ণস্বরের সংগে ষড়জের স্বভাবগত যে অপূর্ব ধ্বনি আছে কি করে তার সংগে সেই সম্পর্কের সমন্বয় হতে পারে! তানপুরায় প্রকৃত নিয়মে বাঁধা স্বুরের সংগে মন-প্রাণ নিয়োগ করে যখন স্বুরের সাধনা করতে থাকি তখন মনে হয় যেন বাইরের শাশ্বত ধ্বনি অন্তরে প্রবেশ করে এবং কণ্ঠের আবেগ ধ্বনি বাইরের সংগে মিলিত হয়ে গলা জড়াজড়ি করে অন্তরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। সত্যই তখন মনে হয় তম্বুরমুনির যোগ সিদ্ধ শক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত এই তম্বুরা যন্ত্রটির রূপাকৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকৃত নিয়মে বাঁধা থেকে যে স্বুর নির্গত হয় তাতে মনে হয় যেন বিশ্বভরা স্বুরের রণন অনুভবে এনে দিচ্ছে। উদারার 'সা' স্বুরের তারে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে আমার অনুভবে আসে যেন তম্বু স্থানটি নাভিস্থলের চক্রাধারের মত, এই তারটিকে উদারার খরজ অর্থাৎ ষড়জের তার বলা হয়। পঞ্চমের তারটিতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় সেই স্থানটিকে যেন মনে হয় হৃদ্‌পদ্মস্থল, এবং 'মুদারা'র 'সা' মস্তকের ব্রহ্মস্থল। এই তিনের একত্র ঝঙ্কৃত রূপ যেন এক বিরাট তাৎপর্য্য ময়। মস্তকের মধ্যে যেমন একটি মস্তিষ্কই আকৃতিতে তুটির রূপ নিয়ে যুক্ত হয়ে থেকে দেহের সমস্ত সজীব শক্তিকে রক্ষা করে রেখেছে, তেমনি জুড়ির তার তুটি স্বর ও শ্রুতির প্রাণ শক্তিকে ধরে সজীব করে রেখেছে। পক্ষাঘাতে মস্তিষ্কের এক অংশ নষ্ট হয়ে গেলে দেহের যে অবস্থা হয় সেরূপ জুড়ির তারের একটিকে স্থানচ্যূত করলে মনে হয় যেন তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে পড়ল। তানপুরায় স্বুর পঞ্চমের দ্বারা যে ধ্বনি নির্গত হয় তা যেন বিশ্বের ব্যাপক ওঙ্কারধ্বনি অন্তরে স্পর্শ করছে বলে মনে হয়। এইরূপ ভাবে এই ধ্বনির তত্ত্ব নিয়ে এই যন্ত্রটির স্বুরের মধ্যে যে তথ্যের সন্ধান অন্তরে এসে উপস্থিত হয়, তাতে থাকে যেন বিজ্ঞান ও দর্শনের একত্র সমাবেশ। ষড়জ ও পঞ্চমস্বর বাঁধার নিময়ের উপর আর এক বিরাট তাৎপর্য্য আছে, সেই তাৎপর্য্যের মধ্যে যে স্বররূপের যুগল সমন্বয় আছে তার বিষয় পুরুষ ও নারীর কণ্ঠ দ্বারা স্বর সৃষ্টির উদ্ভাবন নিয়ে তার তথ্য আলোচনায় যে কথা জানিয়েছি, আশাকরি তার মধ্যে অনেকখানি বুঝবার সহায়তা করবে।

তানপুরায় স্বুর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার উক্ত অনুভবের ব্যাখ্যাকে যদি নিজস্ব হয়েই থাকবে বলে মনে করি তত্রাচ আর এক দিকের বিচারে যেমন ক্রিয়াসিদ্ধির মধ্যে রাগরূপের জীবনীশক্তিতে স্বুরের সা-মা, সা-পা, সম্পর্ক আছে রস সঞ্চারের জন্য অর্থাৎ হার্ম্মোনীর ক্রিয়ার প্রয়োজনে, তেমনি ওই যন্ত্রের

শুর বাঁধর জন্যও সেই প্রয়োজনীয়তাই বিশেষ করে প্রধান হ'য়ে থাকে প্রকৃতি-পুরুষের মত সা-পা সুরের সম্বন্ধ।

এ কথা বলার আবশ্যক করে না যে সংগীত মানব জাতির কণ্ঠেই প্রথমে এসেছিল এবং পরে তার সাধনায় সিদ্ধি লাভের উপায় স্বরূপ একাগ্রতার সহায়করূপে সাধকরা পেয়েছিলেন দর্শনের মাধ্যমে বিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট তম্বরমুনির তম্বরা যন্ত্রটি। আর একটা কথা, ওই যন্ত্রের মধ্যে যে শুরের উদ্ভব হলে প্রকৃত পথে প্রকৃত আনন্দের মধ্যে দিয়ে অগ্রগমন হবে সেই সন্ধান ধরে সা-পা, শুরই তানপুরার মধ্যে আবাহমানকাল চলে আসছে। এই বিচার বোধের গুরুত্বকে অধিকতর স্থান দিয়ে আগেকার গুণীরা পঞ্চমবর্জিত রাগেও তানপুরার পঞ্চম সুরকে স্থানচ্যুত করার আবশ্যক মনে করতেন না। অবশ্য আমার কাছে এই ব্যবস্থা যদিও সম্পর্ণ মনোমত নয়। কারণ, সা-মা, সম্পর্কের মধ্যে যখন পুরুষ-প্রকৃতির মত মিলনমধুর ও সৃষ্টি সম্পর্ক বজায় থাকে তখন মালকৌশ রাগ প্রকাশের সময় তান-পুরার পঞ্চমের তার মধ্যমে বাঁধা অতি সঙ্গত কারণেই চলে। হিন্দোল, পুরিয়ার মত পঞ্চবর্জিত রাগ প্রকাশের সময় ইচ্ছে করলে পঞ্চমের ও ষড়জের (উদারার 'সা' সুরের তার) তার দুটিকে গান্ধার নিষাদে বেঁধে নিতে পারা যায়—তাতে হার্মোনী এবং রাগরূপের স্বরপ্রভাবসম্বন্ধ অব্যাহতই থেকে যায়। তবে এই দুটি তারের আওয়াজ জোওয়ারী বর্জিত করে সন্নাঘাতে উৎপন্ন হওয়া উচিত। কারণ অন্য তারের উপর সা-মা, সা-পা, সম্পর্ক রেখে তার ধ্বনিতে যদি জোওয়ারী থাকে তাহলে তাদের প্রভাব শক্তি কণ্ঠ নির্ভর 'সা' এর সুরকে সীমিত করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং অবলম্বন সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-চিন্তার বিঘ্নও ঘটতে পারে।

'সা' এর পীঠস্থানের উপর সর্বদাই সংযোগ রেখে চলতে হয় প্রত্যেক রাগের রূপ অঙ্কনের সময়ও। কোন রাগ প্রকাশের সময় যদি ষড়জের উৎপন্ন সুর কণ্ঠে দেখাতে বিলম্ব করা হয় অর্থাৎ যথা সময়ে ষড়জে না এসে সুরকে নিয়ে সময়াতিরিক্ত করে এদিকে ওদিকে যাওয়া হয় তাহলে রাগরূপের প্রাণ দান কোন রকমেই সম্ভব হবে না,—হবে কেবল তার মূর্ত্তিকে মন্দির থেকে অনবরত স্থানান্তরিত করা।

এই সব দর্শন ও বিজ্ঞানের নীতি নিয়ম তানপুরার সুরের উপরও সমান প্রযোজ্য।

তানপুরার জুড়ির তারের একটিকে 'নি' সুরে বাঁধা সম্বন্ধে আরো কথা আছে ; যে-যে রাগে প্রধান নিষাদ ব্যবহার হয় না সেই সেই রাগ প্রকাশের সময়ও দেখি তানপুরার জুড়ির একটি তারে 'নি' সুর বাঁধা থাকে। সেই রাগগুলির সংগে 'নি' সুর বাজতে থাকলে সেই সুরের ব্যবহার রাগের উপর যে বর্ত্তে যাচ্ছে তাকে কি করে অস্বীকার করা হবে ? কণ্ঠে বা যন্ত্রে অসাবধান বশতঃ ওই ধরণের রাগে 'নি' সুর প্রকাশ হয়ে পড়লে যদি তৎক্ষণাৎ সতর্ক হতে হয় তাহলে সে সব রাগে তানপুরার অনবরত 'নি' সুর কি করে বাজতে পারে ? অবশ্য গায়করা যদি মনে করেন তাঁদের কাছে—'নি' সুরের রূপ আনন্দ দেয় তাহলে বলবার কিছু নেই। তবে আমার এ বিষয়ের বিচার যুক্তির সত্যই কোন মূল্য আছে কি-না তা তাঁরা ইচ্ছে করলে ভেবে দেখতে পারেন॥

তিন প্রকার গতির রাগ—

প্রত্যেক রাগের স্বরগতি নিরীক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, তাদের স্বররূপ গঠনের নিয়মে আছে প্রধানতঃ তিনটি প্রকৃতিতে নিবদ্ধ হয়ে। যেমন,—কতকগুলি রাগ আছে তাদের ব্যবহার্য্য স্বরসমূহ সরল গতিতে আরোহণ–অবরোহণের দ্বারা রাগরূপ প্রকাশ করতে পারে। উদাহরণ যেমন—খাম্বাজ রাগ, তার স্বরগতি—স-গ-ম-প—ধ-ণ-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-র-স। এইরূপ গতিপ্রকৃতির রাগ-গুলিকে সরলগতির রাগ বলা যায়। আবার এমন কতকগুলি রাগ আছে যাদের স্বরগতি বক্রভাবে না অঙ্কন করলে রাগরূপের প্রকাশ হ'বে না, নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, ছায়ানট রাগ,—এর স্বরগতি—স-র-গ-র-গ-ম-প--ধ-র্স-ন-র্স-ধ-প-গ-ম-র-স। বক্রগতির রাগ সরলগতিতে যাতায়াত করতে পারে না, কিন্তু সরলগতির রাগ সব দিক দিয়ে যাতায়াত করতে পারে ইচ্ছামত প্রয়োজন নিয়ে। ছায়ানটের মত গতিবিশিষ্ট রাগকে বক্রগতির রাগ বলা হয়। আর এক রকম গতি প্রকৃতির রাগ আছে তাদের মিশ্রগতির রাগ বলে পরিচয়ে আসে। এই রাগগুলির মধ্যে কোন কোনটির আরোহণ–অবরোহণে সময় সময় তাদের নির্দ্ধারিত স্বর নিয়ে সোজাভাবে প্রয়োগ করা চলে বটে কিন্তু স্বরগতির নিয়মের উপর প্রকাশ করবার সময় অনুরূপ ভাবে ব্যবহার করা চলে না, তখন কোন কোন স্বর ত্যাগ করবার আবশ্যক থাকে। উদাহরণ, যেমন আলাইয়া রাগ। এই রাগে সরল গতিতে সময় সময় দু'চারটি স্বর প্রয়োগ করা চলে—কিন্তু পর পর সাতটি স্বর এক সংগে ব্যবহার করা চলে না। সেরূপ করতে গেলে নিয়ম–নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাগরূপের কোন প্রকাশই হবে না এবং রাগবিজ্ঞানের ব্যবস্থায় ও তার রূপধর্মে এই ধরণের কোন রাগকেই তা করা চলে না। একথা ঠাটের আলোচনায় জানিয়েছি।

মিশ্রগতিযুক্ত আলাইয়া রাগের স্বরগতিতে অর্থাৎ ঠাটরূপে আরোহণে স্বর প্রয়োগ হবে স-গ-র-গ-প-ধ-ন-ধ-ন-র্স-ন-ধ-প-ম-গ-র-স এই ভাবে কিংবা গান্ধারকে গ্রহস্বর করে গ-প-ধ-ন-র্স-ন ধ-প-ম-গ-র-স। এই রকম ভাবেও হতে পারে। কারণ আরোহণে যে কয়টি স্বর বাদ দিয়ে বাকী স্বর-গুলির সুররূপ উৎপন্ন হচ্ছে তাতেই রাগকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রথমটিই অগ্রে গ্রহণযোগ্য। এই রাগে র-গ-ম-প- স্বর সময় সময় ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু তা ঠাট নির্মাণে ব্যবহার হবে না। কারণ পূর্ব্বেই বলেছি নীতি নিয়ম নিয়ে রাগচিহ্নিত করার দায়িত্ব স্বরগতির মাধ্যমে থাকবেই।

মিশ্রগতির রাগ সম্বন্ধে 'দেশ' রাগকে নিয়ে আর একটি উদাহরণ—এর আরোহণ-অবরোহণে যদি স-র-ম-প-ন-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-র-স, এই রকম স্বর স্থাপন করা যায় তাহলে তার রূপ সুরটরাগের মত হ'য়ে যাবে। সৌরঠী বা সুরট প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ। সুরটের সংগে বনাঞ্চলের পাহাড়ী সুর মিশে গিয়ে দেশজ রূপে 'দেশ' রাগের জন্ম হয়েছে বলে বুঝা যায়। তার স্বরগতি হয়ে আছে মিশ্র

জাতি রূপে অবরোহণের স্বরের উপর পৃথকত্ব নিয়ে। যথা— স-র-ম-প-ন-র্স-ণ-ধ-প-ধ-ম-গ-র-গ-স। গ-র-গ-স, এই স্বররূপ পাহাড়ী রাগের।

প্রাচীন একটি ধ্রুপদাঙ্গের সুরফাঁকতাল তালের গানের অন্তরায় কোমল গান্ধারের স্পর্শ আছে। মুদারায় র-জ্ঞ-স- এই রকমভাবে কোমল গান্ধারও কেউ কেউ ব্যবহার করেন। এই ব্যবহার যখন প্রত্যেক ধ্রুপদে নেই, তখন একে ইচ্ছাধীন আর্শ প্রয়োগের মত বিবেচনা করতে হয়। প্রাচীন একটি হালকা গানের এক স্থানে ধ-ধ-ধ-ণ-ধ-প-ধ-প-গপম,—গ-রগসর—গগম,—গ-র-গ-স-র। এই রকম স্বরের রূপ আছে। এই ধরণের রাগে ওই রকম সুরের প্রয়োগের উপর নীতি-নিয়মের তেমন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কোন কোন ধ্রুপদে ধৈবত আরোহণে ব্যবহার থাকলেও স্বরগতি বা ঠাট নির্মাণে দেওয়া যায় না। কারণ তাহলে রাগের সুররূপ ধরা যাবে না। যাই হোক্—দেশ রাগ মিশ্রগতির একটি রাগ বলেই পরিচিত হয়ে থাকবে। আড়ানা রাগটিও মিশ্রগতির রাগ। এর স্বরগুলি আরোহণে সরলভাবে উঠে, কিন্তু অবরোহণের সময় বক্রগতিতে র্স-দ-ণ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স,—এইভাবে নেমে আসে। বেশীর ভাগ মিশ্রগতির রাগের রূপ ছু'টি রাগের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে। যেমন—আড়ানার আরোহণের স্বরগুলি সারঙ্গরাগের এবং অবরোহণের স্বরগুলি কানড়া রাগের। এ রকম উদাহরণ আরো রাগের মধ্যে পাওয়া যাবে॥

তিন স্বরে রাগ-রূপের সন্ধান

সমস্ত প্রাণীর রূপাকৃতিতে থাকে প্রধান তিনটি অঙ্গ, যথা - মস্তক, বক্ষ ও নিম্ন,—এই তিনটির প্রত্যেকটিই এমন পরিচয় জ্ঞাপক যে, পরিচিত কোন প্রাণীর মাত্র একটি পদকেও যদি দৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় তাহলেও সেই প্রাণীকে আমরা চিনে নিতে পারি। রূপের এই পরিচয় ধরে আমাদের দেখা দরকার প্রত্যেক রাগের রূপে যে যে স্বর প্রয়োগ হয় তার দ্বারা তিন স্বরের উপর রাগকে চিহ্নিত করার সম্ভাবনা আছে কি না। স্বরের নানান বস্তু নিয়েই যখন রাগের রূপ গঠিত হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়েই যখন প্রত্যেক রাগের বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত হচ্ছে তখন তাদের ভিতর নিয়োজিত স্বর সমূহের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন তিনটি স্বর তিনঅঙ্গের মত হয়ে রূপচিহ্ন করণের শক্তি নিয়ে থাকবে যার দ্বারা রাগরূপকে চিনে নিতে আমাদের কষ্টকর হবে না। যদি মনে হয় সকল রাগকে নিয়ে এ নিবাকরণ অসম্ভব তাহলে বুঝতে হবে রাগ বিজ্ঞানের যথাযথ নিয়ম-নীতি ধরে সে রাগ রচিত হয়নি।

যতগুলি রাগে আমি তিন স্বরে রাগ নির্ণয় করে দেখাতে চেষ্টা করলাম সেগুলির প্রকৃত রূপপ্রভাব সম্বন্ধে সত্য নিরূপণের বিশেষ সহায়তার জন্য প্রাচীন ধ্রুপদের উপর যথাযথ দৃষ্টি দেবার আবশ্যক হয়েছে।

সৃষ্টির বহু প্রধান বস্তুতেই তিনের একত্র সমাবেশ আছে, যেমন-ত্রিদেব, ত্রিভুবন, ত্রিগুণ, ত্রিকাল, তিনঅঙ্গ, প্রভৃতি, তেমনি সংগীতেও আছে ত্রিসপ্তক, তিন প্রকার স্বর, ত্রিজাতি ; বাদী-সংবাদী-অনবাদী ; বলী-বিবাদী ও বর্জিত ইত্যাদি। রাগরূপও এক বিরাট বস্তু। আমরা হয়ত খুঁজিনা বলেই পাইনা তার মধ্যে তিন স্বরের প্রভাব কিরূপ আছে। যাই হোক এ বিষয়ে আমি আমার যতটুকু শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে পারলাম সেই শক্তির মূলে আছে ঐকান্তিকভাবে ধ্যান-চিন্তা। রাগরূপের অভ্যন্তরে স্বরশক্তির যে এমন একটি ব্যবস্থা আছে সুন্দর হ'য়ে এবং খুঁজে পাওয়ার উপায় আছে তা আগে চিন্তায় আসে নি এবং জানার সন্ধানও কোথাও পাইনি। এই আগ্রহের মধ্যে দিয়ে তিন স্বরে রাগ নির্ণয় করণের সময় দেখা গেছে—নিতান্ত প্রয়োজনবোধে রাগরূপের স্বভাব ও প্রভাবগত আকর্ষণকে রক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত তিনটি স্বরের কোনটিকে আর একবার ব্যবহার করার আবশ্যক থাকে বুঝলাম। অবশ্য তাতে তিন সংখ্যার নির্দ্দেশে ক্রটি শূন্যই হয়ে থাকবে।

এ বিষয়ে আর একটি কথা, তিন স্বরের কোন কোন রাগের রূপচিহ্নকরণে দু'তিন রকমেরও সন্ধান আছে। সেগুলিও বিচার বিবেচনার জন্য সন্নিবেশিত হয়ে রইল, কোন্‌টি বেশী গ্রহণযোগ্য এইজন্য। তবে বাদী স্বরের প্রভাবের গুরুত্ব কোন্‌টির মধ্যে বেশী পাওয়া যাবে সেদিকে দৃষ্টি দেবার আবশ্যক থাকবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক রাগের রূপ পরিচয় যেখানে দিয়েছি সেখানেও এর পরিচয়ে সহায়তা করবে। তত্রাচ কোন কোন রাগকে এই নির্দ্ধারণ নিয়মে যদি সহজে ধরতে পারা শক্ত বলে মনে হয় তাহলে তখন রাগের যথাযথ মূর্ত্তিকে ধ্যানস্থ করে সেই দিকে গভীর দৃষ্টি দিতে পারলে তখন আর নির্ণয়ে অসুবিধা আসবে না বলে আমার বিশ্বাস আছে। এ বিষয়ের যথাযথ অধিকারের জন্য প্রাচীন ধ্রুপদ গানের সবিশেষ চর্চা থাকারও আবশ্যক আছে। কারণ ভৌগলিকনক্সার মত ধ্রুপদের মধ্যে রাগরূপের নক্সা অঙ্কিত থাকে বিস্তৃত আকারে।

যাই হোক্—এই বিষয়ের প্রমাণ বস্তু আমার দ্বারা যতটুকু নিরাকৃত হল তার চেয়ে যদি আরো সঙ্গতভাবে উত্তম নির্দ্ধারণ হয় তাহলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে। প্রথমেই বলেছি সঙ্গীত-শাস্ত্রের অবদানকে আশ্রয় করে তার মধ্যে অনেক কিছু তথ্য আবিষ্কারের যে সন্ধান-সুযোগ আছে তাকে আরো বৃহত্তরে ও মহত্ত্বরে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের বিশেষ প্রচেষ্টা রাখার একান্ত আবশ্যক আছে।

তিন স্বরে রাগ চিহ্নিত করণ

কণ্ঠে রাগের তিনস্বর উচ্চারণের সময় সামান্যও ভাবাবেগ থাকা দরকার।

১। ভৈরব,—ঋ-গ-ম, অথবা স-ম-ঋ॥ ২। যোগীয়া,—ঋ-প-ম, কিংবা প-ন-দ, অথবা ঋ-গ-স॥
৩। রামকেলী,—ম-দ-প॥ এই তিন স্বরের দ্বারা তার যেটুকু রূপ পাওয়া যাচ্ছে তার উপর ধ্যান-

চিন্তা দিলেই বুঝা যাবে রামকেলী ছাড়া আর অন্য কোন রাগকে ওর পরিবর্ত্তে স্থান দেওয়া যাবে না। অন্য সবগুলির সম্বন্ধেও ওই বোধ-চিন্তার আবশ্যক হ'বে॥ ৪। কলিঙ্গড়া,—দ-প-গ, কিংবা দ-গ-ম-গ ॥ ৫। বিভাস, -গ-প-ধ, সুরের এইরূপ ভাব প্রাচীন ও আদি বিভাসের ॥ ৬। ভৈরবী,—ঋ-জ্ঞ-ম ॥ ৭। আলাইয়া,- ন-ধ-র্স, অথবা ন-ধ-ন-র্স ॥ ৮। আশাবরী,—দ-র্ঋ-র্স কিংবা ম-ঋ-স ॥ প্রথমটিই বেশী নীতি সঙ্গত॥ ৯। জৌনপুরী, - ণ-দ-প, কিংবা ম-প-দ-প ॥ ১০। তোড়ী,—দ্-জ্ঞ-ঋ, কিংবা দ্-হ্ম-জ্ঞ ॥ ১১। গৌড়সারঙ্গ,—গ-র-ম-গ। ১২। বৃন্দাবনী সারঙ্গ,—ম-র-ন্॥ রাগরূপের বিশেষ পরিচয়ে আছে অবরোহণের প্রধান নিষাদও। সুতরাং অবরোহণে কোমল নিষাদ ব্যবহার করলে প্রমাণে আসছে তা সম্পূর্ণ ভুল হবে। ১৩। ভীমপলশ্রী,—ণ্-স-ম, কিংবা স-ম-জ্ঞ ॥ ১৪। মূলতান,—জ্ঞ-হ্ম-প ॥ ১৫। পুরিয়া.—ন্-ঋ গ ॥ ১৬। পুরবী,—প-ঋ-গ, কিংবা ঋ-গ-প। অথবা গ-ম-ঋ-গ। ১৭। শ্রী,- প-ঋ-স ॥ ১৮। গৌরী,—প-দ-ম ॥ ১৯। ভূপালী,—ধ্-গ-র ॥ ২০। কল্যাণ,—ন্-ধ্-গ ॥ ২১। ইমন,—ন্-র-গ ॥ ২২। কেদার,—হ্ম-প-ম ॥ ২৩। হাম্বীর,—গ-ম-ধ ॥ ২৪। ছায়ানট,—র-ধ,-প ॥ ২৫। কামোদ,—ম-র-প, কিংবা ধ-ণ-প ॥ ২৬। খাম্বাজ,—গ-ণ-ধ ॥ ২৭। ঝিঁঝিঁট,—র-ম-গ ॥ ২৮। মেঘ;—ন-প-ম, কিংবা ম-গ-ম-র ॥ গান্ধার প্রয়োগ রাগের রূপধর্ম্মী ॥ ২৯। মল্লার,—র-প-ম ॥ ৩০। সুরট, ম-গ-র, কিংবা র-ম-প ॥ ৩১। দেশ,—ধ-ম-র, কিংবা বিশেষ পরিচয়ে র-গ-স-র ॥ ৩২। পিলু;—প-জ্ঞ-ন্. কিংবা স-দ্-প্ ॥ ৩৩। সিন্ধু,—ম-জ্ঞ-র, কিংবা ণ্-জ্ঞ-র ॥ ৩৪। সেনীমল্লার, - র-ন্-ণ্, কিংবা ম্-ণ্-ধ্ ॥ ৩৫। বাগেশ্রী,— স-র-ম। ম-ধ-জ্ঞ, এই তিন স্বরের দ্বারাও চেনা যাবে, তবে প্রথমটিই নীতি সঙ্গত। ৩৬। জয়জয়ন্তী,—প্-জ্ঞ-র, কিংবা গ-র-জ্ঞ-র। ৩৭। তিলককামোদ, প-ধ-ম, কিংবা গ,-স-ন্ ॥ ৩৮। পাহাড়ী;—স-র-ম, কিংবা র-গ-স ॥ ৩৯। কাফী, জ্ঞ-র-প ॥ ৪০। কানড়া, র-দ্-ণ্ ॥ ৪১। সাহানা,—র-প-জ্ঞ কিংবা ণ-প-জ্ঞ ॥ ৪২। আড়ানা,—র্স-ণ-প ॥ ৪৩। সুঘরাই,—ম-র-ণ্ ॥ ৪৪। বাহার,—ণ-প-ম ॥ ৪৫। মালকৌশ,—স-জ্ঞ-ম ॥ ৪৬। বসন্ত, ঋ-ম-গ, কিংবা ম-ধ-র্স ॥ ইহা প্রকৃত বসন্তরাগ ॥ ৪৭। পরজ,—হ্ম দ ন ॥ ৪৮। বেহাগ,—স ম-গ, কিংবা গ ম-গ, অথবা প-গ-মগ ॥ ৪৯। শঙ্করা,—প-র্স-ন, কিংবা ন-ধ-র্স-ন ॥ ৫০। হিন্দোল,—হ্ম-গ-স ॥ ৫১। ললিত,- ঋ-হ্ম-ম ॥

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা, - যে-যে রাগের মূল উৎস থেকে তার রূপধারা অন্যকোন ঘরাণায় ভিন্নমুখী হয়ে প্রবেশ করেছে—সেই ঘরাণার বাহকদের পক্ষে হয়ত আমাদের প্রাচীন ঘরাণার রাগ সমূহের কোন কোন রাগের রূপ চেনা অসুবিধে হতে পারে। এ জন্য সেই সেই রাগের রূপ পরিচয় জানতে আমাদের ঘরাণার কিংবা ধ্রুপদ চর্চার কোন প্রাচীন ঘরাণার কাছে সন্ধান নেবার আবশ্যক হবে। এ রকম অবস্থা ঘটলে তার মধ্যে যে উপকার আসবে তাতে মূলধারা ও বিচ্ছিন্নধারা এই দু'টির মধ্যে সত্যের স্বীকৃতি নিয়ে রাগ দর্শনের উপর কোনটিতে ন্যায়-নীতি ও বিজ্ঞান আছে তার সমাধান হতে পারবে ॥

সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মোহিনী শক্তি

সঙ্গীতের মোহিনীশক্তির প্রভাবে মানুষ ছাড়াও নানান জীব-জন্তুও আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর সমগ্রজাতির অন্তরে এর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অতি শৈশব জীবনে যদি এর নির্মলস্পর্শের প্রভাব আসে তাহলে অন্তরকে আনন্দময় করে গড়ে তুলে এবং সমগ্র জীবনী শক্তির বিকাশ হয় আধ্যাত্মিক রসে।

সঙ্গীত সার্বজনীন। এর শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, চিত্র বা ভাস্কর্য্যশিল্প সাধারণকে ততটা আকৃষ্ট বা মুগ্ধ করতে পারে না এবং দৃষ্টিহীন ব্যক্তির কাছে কোনই মূল্য নেই। কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদি ভাষাগত বস্তুর রচনা বুঝতে হলে সেগুলি যে ভাষায় রচিত সে ভাষায় যথেষ্ঠ দখল থাকলে তবেই তার রসাস্বাদন করতে পারা যায়। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোনই অসুবিধা নেই। বিভিন্ন জাতির প্রত্যেক শিক্ষিতসমাজ প্রত্যেক জাতির উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা ও কৃতিত্ব অনেকখানি বুঝতে সক্ষম হয়।

আমাদের স্বাভাবিক আর্থিক জীবনের মধ্যেও সঙ্গীতের মত কার্য্যকরী আর দ্বিতীয় কোন বস্তুতে বোধ হয় নেই। মানুষ যদি সুকণ্ঠ নিয়ে কিছুও গাইতে পারে তাহলে বৃক্ষমূলে বসে থেকেও সবকিছুর সংস্থান হয়ে যায়। সংগীতের কোন বড় শিল্পী গৃহ হতে অতি সামান্য অর্থ নিয়ে যদি দেশ ভ্রমণে এবং প্রচার-প্রতিপত্তি কামনায় বাহির হন তাহলে তিনি তাঁর অধিগত বিদ্যার দ্বারা সকল স্থানে সমস্ত সুযোগ ও আরামের মাধ্যমে প্রভূত অর্থও সম্মান অর্জন করে আসতে পারবেন।

সংগীতের প্রয়োজন—উৎসবে, ধর্মানুষ্ঠানে, মিলনে, ভজন-সাধনে, আনন্দানুষ্ঠানে, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শোকেও। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

শাস্ত্রকার মুণিরা বলেছেন 'নাদব্রহ্ম'। এই 'নাদ'ই হল সংগীতের মূলাধার। এই 'নাদ'রূপ সংগীতের মহিমা ও ক্রিয়াপরিচয় নানান শ্লোকের মধ্যে তাঁরা দিয়ে গেছেন॥

সঙ্গীত ও গীত সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক নিম্নে দেওয়া হল :—

১) কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্গীতকান্যখিলানিচ। শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে-বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ॥
২) ওমিতি সামানি গায়ন্তি॥
৩) জপকোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটী গুণংলয়ঃ, লয়কোটী গুণংগানং, গানাৎপরতরং নহি॥
৪। ত্রিবর্গ ফলদাঃ সর্বে দানাধীতি জপাদয়ঃ একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদম্॥
৫) নাহংতিষ্ঠামিবৈকুণ্ঠে যোগীনাংহৃদয়েনচঃ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি হে নারদঃ॥
৬) সংগীত-সাহিত্য রসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃপুচ্ছবিষাণ হীনঃ চরত্যসৌ যত্তু তৃণং ন খাদংস্তদ্ভাগ ধেয়ং পরমং পুশুনাম্॥

মহাকবি সেক্সপীয়র বলেছেন,—যে মানুষ সংগীত জানে না বা ভালবাসে না তাকে কখনই বিশ্বাস করতে নাই।

সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আরো বহু উপমা ও উদাহরণ আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বহু রচনার মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংগীতের মহিমারই গুণকীর্তন করেছেন এবং অনুভবের প্রকাশ রেখেছেন সর্বস্তরে।

সংগীতের শুদ্ধ স্বরকে অবাঙ্ময় কাব্য বলেছেদ মনীষীরা॥

সঙ্গীতের গ্রাম

সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থকাররা গ্রামের বিষয়ে মতভেদ নিয়ে কেউ বলেছেন—ষড়জ, গান্ধার ও মধ্যম এই তিন গ্রাম। আবার অন্য জন বলেছেন,—ষড়জ, গান্ধার ও পঞ্চম, স্বরের এই তিন স্থানেই গ্রামধার্য্য হ'বে। আবার আর এক গ্রন্থে আছে,—তিন সপ্তকের তিনটি ষড়জ স্বরই তিনটি গ্রামের কেন্দ্রস্থল। কোন গ্রন্থকারই বিভিন্ন মতভেদকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নি। শাস্ত্রকারদের এইসব উপেক্ষা ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে রেখেছে।

আমার যুক্তি ও বিচারে গ্রাম সংজ্ঞার যদি কিছু অর্থ নিতে হয় তা'হলে একমাত্র ষড়জই সেই নামের উপযুক্ত এবং গ্রামকেন্দ্রের অধীশ্বর।

কেউ ইচ্ছে করলে রে-গা-মা-পা-ধা-নি; এই ছ'টি স্বরের প্রত্যেকটিকে নিয়ে প্রয়োজনবোধে পৃথকভাবে ষড়জ স্বর অবলম্বন করেও রাগাদি প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু গ্রন্থকাররা বিভিন্ন মতে উক্ত তিনটি করে সংখ্যার উপরই গ্রামকে ধার্য্য করেছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় এটি কেবলমাত্র যন্ত্রসংগীতের ষড়জ পরিবর্ত্তন ঘটিত ব্যাপার। কারণ, কণ্ঠসংগীতের জন্য কেবলমাত্র ষড়জ স্বরই গ্রামনামকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হ'তে পারে; অন্য কোন স্বরকে গ্রামকেন্দ্রের অর্থে ব্যবহার করার বিষয়ে কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। যে 'সংগীতশাস্ত্র' প্রণেতা তিনটি সপ্তকের তিনটি ষড়জকে গ্রামকেন্দ্র বলেছেন তাঁর মতকেই বরং সহজ ভাবে গ্রহণ করা যায়। তবে মধ্যম ও পঞ্চমকে তানপুরায় বাঁধা সুরের উপর ষজড়রূপে ধার্য্য করে কোন কোন সময় কোন কোন রাগ প্রকাশ করার হয়ত আকাঙ্ক্ষা আসতে পারে। এই হিসেবে তখন তাকে তাঁরা গ্রামরূপে ধার্য্য করতে পারেন। এই ধার্য্যকরণের মধ্যে প্রধান ষড়জ স্বরের সংগে সা-মা, সা-পা, সম্পর্ক থাকে বলে তাতে বিজ্ঞান সহায়ক হয়ে সুর সংযোগের বিঘ্ন আনয়ন করে না। অর্থাৎ হার্মোনীর ক্ষতি করে না। তবে তানপুরা নিয়ে বিশুদ্ধভাবে স্বয়ংসিদ্ধতার শক্তির উপর গাইবার জন্য ওইভাবে ষড়জ পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যক আসে না।

আগের কথা ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রাম নির্ণয়ের ব্যবস্থার মধ্যে যদি কিছু গুরুত্ব থাকে তা'হলে বহু আগেকার যুগের পর্দ্দাযুক্ত তারের যন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। আগে দেখা ও শুনা গেছে বীণাদি-পর্দাযুক্ত যন্ত্রে কড়ি-কোমলের জন্য পর্দা বাঁধা থাকত না। এজন্য ষড়জ স্বরের পর্দায় ষড়জ স্বর

অবলম্বন করে মধ্যম গ্রাম রূপে কড়ি মধ্যম যুক্ত রাগ বাজত এবং গান্ধার স্বরের পর্দাকে ষড়জস্বরে গ্রাম অবলম্বন করে চার কোমলের রাগ বাজান হত। এই শ্রেণীর রাগ ওই নিয়মে বাজাবার জন্য পর্দা সরাসরি করবার আবশ্যক হয় না। তাছাড়া মনেহয় বহু আগে পর্দা সরাসরি করবার জন্য সহজ উপায় কোন ছিল না। বহু পুরাতন দু'একটি বীণা ও সুরবাহার যন্ত্রে দেখেছিলাম একেবারে এঁটে থাকা পর্দাগুলোকে।

বহু রাগের জন্য আরো যে সব ষড়জ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক আছে তাতে পাওয়া যাবে, ঋষভের পর্দাকে ষড়জ স্বর করলে গান্ধার-নিষাদ কোমল, পঞ্চমের পর্দায় কোমল নিষাদ, ধৈবতের পর্দায় গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ-কোমল।

এর মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে, যে সকল রাগে কোমল ও প্রধান দুই স্বরই ব্যবহার হয় সেগুলো কি করে তাহলে বাজত? এর উত্তরে বলতে পারা যায়, হয়ত তখন ওই ধরণের রাগের সৃষ্টি হয় নি। আর যদি হয়েও থাকে তাহলে যে কোন দু'টির একটিকে পর্দায় তার টেনে প্রকাশ করা হত। এখনও যাঁরা যন্ত্রে কোমল ঋষভের পর্দা দেন না তাঁরা প্রধান ঋষভের পর্দাকে কোমল করে তার উপর ভৈরবীতে প্রধান ঋষভ ওই পর্দায় টেনেই প্রকাশ করেন। পঞ্চকোটের মহারাজ নীলমণি সিংহদেবের সুরবাহারটিতে মাত্র পাঁচটি পর্দা বাঁধা ছিল, তিনি তাতেই আলাপ বাজাতেন।

যাই হোক—ষড়জ গান্ধার ও মধ্যম বা পঞ্চমকেই শুধুমাত্র গ্রাম ধার্য্য করার বিষয়ে এ-ও মনে হয় যে, তখন মিশ্র স্বর যুক্ত রাগ ছিল না, তাই তাঁরা উক্ত তিনটি স্বরকেই গ্রামরূপে ধার্য্য করেছিলেন। এই গ্রাম নিরাকরণ ব্যবস্থা যে সম্পুর্ণ যন্ত্র সংগীতের জন্যই, কণ্ঠ সংগীতের প্রয়োজনীয়তার কোন গুরুত্ব নিয়ে নয়, তা সহজেই বুঝতে যায়। এই সব প্রত্যক্ষ ও বিচার সম্মত কারণ ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি 'সঙ্গীত শাস্ত্র' নামক গ্রন্থরচয়িতা গ্রাম সম্বন্ধে যে কথায় বলেছেন—"সমন্দ্র মধ্যতারাখ্যা গ্রাম ভেদাত্রিধামতাঃ।" অর্থাৎ মন্ত্র (উদারা) মধ্য, (মুদারা) তার, (তারা) এই তিনটিকেই আমরা গ্রাম কথার মূল্য হিসেবে ধরে নিতে পারি এবং ওই নামের ওই স্থানে গ্রাম ধার্য্যের কথায় বুঝতে পারা যাচ্ছে গ্রাম সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় এই নির্ণয়ই হয়েছিল। কারণ কোমলাদি রাগের সৃষ্টি যে বহু পরে হয়েছে সে কথা আগেও জানিয়েছি। অভিজ্ঞতায় জানি ভারতের যে সকল পণ্ডিত বংশানুক্রমিক রাগ সংগীতের চর্চা না করেও বেদ ও পুরাণ পাঠের সময় কণ্ঠে যে সুর প্রকাশ করেন এবং সেই সুরের গাম্ভীর্য্যময় আকর্ষণের গুরুত্ব নিয়ে অন্যে যাঁরা পাঠ করেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সেই সুরে কড়ি-কোমলের সুর প্রকাশ পায় না। একথা বিশেষ করে বলবার আবশ্যক করে না যে, স্বর সাধনার চর্চা না করে এবং সুরের রূপ মহিমা সম্বন্ধে কোন ধারণা না থেকে মনের আবেগে কণ্ঠে যে সুর প্রকাশ হয় তাতে থাকে প্রধান স্বরেরই রূপ সম্ভাবনা বেশী। যাই হোক্ আমি প্রাচীন গ্রন্থকারদের গ্রামার্থ পড়ে যেটুকু বুঝেছি তাতে গ্রামের বিষয়ে কণ্ঠ সংগীতের জন্য কোন গুরুত্ব আছে বলে খুঁজে পেলাম না। হয়ত তখন ছিল।

গানের অংশ

আস্থায়ী, (স্থায়ী) অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ কথার অর্থ –

'সঙ্গীত-দর্পণ' গ্রন্থকার শ্লোকে দিয়েছেন,— "যত্রোপবেশ্যতেরাগঃ আস্থায়ীত্যুচ্যতেহি সঃ।
আভোগস্তন্তিমোভাগো গীত পূর্ণত্ব সূচকঃ॥ ধ্রুবাভোগান্তরে কশ্চিদ্ধাতুরুক্তোন্তরাভিধঃ॥

শ্লোকের অর্থ ধরে দেখা যাচ্ছে অস্থায়ী এবং আভোগের কথাই প্রধান করে বলা হয়েছে। সঞ্চারীর নাম উল্লেখ নাই।

'সঙ্গীভ-দর্পণ' খুব বেশী পুরাতন গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থের বহু পূর্বে থেকেই ধ্রুপদগানের উক্ত চার অংশ প্রচলিত হয়ে এসেছে। তত্রাচ কেন উক্ত গ্রন্থকর্তা প্রত্যেকটির নাম যথাযথ দিলেন না তার কোন সঙ্গত অর্থ তিনি প্রকাশ করেন নি।

যাই হোক আমাদের বিশেষ অর্থ নিয়েই জানা হয়ে আছে আলাপ ও ধ্রুপদ গানে সর্বসমেত প্রধানতম চারটি অংশ। যথা.—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কেউ কেউ উক্ত অংশ কথার পরিবর্ত্তে কলি বা তুক ও বলেন।

'আস্থায়ী'র অর্থ—রাগরূপ প্রথম অংশেই আস্থা স্থাপন ক'রে তার রূপকে বিকশিত করে বলে 'আস্থায়ী' নাম দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী'র অর্থও একই প্রায়। রাগরূপের স্থায়ীত্ব প্রথম অংশেই, তাই স্থায়ী নামও ব্যবহার চলে। তবে অন্য তিনটি অংশের তিন অক্ষরের মিলন সম্পর্ক রক্ষায় আস্থায়ী কথা ব্যবহার করাই যুক্তি সম্মত।

অন্তরা,—এর অর্থ, যেখানে রাগের পরের অংশের রূপ চড়া সুরে প্রকাশ পায়। অন্তর শব্দের অর্থ পর। পরের অংশ বুঝাবার জন্য ওই অর্থ নিয়ে 'অন্তরা' নাম হয়েছে॥

সঞ্চারী,—রাগ এই অংশে আস্থায়ীর সংগে সংযোগ রক্ষা করে সঞ্চরণ করে। এইজন্য 'সঞ্চারী' নাম হয়েছে। এর প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র মুদারা ও উদারার মধ্যেই বিশেষ করে থাকে।

আভোগ,—এর অর্থ পরিপূর্ণতা অর্থাৎ যে সমাপ্তি ঘটায়। তাই সংগীতে ওই অংশকে 'আভোগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আভোগের আর একটি অর্থ, কবির নামযুক্ত গীত-সমাপক অংশকে অর্থাৎ ভনিতাকে (যেমন-"দ্বিজরাম প্রসাদ বলে") আভোগ বলা হয়।

"যত্রৈব কবিনামস্যাৎ স আভোগ ইতিরীত।"

(সঙ্গীত-শাস্ত্র)

গ্রহ-স্বর ও ন্যাস-স্বর

রাগাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞয়ো যস্তু রাগসমাপকঃ॥

(সঙ্গীত-রত্নাকর)

ভাবার্থ,—যে স্বর হতে রাগের উত্থান হয় তার নাম গ্রহ-স্বর এবং যে স্বরে রাগ সমাপ্ত হয় তার নাম ন্যাস-স্বর ।

গ্রহ কথার অর্থ গ্রহণ, ন্যাস কথার অর্থ ত্যাগ ।

উক্ত কথা দুটির সহজ অর্থ ওই হলেও, প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরে এই দুটি কথার অর্থ নিম্নোক্ত নিয়মের উপর সিদ্ধান্ত রেখে নির্দেশিত হয়েছিল ; যথা,—রাগরূপ প্রকাশের সময় সর্বাগ্রে তার বাদীস্বরকে গ্রহণ করে তারপর বিস্তৃত হবে তার রূপ এবং সমাপ্তিকালে মুদারার ষড়জ স্বরে কিংবা পুনশ্চ বাদী-স্বরে ত্যাগ অর্থাৎ ন্যাস দেখাতে হবে। এই বিষয়টিতে মূলতঃ বাদীস্বরকেই গ্রহস্বর বলে নির্ণীত হয়েছে বলেই বুঝা যায় এবং এই অর্থ গুণীপরম্পরাও শুনা আছে। ভৈরবী রাগের এই সম্বন্ধে শ্লোকে আছে— "গ্রহাংশৌমধ্যমশ্চৈব ষড়্জোন্যাসস্বরোভবেৎ । কোমল ঋ-গ-ধ-ন-য়ঃ সম্পূর্ণো ভৈরবী রেষঃ ।"

(রাগবিবোধ)

গানের চার অংশ প্রকাশের নিয়ম—

গানের প্রথম অংশ আস্থায়ী গাইবার পর দ্বিতীয় অংশ অন্তরাকে নির্দিষ্ট তাল থেকে ধরে সমস্ত ওই অংশ গেয়ে পুনরায় আস্থায়ীতে ফিরে আসতে হয়। তারপর তালের যথাস্থান হতে সঞ্চারী এবং আভোগ এক সংগে গেয়ে পুনরায় আস্থায়ীতে ফিরে আসবে। এই নিয়ম বজায় রেখে তারপর ইচ্ছে মত ওই অংশগুলি গাওয়ার বাধা নেই। তবে যতবার প্রয়োজন হবে ততবার সঞ্চারী-আভোগ এক সংগে গেয়ে যেতে হয়। এই চার অংশের গীত পদ্ধতি শাস্ত্রীয়সংগীতের ধ্রুপদ গানেই বিশেষ করে নিবদ্ধ আছে ॥

ছন্দ, মাত্রা, গতি, লয় ও তালের ব্যাখ্যা—

ছন্দ,—জগৎকে ছন্দময় বলা যায়। সৃষ্টির নিয়ম ছন্দেতে যেমন নিবদ্ধ—তেমনি ছন্দও নিয়মের অধীন। জীবদেহে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি ঠিক ছন্দের নিয়মে চলতে থাকে। ছন্দের গতিনিয়মের ব্যতিক্রম হলে দেহের বিপর্য্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

স্বভাবের মধ্যে দিয়েও ছন্দের সুন্দর প্রকাশ আছে। শিশুরা যখন প্রথম চলতে সুরু করে তখন তারা 'চলি চলি পা-পা' এই বুলির সংগে ছন্দে ছন্দে 'পা' ফেলতে চেষ্টা করে। ঘুম পাড়ানগানে কোলে কিংবা বুকের উপর রেখে ছন্দের যে আন্দোলন থাকে সেই আন্দোলনের মধ্যে স্নায়ুর ক্রিয়ায়

শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। অ, আ, ক, খ, পাঠও শিশুকণ্ঠে ছন্দ নিয়ে প্রকাশ হয়। নানান প্রমাণের দ্বারা ছন্দকেই সৃষ্টির আদি বা উৎস এবং প্রাণ বলা যায়। আমাদের জ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ক্রিয়ার জন্য হ্রস্ব-দীর্ঘের উচ্চারণে বহু প্রকার ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। বেদের সুক্ত, শ্লোক, স্তোত্র, মন্ত্র, কবিতা, পদাবলী, গীত, সংগীত প্রভৃতি এ সমস্তই ছন্দের অধীন অর্থাৎ ছন্দকে ধরেই তাদের রূপ সৃষ্টি।

সংগীতের মধ্যে আলাপের বিলম্বিত ক্রিয়ায় ছন্দের স্পন্দন নিয়ে তার বিভাগ বস্তু উপলব্ধি হয় না বটে কিন্তু তাতেও তার অভ্যন্তরে ছন্দের স্রোত থাকে। কারণ তার মধ্যেও এক গঠন মূর্ত্তি আছে ছন্দ নিয়েই,—তালের বিভাগ নেই এইমাত্র। পর্বতের মধ্যেও তার ভঙ্গীমায় ছন্দ আছে স্বভাব গঠনের মধ্যে দিয়ে। বারিক্ষেত্রের উপরিভাগ যখন নিস্তব্ধ থাকে তখনও তার অভ্যন্তরে ছন্দের ক্রিয়া থাকে। ছন্দ শুধু প্রাণ বস্তুই নয়, জড় বস্তুর গঠনেও তার প্রভাব আছে প্রকৃতির সাহায্যকারীরূপে।

ছন্দের বিবিধ ভঙ্গীকে বিশেষভাবে ধরে রাখা আছে প্রাচীন শাস্ত্রের 'ছন্দোমঞ্জরী' নামক গ্রন্থে। তাতে প্রত্যেকটি ছন্দের গতি নিয়মকে সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা ব্যাখ্যায় আবদ্ধ করা আছে। আমাদের সংগীতবিদ্যার উপযোগী কয়েকটি সেই ছন্দকে নিয়ে তাদের নিজস্ব নাম পরিবর্ত্তন করে শুধু গঠনভঙ্গী অনুসারে কোনটির নাম 'তেতাল,' কোনটির নাম 'চৌতাল' ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। যেমন 'বিদ্যুন্মালা' ছন্দের ষোল মাত্রার গতিকে ধরে বিলম্বিত তেতাল অর্থাৎ ধ্রুপদের 'ঢিমেতেতাল' তালের সৃষ্টি হয়। 'মত্তা' ছন্দ থেকে স্বভাব নৃত্যে ও বিবিধ গানে এসেছে 'কাহারওয়া' নামক তাল।

ছন্দো মঞ্জরী গ্রন্থের শ্লোক—

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষর সংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥
সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তৎত্রিধা।
সমং সমচতুষ্পাদং ভবতার্দ্ধসমং পুনঃ॥
আদিস্তৃতীয়বদ্‌ষস্য পাদস্তুর্য্যো দ্বিতীয়বৎ।
ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমংরিকীর্ত্তিতম্॥

কাব্য শাস্ত্রে 'বৃত্ত' ও 'জাতি' ভেদে ছন্দ দুই প্রকার। অক্ষর-সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত ছন্দ 'বৃত্ত' অর্থাৎ বর্ণবৃত্ত নামে অভিহিত হয় এবং মাত্রা দ্বারা পরিমিত ছন্দ 'জাতি' অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত নামে কথিত। সংগীতে বর্ণবৃত ছন্দ সচরাচর ব্যবহার হয় না, মাত্রাবৃত্ত ছন্দই সংগীতের বিশেষ উপযোগী। বৃত্তের মধ্যে যার চারটি পদেরই বর্ণমাত্রা বিন্যাস একই রূপ থাকে 'তার নাম 'সমপদী', যার প্রথম পাদ ও তৃতীয়পাদ, এবং দ্বিতীয়পাদ ও চতুর্থপাদ একইরূপ তার নাম "অর্দ্ধসমপদি," যার প্রত্যেক পদই ভিন্ন তার নাম "বিষমপদী"। সাধারণতঃ সঙ্গীতের তাল সকল তিন জাতিতে বিভক্ত, যথা,—চতুর্মাত্রিক জাতি, ত্রিমাত্রিক জাতি ও মিশ্রজাতি। দ্বিমাত্রিক ও অষ্টমাত্রিক তাল চতুর্মাত্রিক তালের

অন্তর্গত এবং ষন্মাত্রিক তাল ত্রিমাত্রিক তালের অন্তর্গত। তেতাল, মধ্যমান ও আড়াঠেকা ইত্যাদি চতুর্মাত্রিক জাতির তাল। একতাল, দাদ্‌রা ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক জাতির তাল এবং ঝাঁপতাল, ধামার, তেওট ইত্যাদি মিশ্রজাতির তাল।

সংস্কৃত ছন্দের যেরূপ পাদ বা চরণ আছে সে রূপ তাল সকলকে চার ভাগে বিভক্ত করলে অর্থাৎ প্রত্যেক তালাঘাতকে পাদরূপে ধরে নিলে তেতাল, মধ্যমান ইত্যাদিকে সমপদী তাল এবং ঝাঁপতাল, যৎ (সাত মাত্রার) ইত্যাদিকে অর্দ্ধসমপদী তাল বলা যেতে পারে, কেননা অর্দ্ধসমপদীর যেরূপ লক্ষণ তা মিশ্রজাতি তালের সংগে ওর সামঞ্জস্য হয়। যেমন ঝাঁপতালের প্রথম পদের সংগে তৃতীয় পদের এবং দ্বিতীয় পদের সংগে চতুর্থ পদের তুল্যতা দৃষ্ট হয়। যাই হোক্ বৃত্ত ও জাতি এতদুভয়েরই মাত্রা গণনা করলে সঙ্গীতের অনেক তালের সংগে তাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। কারণ কাব্যশাস্ত্রের ছন্দ ও সংগীতের তাল উভয়েরই নিয়ম একই প্রকার। বিদ্যুন্মালা, মত্তা, এবং তোটক ছন্দ, ওদের চতুর্মাত্রিক জাতি তালের সংগে, বৃহতী ও প্রমাণিকা ছন্দের ত্রিমাত্রিক জাতি তালের সংগে এবং ভুজঙ্গপ্রয়াত, তনুমধ্যা ও হরিগীতিকা ছন্দের মিশ্রজাতিতালের সংগে তুল্যতা দৃষ্ট হয়।

নিম্নে কয়েকটি ছন্দের সহিত তালের সম্পর্ক সংযোগের শ্লোক উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

	+ ৩ ০ ১
বিদ্যুন্মালা ছন্দে বিলম্বিত—	বাসোবল্লী বিদ্যুন্মালা বর্হশ্রেণী শাক্রশ্চাপঃ
তেতাল পাওয়া যায়—	যস্মিন্নাস্তং তাপোচ্ছিত্ত্যৈ গোমধ্যস্থঃ কৃষ্ণাম্ভোদঃ ॥
	+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
মত্তাছন্দে দ্রুত তেতাল—	পীত্বা মত্তা মধু মধুপালী কালিন্দীয়ে তটবন কুঞ্জে।
	উদ্দীব্যন্তীর্ব্রজন রামাঃ কামাসক্তা মধুজিতিচক্রে ॥
	+ ০ + ০ + ০ + ০
তোটক ছন্দে ঠুম্‌রীতাল	যমুনা তট মচ্যুত কেলিকলালসদঙ্ঘ্রি সরোরুহসঙ্গরুচিম্।
(আড়কওয়ালী)	+ ০ + ০ + ০ + ০
	মুদিতোঽটকলেরপনেতুমঘং যদি চেচ্ছসি জন্ম নিজং সকলম্ ॥
	+ ০ ২ ০ ৩ ৪ + ০ ২ ০ ৩ ৪
বৃহতী ছন্দে চৌতাল -	হ্রদতট নিকট ক্ষৌণী, ভুজগশিশুভৃতা যাসীৎ।
	+ ০ ২ ০ ৩ ৪ + ০ ২ ০ ৩ ৪
	মুররিপু দলিতে নাগে, ব্রজজন সুখদা সাভূৎ ॥
	+ ০ + ০ + ০ + ০
প্রমাণিকা ছন্দে দাদ্‌রা তাল—	পুনাতু ভক্তির চ্যুতা সদাচ্যুতাঙ্ঘ্রি পদ্ময়োঃ
	+ ০ + ০ + ০ + ০
	শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণিকা ভবাম্বুরাশিতারিকা ॥

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
'ভুজঙ্গপ্রয়াত'এ ঝাঁপতাল— নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় ।
+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়,
+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় ॥

"মহানির্ব্বাণ তন্ত্র"

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
'ভুজঙ্গপ্রয়াত'এ ঝাঁপতাল সদারাত্মজজ্ঞাতিভৃত্যো বিহায়
(ছন্দোমঞ্জরী) + ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
স্বমেতং হ্রদং জীবনংলিপ্সমানঃ ।
+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
ময়াক্লেশিতঃ কালিয়েত্থং কুরু ত্বং
+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
ভুজঙ্গপ্রয়াতং দ্রুতং সাগরায় ॥

+ ২ ৩ + ২ ৩
'তনুমধ্যা'তে সুরকাক্তাতাল— মূর্ত্তির্মূরশত্রোরত্যদ্ভুতরূপা ।
+ ২ ৩ + ২ ৩
আস্তাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা ॥

৩ + ২ ৩+ ২৩ + ২ ৩ + ২
'হরিগীতিকা'য় তেওরাতাল,— কমলেশ কমলাসন সুরেশ জলেশ মুখসুর বন্দিতে
ভুজদণ্ডখণ্ডিত চণ্ডমুণ্ডকপাল সদ্বলি নন্দিতে ।
মৃগরাজবাহিনি রুধিরবীজ কপোলদারিণি পাহি মাং
শঙ্কর-বিলাসিনি বিন্ধ্যবাসিনি কলিতপাশিনি রক্ষমাম্ ॥

মাত্রা,—ছন্দের যে গতি আছে তার সময়কে সমান ওজনে যে মেপে যায় তাকে মাত্রা বলে। 'শ্রুতিবোধ' গ্রন্থে আছে,—"মাত্রাতু যাবতাপাণিঃ পর্য্যেতি-জানুমণ্ডলে।"

পরিমাণ বোধক 'মা' ধাতু হতে মাত্রা শব্দের উৎপত্তি। মাত্রাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় ছন্দ ঠিকভাবে চলছে কি-না।

বক্ষস্থলে হাত রেখে আমরা হৃৎপিণ্ডের সমান ভাগে যাওয়া ধক্-ধক্ শব্দ শুনতে পাই, সেই শুনতে

পাওয়া প্রতিটি শব্দই মাত্রারূপে যেমন সেখানের জীবনী ক্রিয়া ঠিক ছন্দে চলছে কি-না বুঝিয়ে দেয় তেমনি মাত্রাই সঙ্গীতের ছন্দ প্রাণকে ও গঠনকে রক্ষা করে।

ছন্দের সহিত মাত্রার সম্বন্ধের উদাহরণ, অস্থি সমূহ যেমন জীব দেহের শক্তি ও গঠনকে রক্ষা করে তেমনি মাত্রা রক্ষা করে তার ছন্দের অভ্যন্তরের শক্তি ও গঠনকে॥

গতি,—সময় বা কালের প্রধানতঃ তিন প্রকার গতি আছে। সেগুলির নাম বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। মাত্রা যেমন ছন্দের গঠনকে রক্ষা করে তেমনি মাত্রার সমতাকে গতিই রক্ষা করে। সংগীতে ওই তিন প্রকার গতিকেই আমরা ব্যবহারের মধ্যে রেখেছি। আমরা কোন জিনিস চালনা করলে সহজেই ধরে নিতে পারি যে বিলম্বিত, মধ্য, না দ্রুত গতিতে চলছে। এ স্থলে বিলম্বিত অর্থ সম্বন্ধে বুঝতে হবে যে এমন অতিশয় বিলম্বিত হবে না যাতে করে তার ছন্দের গতিভঙ্গী উপলব্ধিতে আনা দুরূহ হবে।

লয়,—গতি মাত্রার মধ্যে লীন হয়ে থাকে বলে সংগীতে তাকে লয় নামে ব্যবহার করি। কোন চলমান বস্তুতে যদি কোন প্রকারে মাত্রার সংগে গতির বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে উভয়ের মিলন নষ্ট হয়ে গিয়ে অর্থাৎ লয় ভ্রষ্ট হয়ে ছন্দহীন অবস্থায় তার আবর্ত্তন বা গমন বিকল হয়ে সর্বশক্তিই নষ্ট করে দেবে। সংগীতেও মাত্রার সংগে গতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তারও ওই অবস্থার মতই হবে। উদাহরণ যেমন, কোন একটি এঞ্জিন চলছে পুরাদমে, হঠাৎ তার কল বিগড়ে গিয়ে চলার মাত্রা ছেড়ে গেল কিন্তু চলার বেগের ক্রিয়ায় যন্ত্রটির চাকা কিছুক্ষণ চলতে থাকলেও শীঘ্রই তার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি সংগীতে মাত্রার সংগে গতির অবিচ্ছেদ্য ছন্দসম্বন্ধ নষ্ট হয়ে গেলে এইরূপ পরিণতি হয়? সংগীতের ক্ষেত্রে এই বিষয় ধরে একটা প্রশ্ন আসতে পারে—সংগীতে তালের ক্রিয়ায় যে সমস্ত আড়, অতি আড় ছন্দাদি প্রকাশ পায় তাতে গতির নিয়মিত সমতা কি বজায় থাকে? এর উত্তর—আপাত দৃষ্টিতে হয়ত মনে হবে তার নিয়মিত চলার সমতা থাক্‌ছে না কিন্তু গতির সঙ্গে লয়ের বাঁধন যে ঠিকই থাকে একথা সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই বুঝতে পারেন। আমার মতে ছন্দের উপর খুব বেশী কাটা জোড়া জিনিস সংগীতধর্ম্মী নয়। অবশ্য তালের বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শনের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে এবং তাকে প্রকাশিত করা বিশেষ সামর্থ্যের উপরও নির্ভর করে সত্য, কিন্তু ব্যবহারের সময় সঙ্গত সীমার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তাতে রাগ-তালের ক্রিয়া সমর ক্ষেত্রে পরিণত করে।

ধ্রুপদাঙ্গের অপ্রচলিত ও স্বল্পচলিত তালগুলির ঠেকার পরিচয়—

পটতাল, (পুটতাল)—ষোল মাত্রা এবং একটি তাল ও একটি ফাঁক।

+ ০

ঠেকা—ধা-গে-দিন-তা-। তে-টে দিৎ-ত.-ধা। প্রত্যেক তাল আট মাত্রায় নিবদ্ধ॥

ধ্রুপদের বিলম্বিত তেতাল,-- বত্রিশ মাত্রা, তিন তাল, এক ফাঁক।

+ ৩ • ১

ঠেকা,-- ধা-গে-দিন্-তা- তেটে দিৎ-তা-ধা-। দিন্-তা-ক-তা। তেটে কতা গদি ঘেনে ॥

বীরপঞ্চ তাল,—ষোলমাত্রা। পাঁচ তাল, তিন ফাঁক।

+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫

ঠেকা,—ধা-দেৎ ঘেনে নাগ্ ধেটে ধেটে কেটে তাগ্ গ দিন্ তা-নে ধাগে তেটে কতা গদি ঘেনে ॥

সাত্তিতাল, কুড়ি মাত্রা। সাতটি তাল, তিনটি ফাঁক।

+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ৭

ধা-ধেনে নাগ্ দি ঘেনে নাগ্ গদ্দি ঘেনে নাগ্ ধাতে টেতা তেটে ঘেনে তেটে তেটে ঘেটে তেটে

০

গদি ঘেনে ॥

মোহন তাল,—চব্বিশ মাত্রা। সাতটি তাল এবং পাঁচটি ফাঁক।

+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ০ ৬ ৭

ধা কেটে তা-ধা দিন্ তা কেটে ধা দিন্তা কেটে ধা তা ধা দিন্ তাক্ তেটে কতা গদি ঘেনে ॥

দোবাহার তাল,—ছাব্বিশ মাত্রা। নয়টি তাল, চারটি ফাঁক।

+ ০ ২ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ৭

ধা ধা দিন্তা কেটে তাক্ গদি ঘেনে ধা ধা দিন্ তা দিন্ তাক দিন্ তাক ধেৎতাগে দিন্ তাক্

৮ ৯ ০

ধেৎ তাগে তেটে কতা গদি ঘেনে ॥

ব্রহ্মতাল। আটশ মাত্রা। দশটি তাল, চারটি ফাঁক।

+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ • ৭ ৮

ধা—তেরে কেটে তাগ্ তা-ধা- কিটি তাক্ নাগ্ ধেরে কেটে তাগ্ ধা— কেটে তাগ্ নাগ্ ধেরে

৯ ১০ ০

কেটে তাক্ গদি ঘেনে নাগ্ দেৎ ॥

সওয়ারী (পঞ্চম সওয়ারী)। ত্রিশ মাত্রার তাল। পাঁচ তাল, তিন ফাঁক।

+ ২ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০

ধিন্ তাক্—ধিন্ তাক্ —তাক্—থুনা কেটে থুনা কৎ—থুনা কেটেতাক্ থুনা কেটে তাধি নিধা

কেটেতাক্ ॥

রুদ্রতাল। বত্রিশ মাত্রা। এগারটি তাল, পাঁচটি ফাঁক।

+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০ ৭
ধা কেটে ধা ধা দিন্‌তা কেটে ধা দিন্‌তা কেটে ধা কেটে ধা কেটে ধা দিন্‌তা দিন্‌তা
০ ৮ ৯ ১০ ১১ ০
কেটে তাগ্‌ তা ধা দিন্‌তা কেটে ধা দিন্‌তা কেটে ধা ॥

ব্রহ্মযোগ তাল। চৌত্রিশ মাত্রা। বারটি তাল, পাঁচটি ফাঁক।

+ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০ ৭ ৮
ধা—তেরে কেটে তাগে তা—ধা—কেটে তাগ্‌ নাগ দেরে কেটে তাগ্‌ ধা—কেটে তাগ্‌ নাগ্‌ দেরে
৯ ১০ ০ ১১ ১২ ০
কেটে তাগ্‌ গদি ঘেনে নাগ্‌ দেৎ ধা দিন্‌ ধা—কৎ—॥

লক্ষ্মীতাল। ছত্রিশ মাত্রা। ষোলটি তাল, তিনটি ফাঁক।

+ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ধা—কেটে দিন্‌—তা—খেৎ—তাগে দিন্‌—তা—ধুমা কিটি কিটি ধা—গে—দেন্‌—তা—
১৪ ১৫ ১৬ ০
গে—দেন্‌—তা—দিৎ—॥

উক্ত তালগুলির অধিকাংশই প্রায় বিশেষত্ব হীন। এত সংখ্যক তালাঙ্কের হিসেব রেখে যদি গান করতে হয় তাহলে সংগীতের শিল্পরূপ ব্যাহত হতে বাধ্য। ফাঁক ও তালের হিসেব রাখার জন্য এতবেশী মনযোগ দিতে হবে যে গান তখন হয়ে উঠতে বাধ্য হবে তালের বোঝাবহনকারী মাত্র। মনে হয় এক সময় বাদক সম্প্রদায় বহুবিধ তাল রচনা করে দেখিয়ে ছিলেন তাঁদের কৃতিত্বের শক্তি। এই রকম কৃতিত্বের আদর্শকে বড় করে ভেবে নিয়ে ওই রকম তাল সৃষ্টির মত গায়কদের দ্বারা বহু রাগেরও সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে বহু সংখ্যক অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এখন আবার যেভাবে নূতন নূতন রাগ রচনা হচ্ছে সেগুলিরও মনে হয় ওই অবস্থা হয়ে যাবে। থাকবে বরাবরের জন্য চলিত রাগগুলি, যথা,— ইমন, ভূপালী, কেদার, কানড়া, বাগেশ্রী, তোড়ী, বেহাগ, পূরিয়া, ভৈরব ইত্যাদি॥

তাল,—তাল নাম এসেছে হাতে তালি দেওয়া থেকে। তালের অর্থ করতালাঘাত। পূর্ব্বে ছন্দের আলোচনায় তালের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। ছন্দের নাম থেকে যে তালগুলির নামকরণ হয়েছে সেগুলিকে আমরা নামের সম্বোধনে তালই বলি। যেমন কি তাল? মাত্রা তালের নিয়ম বুঝে উত্তর এল 'চৌতাল'। আবার হাতে যখন আমরা তাল দিই তখন তাকেও বলি তাল। যেমন তাল দাও বা দিচ্ছি। তাল কথাটি দু'রকম অর্থেই চলে আসছে ব্যবহারিক নিয়ম নির্দ্ধারণের জন্য।

আমার মনের মধ্যে ধরা দিয়ে তালের অর্থ নিয়ে তার উদ্দেশ্যের উপর একটু ব্যাখ্যার আছে,—যথা-অর্থসঙ্গতভাবে তু'হাতে করতালির দ্বারা সুরের সংগে ছন্দ প্রকাশের মধ্যে অন্তরে যে ভাববস্তু আসে তা যেন তুইকরের মিলন সম্বন্ধ রেখে প্রার্থনার মত। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের নিকট মাত্রার ভারসাম্য-বোধ রাখার জন্যও এর কার্য্যকারীতায় যে অনেকখানি সাহায্য হয় তা উপলব্ধিতে আসে ॥

তালাঙ্কের নামে 'সম'তাল—

যে কয়টি তালাঙ্ক আছে তাদের মধ্যে সুর ও ছন্দের উপর যার প্রভাব বেশী. এবং তাল-মাত্রার গণনা নির্ণয় ও তার যথাযথ সমতাকে বুঝবার জন্য যে তালটিকে গ্রহণ করা আছে, তাকে বলা হয় 'সম'তাল। আরো পরিষ্কার অর্থ,— যে কোন তালনামের গঠনরূপের উপর মাত্রাসমষ্টির মধ্যে যে কয়টি তাল থাকে সেগুলি ছন্দ ও গতি নিয়ে চলার সময় মাত্রার ঠিক সমতা বা সঙ্গতি রেখে চলছে কিনা তার পরিচয় যে তালটির উপর দিতে হয় তাকে 'সম'তাল বলে। ঘড়ির বারটার চিহ্ন বা ঘর যেমন অন্য চিহ্নিত ঘরগুলির মধ্যে প্রধান, তেমনি তালের মধ্যে 'সম'তালটিই প্রধান। সমতা নির্দেশ-কারী বলে 'সম' নাম হয়েছে। 'সম'তাল হতেই তাল-মাত্রার হিসেব গণনা করা হয়। এই তালকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের তাৎপর্য্যের বিচার নিয়ে আর এক অর্থ করা যায়,—যেমন নদী বা সমুদ্রের ঢেউ ভাসতে ভাসতে তটে গিয়ে আছড়ে পড়ে, তেমনি সুরসংযুক্ত অন্য তালের ঢেউগুলি সমের তটে আছড়ে পড়ে। সে সময় সংগীতে সুর ও ছন্দের একটি আকাঙ্ক্ষামূলক মিলনসৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন সেই জায়গাটিতে সুর ও ছন্দ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হল। গায়ক ও যন্ত্রীগণকে ওই মিলনের স্থান থেকেই তালের হিসেব রাখতে হয় এবং সংগীত সমাপন সেই স্থানটির উপরই করতে হয় গান ও গৎএর নীতি নিয়মে ॥

'সম' তালের সংগে অন্য তালের অঙ্কন স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা।

প্রত্যেক তালের গতিচক্রের উপর তালাঙ্কগুলির সঙ্কেত আছে। যেমন তেতাল নামে একটি তাল, তার মাত্রা সমষ্টি ষোলটি এবং তার চারটি ছন্দ বিভাগের উপর আছে চারটি তাল। এই চারটি তালের অঙ্কাক্ষর যথা,—'সম', তৃতীয়, ফাঁক, প্রথম। এই অঙ্ক চিহ্ন করণ অন্য ভাবেও আজকাল করা হচ্ছে, যথা,—'সম'তাল 'এক', পরের তাল 'দ্বিতীয়', তৃতীয় 'ফাঁক' এবং চতুর্থ 'তিন'।

তেতাল এবং আদি একতাল তালের উপর 'সম'তালকে দ্বিতীয় রেখে এতকাল কেন চলে আসছে তার সম্বন্ধে আমার বিশেষ যুক্তি আছে। আগেই বলেছি, সুর ও ছন্দের মিলন স্থানকেই 'সম' বলা হয়। অর্থাৎ 'সম্'তাল তালের সন্ধিস্থলের তাল। এ কথা ন্যায়তঃ স্বীকার করলে সন্ধিস্থলের তালকে

মধ্যস্থানেই ধরতে হয়। এই নিয়ম নীতি ধরেই আদি পুটতালের (হস্তপুট দ্বারা তাল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর ব্যবস্থা আরোপ ক'রে ব্যবহারিক সংকেত রেখে পুটতাল নামকরণ হয়ে ছিল। পুটতালকে 'পটতাল' ও বলা হয়। এই তালটির এই অর্থই আমার চিন্তা ধারায় যথাযথ বলে স্বীকৃত হয়)। উপর সন্ধি তাল 'সম'কে দিক্‌বলয়ের চতুর্দিকের সীমা মধ্যে পূর্বদিকের মত পূর্বমুখী তাল ধার্য্য করে পশ্চাতের পশ্চিমদিকের স্থানের মত সেইস্থানে ফাঁকতালকে রাখা হয়েছে। এই সঙ্গত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তেতাল ও একতাল তালের সমতালকে দ্বিতীয় স্থানের তাল ন্যায়-নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত বলা চলে। আদি পটতাল থেকে বিলম্বিত তেতাল (টিমাতেতালা) এবং তার থেকে পরে খেয়াল ইত্যাদি গান ও গৎএর জন্য মধ্য ও দ্রুত লয়ের প্রয়োজনীয়তায় তেতাল নামে ব্যবহার হতে থাকে। অনেকে সাধুভাষায় ত্রিতাল বলেন, কিন্তু আমার মতে একতাল, চৌতাল, আড়াচৌতাল, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল ইত্যাদি তালগুলির নাম সাধারণ ভাষাতেই যখন ব্যবহার চলে আসছে,— শুদ্ধ ভাষায় বলার ইচ্ছে করলেও বলা যাবে না, তখন কেবলমাত্র 'তেতাল'কে ত্রিতাল বলে নামের কৌলিন্য দেওয়ার কি প্রয়োজন ও গুরুত্ব আছে ?

গতির মধ্যে ছন্দতালের সৃষ্টি

স্বভাবের উপর ছন্দের গতি গঠন একটিই। আমার অভিজ্ঞতা মত এই একটি থেকেই আর একটির জন্ম হয় জীবদেহের গঠনভঙ্গীর স্বভাব ধরে এবং পরে আসে মানুষের নৃত্যরূপের ভঙ্গীমায়। যখন প্রত্যেক প্রাণীর দেহ সোজা দাঁড়িয়ে থাকে তখন দৃষ্টিতে আসে সরল গতির স্বাভাবিক রূপ, যখন চলাচল করে তখন নিম্ন, মধ্য ও উর্দ্ধাঙ্গের গঠনভঙ্গীর মধ্যে অনেকখানি পাওয়া যায় ওই-সংযুক্ত তিন-ভাগে ত্রিমাত্রিক ছন্দের মত রূপদৃশ্য। এই বাস্তব নিদর্শন ধরে সহজেই মনে আসে, সমগতির ছন্দই প্রধান ও সৃষ্টির মূল প্রাণবস্তু, এবং তার থেকেই এসেছে গতিভঙ্গীমায় তিনের সমাবেশে নৃত্যছন্দের মত আর এক রূপ। সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে এই দুটি মাত্র ছন্দকেই পাওয়া যায় এবং এই দু'টি ছন্দকে ধরেই তার মিশ্রণে নানান তালের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত দুটি গতির প্রমাণে দেখা যায়, সমান গতির তেতাল তাল যখন খুব দ্রুত লয়ে চলে তখন ছন্দ তার ত্রিভঙ্গ রূপ নেয়। আবার দেখা যাচ্ছে 'চৌতাল' তাল দুই-দুই মাত্রার সমান গতি নিয়ে চললেও তার অভ্যন্তরের ছন্দে থাকে ত্রিমাত্রিকের ভঙ্গীরূপ। একে সহজেই ধরা যায় গানের সুর ও কথার রচনার মধ্যে। ছন্দের এই রূপসম্পর্ক দেখে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম রূপের মধ্যে শক্তিরূপা শ্রীরাধার সহজ সরল রূপ জড়িয়ে আছে— পুরুষ-প্রকৃতির মত, অথচ রূপ ও দেহে প্রত্যেকে পৃথক। যাই হোক্ মোটের উপর দুই আর তিন, মাত্রার এই দুটি ছন্দ বিভাগের উপরই সমস্ত ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে নানান ভাবে যুক্ত করে॥

রাগের প্রকৃতি বা আকৃতি

সমস্ত রাগরূপের প্রকাশ শক্তি ও সামর্থ্য এক নয়। কতকগুলি বৃহৎ আকৃতি ও প্রকৃতির, কতকগুলি তার চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন এবং কতকগুলি শক্তিতে আরো কম। প্রথমস্তরের পরিচয়ে যেমন,—ইমন, কানড়া, তোড়ী, ইত্যাদি, দ্বিতীয়স্তরে যেমন,— আড়ানা, রামকেলী, কলিঙ্গড়া ইত্যাদি, তার পরের স্তরে যেমন,—ঝিঁঝিঁট, বারওঁা, পাহাড়ী ইত্যাদি ॥

ধ্রুপদ গানের চার প্রকার বাণীর অর্থ সম্বন্ধে

ধ্রুপদ গানে বাণী নাম দিয়ে চার রকম গায়কী নামের পরিচয় আছে, যথা,— গৌড়হার বাণী, খান্দান (খাণ্ডার) বাণী, ডাগর বাণী এবং নওহার বাণী। বাণী এবং তার পূর্বে ওই কথাগুলির কি অর্থ ধরে তাদের নামকরণ হল, তার সঙ্গত ব্যাখ্যা কিছু পাওয়া যায়নি। কেবল পরিচয়ের মধ্যে আছে.—ধ্রুপদের রাজা বিশেষ ধ্রুপদ হল গৌড়হার বাণীর ধ্রুপদ, খান্দান বাণীর ধ্রুপদ সেনাপতির মত শক্তিশালী, মন্ত্রীতুল্য ডাগর বাণীর ধ্রুপদ এবং বক্‌সী অর্থাৎ খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষের পদের মত অধিকারী নওহর বাণীর ধ্রুপদ। এই নামগুলির উক্ত ব্যাখ্যা তানসেনের রচিত ভূপালী রাগের উপর চৌতাল তালের এক গানেও পাওয়া যায়, যথা, — "বাণীচারকে ব্যওহার শুনলিজে হো গুণীয়ন, তব পাওয়ে ইহবিত্থাকো সার। রাজা 'গৌড়হার', ফৌজদার 'খাণ্ডার', দিয়ান 'ডগর', বক্‌সী 'নওহার'। অচল সুর-পঞ্চম, চলস্বর ঋষভ, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ, গান্ধার। সপ্তক তিন, একুইশ মূরছানা, বাইশ শ্রুতি, উন'ঞ্চাশকোট তান, তানসেন আধার॥" এই গানটিতে কয়েকটি ঔপপত্তিক কথা আছে বলে সমস্ত গানটিই লিখিত হল। ধ্রুপদের রচনা গদ্য-পদ্যময়, সুর, তাল ও রাগাদির প্রগাঢ়তা এবং রচনার গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি অলংকার সংযুক্ত বলে এই প্রকার রচনা কৌশলকে সংস্কৃতঅলঙ্কারিকেরা গোড়ী রচনা বলেন, গৌড়ীশব্দের হিন্দী নাম গৌড়হার। খেয়ালের মৃদুপদ বিন্যাসের রচনাকে সাহিত্যদর্পণকর্ত্তা লাটিরীতি বলেছেন। লাটি রীতিকে 'নওহার' ভাষায় ব্যবহার করা হয়। এ কথা প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে। শুধু এই বর্ণনা ধরে চারটি বাণীর পৃথক অর্থ আসে না। খেয়ালকে 'নওহার' বাণী বললে তার মধ্যে কোন বিচার বিশ্লেষণ এবং যুক্তি থাকবে বলে আমি মনে করি না। তা-ছাড়া চারটি বাণী ধ্রুপদের মধ্যেই উল্লেখ আছে কিন্তু রচনার ভাবার্থের উপর নির্দ্ধারণ আশ্রয়ে ধ্রুপদের মধ্যে চারটি বাণীর স্তর সৃষ্টি করে বিভাগ করা হয়েছিল বলে কোন সঙ্গত বিচারে আসে না। সুতরাং দেখতে হচ্ছে ওই নির্দ্ধারণ ব্যবস্থায় বাণী কথার ব্যবহার কি অর্থ নিয়ে এল এবং গতিপদ্ধতির উপর এমনকি তার প্রভাব আছে। বাণী মানে কথা—এই অর্থ ধরে উক্ত চার শ্রেণীর ব্যবস্থায় কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। আগেই বলেছি কোন একটির উপর নির্দিষ্ট রচনার ভাবার্থ রেখে ধ্রুপদের শ্রেণী

পৃথকীকরণ স্বীকারে আসে না। ধ্রুপদের প্রত্যেক তালের গান নানান ভাব দিয়ে রচনা আছে। সুতরাং শ্রেণীকরণে কথার উপর গুরুত্ব দিয়ে বাণী নামকরণ যথার্থ নয়।

এখন দেখা যাক্ বাণী কথার আর কি মানে আছে। বাণী মানে 'বপন' কথাও আছে কিন্তু সে অর্থের সংঙ্গে দ্রুপদের শ্রেণী শক্তির সম্বন্ধ ধরে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বেদে বাণী অর্থে ছন্দকেও ধরা আছে। এই অর্থকে নিয়ে পূর্বোক্ত বিষয়ের একটা সমাধানে আনতে পারা যাবে। যেমন, চৌতাল তালযুক্ত যে ধ্রুপদ গানের কথার উপর ছন্দের আয়তন থাকে দীর্ঘতা নিয়ে এবং সুরের ঢেউ তুলে দুলে-ফু'লে ফু'লে ধীর গতিতে চলতে থাকে বা চালনার প্রয়োজন থাকে.-রাগের মূর্ত্তিকে মনে হয় যেন বিরাট রূপৈশ্বর্য্যের অধিকারী—সেই ছন্দযুক্ত ধ্রুপদ গানকে বলা যেতে পারে গৌড়বাণীর ধ্রুপদ অর্থাৎ ওই অর্থে ধ্রুপদের রাজা বিশেষ।

দ্বিতীয়,—যে ধ্রুপদ গানের মধ্যে চৌতাল তালকে নিয়ে ছন্দ তার দ্রুত গতিতে ধাবমান হয় এবং তানের মত সুর ছুটতে থাকে সেনাপতির দ্রুত চালনা অসির ঝলকের মত, সেই প্রকার ধ্রুপদ গানকে বলা যেতে পারে খান্দান বা খাণ্ডারবাণীর ধ্রুপদ। যাকে বলা হয়েছে ফৌজদার অর্থাৎ সেনাপতিতুল্য।

তৃতীয়,—যে চৌতালের ধ্রুপদে আধ্যাত্মিক ভাবধারার রচনা প্রধানতম হয়ে থাকে, ছন্দের গতি যার মধ্য লয়ে চলে বা চালনা করতে হয় এবং তাতে শুধু পরিমিত রসমাধুর্য্যের দ্বারা সুর ও ভাষার ভাব জড়িয়ে থাকে বা জড়িয়ে রাখতে হয় সেই উচ্চস্তরের বাণী-সুরের ভাবময় ধ্রুপদকে ডাগরবাণীর ধ্রুপদ নামে আখ্যাত করা যায়। ডাগর কথা বড় অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

চতুর্থ,—অন্যান্য যে সমস্ত ছন্দ তালের ধ্রুপদ গান আছে তাদের সমস্ত গোষ্ঠীকেই নওহর বাণীর ধ্রুপদ বলতে পারা যায়।

এই চারটি বাণীর ধ্রুপদের নামকরণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়, বাংলার গৌড়দেশে বল্লাল রাজার সময় মার্গসংগীতের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল লোচন পণ্ডিতের দ্বারা, সেই সংগীতের গায়কীনীতি অনুসরণ করেই হয়ত গৌড়বাণী নাম দিয়ে ধ্রুপদের উক্ত শ্রেণী বিভাগে ধার্য্য হয়েছিল।

কান্দাহার নামক স্থানের প্রচারিত ধ্রুপদ গানের গায়কী রীতিকে ধরে খান্দান বা খাণ্ডার বাণীর ধ্রুপদ বলে পরিচিত হয়েছে মনে করা যেতে পারে। খান্দান মানে এখানে বংশানুক্রমিক আভিজাত্য গায়কীরীতি। এই সঙ্গত অর্থ ধরে আমার বিশ্বাস খান্দান (খান্দানী) কথার অপভ্রংশে খাণ্ডার কথা এসে গেছে। দেশের নাম ধরে উক্ত নামকরণ বিচারসম্মত হয় না।

সংগীত ঘরাণায় ডাগরবংশের এক বিশেষ পরিচয় আছে। ডাগরবাণীর ধ্রুপদ ওই বংশের গায়কী ভাবধারকে গ্রহণ করেই উক্ত নামকরণ হয়েছিল বলেই সিদ্ধান্তে আসে। নওহর কথার সঠিক অর্থ পাওয়া মুস্কিল। সম্ভাব্য ধরে এর একটা অর্থ করে নেওয়া যায়। হিন্দী কথার 'হর' মানে বহু। গানে আছে 'হরতরহ' এর অর্থ-বহুপ্রকার। 'তরহ' মানে প্রকার।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় বহু প্রকারের ছন্দ তালকে নিয়ে যে সমস্ত ধ্রুপদ গান আছে তাকেই আমি

নওহর বাণীর ধ্রুপদ বলে মনে করি। নও মানে নূতন, নওহর-মানে নূতনবহু 'তরহ' কথাটি থাকলে মানে পরিষ্কার হয়ে যেত। মনে হয় সংক্ষেপ করার জন্য ওই কথাটি অনুল্লেখ থেকে গেছে। ছন্দ-সৃষ্টির নূতন নূতন ভঙ্গীতে চৌতালের পরে যে সমস্ত তাল তৈরি হয়েছিল তাকে ওই কথার উপর বাণী নামে প্রচলন করা হয়েছিল বলে ধরা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। 'নওহর' বলে কোন স্থানের বা ঘরাণার সন্ধান নেই এবং অন্য কোন দিক দিয়েও নওহর কথার সম্ভাব্য উত্তর মনের সামনে আসে না।

খেয়ালের মৃদুপদবিন্যাসের রচনাকে সাহিত্যদর্পনকর্ত্তা লাটিরীতি বলেছেন এবং লাটিরীতিকে নওহার ভাষায় ব্যবহার করা হয়,---" —এ কথা আমার কাছে বিচারসহ বলে ধরা দেয় না। কারণ আগেই বলেছি উক্ত চার প্রকারের বাণী একমাত্র ধ্রুপদেই উল্লেখ আছে। তাছাড়া অন্য দুটি বাণী পদ্ধতির ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি। তাঁদের দেওয়া ব্যাখ্যাকেই মানতে হলে ধ্রুপদের ওই বাণী কথার অর্থে সামগ্রিকভাবে একটিকেই বুঝাতে পারে। কারণ প্রায় প্রত্যেকটি ধ্রুপদের গানের মধ্যেই আছে গভীরভাবযুক্ত রচনা শৈলী, রাগরূপের প্রগাঢ়তা এবং সুরের ভাব গাম্ভীর্য্য। সুতরাং ছন্দের গতিভঙ্গীর ভাব ধারার উপর এবং গানের গায়কীর রীতি নির্ণয় ধরে আমি যে ব্যাখ্যা দিতে পারলাম তা প্রকৃত যুক্তিযুক্ত হল কি-না এ বিষয়ে অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কাছে বিচারে সহজ হয়ে আসবে বলে মনে করি।

ধ্রুপদগানের সৃষ্টি বিষয়ে

গুণী পরম্পরা এবং কোন কোন গ্রন্থের মাধ্যমে উক্ত গানের সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়, বহুপ্রাচীন যুগ হতে যে সমস্ত রাগের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়ে এসেছিল তাকে অনুসরণ করে প্রায় আটশ' বছর আগের পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজীর সময় নায়কগোপাল প্রভৃতি দরবারগুণীদের দ্বারা হিন্দী ভাষায় তালে-ছন্দে রাগরূপকে নিয়ে গঠিত হয়ে নিবদ্ধ সংগীত রূপে সৃষ্টি হয় এবং সেই গীতপদ্ধতি বস্তুর নামকরণ হয় 'ধ্রুব-পদ'। চলিত কথায় ধ্রুপদ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। পদ কথার অর্থ—ছন্দের সংগে-মিলন সংযুক্ত করে ভাষা-ভাব দিয়ে রচনা বস্তুর এক একটি অংশকে পদ বা চরণ কিংবা আর এক চলিত কথায় তুক্ বলা হয়। ছন্দের ঠিক ঐ রকম নিয়ম ধরে সমস্ত ধ্রুপদ গানের রচনায় না থাকলেও প্রত্যেকটির পদের শেষ অক্ষরের সংগে রচনার মিল থাকে এবং এক একটি পদের মধ্যে দিয়ে তার সমাপ্তির পর তখনকার মত কথার ভাবের সমাধান হয়। বেশীর ভাগ ধ্রুপদে চারটি অংশ বা পদের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত নীতি-নিয়ম নিয়ে রাগের বিস্তৃত রূপ এবং বাক্য রচনার ভাব উদ্দেশ্যের পরিচয় থাকে।

ধ্রুব-পদ কথার প্রকৃত অর্থ,—গানের রচনার পদ (চরণ) সমূহ রাগের সত্তারূপকে ('ধ্রুব'মানে-সত্য) এবং ঈশ্বর আরাধনার ভাবকে বহন করার সামর্থ্য রাখে বলে এই শক্তিসম্পন্ন গানের নাম 'ধ্রুব-পদ'। এর অন্য কোন অর্থ আনতে গেলে ধ্রুব-পদ বস্তুটির ক্রিয়াশক্তির উপর যথাযথ ব্যাখ্যার

বিচার থাকবে না,—একথা আমার ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতা লব্ধ। ধ্রুপদ গানের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি এক অদ্ভুত ইতিহাস পাঠ করেছি। সে বিষয়ের উত্থাপন পরে করব ॥

খেয়াল গানের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে

খেয়াল গানের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কাছে তার পরিচয় কি আছে সে কথাই জানাব।

তানের মত বস্তু দিয়ে গান করা বহু বহু আগে যে ছিল না এ কথা মনে হয় কেউই বলবেন না।

মনের আবেগে মনুষের কণ্ঠে যখন সংগীতের সুর আসে তখন সে তার ভাষার ভাবকে খুঁজে না পেলেও সুরের ভাব তাকে উদ্বেলিত করে এবং তখন যে কোন একটা অক্ষর নিয়েই সুরের রূপকে তানের মত তুলির সাহায্যে এঁকে আনন্দ পায়।

সংগীতের প্রভাব এই ভাবেই মানুষের অন্তররাজ্যে বিস্তৃত হয়ে এসেছে। তারপর ক্রমশঃ মানুষ মনের ভাবকে সংগীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবার জন্য আবেগ নিয়ে ভাষার ভাব দিয়ে গান রচনা করে আসছে।

মানুষের মনে সুরের প্রথম প্রথম আগমনের মধ্যে তার স্বরূপের উপর তানের মত বস্তুই নানান ভাবে চিত্রিত হয়। সেই বস্তু কণ্ঠের সামর্থ্যানুযায়ী সুন্দর বা অসুন্দর হতে পারে। কিন্তু তাই বলে ওই রকম তানের দৃষ্টান্তের সম্বল ধরে তাকে খেয়ালগানের মত অতবড় গায়কী-নীতিধারার গানের সৃষ্টি উৎস বলা যেতে পারে না এবং উদাহরণের যোগ্য ও নয়।

এখন যুক্তি দিয়ে দেখা যাক কিভাবে এই নীতিধারার গান কোন আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠল।

এ বিষয়ে দেখতে পাচ্ছি—তানসেনের গায়কীরীতির উপর যে ধারণা আছে তার উপর নির্ভর করে একটা সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যদি ইতিহাস কথিত হরিদাস স্বামী তানসেনের সত্যই সংগীত গুরু হন তাহলে আমার যুক্তিকে সমর্থন করতে দ্বিধা আসবে না বলেই বিশ্বাস করি। কারণ দেখিয়ে বলা যায়,— হরিদাসস্বামীকে আমরা জানব ভগবৎ সাধনায় মগ্ন পুরুষ রূপেই। তাহলে আমরা মেনে নিতে পারি তিনি ভগবৎ আরাধনায় ধ্রুপ-পদ (ধ্রুপদ) সংগীতকে প্রধানতমরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তালাদি গঠনের দ্বারা বাদ্য সঙ্গতের নীতিধারায় ধ্রুপদ সংগীতের যে সহযোগ-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে তার থেকে তিনি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রধারায় গাইতেন। অর্থাৎ পাখোওয়াজ বাদ্যের অধীনে তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন না, —কথার ভাবের সংগে সুরের ভাবকে মিশিয়ে রাগরূপের নব নব বৈচিত্র্যক্রিয়া নিয়েই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূজার্ঘ দিতেন। এই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাবারূপেই ধরে নিতে পারা যায়—রাগরূপের স্বাধীন ক্রিয়ার মহিমময় সৃষ্টির বিস্ময়কর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে রামতনু পাঁড়ে (তানসেন) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন। স্বামীজীও শিষ্যের প্রতিভা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও ভক্তিভাব লক্ষ্য করে শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ যোগ্যতা আছে বুঝে

তাঁকে দীক্ষা দান করে তাঁর গায়কী নীতিধারার ধ্রুপদ গান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর মোঘল সম্রাট অক্‌বরশার দরবারে রামতনু (তানসেন) যখন থেকে সসম্মানে গায়কপদে অভিষিক্ত হন, তখন থেকে তাঁর ধ্রুপদ গানের গায়কীর মনমাতান নূতন পদ্ধতির স্বরবিস্তারিত গান নূতনভাবে সকলকে আকৃষ্ট করে। গুরুর মত গায়কীপদ্ধতিকে অনুসরণ করেই যে তিনি গাইতেন সে কথা বাস্তবতার বিচারে অস্বীকার করবার নয়। তাঁর সেই গায়কীর মধ্যে সুরের যে লহরী মধুররসে প্রবাহিত হত তাতে মানুষের মন তৃপ্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ত বলেই তিনি এত নাম করেছিলেন।

কোন উচ্চস্তরের গানে বিধিবদ্ধ পদ্ধতির উপর শুধু নির্ভর না করে থেকে যদি কেউ রাগরূপের বৈচিত্র্যলীলার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য শিল্প স্বাধীনতা নেয় তাহলে সেই দর্শনরূপের উপর মানুষ মুগ্ধ ও তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারে না। কারণ সংগীতের রাজত্ব যে শুধু সুরের উপরই। এজন্য খেয়ালগান শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের রাজ্যে এত ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ শ্রোতার মুখে শুনেছি ধ্রুপদের মধ্যে এই রকমের গায়কীধারা ছিল যতুভট্টর। গায়কী আদর্শের উপর গভীর বোধ রেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'যতুভট্ট বাংলার 'তানসেন'।

তানসেনের ভারতব্যাপী পরিচয় শুধু কণ্ঠের অপূর্বতা নিয়ে হতে পারে না। কারণ—সুকণ্ঠ বা অপূর্বকণ্ঠ কোন যুগে শুধু একজনেরই থাকে না। স্বরবিস্তারের লীলায়িত বস্তুই তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছিল, এ কথাই মানতে হয় এবং তার জন্যই সম্রাটের কাছে তিনি তানসেন উপাধি লাভ করেছিলেন এবং সম্রাটের নবরত্ন সভার একটি রত্নবিশেষ হয়েছিলেন।

তানসেন উপাধি পাওয়ার মধ্যেই বিশেষ করে তাঁর গায়কী পরিচয় নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। 'তান' মানে বিস্তার, 'সেন' মানে শ্রেষ্ঠ। রাগ বিস্তারে শ্রেষ্ঠ বলে এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সে যুগে যে সমস্ত গায়কগুণী ছিলেন, তাঁরা ধ্রুপদের গায়কীর সৃষ্টরূপকেই যথার্থ অনুসরণীয় বলে মনে ধরে রেখেছিলেন এবং ধ্রুপদী সম্প্রদায় সেই তাকেই যথার্থ কৌলিন্যের প্রতীক বলে যে মনে করে এসেছেন তা বেশ বুঝা যায়। বহুপরে তানসেনের ওই গায়কীপদ্ধতির অবদানের মূল সম্পদই খেয়াল গানের নাম মূর্ত্তি ধরে আবির্ভূত হল মোঘলের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা'র দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক সদারঙ্গের হৃদয়ে ; এ কথাই প্রমাণের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি স্বইচ্ছায় অর্থাৎ খেয়াল নাম দিয়ে খুব অল্প কথায় গান রচনা করলেন স্বর বিস্তারের প্রাধান্য দিয়ে। তালের গণ্ডি রইল, কিন্তু সে শুধু ছন্দের নিয়ম রক্ষার জন্যই।

তানসেনের ধ্রুপদ গায়কীরীতি যে কেউই অনুসরণ করেন নি তা বলা চলে না। বিশেষ প্রমাণে যতুভট্ট ছিলেন তার প্রতীক। তবে সদারঙ্গের আগে কেউ যে খেয়াল গান সৃষ্টি করেছিলেন সে কথা হলপ্ করে বলা শক্ত। কারণ সদারঙ্গের আগের গায়কদের রচিত শুধু ধ্রুপদ গানই পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলেন আমিরখস্রুদেহলবি খেয়াল গান রচনা করেছিলেন। একথা আমার কাছে

মোটেই বিশ্বাসের রেখাপাত করে না। কারণ-তাঁর রচিত কোন খেয়াল গান কোন দিক দিয়েই সংগৃহীত হয়ে আসে নি, এবং প্রামাণ্যরূপে চাক্ষুষ হয় নি। যদি তাই হত তাহলে সদারঙ্গের বহু আগে থাকতে অনেক গায়কের রচিত খেয়ালগান নিশ্চয়ই থাকত। এবং তানসেনও নিশ্চয়ই খেয়াল গাইতে ইচ্ছে করতেন এবং অত ধ্রুপদ রচনার সংগে খেয়ালও রচনা করতেন। স্বররূপের আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে খেয়ালের মত এমন একটি উচ্চশ্রেণীর ও উচ্চস্তরের গান তাঁর মত প্রেমিক সুররসিককে আকৃষ্ট করত না একথা বিশ্বাস করা কোন সুরসাধকের পক্ষেই অসম্ভব। কারণ শিল্পসাধক-প্রেমিকের কোন একটির উপর গণ্ডীবদ্ধ মন থাকে না। এইসব বাস্তব বিচারের উপর দৃষ্টি দিয়েই বিশ্বাস করতে হবে সত্যই খেয়ালগানের সৃষ্টি ধ্রুপদের অনেক পরে হয়েছে এবং সদারঙ্গই তার স্রষ্টা।

রাগরূপে অলঙ্কার প্রয়োগের বিভিন্ন নাম ও প্রকাশের অর্থ—

তান,—রাগরূপকে সুরের নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত করাকে 'তান' বলে। 'তান' কথাটি রাগালংকারের আদি ও প্রধান নাম। 'তন' ধাতু অর্থে বিস্তারকে বুঝায়,—এই অর্থেই তান নামকরণ হয়েছে।

তানের ক্রিয়ার স্বরূপ নিয়ে কতকগুলি পরিচয় জ্ঞাপক নাম আছে। যেমন,—আশ, মীড়, গমক, গিট্‌কারী, মুর্চ্ছনা ও কম্পন। ধ্রুপদাঙ্গের গানে শুধু আশ, গমক ও মীড়, এই তিন অলঙ্কারই মাত্র প্রয়োগ করার দায়িত্ব থাকে। খেয়াল অঙ্গের গানে ওই সমস্ত তানের ক্রিয়া ছাড়াও আরো বিবিধ প্রকারের যে সকল তান পৃথক পৃথক ছন্দভঙ্গীমা নিয়ে প্রকাশ করা যায় তার প্রত্যেকটিকে ক্রিয়ানুযায়ী পরিভাষায় বিভিন্ন নামে পরিচিত করা যাবে। যথা, জোড়তান, চক্রফেরতান, ঘোরফেরতান, বোলতান, জোড়গমকতান, গমককম্পনতান, ঠোক্‌তান, হলক্‌তান, কুন্তনতান, দ্রুতজম্‌জমাতান ইত্যাদি।

শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থে সাত প্রকার তানকে আদি ও নির্দ্ধারিততান বলে তার বর্ণনা দিয়েছেন,—যথা,—"আর্চ্চিকো গাথিকশ্চৈব সামকিশ্চ স্বরান্তরঃ
ঔড়বঃ ষাড়বশ্চৈব সম্পূর্ণশ্চেতি সপ্তমঃ ॥"

এর অর্থ দেওয়া আছে,—এক স্বরের তান বিন্যাসকে 'আর্চ্চিক', দুই স্বরের তান বিন্যাসকে 'গাথিক', তিন স্বরের তান বিন্যাসকে 'সামিক', চার স্বরের তান বিন্যাসকে 'স্বরান্তর', পাঁচ স্বরের তান বিন্যাসকে 'ঔড়ব', ছয় স্বরের তান বিন্যাসকে 'ষাড়ব', সাত স্বরের তান বিন্যাসকে 'সম্পূর্ণ' তান বলে।

এই সাত প্রকার তানের প্রত্যোকটির কিভাবে স্বরের প্রয়োগকৌশলের দ্বারা তাদের নামের পরিচয়ে আসবে তার ব্যাখ্যা কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। এক স্বরে তান, দুই স্বরে তান ইত্যাদি কি করে কিভাবে নিষ্পন্ন হবে তার যথাযথ ব্যাখ্যা না থাকায় এর উদ্দেশ্য নিরাকরণ করা সহজ নয়।

উক্ত প্রথম তিনটি নামের কথা অভিধানে পেলাম না। যাইহোক্—নামের অর্থ না হয় আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হল না কিন্তু তানের অর্থ নিম্নোক্ত নিয়মের উপর তাঁরা ধার্য্য করেছিলেন বলে যদি মনে করা যায় তাহলে একটা সমাধানে আসতে পারবে। যথা—একস্বরে তান বিন্যাস—সা, সাসা, সাসাসা, সাসাসাসা, সাসা-সাসাসা, ইত্যাদি। তুই স্বরে তান বিন্যাস—যথা,—সারেসা, সাসারেসা, সারেরেসা, সারেসাসা, সারেসারেরেসা, রেসারেসারেরেসা, রেরেসারেরেস' ইত্যাদি। তান প্রকাশের নিয়ম প্রকরণ এই ভাবে তার ক্রিয়ার নির্দেশ ধরেই মনে হয় করা হয়েছিল।

এখন আমি অন্যান্য নামের তানগুলির ক্রিয়ানুযায়ী তাদের অর্থ জানাব।

আশতান,—তান তুলবার প্রথম প্রচেষ্টাকে 'আশতান' বলে। আশ মানে আশা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা। যে তান কণ্ঠে প্রথম অবস্থায় এসে আশাদান করে তাকেই তানের আশা তান বা আশতান বলা যাবে। আশতান প্রথম অবস্থার তান হলেও পরিপক্ক অবস্থায় তখন তার নিজস্ব রসমাধুর্য্য সৃষ্টি হয়ে তানের উপর সুন্দর রূপ প্রদান করে এবং বিশেষত্বে মন আকর্ষিত হয়।

এই তানের স্বরসমূহ বিভাগ হয়ে প্রকাশ হবে না এবং সেরূপ করার নিয়ম নয়। পরের পর স্বর প্রকাশের সময় একটির সংগে আর একটির সূক্ষ্ম যোগসূত্র রাখতে হয় এবং একই স্থানে একাধিক স্বর প্রকাশ করা চলে না, করলে আশতানের নিজস্ব রূপ নষ্ট হয়ে যাবে। এই তানকে সূক্ষ্ম মীড়-যুক্ত তানও বলা যায়—যখন পরিপক্ক অবস্থায় আসে, তখন এই তানের রূপ আবেগ মধুরের মত হয়ে উঠে।

তান সমূহকে গানের অক্ষর কিংবা আ, ই, উ, এ. ও,—এই সব অক্ষরগুলির কোন একটিকে ইচ্ছে মত নিয়ে করা হয়। তবে প্রয়োজনের সময় 'আ' অক্ষর নিয়ে এবং ভাবার্থের উপর গানের কথা ধরে তান করা বেশী ভাল শুনায়, অবশ্য গানের কথার ভাবসঙ্গতি রক্ষা করে কথার উপর তান করাই আমার মতে বিচার যুক্তি সম্মত।

মীড়তান,—স্বরের শ্রুতিকে ঘর্ষণ অর্থাৎ মেড়ে দিয়ে যে সুরের কাজ দেখান হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে 'মীড়তান'। এই তানের উপর যে সুরের ধ্বনি বহির্গত হয় তার রূপের আকৃতি অর্দ্ধগোলাকার এবং গোলাকারের মত হয়॥

গমক তান,—গমক মানে গময়িতা, অর্থৎ গমন করায় এরূপ বোধক কিন্তু এই তানে যে সুরের উৎপাদনের উপর গমক নাম দেওয়া হয়েছে তার সংগে উক্ত অর্থের সঠিক সামঞ্জস্য নেই। গমকতান বলা হয় তাকে যার মধ্যে তুই কিংবা ততোধিক স্বর একই স্থানে অথবা ক্রমান্বয়ে স্বরগুলির মধ্যে পরস্পর সংযোগ রক্ষা ক'রে বেশ একটু জোরাল ও পরিষ্কার ভবে আন্দোলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই তান প্রকাশকালীন বেশ একটা গম্‌গম্ ভাব থাকে, সেইজন্যই ওই নাম প্রদত্ত হয়েছে বলেই আমরা ধরে নিয়েছি॥

গিটকারী তান,—গিট্‌কারী কথাটি হিন্দী থেকে এসেছে। হিন্দী কথায় গিট্ অর্থে ঝট্ অর্থাৎ

শীঘ্রকে বুঝায়। গিট্‌কারী মানে যে শীঘ্র করে। এই অর্থ ধরে যে তান দ্রুত প্রকাশ করা হয় তাকেই গিট্‌কারী তান বলা হয়। এই তানের স্বরসকল সরল এবং বক্রগতিতে যাতায়াত করতে পারে ॥

মূর্চ্ছনা তান,—পরের পর স্বরের দ্বারা যে তান অতি দ্রুত গতিতে উঠেই তৎক্ষণাৎ নেমে আসে তাকে মূর্চ্ছনাতান বলে। এই তানকে প্রকাশকালীন মনে হবে যেন তান মূর্চ্ছার মত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। শাস্ত্রীয়গ্রন্থে মূর্চ্ছনা তানের এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে,—যে স্বরে তান আরম্ভ হবে সেই স্বর সমানে দ্রুতগতিতে তার অষ্টম স্বর পর্য্যন্ত গিয়ে যথাস্থানে ফিরে আসবে। যেমন পরের পর 'সা' থেকে তারার 'সা' এবং 'রে' থেকে তারার 'রে' ইত্যাদি। এর শাস্ত্রীয় শ্লোকটি আরোহণ-অবরোহণের আলোচনায় উদ্ধৃত করা আছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে একুইশটি মূর্চ্ছনার নাম এইরূপ দেওয়া আছে। যথা,—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিনী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, ষণ্ডমধ্যা, পঞ্চমা, মৎসরী. মৃতুমধ্যা, শুদ্ধা, অন্তা, পলাবতী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, স্বোদরী, সুরা, নাদাবতী ও বিসানা ॥

একুশটি মূর্চ্ছনা এবং তার প্রত্যেকটির নামকরণ কি নিদর্শন ও তাৎপর্য্য এবং ভঙ্গীমার বিভিন্ন আকৃতি দেখে ধার্য্য করা হল তার সম্বন্ধে কোন পরিচয় জ্ঞাপন করা নেই। সুতরাং উক্ত নামগুলিই কেবল জানা হয়ে থেকে যাওয়া ছাড়া সহজে বুঝবার পক্ষে কোন সন্ধান এখন পর্য্যন্ত আমি পাইনি।

কম্পনতান,—বারংবার একই স্বরকে দ্রুতভাবে কণ্ঠনালী স্থানে কাঁপাইয়া প্রকাশ করাকে 'কম্পন তান' বলে ॥

এই কয়েকটি প্রধান তান থেকে আরো যে সমস্ত কথ্য ভাষায় তানের নাম আছে তাদের ব্যাখ্যা,

জোড়তান,—কেবল মাত্র দুই দুই স্বর নিয়ে যে তান প্রকাশিত হয় তাকে 'জোড়তান' বলে ॥

চক্রফেরতান,—যে তান ঘুরে ঘুরে উঠতে এবং নামতে থাকে তাকে 'চক্রফের' তান নামে অভিহিত করা হয় ॥

ঘোরফেরতান,—চক্রের মত ঘুর্ণীমান হয়ে নয়, এমনি ঘোরাফেরা করে যে তান দেখান হয় তাকে ঘোরফের তান বলে ॥

বোলতান,—গানের কথা সাজিয়ে যে তান প্রকাশ করা হয় তাকে 'বোলতান' বলা হয়। বোল, মানে অক্ষর ॥

জোড়গমকতান,—গমকের মত ঢেউ নিয়ে দুই দুই স্বরে তান প্রকাশ করাকে 'জোড়গমকতান' বলে ॥

গমককম্পনতান,—গমকতানের মত শব্দের দ্বারা এক এক স্বরের উপর দিয়ে কম্পন উৎপন্ন করাকে 'গমককম্পনতান' বলা হয় ॥

ঠোক্‌তান,—তান করার সময় ছন্দের আঘাতে কোন স্বরকে ঠুকে আনাকে বলে 'ঠোক্‌তান'। এই তান একই সুরের জায়গায় প্রত্যেকবার যখন ওইভাবে প্রকাশ করা হবে তখন তার আগের ঠোক্

স্বরটি পরের স্থিতিশীল স্বরে সুরের রেষ প্রকাশ পাবে না। এই তানও অত্যন্ত কঠিন॥

হলক্‌তান,—এই তানের দ্রুত প্রকাশ ভঙ্গীর উপমায় আগুনের লেলিহান রূপ অর্থাৎ হল্‌কার-মত মনে হয় বলে হলক্‌তান নাম হয়েছে। এই তান একটি করে স্বর নিয়ে উঠানামা করে। আশতান যেমন নমনীয় সুঠাম মূর্ত্তির তান—এই তান হল তারই এক ভীষণপেশীবহুল মূর্ত্তির প্রকাশ। কণ্ঠে একে গড়ে তুলা অত্যন্ত সাধনা এবং বয়েস সাপেক্ষ, গলায় জোওয়ারী সুর না আসার বয়েস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর এই তান প্রকাশের প্রয়াস নিতে হয়॥

কৃন্তনতান,—দুই কিংবা প্রয়োজনমত তিন চারিটি স্বরকে সূক্ষ্মভাবে কর্ত্তন করে প্রকাশ করাকে 'কৃন্তনতান' বলা হয়॥

দ্রুতজম্‌জমাতান,—গমক তানের দ্রুতকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই তান কণ্ঠে আনা খুবই শক্ত। তানের ব্যবহারিক ক্রিয়ার প্রায় সবগুলিরই অর্থ দেওয়া হল॥

গানে বা সংগীতের অন্য কোন বস্তুর উপর স্বরগ্রাম করাকে তান নামে পরিচিত করা তানের ক্রিয়ার্থ ধরে চলে না, নিজ নামেই তার পরিচয় থাকবে।

যদি বলা হয় 'তন' ধাতুর অর্থ যখন বিস্তার তখন স্বরগ্রাম করার বস্তুকে তান বলা হবে না কেন? সে-ও তো রাগের উপর স্বর নিয়ে বিস্তার দেখাচ্ছে? এর উত্তরে বলা যায়—স্বরগ্রাম কণ্ঠসাধনার বস্তু, তার স্থান কেবল 'তেলানা'র বস্তুতে এবং রাগে-তালে গঠিত স্বরগ্রামের বস্তুতেই থাকবে, গানের মধ্যে শুধু সুরের ক্রিয়াই প্রযোজ্য হবে, এই সঙ্গত কারণ ধরেই স্বরগ্রামকে তানের অর্থে ও ক্রিয়ায় স্থান দেওয়া হয় নি। এই বিষয়ের বিচার করে দেখলে যুক্তি যথাযথই পাওয়া যাবে। এজন্য আগে দেখেছি বহু ঘরাণাগায়ক গানে স্বরগ্রামের ক্রিয়া না দেখিয়ে তেলানা ইত্যাদিতে প্রকাশ করতেন।

ধ্রুপদঅঙ্গের গানে শুধু দুন, ত্রিদুন, চৌদুন, অতীত, অনাঘাত, এই ক্রিয়াগুলিই মাত্র ব্যবহার করার নিয়ম আছে। আমার মতে ওই ক্রিয়াগুলি ব্যতিরেকে প্রত্যেক কথার উপর আলাপের ভাব-ধারার সুরে পরিবর্ত্তন করা সুন্দরভাবেই চলতে পারে। ধ্রুপদঅঙ্গের চৌতাল গানে সুরের কাজে আশ, মীড়, গমক্, এইগুলি ছাড়া সুরের অন্য তানাদি ক্রিয়া দেখানর নিয়ম নেই। ওই গানে কথা ও সুরের যে ভাববস্তু আছে তাতে তালের অঙ্কশাস্ত্রের আধিক্য এবং সুরের তরলরূপ প্রকাশ করা চলে না। দ্রুত ও কম্পন যুক্ত সুর প্রকাশ করলেও তার অঙ্গহানি হয়ে পড়বে॥

বাঁট,—এই কথার অর্থ বণ্টন। গানের নির্দ্ধারিত সুরকে ত্যাগ করে তার কথা নিয়ে রাগরূপের বৈচিত্র্য ক্রিয়ার সমাবেশে নানান ছন্দ বণ্টন করে দেখানকে 'বাঁট' বলে। এই বস্তু খেয়ালগানে এবং ধ্রুপদের একমাত্র ধামার তালের গানে প্রয়োগ হয়।

তেহাই,—গানের ধরতাই মুখ (চলিত কথা মহড়া) বা আস্থায়ীর শেষ অংশের কিয়ৎঅংশ তিন-বার মাত্রার সমান ভাগ রেখে উচ্চারণ করে গানের প্রথম অংশের সমের উপর ত্যাগ করাকে 'তেহাই'

বলে। কথাটা তে-ঘাই,—তে, মানে তিন, ঘাই মানে ঘা দেওয়া অর্থাৎ আঘাত করা। তেঘাই কথাটি তেহাই নামে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। আজকাল কোন কোন তার যন্ত্র বাদকদের গৎবাদনকালে দেখছি তাঁরা তেহাই দিয়ে সমে না ফেলে গৎএর মহড়ায় ফাঁক বা প্রথম তালে এনে ফেলেন। এ কি করে তাঁরা করতে পারেন তা কোন বিচারে আসে না। নানান ছন্দ ও পদ্ধতি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তেহাই সৃষ্টি করে সমে ফেলার উপরই তার কৃতিত্বের প্রকাশ থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য ধরেই এই ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কোন গায়ক, বাদকই এই নীতি নিয়মের ব্যতিক্রম করে আসেন নি। সুতরাং এ রকম ভাবে তেহাই রাখা সম্বন্ধে তাঁদের কি যুক্তি আছে তা বিশদভাবে বুঝান আবশ্যক। তবলা ও পাখোওয়াজ প্রভৃতি বাদ্যেও বহু প্রকারের তেহাইপদ্ধতি প্রদর্শিত হয়। যদি ওই পথ অনুসরণ করে, কোন চর্মবাদ্যকার তেতালায় তেহাই দেখিয়ে ফাঁকের না-তি-তি-না' তে এনে ফেলেন, পাখোওয়াজে চৌতাল তালে তেহাই দিয়ে দ্বিতীয় ফাঁকের 'দিন্‌তা তেটে কতা গদি ঘেনে'র উপর ধা ফেলে-'ধা-ধা-দিন্‌তা' ধরেন তাহলে কি উক্ত ব্যক্তিরা বলবেন তেহাই দেওয়া যথোপযুক্ত হল ? প্রত্যেক বিষয়ে নীতি নিয়ম সত্যই বজায় থাকছে কি থাকছে না তা সর্বাগ্রে আমাদের ভেবে দেখার একান্ত আবশ্যক আছে।

অতীত ও অনাঘাত,—এই বস্তু ধ্রুপদের চৌতাল গানেই বিশেষতঃ ব্যবহার হয়। সমের প্রকৃত স্থানের একমাত্রা পরে সম তালের আঘাত দিয়ে নিয়মিত তাল দেওয়া সুরু করে দেখতে হবে গানের স্বাভাবিক রচনার উপর যে তালাঙ্ক আছে তার প্রত্যেকটির একমাত্রা পরে পরে হাতের তাল পড়ছে কিনা। এই নিয়মে গেয়ে গানের মহড়ার সমের একমাত্রা আগে হাতের তালে সম্ দেখিয়ে আসল সমের জায়গায় হাত তুলে রেখে দেখাতে হয় অতীত ক্রিয়া সম্পন্ন হল বলে। সেই হাত তুলে রাখবার জায়গাটিতে পাখোওয়াজ বাদককে 'ধা' বা তেহাই রাখতে হবে। অনাঘাত ক্রিয়াটি প্রকৃত সমের জায়গার একমাত্রা আগে সমতাল ধরে নিয়ে গানের নির্দ্দিষ্ট স্থানের সমের নিয়মিত একমাত্রার আগেই হাত তুলে সমের নির্দেশ থাকবে গানের সম তালের কথার উপর এবং ওইখানেই বাদককে নিয়ম মত 'ধা' দিতে হবে। অনাঘাত দেখানর সময় গানের আভ্যন্তরিক তাল নিয়মিত স্থান থেকে একমাত্রা আগে আগে হাতের তাল পড়তে ও উঠতে থাকবে ॥

আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি গাওয়ার নিয়ম—

আলাপ,—রাগসংগীতে আলাপের স্থান সমস্ত শ্রেণীগত গানের অনেক উর্দ্ধে। পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণরূপে আলাপ করতে পারলে মনে হবে রাগরূপ অঙ্কনের আর অন্য কোন শ্রেণীগানের জন্য অবশিষ্ট কিছু নেই,—শক্তির সীমা নিয়ে সংগীতকলা বলতে তার অর্থে যা বুঝায় তাই এর সত্যরূপে প্রকাশিত হয়। তালবাদ্যের ক্রিয়া থাকে না বলে তার কোন অভাবই মনে আসে না, বরং নির্বিঘ্নে সমস্তটুকুই উপভোগ্য হয়। রাগালাপের শেষকালে তালবাদ্যের সংগে গাওয়ার ইচ্ছায় আরো উত্তম

পরিবেশ সৃষ্টি হবে মনে করে দেখা গেছে তাতে বরং বিঘ্নই আসে, অর্থাৎ রাগরূপ অঙ্কনের ধ্যান-চিন্তা তখন সরে গিয়ে তাল-সুরের একটা বাহ্যিকরূপের সৃষ্টি হতে থাকে এবং শ্রোতা ও শিল্পীর তন্ময়তার পরিবেশ নষ্ট হ'য়ে পড়ে। রাগালাপের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল পরম ভক্তিভাব রেখে রাগরূপের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাওয়া এবং নানান রূপবৈচিত্র্যের লীলামাধুর্য্য ও অঙ্কন-দক্ষতার দ্বারা রসসৃষ্টির প্রয়াস রাখা, পরিশেষে তার সংগে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবে শিল্পসৃষ্টির কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান।

বহু আগে আলাপ করার জন্য এই কথাগুলি ব্যবহার হত। যথা— 'অনন্ত হরি নারায়ণ ওঁ।' রাগসঙ্গীত সাধনার মধ্যে ভগবৎ আরাধনাই যে মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল তা আলাপের এই পরম বাক্যগুলি বিশেষ করে প্রমাণিত হয়ে আছে। তারপর বহু পরে মনে হয় পাঠান রাজত্বের সমকালীন যে কোন কারণে—আলাপের প্রয়োজনে উক্ত ভগবৎ আরাধনার বাক্যগুলিকে ত্যাগ করে, তার পরিবর্ত্তে তে, রে, নে, রি, তোম্, না, না, রি, রোম্ ইত্যাদি অক্ষর নিয়ে আলাপ করার রীতির প্রচলন হয়ে পড়ে।

যেভাবে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতগতিতে আলাপের ক্রিয়া চলে আসছে তাতে স্বভাবতই হয়ত মনে আসতে পারে ওই পরম বাক্যগুলিকে নিয়ে ওই রকমভাবে আলাপকরা কি করে সম্ভব হ'তে পারে? এ ধারণা আগেও আমার ছিল কিন্তু সম্প্রতি ওই কথাগুলি নিয়ে সব রকম লয়ের গতিতে আলাপ করে দেখেছি কোন অসুবিধা হয় না, বরং মনে হয় এতেই সবকিছু পাওয়ার বস্তু আছে। অতি দ্রুতগতিতে যখন ওম্ নারায়ণ ওম্ নারায়ণ বলে সুরে ডাকা হয় তখন যেন ভাবের এক উন্মাদনা এসে মনকে আকুল ও তন্ময় করে দেয়। সমাধা করার পর নিঃশব্দে চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

অবশ্য এস্থলে একটা কথা আছে—তে-রে-নে-রি ইত্যাদি অক্ষর নিয়ে যেমন সব রাগেই আলাপ করা যায়, কিন্তু 'অনন্ত হরি নারায়ণ ওঁ' এই আরাধনার বাণীকে নিয়ে করুণ ও অতি সরল রসাত্মক রাগগুলি যথোপযুক্ত হয় না। যেমন,—ললিত, বেহাগ, পিলু, ইত্যাদির মত রাগ। ভক্তিই আরাধনার একমাত্র পথ, সেখানের পরিবেশ হয়ে থাকে শান্ত, স্নিগ্ধ এবং গাম্ভীর্য্যের নিবিড়তার সমাধিস্বরূপ। সুতরাং সেই ভাবরূপের উপযোগী হয়ে যে যে রাগের রূপমাহাত্ম্য আছে তাকেই ওই পরমবাক্যের উপর নির্বাচন করে নেওয়ার আবশ্যক হয়।

বর্ত্তমানের আলাপ করার নীতি-নিয়ম সম্বন্ধে তার পরিচয়—

এখন আলাপে যে অক্ষরগুলি আমরা ব্যবহার করি সেগুলি রাগরূপ অঙ্কনের সর্ববিধ প্রয়োজনে সুন্দরভাবে সহায়তা করে আসছে এবং কুশলী শিল্পীর দ্বারা প্রয়োজনমত সুরের যখন প্রয়োগ হয় তখন মনে এনে দেয় তারাও রসসৃষ্টিতে এবং ভাবোদ্দীপকের উপর যেন প্রতিষ্ঠিত।

তবে রাগালাপের উপর রি-রি-রুম্ কিংবা হুম্-হুম্-তোম্-তোম্ অক্ষর দিয়ে বারম্বার উচ্চারণ করে গাওয়া উচিত নয়। কারণ বার বার ওই রকম অক্ষরের এক ঘেয়ে শব্দ ভাব উৎপাদনের পক্ষেই শুধু

বিঘ্নকারক নয়--শ্রুতিকটুও লাগে।

ধ্রুপদের মত আলাপেও রাগরূপকে নিয়ে আস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের উপর বেশ ধীর-স্থির ও সংযম নিয়ে স্বরাঙ্কন করতে হয়। তারপর দ্রুতগতিতে মাত্রার ছন্দ ধরে এর ক্রিয়া চলতে থাকে। স্বরগ্রাম দেখানর ইচ্ছে থাকলে একেবারে শেষের দিকের দ্রুতগতির সময় চলতে পারে। বিলম্বিত ও মধ্যগতির সময় স্বরগ্রামের ক্রিয়া দেখাতে গেলে রাগরূপের গঠনসৌন্দর্য্যের সৃষ্টির উপর যে ধ্যান-চিন্তা রাখতে হয় এবং রস্ উদ্ভব করতে হয় তাতে আঘাত পড়ে। যখন এ রকম কেউ করেন তখন মনে হয় রাগরূপের উপর স্বর প্রয়োগের নীতি নিয়ম বুঝান হচ্ছে—যেন গায়ক শিক্ষা দানে রত হয়ে পড়লেন। আলাপের অভ্যন্তরে এরূপ এনাটমির (Anatomy) দৃশ্য আনা সম্পূর্ণ ভাব-রস বিরোধী।

শাস্ত্রীয় সংগীতের সমস্ত শ্রেণীগত গানেও স্বরগ্রাম করে দেখান কোন রকমেই সমীচীন বলে মনে করা যায় না। গান বলতে বুঝাবে কথার ভাব ও সুরের ক্রিয়া, সেখানে সা-রে-গা-মা—ইত্যাদির উচ্চারণ থাকতে পারে না। তবে আমরা যদি যা খুসী করতে পারি তবে সে কথা আলাদা।

এই প্রসঙ্গে স্বরের প্রকাশ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা আছে, প্রত্যেকটি স্বরের নিজস্ব মূর্ত্তির মধ্যে যে রসঘন তৃপ্তির স্বাদ আছে এবং তার মধ্যে যে অধ্যাত্মশক্তি নিহিত আছে তাকে বহুকাল গভীর অন্তঃর্দিষ্টির মধ্যে দিয়ে সাধনার মাধ্যমে পাওয়া যায়। সেই পাওয়ার বস্তু যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রত্যেকটি স্বরের আকর্ষণীয় মাহাত্ম্য মনকে অভিভূত করে দেয় এবং বুঝিয়ে দেয় তাদের শক্তির প্রভাব কি অদ্ভুত আশ্চর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে; যেন এক একটি দেব শক্তির মত। কণ্ঠে স্বরের সেই রূপকে জাগ্রত করতে পারলে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার মত হয়। বাল্যকাল হতে লক্ষ লক্ষবার স্বরগুলি গেয়ে আসছি কিন্তু যখনই 'সা' সুরের উপর ওম্ বলে দম্ রাখা যায় তখন মনে হয় যেন 'সা' সুরের আরো কিছু প্রকৃত সন্ধান লাভ হল। অধিকাংশ রাগের মধ্যে পূর্বাঙ্গের রে, গা, মা, এই তিনটি স্বরই বাদী স্বর হয়ে আছে। কেন হল তার তাৎপর্য্য ওই স্বরগুলি প্রত্যেক দিন যখন বহুক্ষণ ধরে আবেগ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাধনা করি তখন বেশ উপলব্ধি হয়। স্বরকে প্রকৃতভাবে বুঝতে হলে স্বরের উচ্চারণ স্থানের পবিত্রতা রক্ষার উপরই সম্ভব হবে।

সুতরাং ন্যায়, নীতি ও বিজ্ঞানের উপর দখল রেখে প্রত্যেকটি স্বরের রূপকে একমাত্র তার নির্দ্ধারিত কেন্দ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করে রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাখতে হয়। রাগরূপের স্বভাবগত শ্রুতির প্রয়োজন ছাড়া কোন স্বরকে স্বরোচ্চারণে ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুমাত্রও সরান চলে না। কিন্তু খুব বিস্মিত ও আশ্চর্য্য হয়ে আজকাল যখন দেখি প্রত্যেক স্বরের নির্দ্ধারিত স্থান থেকে স্বরোচ্চারণের দ্বারা তাদের আশ, মীড় ইত্যাদির উপর স্থানচ্যুত করা হয় তখন ভাবি আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান-বুদ্ধি কি করে এত উপেক্ষিত হচ্ছে! কি করে 'গা' সুর উচ্চারণ করে 'ধা' এর উপর নিয়ে যাওয়া হয়, 'নি' উচ্চারণ করে সেইভাবে 'মা' সুরে নেমে এসে তারপর 'মা' বলা হয়! ইত্যাদি। ...

এই ব্যাভিচারের নজির ধরে এর এমন বিস্তৃতি ঘট্‌ছে যে তা বিশেষ করে বলার আবশ্যক করে না। এর এই বিপুল দৃষ্টান্তে এরপর কেউ যদি যে কোন একটা স্বরকে নিয়ে ওই রকম ভাবের উন্মাদনায় আরোহণ—অবরোহণে ঘোরাফেরা করেন তাহলে তিনি তা স্বচ্ছন্দে কেনই বা করতে পারবেন না? আপত্তি উঠলে তিনি বুক ফুলিয়েই বলবেন—বড় বড় দিক্‌পালরা যদি ওই রকমভাবে স্বরকে স্থানচ্যুত করতে পারেন তাহলে আমিই বা আরো বেশী করে করব না কেন? সুতরাং নামকরা গায়কদেরই বিশেষ করে জ্ঞানবোধ রেখে ন্যায়-অন্যায়গুলো ভেবে দেখা দরকার। সর্বদাই মনে রাখতে হবে সংগীত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং এই বিদ্যায় এখন দেশের শত শত ব্যক্তি অধ্যয়নরত। যে কোন শিল্প বিদ্যায় যদি ব্যাভিচার ও অনাচার আসে তাহলে এই এতবড় বিদ্যার সমূহ ক্ষতি হবে। যা খুসী করার অধিকার কারোরি থাকা উচিত নয়, তীব্র প্রতিবাদ যোগ্য।

১৯৬৮ সালের বোধ হয় এপ্রিল মাসে—বিশিষ্ট এক বাংলা সংবাদ পত্রে একজন এক নামি গায়কের সম্বন্ধে বিরাট প্রবন্ধে এইরূপ লিখেছিলেন,—“আমি গায়ককে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি সেদিন পাঁচ স্বর বিশিষ্ট মালকৌশ রাগের বর্জিত স্বরগুলো রাগরূপ অঙ্কনের সময় গলায় দেখিয়ে দিলেন,—এতে রাগভ্রষ্ট হল না কি? উত্তরে তিনি বললেন,—আমি সুরকে এবং তার সৃষ্টিকেই বুঝি—রাগ আইনের গুরুত্ব বুঝি না……।” লেখক এই উক্তিকে বিরাট প্রশস্তির উপর তাঁর মন্তব্যকে শ্রদ্ধার উপর রেখে আবেগ প্রকাশ করেছিলেন। সংগীতশাস্ত্রে এবং তার নীতিবিজ্ঞানে ও রাগরূপের দর্শনবোধশক্তির অভাবে এই দু'জনেই সমতুল্য।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না লিখে পারলাম না। বর্ত্তমানকালের সংগীত আসরের মনোমত ধারণা নিয়ে সঙ্গীতজ্ঞদের সংগীত পরিবেশনের সমালোচনা যখন পড়ি, তখন মনে হয় আমরা এতকাল সংগীত সাধনা করে বিচারবোধ শক্তির যে উচ্চশিখরে পৌঁছতে পারলাম না, লেখকরা কি করে ম্যাজিকের মত অদ্ভুত বিস্ময় দেখিয়ে সেই স্থানে পৌঁছে এমন বাক্যবিন্যাসের চ্ছটায় লিখতে পেরেগেলেন? শুধু সঙ্গীত আসরের বিষয়ই নয়, সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েও এইরূপ ম্যাজিকের অবস্থা চাক্ষুষ হয়॥

ধ্রুপদ,—ধ্রুপদে, চৌতাল তালের গান রচনার অধিকংশের মধ্যে ঈশ্বর ও দেব-দেবীর আরাধনার ভাববস্তু থাকে বলে অন্তরে আনে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রভাব। মনে হয় যেন এর সাধনায় প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় আছে। এজন্য ধ্রুপদ গাইবার সময় অন্তরের ক্ষেত্র একাগ্রতার বস্তু দিয়ে প্রস্তুত করে রাখার আবশ্যক থাকে।

কেউ কেউ মনে করেন খুব জোরাল গলা নিয়ে পাখোওয়াজের সাঙ্ঘাতিক আওয়াজের সংগে যুদ্ধের মত ভাব দেখানকেই বলে ধ্রুপদ গান। এরূপ মনে করা অত্যান্ত অনুচিত। বিশেষ করে চৌতাল তালের ধ্রুপদ গাইবার সময় তার স্বভাব ও প্রকৃতিগত ভাবধারাকে বজায় রেখে আত্মসংযমের উপর তার সুর রচনায় ভাব-ভক্তির প্রকাশ থাকার এবং আরাধনা করছি এই ধ্যান-চিন্তা

রাখতে পারলে তবে গাওয়ার সার্থকতা আসবে। ছন্দাদি ক্রিয়াকর্মের জন্য ধ্রুপদের ধামার তাল আছে।

বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি, কারো কারো ধারণা, ধ্রুপদ বলতে চৌতাল তালের গানকেই বুঝায়। এরূপ ধারণা হয়ে পড়ার কারণে মনে হয় তাঁদের ধ্রুপদগানের সৃষ্টির সংগে তার গোষ্ঠীসম্পর্ক বিষয়ে এবং রীতি-নীতির ক্রিয়া সম্বন্ধে ও ধারাবাহিকতার পরিচয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বোধের একান্ত অভাব থাকার জন্যই হয়েছে।

ধ্রুপদ বলতে ধ্রুপদাঙ্গের সমস্ত তালকেই বুঝায়, এ কথা এখন জানাতে হচ্ছে বলে দুঃখ আসে। খেয়াল অঙ্গ, ধ্রুপদ অঙ্গ ইত্যাদির কথা শুধু একটা তালকে অবলম্বন করে হয়নি, কতকগুলি তালকে আশ্রয় করেই হয়েছে। কতকগুলি তাল ধ্রুপদাঙ্গের এবং কতকগুলি তাল খেয়াল-অঙ্গের, এইভাবেই উক্ত গানের নীতিধারায় চলে আসছে। এর উপর বিশেষ কথা আছে,—ধ্রুপদের তালগুলিই প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুপদগানের প্রয়োজনে। তারপর ধ্রুপদাঙ্গেরই কয়েকটি তাল খেয়াল-অঙ্গের গানের জন্য নেওয়া হয়। যেমন,—ধ্রুপদের আদি পুটতাল (পটতাল) হতে খেয়ালের ঢিমে-তেতাল, চৌতাল থেকে একতাল, ধামার থেকে তেওট (ঝুমরা), আড়াচৌতাল এবং ঝাঁপতাল, ধ্রুপদের এই দুটি তাল খেয়ালে একই নামে থেকে গেছে। সুতরাং বহুবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে ধ্রুপদাঙ্গের গান বহু তালে সমৃদ্ধ। অনেকের অজানা—ধ্রুপদাঙ্গের আরো অনেকগুলি তালের নাম আছে, সেগুলিও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়ে রইল। সেইসব তালের গান আমাদের ঘরাণার গ্রন্থ মধ্যেও পাওয়া যাবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, ধ্রুপদাঙ্গের মধ্যে চৌতাল তালের ধ্রুপদ গান অন্যান্য তালের ধ্রুপদ গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আগে ধ্রুপদাঙ্গের গানে নানান ছন্দক্রিয়া দেখান অসঙ্গত ছিল—ধ্রুপদের ভাবরূপ ব্যাহত হবার আশঙ্কায়। এই সুযোগ এনে দিলেন—মোঘল রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুরশা'র দরবারের বিখ্যাত গায়ক অদারঙ্গ—গ্রাম্য হোলীগানের যৎ তাল থেকে মাত্রা ও ছন্দ গ্রহণ করে ধামার তাল নাম দিয়ে এক নূতন ছন্দভঙ্গীমার গান সৃষ্টি করে। সেই থেকে ধ্রুপদাঙ্গের ওই গানে ধ্রুপদীরা ছন্দের নানান বৈচিত্র্যক্রিয়া প্রদর্শন করে তাঁদের সাধনার অন্যতম কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছেন। কোন বোধজ্ঞ ধ্রুপদী এইসব ক্রিয়া চৌতালের গানে প্রদর্শন করে আসেন নি, ওই গানের ভাবরূপের মর্য্যাদা রক্ষায় সচেতন থেকে এসেছেন। অদারঙ্গের আগেকার কোন গায়কের রচিত ধ্রুপদাঙ্গের গানের মধ্যে ধামার তালে নিবদ্ধ নেই। চৌতাল, সুরফাঁকতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল ইত্যাদি তালের গানই দেখতে পাওয়া যায়। এইসব চাক্ষুস নিদর্শনের দ্বারা বিশেষভাবেই প্রতীয়মান হয়ে আছে, ধামার তালের গান ধ্রুপদাঙ্গের জন্য অদারঙ্গেরই সৃষ্টি। কেউ কেউ ধ্রুপদের লঘু ছন্দের তালগুলিকে বলেন 'সাদ্‌রা'। তাঁরা কেন এই নাম বলেন তার কোন অর্থ আমার শুনা নেই। এই নামের মধ্যে কি ইতিহাস থাকতে পারে তাও আমার ধারনায় এবং বিচার যুক্তিতে আসে না। ওই তালগুলিকে 'সাদরা' নামে অভিহিত

করতে গেলে মনে হবে তারা ধ্রুপদ ছাড়া আর এক আলাদা গানগোষ্ঠীর তাল।

তাহলে তাঁদের মতেও শুধু চৌতালই ধ্রুপদ। আগেই বলেছি বিভিন্ন তালের গান নিয়েই অঙ্গ নিরাকরণ হয়েছে, এই জন্য নাম ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালঅঙ্গ। আগে কোন ধ্রুপদীগুণীর মুখে শুনিনি 'সাদ্‌রা' নাম। যাই হোক্—ধ্রুপদাঙ্গের কয়েকটি তালকে অন্য এক গোষ্ঠির মত ভেবে তাদের 'সাদ্‌রা' নামে ব্যবহার করতে হলে তার যথাযথ ব্যাখ্যা আমাদের জানা আবশ্যক।

ধ্রুপদাঙ্গে ধামার,—আজকাল অধিকাংশ সংগীতের প্রচার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি ধ্রুপদের গোষ্ঠি-অঙ্গ থেকে 'ধামার'কে পৃথক করে তাকে শুধু এককভাবে শ্রেণী নামকরণের পর্য্যায়ে 'ধামার' বলে প্রচার চলছে। একটা তালের উপর গানকে পৃথক নামে পরিচয় দিলে তাহলে ধ্রুপদ গান, খেয়াল গান, ইত্যাদি না বলে চৌতাল গান, একতাল গান, তেতাল গান ইত্যাদি নামেই বা তাঁরা ব্যবহার করবেন না কেন? এই রকম ধার্য্য করণকে তাঁরা যদি সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবান্তর কথা মনে করেন তাহলে ধ্রুপদাঙ্গের ধামার তালের গানকে পৃথক করা সম্পূর্ণ অনুচিত মনে করতে হবে।

পৃথক করে ভাবার ও ধার্য্য করার ব্যাপারে আমার এই ধারণা যে, ধ্রুপদঅঙ্গের গান সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই এই ভুলধার্য্যকরণ হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি এখন ১৯৬৮ সাল ধরে আজ প্রায় আটান্ন বছর পূর্ব সময় হতে ভারতের কোন ধ্রুপদ গায়ককেই দেখিনি ধ্রুপদ থেকে ধামারকে স্বতন্ত্র করে ভাবতে। কয়েক শত বৎসর আগে থাকতে বিষ্ণুপুরের-মত প্রাচীন ধ্রুপদীঘরাণার গুণীগায়করাও ধামারকে ধ্রুপদ থেকে পৃথক করে দেখেন নি। কারণ এমন অবান্তর নিরাকরণের ধারণা আসার মত তাঁদের বিচারবোধের অভাব ছিল না। যাই হোক্ এ সব প্রমাণের মৌখিক কথার গুরুত্বকে উপেক্ষা করার ইচ্ছে থাকলেও ন্যায় সঙ্গত বিচার যুক্তির উপরে আস্থার অভাব রাখা চলে না। ধ্রুপদাঙ্গের গানের মধ্যে চৌতালের গান শ্রেষ্ঠ হলেও ধামার ইত্যাদি সমস্ত তালে রচিত যত গান আছে, তার প্রায় সকলের মধ্যেই গানের রচনার পদ-সংখ্যা একই এবং পরস্পরের মধ্যে গোষ্ঠিসম্পর্কের পরিচয়ে আছে রীতি-নিয়মভুক্তহয়ে গায়কী-নীতির নিদর্শন চিহ্ন একইভাবে।

ধ্রুপদ অঙ্গ থেকে ধামারকে আলাদাভাবে দেখার কারণে এ-ও মনে হয়—তার রচনার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা হয়েছে—যে, এই গানের রচনা যখন সবই হোলীর বর্ণন তখন ওই গান শুধু ধামার বা হোলীধামার নাম থাকাই উচিত। এরূপ ধারণা নিয়ে যদি এই নিরাকরণ হয়ে থাকে তাহলে তাতে বিচার চিন্তার অবকাশ রাখার আবশ্যক হয়নি বলে বুঝতে হচ্ছে। একথা বলবার বিশেষ কোন আবশ্যক করে না, যে, রচনার ভাব-বর্ণনার উপরই শুধু শ্রেণী নিরাকরণ নির্ভর করতে পারে,—শ্রেণী নির্ভর করে তার গায়নগীতিপদ্ধতির উপরই। তা যদি না হত তাহলে পরজ-বসন্ত (অধুনা বসন্ত) রাগের "ফাগুয়া বৃজ দেখন কো চলোরি···" গানটি খেয়াল নামে পরিচিত না হয়ে হোলী শ্রেণীর গান নামে তার পরিচয় থাকতে হত। তাছাড়া ধামার তালের গানে হোলী বিষয়ক রচনা

ছাড়াও অন্য ভাবরচনার গান বহু আছে। তার কয়েকটি উদাহরণ, যথা,—ইমন-কল্যাণ রাগে, “কেশর-গোরীকে (কিশোরীকে কেশর বলা হয়েছে) অঙ্গ ছোড় অব তুম লাল হো কঁহাজ্বায়ে…”। মালকৌশের, “কাজর ফৈলি রহোহৈ নেক দেখ নার…”।

বেহাগরাগে,—“জমুনা জল সজনী এরি মৈ কৈসে জ়াউ…।”
তোড়ীরাগে,—“সম্হাল চল জ়াউ ডগ মগ পড়ত চরণ…।”
বেহাগরাগে,—“কাঁহাসে তুম মধু-চৌঁকি আয়ে হো…।”
দেশরাগে,—“কাহে ব্রজ ছোড় চলি আয়ে জাওত…।”
আড়ানারাগে,—“আঁাড়ি আঁাড়ি ডোলত…।”
আলাইয়ারাগে,—“তারি ডকবাজত মোহন সঙ্গ সাজত…।”
বাগেশ্রীরাগে,—“দৌর দৌর আয়োরী সেঁা মুহ ঝুক ঝুক ফিরজাত…।” ইত্যাদি।

অবশ্য চৌতালের গানের আদর্শগত আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ রচনা ধামারের গানে ততটা নেই সত্য কিন্তু তারজন্য গোষ্ঠী ছাড়া সে হতে পারে না। চৌতালের অনেক গানে রাজাদের শুধু গুণকীর্ত্তন আছে এবং ঔপপত্তিক বিষয়েরও রচনা আছে। খেয়াল গানেও ঠুম্‌রীর মত আদি রসের রচনা অনেক পাওয়া যায়—তাই বলে তাতে খেয়ালের মর্য্যাদা নষ্ট হয়নি। সুতরাং শুধু রচনার বিচার নিয়ে শ্রেণীর পার্থক্য হয় না।

ধ্রুপদগানের প্রভাব ও তার অন্যান্য বিষয়—

সর্বদা মনে রাখবার আবশ্যক থাকে ধ্রুপদ সংগীত শুধু রাগসংগীতের শিল্পরূপ সাধনারই বস্তু নয়,—সাধন-ভজনেরও বস্তু। পাখোওয়াজের সংগতের সংগে ধ্রুপদগানের মধ্যে আসর জমানর মত এক বস্তু সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তাতে চৌতালের ধ্রুপদগানেব প্রকৃত ভাবময় ও প্রাণময় বস্তুর ক্ষতি হয়। কিন্তু আমরা মনে করে থাকি এইভাবে না গাওয়া হলে ধ্রুপদের ঐতিহ্য বজায় থাকে না। যাইহোক্ আমার অন্তরের কথা এই,—বাদ্যসংগত ছাড়া যখন ধ্রুপদসাধনা করা যায় তখনই প্রকৃত আনন্দ আসে এবং তৃপ্তির মধ্যে দিয়ে মনকে নিয়ে যায় উপরে তুলে। ধ্রুপদগান গাইবার সময় তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সর্ব্বদাই মনে রাখার আবশ্যক আছে বলে মনে করি। অবশ্য অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর গান সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

বর্ত্তমানে ধ্রুপদগানের ক্রিয়াপরিস্থিতির উপর কয়েকটি বিষয়ের কথা—

আজকাল অনেক শিক্ষালয়ে ও পরীক্ষাকেন্দ্রে ধ্রুপদের সঞ্চারী-আভোগ, অর্থাৎ অর্দ্ধাংশকে

বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেকে পৃথকভাবে গাইবার সময়ও এই কাণ্ড করেন। আমার কাছে এরূপ কাজ অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হয়। যে কোন গায়কগুণীর রচিত গানের অর্দ্ধেক বাদ দেবার অধিকার থাকা উচিত বলে কোন রকমেই বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া পূর্ণাঙ্গগানের রচনার মধ্যে তার ভাব উদ্দেশ্যের যে সমাধান থাকে, তাকে যদি খণ্ডিত করে দেওয়া হয় তাহলে রচনার ভাব-মাহাত্ম্য ও সঙ্গতি যে নষ্ট হয়ে পড়ে তার কথা ভাববার কেন আবশ্যক থাকে না, সেই আরো আশ্চর্য্য। বাক্যের দ্বারা কোন রচনাকেই অসম্পূর্ণ করে রাখা চলে না তার ভাবব্যঞ্জনার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত। এ রকমভাবে অর্দ্ধাংশ বাদ দিলে তার মধ্যে যে রচয়িতার নাম থাকে গানের শেষে সে পরিচয়টুকু লুপ্ত হয়ে পড়ে। এই পরিচয় লোপ করে দেওয়াকে খুব ক্ষতিকর ও অপরাধ বলে মনে করি। বাদ দেওয়ার বিষয় নিয়ে আমার মনে হয়,—বড় গান বলে তাকে মুখস্থ করার ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কিংবা এমনও ধারণা থাকতে পারে সঞ্চারী-আভোগের সুর প্রায় আস্থায়ী, অন্তরার মত মনে করে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে সংযম, ধৈর্য্য ও বিচারের একান্ত অভাব আছে, এই প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয় ধারণা হবার সম্ভাবনার উত্তরে বলতে পারা যায় অনেক গানে সঞ্চারী এবং আভোগের সুর পৃথকভাবে থাকে। যাই থাক না কেন বিচার বুদ্ধিকে ধারণ করে ধ্রুপদ-গানের সমস্ত রচনাকেই গেয়ে যেতে হবে ও রক্ষা করতে হবে।

এই সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের ধারণা,— বর্তমানে কোন কোন ব্যক্তির কাছে শুনেছি, তাঁরা বলেন—ধ্রুপদের মধ্যে রাগের শাশ্বত নীতিধারাই যে প্রবাহিত হয়ে আসছে—পরিবর্ত্তন যে হয়নি তারই বা প্রমাণ কি? এর উত্তর আমার কাছে এই, প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে এবং পরে তাকে অনুসরণ করে যে সমস্ত ধ্রুপদ গানের উপর রাগরূপ অঙ্কিত হয়ে আছে এবং তার থেকে অন্য শ্রেণীতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলির বেশীর ভাগই যে অকৃত্রিম তা তাদের রূপ কৌলিন্যই বিশেষভাবে প্রমাণ করে দেয়। কি করে এবং কোন যুক্তিতে বলতে পারা যাবে ভৈরব, ভৈরবী, তোড়ী, সারঙ্গ, ভূপালী, কানড়া প্রভৃতির মত রাগের রূপ ধ্রুপদের মধ্যে দিয়ে পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে? এই ধরণের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাগগুলির মূর্ত্তির দিকে তাকালে কখনই মনে আসে না যে তারা আদিরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। মনে হয় যেন গোমুখীনিস্মৃত ভাগিরথীর প্রবাহের মতই তারা রাগ সৃষ্টির গুহা হতে পবিত্র ধারা নিয়ে বহির্গত হয়েছে। এ সত্য যদি না থাকত তাহলে মিশ্রণ রাগের সীমাবদ্ধ ক্ষীণকায় রূপের মত অনাকর্ষণীয় হয়ে যেত। বহু প্রাচীনরাগের মধ্যে কয়েকটি রাগের রূপ একই নামে তাদের রূপের কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে বলে মনে হলেও আদি উৎস ধারার সংগে সম্পর্ক লুপ্ত হয় নি। এ রকম রাগের পরিচয় রাগরূপ আলোচনায় দেখিয়েছি। পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন যুগেযুগে হয়েএসেছে এবং হবেও কিন্তু কোনটাই পশ্চাৎকে ত্যাগ করে হয়নি এবং হয় না, যদি সে রকম হয় তাহলে তার অগ্রগমণ নেই। সুতরাং কোন প্রাচীন রাগের রূপ পরিবর্ত্তীত আকারে যদি দেখা দেয় তাহলেও তাতে শাস্বত নীতিধারার যোগাযোগ নেই এ কথা বলা চলে না,—যদি তার মধ্যে যথাযথ বিশুদ্ধ নিয়মনীতির উপকরণ থাকে॥

খেয়ালগানের প্রকাশ্য ভঙ্গীর পরিচয়ে—

আগে খেয়ালগানের গায়কীরীতির মধ্যে অন্যতম পৃথকভাবে একটি উচ্চ আদর্শের শিল্প নীতিধারা ছিল। যেমন, খুব শক্ত শক্ত পাথরে খোদাই করার মত কণ্ঠে হলক্‌, গমক ও মীড় বস্তুগুলিকে উৎপন্ন করবার জন্য এক শ্রেণীর সুর-তপস্যারত ব্যক্তিরা কঠোর পরিশ্রমের উপর সাধনা করতে ভালবাসতেন এবং তাঁরা সেই উৎপন্ন বস্তুর সম্মান এবং যথাযথ মূল্য পেয়ে এসেছিলেন রাজদরবারে, শিল্পীদের কাছে এবং বোধজ্ঞ শ্রোতাদের কাছে। গানের এই দুর্দ্ধর্ষ গায়কীবস্তু এখন প্রায় শ্রোতাদের উপলব্ধির সংখ্যা অভাবে লোপ পেয়েই গেল। বহু সংখ্যক সাধারণ শ্রোতার কাছেই এখন গান-বাজনার আসর চলছে বলে শিল্পীদেরও সেইভাবে প্রয়োজন বুঝে সংগীত পরিবেশন করতে হচ্ছে। তাঁরা বুঝে নিয়েছেন কণ্ঠে দুরূহ কৃচ্ছসাধনের আর খুব বেশী আবশ্যক নেই। তাই প্রয়োজন বুঝে স্বভাবতই নূতন নূতন গায়কীভঙ্গীর আবির্ভাব হচ্ছে। রসলালিত্য, রসসৃষ্টি, স্বরবিস্তারের নূতন নূতন প্রণালী এবং আকর্ষণীয় চমকপ্রদ দ্রুততানের আধিক্যই এখন খেয়ালের গায়কীরীতির সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েছে সুন্দর অলংকরণ মূর্ত্তি ধরে। তবে সাধনার ওই দিকটার বিরাট বস্তুগুলির তিরোভাব ঘট্‌ছে দেখে দুঃখ লাগে। ওই সব বস্তুর যদি আর পরিচয় না থাকে তাহলে হয়ত আর ধারণাতেই আসবে না, কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে কত রকমের কঠিন কঠিন বিরাট বস্তু উৎপন্ন হতে পারে।

১৯১৯ সালে বিখ্যাতধ্রুপদী—আলাবন্দখাঁসাহেবের যখন কাশীর রাজা মতিচাঁদের বাগান-প্রাসাদে মালকৌশের আলাপ শুনলাম তখন তাঁর কণ্ঠে আলাপের শেষের দিকে অক্ষরনিয়ে দ্রুত-গতিতে যে বস্তু উৎপন্ন হতে লাগল তা শুনে মনে হয়েছিল যেন হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে বীণার ঝঙ্কার হচ্ছে। প্রমাণ পেলাম, ওই বস্তু শুনে ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ ও শিল্পীরা অবাক বিস্ময়ে যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন। আমি তো তখন ধারণাই করতে পারলাম না কি করে এবং কোন প্রক্রিয়ায় এই রকম বস্তু কণ্ঠে প্রকাশ পেতে পারে। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের তিন মিনিটের-রেকর্ডে তোড়ীরখেয়ালে যে দু' চারটে মীড়ের গমকী টান আছে তাতেই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় অনেক উচ্চে থেকে সম্মানিত হয়ে থাকবে। অবশ্য মালকৌশ ও তোড়ীর মত বিরাট রাগ না হলে এই পরিচয়ের যথাযথ সুযোগ থাকত না। বড় বড় গায়কদের বড় বড় রাগের উপরই চেনা যায়।

কণ্ঠের এই সব কঠিন বস্তু প্রকাশ করবার জন্য সুরের মধ্যে যে জোয়ারীকে আনতে হয় এবং সূক্ষ্ম শ্রুতির উপর যে দখল শক্তি লাভ করতে হয় তারজন্য অন্ততঃ চল্লিশ বছর কঠোর সাধনা করার প্রায়াজন থাকে।

গান গাওয়ার নীতি,— প্রকৃত নিয়মকে অনুসরণ করে নিজ হাতে তানপুরা বাজিয়ে গান করে এসেছেন শাত্ত্বিকভাবাপন্ন গুণীগায়করা। আমার মতে গানের সংগে অন্য কোন সুর সহযোগের আড়ম্বর না রাখাই বিধেয়। মুদ্রাদোষ শূন্য হয়ে ভাবুক সাধকের মত গান করাই হল আদর্শসম্মত। এখন গান

কালীন বহু গায়কদের আড়ম্বরের এত প্রয়োজনীয়তা এসে গেছে যে বিশিষ্ট শ্রোতারা বলেন--"অনেক গায়ককেই গানে নিজের শক্তিতে স্বয়ং সম্পুর্ণ কি-না তা বুঝা মুস্কিল হয়ে পড়ে। যদি তাঁদের মুদ্রাদোষ শূন্য হয়ে, অন্য সুরের সহযোগীতা না নিয়ে নিজে ভানপুরা বাজিয়ে গাইতে বলা যায় তাহলে আসরে ঠিক নিজের পছন্দমতকরে গাইতে পারবেন কি-না তাতে খুব সন্দেহ থেকে যায়। তার উপর আজকাল আর এক উপসর্গ যোগ দিয়েছে—হার্পের মত এক যন্ত্র কোলের কাছে রেখে গান করা। গায়কের হাত দিয়ে যখন ওই যন্ত্রে অনায়াসে অঙ্গুলি চালিত হয়ে কতকগুলো স্বর এক সংগে উদ্গিরণ করে, তখন সংগীত শুনার একাগ্রতার মধ্যে ভীষণ বিঘ্নতা এসে যায়। তাছাড়া গায়কের শিল্পীগুণোচিত ভাবময়শ্রদ্ধা-সংযমমূর্ত্তির মধ্যে ঐ যন্ত্রকে কোলের উপর ধারণ করে থাকা খুবই অশোভন মনে হয় এবং তরলতা প্রকাশ পায়।" তাঁদের এই মন্তব্য সমস্তই সমর্থনযোগ্য। সংগীতকে নিয়ে আমরা 'তাঁর' পূজা-আরাধনা করছি এই পরম সত্যকে বুঝে নিলে সব কিছুই সুচিতা বজায় থাকে,—কোন আড়ম্বরই সেখানে স্থান পায় না।

খেয়াল গানে আজকাল রাগ নির্বাচন নিয়ে কিছু বলা আবশ্যক। আজকাল এমন সব নূতন ধরণের রাগ প্রচারিত হচ্ছে যার মধ্যে বেশীরভাগই থাকে শুধু সুরেরঅঙ্কন। রাগের মধ্যে যে বিশুদ্ধ দর্শনরূপ, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ থাকতে হয় তার যথাযথ সন্ধান এই সব নূতনরাগের মধ্যে পাওয়া দুরূহ। এই দৃষ্টান্তের উপর গভীর দুঃখ প্রকাশ করে দিল্লীগভর্ণমেণ্টের একাডমির এক বিশিষ্ট উচ্চ পর্য্যায়ের ব্যক্তি ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে আমার কলিকাতাস্থ বাটীতে এসে কথা প্রসঙ্গে ওই কথাই বলেছিলেন—"শিল্পীরা এখন আর রাগ বড় একটা প্রকাশ করেন না। যা করেন তাকে শুধু সুরই বলা চলে।" রাগ প্রচারের এই মনোভাবের মূলে কেউ কেউ বলেন "খাঁটিরাগ গাইলে বা বাজালে শ্রোতারা গতানুগতিক অনুসরণকারী মনে করে এবং তারা ভাবে নূতন সৃজনীশক্তি নেই। এজন্য আজকালকার পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে প্রতিপত্তি কমে যাবার সম্ভাবনায় এবং ব্যবসা চালু রাখবার জন্য এই পন্থা অনুসরণ করতে হচ্ছে।" আমার কাছে তাঁদের এই মন্তব্য মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ আমি জানি কোন শ্রোতাই আসরে মনগড়া রাগ শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন না, অর্থাৎ তাঁরা দরবারীকানড়া, মালকৌশ, বাহার, বাগেশ্রী ইত্যাদি বড় বড় রাগ শুনতে না চেয়ে নূতন রাগ,—যেগুলোর মাথা-মুণ্ড কিছুই তাঁরা বুঝেন না সে গুলোই শুনতে চাইবেন এ ইচ্ছা তাঁদের আসবে কেন এবং বিচারবোধজ্ঞ শিল্পীরাই বা শুনিয়ে কি আনন্দ পাবেন, - যে যে রাগ শ্রোতাদের কাছে দুর্বোধ্য! সুতরাং এই ধরণের রাগ পরিবেশন কতকগুলি শ্রেণীশিল্পীদের নিজস্ব ইচ্ছার উপরই নির্ভর হয়ে থাকে।

অবৈজ্ঞানীক পাঁচমিশালী সুরেররূপ কোন পক্ষেরই কল্যাণকর হয় না। কোন চিত্রশিল্পী যদি কতকগুলো জীবজন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন কোন একটা অংশ নিয়ে একটা নূতন কিছু করার প্রয়াসে মূর্ত্তি আঁকতে যান, তাহলে সেই চিত্ররূপের মধ্যে যেমন বিশেষত্ব নিয়ে একটা সুন্দর আদর্শরূপ কিছু

প্রকাশ পাবে না, হবে শুধু এক দর্শনকটু কিম্ভুতকিমাকার রূপ, তেমনি রাগরূপ সম্বন্ধেও। শিল্পীদের এই রকম রাগরূপ অঙ্কনের উপর আগ্রহের প্রভাবে অনেক শিক্ষার্থীদের অন্তরেও এসে গেছে খাঁটি রাগ শিক্ষার উপর উপেক্ষার মনোভাব। এ খুবই ক্ষতিকর। বড় বড় রাগের উপর অঙ্কন দক্ষতা যত বেশী বাড়তে থাকবে ততই উচ্চস্তরের শিল্পী হবার সম্ভাবনা থাকবে। খুব দুঃখ লাগে দেখে যে, শিক্ষার্থীবয়েসেই যাঁরা শিল্পীর নাম নিয়েছেন তাঁরাও আসরে বা রেডিওতে খাঁটি রাগ প্রকাশ করতে পছন্দ করেন না। তাঁদের বোধ হয় ধারণা হয়ে গেছে—ওই রকম রাগ প্রকাশ করলে বড় শিল্পীর সমপর্য্যায়ে আসব না। অথচ শিক্ষায় বহু অভাব অনুভূত হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা,—রাগের প্রকৃতিগত ও সময়গত ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে দুটো রাগ মিশিয়ে যেভাবে এখন সংখ্যাধিক্যে প্রকাশ হচ্ছে তার মধ্যেও থাকে না সুস্থ মনের পরিচয়। যেমন—'বসন্ত-বাহার', বা 'বাহার-বসন্ত', 'হিণ্ডোল-বাহার'। বাহাররাগের বিরাট রূপের উপর তার ভাব-রস যে ভাবে নিহিত আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় আছে হিণ্ডোল ও বসন্ত রাগের রূপ ও রস, এবং গঠন প্রণালীর উপর স্বর সংস্থাপনায় তার ভিন্ন আকৃতিতে। সুতরাং ওই দু'টির মধ্যে রূপের ব্যবধান যেখানে অত বেশী, সেখানে তাদের রসসৃষ্টিতে একাত্ম হওয়া একেবারেই অসম্ভব বলে শুনতে অত্যন্ত বেখাপ্পা লাগে। এই রকম রাগ মিশিয়ে সুরের রূপ প্রকাশের ইচ্ছে কি করে আসে তা ভেবে আমি আশ্চর্য্য হই। ওই তিনটি রাগের এক একটিকে নিয়ে পৃথকভাবে প্রকাশ করার অবকাশ কি কম থাকে? এ রকম অদ্ভুত প্রয়াস শিল্পীর মনে কেন আসবে? দুঃখের বিষয় এই রকম দৃষ্টান্তই এখন অনেক বেশী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

কোন একটি রাগের নিম্নাঙ্গ এবং আর একটির পূর্বাঙ্গ নিয়ে নির্দ্ধারিত সকাল ও রাত্রের সংগে মিলিয়ে দিয়ে তাদের রূপ প্রকাশ করা অত্যন্ত অবিবেচনা প্রসূত বলে মনে করি।

দিবা-রাত্রের সময়ের মধ্যে প্রকৃতির যে স্বভাবরূপের পরিবর্ত্তন আছে অর্থাৎ ধরিত্রীর যে পরিবর্ত্তন রূপভাব আছে সেই রূপভাবের প্রভাবের সংগে সমস্তরাগরূপের স্বভাবগত সম্পর্ক ধরে মিলন সঙ্ঘটিত হয়ে আছে। এই মিলন সম্পর্ককে আমরা যথার্থভাবে অনুভবের দ্বারা সময়োপযোগী-রাগ প্রকাশ করে শুধু আনন্দই পাই না,—এই একাত্মমিলনের ভাবগত সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিহান হয়েও আছি। রাগরূপ ব্যবহারের উপর এই নির্ণয় ব্যবস্থার মধ্যে যে গভীরতম দর্শন ও বিজ্ঞান আছে তাকে প্রত্যেক দৃষ্টিবান ব্যক্তিই স্বীকার করেন বলে আমার বিশ্বাস আছে। কেউ যদি মনে করেন সময় নিরূপণের উপর রাগ প্রকাশ ওটা একটা শুধু প্রচলিত ও অভ্যাসগত ছাড়া আর কিছু নীতি-বিজ্ঞান নাই,"—তাহলে তাঁদের এ মনোভাবে থাকবে অত্যন্ত ভুল। সময়ের সংগে রাগ নিরূপণের নিয়ম ব্যবস্থা যদি খেয়ালখুসীমত হত তাহলে এতকাল ধরে ধারাবাহিকরূপে চলে আসতে পারত না। সত্য না থাকলে কোন বস্তুরই স্থায়ীত্ব থাকে না। ভৈরবরাগের রূপভাব প্রাতঃকালের প্রকৃতির রূপভাবের সংগে মিশে যায় বলে অন্তরে আনন্দ ও আধ্যাত্মিক তৃপ্তি অনুভব হয়। এই সঙ্গত প্রভাবধারার

উপর নীতি নিয়ম রেখেই বাহাররাগকে প্রকাশের জন্য একটু বেশী রাত্রে স্থান দেওয়া আছে। আমরা রাগ নির্দ্ধারণের ওই নিয়মকে যথোপযুক্ত বলে মেনে নিয়ে যখন কদাচ ভৈরবরাগকে রাত্রে এবং বাহাররাগকে প্রাতঃকালে ব্যবহার করি না তখন পূর্বোক্ত নীতিসঙ্গত নিয়মের ব্যতিক্রম করে ভৈরব এবং বাহারকে একত্রে ভৈরব-বাহার বলে প্রকাশ করতে কি করে পারি? ললিতরাগের রূপভাবকে প্রকৃতভাবে রাত্রের সর্বশেষের উপযোগী বলে তাকে প্রকাশের সেই স্থানে রাখা হয়েছে এবং সেইভাবধারার নীতিকে অনুসরণ করে গৌরীরাগের স্থান সন্ধ্যায় নির্বাচিত হয়ে আছে। সুতরাং ওই দু'টিরাগকে এক সংগে যুক্তকরে কি করে আমরা তাদের রূপকে প্রকাশ করতে পারি 'ললিতা-গৌরী' বলে? এ রকম কাণ্ড অনেক রাগের উপরই চলছে—সময় নিরূপণের স্থান থেকে টেনে এনে অঙ্গচ্ছেদ করে এটার সংগে ওটাকে জুড়ে দিয়ে। অথচ পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটিকে নিরূপিত সময়েই তাদের রূপ অঙ্কিত করার নিয়মকে মেনে চলা হয়। সুতরাং আমরা যদি সময় নিরূপণের সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেও সময়ের প্রভাব বহির্ভূত কাজ করি তাহলে সেচ্ছাচারিতারই প্রমাণ দেওয়া হবে এবং শাস্ত্রীয়সংগীতের বিধি নিয়মের উপর শ্রদ্ধার অভাব হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি বিষয়ে চিন্তাধারা নিয়ে চলবার দায়িত্ব আমাদের খুবই বেশী আছে। নতুবা এত বড় বিদ্যার আদর্শগতকৌলীন্য এবং তার সত্যের উপর আঘাত পড়ে সমূহ ক্ষতি হবে।

গানের বাণী,—কথার ভাব রচনার উপর সুর ও তাল সংযোগ করে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তার নামকে বলা হয় গান। গান শুনছি বা গান শেখাচ্ছি বললে যদি তার মধ্যে কথার ভাবের গুরুত্ব ও প্রভাব পরিলক্ষিত না হয়, কেবল সুরের অঙ্কনের জন্যই কথার অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করা হয় তাহলে সে বস্তু গান নামে কি করে অভিহিত হবে? কিন্তু এই অবস্থাই এখন ঘট্‌ছে,—বিশেষ করে হিন্দী গানের বিলম্বিত খেয়ালের উপর। ওই গানে কথার ভাব প্রকাশের আবশ্যকতা ভুলে গিয়ে শুধু সুর রচনার জন্যই হিন্দী অক্ষরগুলোকে গ্রহণ করি। এ রকম অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় গান নামের পরিবর্ত্তে শুধু ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এই নামে সম্বোধন রাখাই সমীচীন।

গান নামের সার্থকতা নিয়ে ধ্রুপদের মধ্যে চলে এসেছে সত্য—কিন্তু তাতেও দেখতে পাওয়া যায় কথার ভাবের উপর খণ্ডিতকরণ এবং রচনার অপপ্রয়োগ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এমন আধ্যাত্মিক ভাবধারার রচনাবস্তুকে অন্তরে স্থান না দিয়ে ভাবময় কথার উপর প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর ধাক্কা দিয়ে তাদের আঘাত দিয়ে চলে এবং ধ্রুপদের ভাবক্রিয়া গৌণ হয়ে গিয়ে মনে হয় সুর-তালের যুদ্ধ হচ্ছে। শুধু তাই নয় বাণীর ভুলও বহুলাংশে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই ত্রুটি অন্য শ্রেণীর হিন্দী গানেও বড় কম দেখা যায় না। এ রকমভাবে ভাষার ভাবকে ও বাণীকে উপেক্ষা করে যাওয়ার চেয়ে বরং শ্রেণীগত গান—তে, রে, নে, রি, করে যদি গাওয়া হয় তাহলে হিন্দী অক্ষর বেচারিরা দাসত্বের বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। এই পরিস্থিতি দেখে মনের তাগিদে পরীক্ষা করে, তে-রে-নে-রি, অক্ষর দিয়ে বিলম্বিত খেয়াল গেয়ে দেখেছি যথাযথ পরিবেশনে কোনই অসুবিধা থাকে না। গানের কথার

বন্ধন দায়িত্ব যেটুকু থাকে তা থেকে মুক্ত হয়ে বরং এইভাবে গাওয়াই ভাল, তাতে সবদিক দিয়েই সুবিধা আসবে। দ্রুতখেয়াল তেলানার উপর সমাধান যে হবে সে কথা বলাইবাহুল্য।

কি রকমভাবে ভাল রচনার গানের ভাবকেও আমরা অবজ্ঞা করে নসাৎ করি এবং জ্ঞানবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার ভাবসংরক্ষণের দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করি, তার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ঘটনা জানাই। বহুদিন আগে একজন ধ্রুপদগায়ক ‘ইমন-কল্যাণ’ রাগের একটি ভাল ভাবপূর্ণ গান গাইতে আরম্ভ করে—অন্তরা ধরে কথা গেলেন ভুলে—তখন বাংলা কথাকে বেঁকিয়ে-সুরের ঢেউএর ভেতর ঢুকিয়ে বলে গেলেন,—তালগাছ, খেজুরগাছ বনপাখী উড়ে ব্যায়সে (বসে) ইত্যাদি। কোন শ্রোতাই এইরূপ অদ্ভুত হাস্যকর ব্যাপার বুঝতে পারলেন না। তাঁরা জানেন হিন্দীগানের শুধু সুরই শুনতে হয়, গানের বাণীর কোন মূল্য নেই বা তার ভাবার্থ জানবার বা বুঝবার কোন প্রয়োজনই আসে না। আমি সেই গায়ককে জিজ্ঞেস করলাম—একি কাণ্ড করলেন? উত্তরে তিনি এই কথাই জানালেন—“হিন্দী কথা কেউ বুঝে না ও শুনেনা বলে নিজের মর্য্যাদার গুরুত্ব রাখবার জন্য গানটা বন্ধ করবার দরকার হল না—তাই সামনের তালগাছ, খেজুরগাছগুলো মনে এসে যাওয়ায় তাদেরকেই তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিলাম অন্তরার গানে; ভাগ্যিস পরের ভাষায় গানগুলো হয়েছিল তাই কত সুবিধে হয়েছে,—গান মুখস্থ না থাকলেও গাইতে আটকায় না।” মনে মনে করলাম—চমৎকার সুযোগ,—“পার্ব্বতীসুত লম্বোদরকে···” পাক দিয়ে সুতা লম্বাকর—বলে গাওয়ার প্রবাদের কথা অনেক দিন হতেই চলে এসেছে। নিরক্ষরতা, পরভাষায় দখলহীনতা ও অশুদ্ধকরণ—এ সবই মূর্খতার পরিচয় এবং তার সংগে এই রকম মনোভাবও। যে ভাষায় গাইব সেই ভাষার গানের ভাবার্থ শ্রোতারা বুঝতে পারে না বলে নিজে যা খুসী করে গেয়ে দেবার সুযোগ-সুবিধা নেওয়া হবে,—এ অতি অন্যায় ও লজ্জাকর।

এই রকম পরিস্থিতির গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং সবদিক দিয়ে বিচার করে প্রত্যেকের নিজের মাতৃভাষায় রাগসংগীত পরিবেশন করা এবং ভিন্নভাষিদের কাছে গানের যথাযথ ভাবার্থ বুঝিয়ে দেওয়াই খুব উচিত বলে মনে করি।

গানের ভাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর একটা কথা,—যে কোন গানের ভাব-ভাষা যদি অন্তর স্পর্শ করে মনকে উর্দ্ধপথে নিয়ে যাবার সহায়তা না করে তাহলে সে গান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

“···গানাৎ পরতরংনহি···”। এই কথার অর্থই হল, রাগরূপের সংগে আরাধনামূলক ভাষার ভাব-দিয়ে রচিত গান এবং সেই গানই ভগবৎ সাধনার সমস্ত উপায়ের সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এবং নিয়ে যায় তাঁর সান্নিধ্যে এবং নিয়েও আসে তাঁকে অন্তরের সম্মুখে। গান কথার অর্থই এই। আর “ন বিদ্যা সংগীতাৎপরা”। এ কথা—শাস্ত্রীয়সংগীতবিদ্যায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ এবং তপস্যাগত সাধনা আছে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করে বলা হয়েছে॥

বিলম্বিত খেয়ালের গায়কী রীতি-নীতি—

আলাপের ধরণে গানের মধ্যে রাগ বিস্তারের দ্বারা রসসৃষ্টি করে এবং রাগরূপের ভাবগাম্ভীর্য্যময় মূর্ত্তি অঙ্কিত করে যে বস্তু উৎপন্ন হয় তাকে বিলম্বিতখেয়াল বলে। ওই নীতিধারায় উক্ত গান গাইবার জন্য বিলম্বিত-একতাল নামে যে তালটিকে আশ্রয় করে গাওয়া হয় তার সম্বন্ধে সমালোচনার বিষয় আছে। অতি সংগত নিয়মে হাতে তাল দিয়ে গাইবার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের ওইভাবে শেখাবার জন্য প্রয়োজনবোধে নানান তালের নামকরণ হয়েছিল—রাগসংগীতের বিধিবদ্ধ গানের জন্য। হাতে তাল দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তালি দেওয়া কথার ক্রিয়া থেকে তাল কথার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু উক্ত 'বিলম্বিত-একতাল' তালে ছন্দবিভাগ নিয়ে তালাঙ্কের নির্দেশ যথাযথ নিয়মে নেই বলে হাতে তাল দিয়ে গাওয়ার প্রয়োজনীয়তার নীতিরক্ষার উপায় নেই। তব্‌লাবাদকের সঠিক মাত্রার গতি রেখে ঠেকা-বাজানর আয়ত্তের উপর নির্ভর করে গাইতে হয়। অন্যান্য তালের মত প্রকৃত নিয়মে ছন্দের বিভাগে তালাঙ্কের চক্রনির্দেশ না থাকায় নির্দ্ধারিত মাত্রার কমবেশী হয়ে পড়লে তা ধরা মুস্কিল। এজন্য সমষ্টিগত মাত্রার কমবেশী নিয়ে অনেক সময় 'সমে'র মুখে এসে যায়—বাদকের সংগীত শুনার আকর্ষণে বা অন্যমনস্কতায়। এই রকম পরিস্থিতি আমার অনেক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় জানা আছে। যাই হোক্ এই তাল পরনির্ভর সত্বেও আমাদের গায়কগোষ্ঠির কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অভ্যাসগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আইনসঙ্গতভাবে নিজের স্বাধীন সত্তা নিয়ে হাতে তাল দেখিয়ে গাওয়ার সুবিধে নেই যখন তখন তালের অর্থ ও নিয়মের উপর এই তাল তালনামের যোগ্য হয় কিনা সেটাই বিচার্য্য। যথার্থভাবে যদি বিচার করা যায় তাহলে এই তালের উপর বিলম্বিতগানে অনেক বিষয়েও ত্রুটী আছে—নিবদ্ধ সংগীতের যথাযথ নিয়ম ব্যবস্থায়। কারণ গানে তালের ক্রিয়ায় থাকতে হয় তারমধ্যে সহজায়ত্ত ছন্দগতির সুযোগ এবং গানের মহড়ার মূল স্থানে এবং 'অন্তরা' অংশে সল্পসীমার মধ্যে প্রত্যাবর্তনের সহজ উপায়। তাছাড়া ছোট ছোট অলংকরণের দ্বারা রাগরূপের উপর সৌন্দর্য্য নির্মাণের সুব্যবস্থা। কিন্তু বিলম্বিত একতাল তালের গানে ওই সমস্ত নিয়ম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই তালের গানে সমের পর তান আরম্ভ করলে মনে হয় শেষ হতে চাচ্ছে না,—সমে আসার জন্য দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণ করতে হয় এবং অনেক সময় রচনাশৈলীর মন যেন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে বলেও প্রত্যক্ষ হয়। আগে বিলম্বিতখেয়ালগান আড়াঠেকা ও ঢিমেতেতাল তালে গাওয়া হত বেশ স্বাধীনস্বচ্ছভাব নিয়ে। রূপক, আড়াচৌতাল, ঝুম্‌রা,—এইসব ছন্দময় মিশ্রগতিভঙ্গীর তালগুলিকেও আজকাল ওইরকমভাবে বিলম্বিত করা হচ্ছে দেখে বিচার-বুদ্ধির উপর বিস্ময় আসে।

বিলম্বিত গানের বিষয় নিয়ে আরো কিছু,—বিলম্বিতএকতালকে নিয়ে বা অন্য তালে বিলম্বিত খেয়াল গাইরার সময় যে নীতিধারার উদ্দেশ্যের উপর তার রাগরূপ অঙ্কিত হয় সেই নীতিধারার ভাব-গাম্ভীর্য্য ও রসঘনরূপকে শেষ পর্য্যন্ত বজায় না রেখে দ্রুত তানের ক্রিয়া কেন দেখান হয় তা কোন

যুক্তি দিয়ে বুঝি না। ওই সব তান দ্রুত খেয়ালের জন্যই থাকা বিধেয় মনে করি। সেই দ্রুত-তান যদি বিলম্বিতেও দেখান হল তাহলে দ্রুত খেয়াল গাইবারই বা কি এমন প্রয়োজন থাকে। আর একটা কথা,—সুরঅঙ্কনের বিচারে মনে হয় যে কোন তানযুক্ত গানে কথার ভাবার্থ ধরে তান-বৈচিত্র্য দেখান সব দিক দিয়েই নীতি সঙ্গত। এর দ্বারা গানেরভাব এবং সুর রচনা সমভাবে বজায় থাকে ও কথার অর্থের অসঙ্গতি ঘটে না। যেমন গানের কথায় আছে, ‘মন্দিলরা বাজ’ বাজ বলে আ-বা-ই অক্ষর নিয়ে তান করলে ওই অক্ষর দু'টি গানের নয় বলে—‘বাজ’ আ বা ‘বাজ’ই হয়ে পড়ে, যার কোন মানে হয় না। এজন্য আমার বিবেচনায় বাজ কথার ‘বা’ দিয়ে তান তুলে পরে স্থান বুঝে ‘জ’ বলে গানের কথাতে আসাই যুক্তি সঙ্গত। বিশেষ করে বিলম্বিত গানের সময় এই নীতি ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিলম্বিত ও দ্রুত এই দুই গতি বিশিষ্ট গানেই কথার ভাব রক্ষা করে সুন্দরভাবে আগাগোড়া রাগরূপের রচনাকৌশল ও তানাদি প্রকাশ করতে কোনই অসুবিধা হয় না। গানের কথায় তানের উপযোগী সব অক্ষরই থাকে। গান বলতে যে বস্তুকে বুঝায় এবং তাতে যে ভাব, রস ও রূপের শিল্পগঠন থাকে সেখানে দ্রুতলয়ের গানের উপরও স্বরগ্রামের ক্রিয়া দেখালে মনে হয় যেন গানের প্রভাবপ্রকৃতির সংগে যোগাযোগে ঠিক উপযোগী নয়। উদাহরণ যেমন একটি দ্রুত খেয়াল “তুম জাগো মোহন প্যারে শ্যামলী সুরত মেরে মনহি ভাঁওয়ে··· ।” এই গানটির সামগ্রিক ভাবার্থ,—বৃন্দাবনের অধিবাসীরা বলছেন,—হে প্রিয় গোপাল তুমি এবার ওঠো, তোমার রূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর সর্বদা আকুল হয়ে আছে, হে আমাদের সুন্দর শ্যাম। প্রভাত হয়ে গেছে, সূর্য্য উদিত, তোমার সাথি গোওয়ালা শিশু সব ছুটে এসেছে, তোমাকে দর্শন করবার জন্য সমস্ত কাজ আটকে আছে, হে নন্দ কিশোর শীঘ্র ওঠো। গানের এই ভাবকে রক্ষা করার দায়িত্ব রেখে সেই সঙ্গতির উপর গানের কথা ধরে, তান বৈচিত্র্যাদি প্রকাশ করে, গেয়ে সমাধা করার উপরই গানের ভাবতাৎপর্য্য রক্ষা পাবে”। কিন্তু “তুম জাগো মোহন প্যার” বলে যে গতিতেই হোক পা—পা-ধা-পা-পা-পা-ধা-পা, মা-মা-ধা-পা-মা-মা-ধা-পা-ইত্যাদি স্বরগ্রাম করা কি রুচি ও নিয়মসঙ্গত রূপে উপযোগী হতে পারে?

কণ্ঠে বিভিন্ন ছন্দের উপর স্বরগ্রামের কৌশল প্রদর্শন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক বটে এবং উন্মুখ হয়ে শুনার আগ্রহও আসে সত্য, কিন্তু আমার মতে সে বস্তু গানে না রেখে—রাগ-তাল নিয়ে যে এক প্রকার স্বরগ্রামের শ্রেণীবস্তু আছে তার উপর এর কৃতিত্বের সব কিছু সমাবেশ করে দেখান যায় এবং তেলানাতেও প্রয়োগ চলে। আগেকার গায়করা স্বরগ্রাম দেখানর ইচ্ছায় গানের শেষে এইভাবেই দেখাতেন। আমার এই যুক্তির উপর সত্যই সত্য আছে কিনা আশা করি শিল্পীরা ভেবে দেখবেন। কিছুকাল আগেও আমি গানে-স্বরগ্রামের বিভিন্ন ক্রিয়া দেখান বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলেই মনে করতাম। তারপর গানের ভাবময় নীতিপদ্ধতির উপর সবিশেষ দৃষ্টি আসায় তাতে স্বরগ্রাম করা উচিত নয় বলেই মনে এল। তবে একটা কথা—আজকাল দ্রুতখেয়ালের মাত্রাগতি

যেভাবে ধাবিত হয়, তখন তানাদি ক্রিয়ায় গানের যথাযথ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে রাগরূপের আঙ্গিকমূর্ত্তিরই অধিক আবির্ভাব হয়, তখন শেষের দিকে মনঃতুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় স্বরগ্রামের কাজ দেখান চলতে পারে। তবে এ স্থলেও বিচার রাখার আবশ্যক থাকবে গানের ভাবরূপ কোন্ স্তরের।

যেমন,—বাহার রাগের একটি দ্রুতখেয়ালের কথা রচনায় আছে 'এরি গুঞ্জে গুঞ্জে মধুকর মদমাতিয়া…' এই রকম কথার ভাব রচনার গানে স্বরগ্রামের ক্রিয়া দেখান অসমীচীন হবে না। কিন্তু পূর্বোল্লেখিত দ্রুত গানে কিংবা ভৈরবরাগের 'ধন ধন মূরত কৃষ্ণমুরারী…' এই দ্রুতগানে স্বরগ্রামের কাজ করা যে গানের ভাব-রস বিরোধী হবে এ কথা গায়কগণ সহজেই স্বীকার করবেন বলে মনে করি।

আজকাল কোন কোন বাংলা আধুনিক গানেও যখন স্বরগ্রামের কাজ করতে দেখি, তখন ভাবি গানের জন্য বিচার বুদ্ধির বোধ হয় কোনই আবশ্যক করে না।

টপ্পা,—শুনা যায় পাঞ্জাব নিবাসী গোলামনবী নামক এক গায়ক শোরীনামক তাঁর স্ত্রীর নাম দিয়ে টপ্পা রীতির গান প্রচলিত করেন। পরে হম্‌দম্, সরসার্ প্রভৃতি গায়কদের দ্বারা টপ্পাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। হিন্দী অভিধানে টপ্পা কথার অর্থ দেওয়া আছে 'উছাল', অর্থাৎ আমরা যাকে বলি উছ্‌লে পড়া।

এই গানের রচনার ভাব মধুরপ্রেমবিরহ নিয়েই বেশী। ভাবের আবেগ সুরকে নিয়ে নিরাকুত ঢেউএর মত তানে উছলে পড়তে থাকে এর গায়কীনীতিধারায়, তাই সঙ্গত কারণ ধরে এই শ্রেণীর গানের টপ্পা নাম হয়েছে। টপ্পাগানের এই গায়কীনীতি বোধ হয় না জানার জন্য কেউ কেউ এই গানে দ্রুত তান করেন। গানের অর্থ ধরে দ্রুততান যে নীতি-নিয়ম সঙ্গত নয় এ কথা বিশেষ করে বলার আবশ্যক করে না। খাম্বাজ, ঝিঁঝিঁট, সিন্ধু, ভৈরবী প্রভৃতির মত রাগগুলিই টপ্পাগানে থাকে।

খুব দুঃখের বিষয় রাগসংগীতের শ্রেণীগত গানের মধ্যে এমন একটি বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ এবং আবেগবিধুর ও রসমাধুর্য্যময় গানের চর্চা প্রায় লোপ পাওয়ার মত হতে বসেছে। টপ্পাগান খেয়ালের বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত হলেও তার গায়কীর শক্ত গঠনক্রিয়া শিল্পসৃষ্টির এক বিশেষ স্থানে আছে। সাধারণভাবে গাইবার মত অল্প দিনে খেয়ালগান গাইতে পারা যায়,—কিন্তু টপ্পাগান ওই সময়ের মধ্যে কণ্ঠে আনা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ—কণ্ঠে পাকা গমকীতান উৎপন্ন হবার সামর্থ্য না আসা পর্য্যন্ত টপ্পার তান প্রকাশ হয় না। এই শ্রেণীর গানের রচনায় আগাগোড়া ওই প্রকার তানের গঠন নির্মিত হয়ে আছে।

এ সম্বন্ধে একটা বিচার বিবেচনার কথা,—পূর্বেই বলেছি যে কোন গানের ভাষা যদি বুঝবার সামর্থ্য না থাকে তা হলে তার শুধু সুরই গাওয়া হয়,—গান গাওয়ার যে সার্থকতা ও অর্থ থাকে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহলে আলাপের তে, রে. নে, রি. তোম্, ও যেরূপ উহাও তদ্রূপ। আমাদের দেশের নিধুবাবু টপ্পাগানের নীতি-নিয়ম ও গায়কীকে হুবহু অনুসরণ করে বাংলা ভাষার দ্বারা অপূর্ব ভাব সম্পদ দিয়ে বহু গান রচনা করেছিলেন। সে সব গান যখন গাওয়া হয় তখন মনে হয় পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত টপ্পাগান গাওয়া আমাদের জন্য নিরর্থক। আগে শিক্ষিত ও আভিজাত্য

মহলে নিধুবাবুর টপ্পাগান সগৌরবে সমাদৃত হয়েছিল। শুধু বাংলা টপ্পাই নয়—বহু মনীষীব্যক্তির রচিত বাংলা খেয়ালও স্থান পেয়েছিল হিন্দীর সমস্তরে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখনকার সংগীতজ্ঞ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতারা এবং শিক্ষার্থীরা শাস্ত্রীয়সংগীতে মাতৃভাষার স্থান থাকা যে অপরিহার্য্য তা তাঁরা স্বীকার-করার মত মনোভাব না দেখিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। যেদিন তাঁদের এই বিলুপ্তি মনোভাব ফিরে আসবে, তারপর থেকে তাঁরা দেখতে পাবেন সহরবাসী এবং গ্রামবাসীরা পর্য্যন্ত আবার আগের মত শাস্ত্রীয়সংগীতকেই প্রকৃত গ্রহণয়োগ্য আদর্শ সংগীত বলে মনে করেছে।

আগে বাল্যজীবন থেকে এই সাফল্যের অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছিলাম। তখন মাতৃভাষার-মাধ্যমে বেশী করে রাগসংগীত প্রচারিত হয়ে এসেছিল বলেই জনগণচিত্তে, যাত্রায়, রামায়ণে, চৈতন্যমঙ্গলে, পুরাণ ও ভাগবত পাঠে এবং আরো বিবিধস্তরে রাগসংগীতের মহিমময় আকর্ষণীয় রূপ প্রবেশ করে চতুর্দিকে এর আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল।

হিন্দীর একটা কথাকে নিয়েই গাওয়ার উদ্দেশ্য সার্থক হ'ল বলে মনে করা হবে,—অথচ বাংলাভাষায় রাগরূপ প্রকাশের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও খেয়াল, ঠুম্‌রী ইত্যাদি গাওয়া পছন্দ করব না—এ খুবই বেদনাদায়ক।

সংগীত কোন একটা নির্দিষ্ট ভাষার অধীন নয়। নিজের সাধনা, সামর্থ্য ও বোধ থাকলে যে কোন ভাষায় যথাসঙ্গতরূপে শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেণীগত গানের নীতিধারা ও গায়কী-রীতি অক্ষুন্ন হয়েই থাকবে, অপহ্নব কদাচই ঘটবে না।

টপ্পাগানের শ্রেণীকরণ নিয়ে আরো দু'চার কথা,—

শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রায় সমস্ত রাগেই ধ্রুপদ হয়, কিন্তু সবরাগে খেয়ালের প্রতিষ্ঠাগতরূপ ঠিক অঙ্কিত হতে চায় না, এই ধারণা আছে। ধ্রুপদের রূপসৃষ্টির মধ্যে তার নীতিধারায় অন্যান্য গুণবস্তুর সংগে এমন এক গায়কীপদ্ধতির ব্যবস্থা আছে যে, তার রূপের উপর যে কোন রাগের বিজ্ঞান-ব্যাকরণকে সম্যকরূপে রক্ষা করা যেতে পারে। অবশ্য সুরের রূপে নানান ভেজাল যদি না থাকে।

সিন্ধু, পিলু, বারভা. পাহাড়ী, মাঝ, ইত্যাদি রাগগুলি খুব হাল্‌কা ধরণের মনে করে খেয়ালে ব্যবহার হয় না। কারণ তাতে তার গায়কী নীতিধারার গঠনশক্তির বৈশিষ্ট্য এবং গৌরব রক্ষা হয় না। কিন্তু এই রাগগুলি বাদ থেকে গেলেও আজকাল এমন ধরণের রাগরূপ পরিবেশিত হয় যার মধ্যে খেয়ালের প্রকৃত মর্য্যাদার আভিজাত্যরূপ যথাযথ থাকে না। সেই সব রাগের সুর নিয়ে গাওয়া খেয়ালকে মনে হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর খেয়াল। অর্থাৎ নরম মৃত্তিকার দ্বারা ছোট একমূর্ত্তির মত।

যাইহোক,—পূর্বকথিক রাগগুলির উপর খেয়ালের গমকীতানগুলি টপ্পায় এসেছে এবং সূক্ষ্মতানাদির ক্রিয়াগুলি ঠুম্‌রীর উপর প্রয়োগের ব্যবস্থা নিয়ে দুই শ্রেণীর গানে বিভক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য ওই দুই শ্রেণীতেই অল্প পরিমাণে বিস্তারের মত সুরের শান্তরসের ক্রিয়া রাখায় দোষের হয় না। তবে আমার মতে ওই বস্তু টপ্পাতে বিশেষ ব্যবহার না করে বর্ত্তমানের বিশেষ করে বিলম্বিত ঠুম্‌রীতে

বেশ গুরুত্ব নিয়ে করা যেতে পারে এবং করার সুযোগও আছে, তার সংগে তানও করা যায়।

হোলী, কাজ্‌রী, চৈতি এবং ঝুমুরগান—

শ্রীকৃষ্ণের দোল লীলার সময় হোলী খেলার বর্ণন নিয়ে কাফী সুরে যৎ এবং কাহারওয়া তালে যে গান গাওয়া হয় বিশেষ করে ঠুম্‌রীর গায়কী ভঙ্গীতে তাকে হোলী শ্রেণীর গান বলা হয়। পশ্চিমে কাহার জাতিদের মধ্যে গ্রাম্য হোলীগানের প্রচলন হয় প্রথম অবস্থায় এবং বেশী পরিমাণে। তাদের আনন্দোচ্ছল গানের ছন্দে ঢোলকে কিংবা ডফ ইত্যাদি বাদ্যে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেই শব্দের পুনারাবৃত্তির চক্ররূপে আসে আটমাত্রা এবং তাতে প্রকাশ পায় দুটি ছন্দের দোলন। তার মধ্যে প্রথমটিতে শব্দের যে ঢেউ উংপত্তি হয় সেইটি সমতালে পরিচিত হয় এবং পরেরটির নাম আসে ফাঁক তালরূপে। ওই জাতিদের দ্বারা এই তাল উংপন্ন হওয়ার দরুণ নাম 'কাহারওয়া' হয়েছে বলেই আমার অনুসন্ধানে এসেছে।

কাজ্‌রী কথার অর্থ—কাজ্জলযুক্ত। এই নামের অর্থ নিয়ে মনে হয়--বর্ষাকালে মেঘের কাজলরূপ দেখে তার ঘনঘোর দৃশ্যের করুণ শিহরণে পতিবিরহিণীর বিয়োগবিধুরঅন্তরে যে করুণসংগীত বিলাপের সুরে কণ্ঠ দিয়ে নেমে আসে কথার ভাবযুক্ত হয়ে এবং ধুইয়ে দেয় আশারঞ্জিত চোখের কাজল, তার সেই গানই বর্ষাকালে গীত হয়ে প্রচলিত হয়েছে 'কাজরী' নামে। এই সব ব্যাখ্যা এসেছে আমার পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামের সংগে পরিচয়ে। সুরের এই গায়কীপদ্ধতির গানকে এখন ঠুম্‌রী পর্য্যায়েই ধরা হয়েছে। কাজ্‌রী গানে তিলোককামোদ, পাহাড়ী এবং দেশরাগ—এই তিনের মিশ্রণ নিয়েই বেশীরভাগ রচিত থাকে। ওই তিনটি রাগের সুর পাহাড়ী-গ্রামাঞ্চলের-অধিবাসীদের কণ্ঠে স্বভাবগত আকর্ষণে ধরা দিয়েছিল যেন কামনার আহ্বান পেয়ে। আগেই বলেছি এই পরিচয়ের মূলে সত্যের সন্ধান আছে। কাজ্‌রী গানের সুর যদিও বিশেষ বিস্তার বহুল নয়, তত্রাচ যেন ওতেই শিল্পী-অন্তরে এক মাদকতার স্থান নিয়ে আছে। তার ভাবও সুরের রূপস্পর্শ মনে এনে দেয় যেন সে কোন কামনার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের রূপধরে আসছে।

হোলী এবং কাজ্‌রী গানে ঠুম্‌রী এবং টপ্পার অলংকরণ বস্তু দুই-ই ব্যবহার হয় বলে গায়কীরূপের উপর সুন্দরতৃপ্তির বাঁধন আছে।

রাগরূপের সুর ধরে পাহাড়ী পল্লীপ্রাণের আরো দু'একটি শ্রেণীর গানের বিষয় জানি। যেমন, চৈতি ও ঝুমুর। চৈতিতে পিলু-বারঙার সুর পাওয়া যায়। পুরো চৈত্রমাস ধরে, এই গানের প্রিয়-অধিবাসীরা তাদের গ্রামে গায়। এই গান তাদের গায়কদের কাছে শুনে আমার শেখা হয়েছিল। এর সুর ও গায়কী ঠুম্‌রী শ্রেণীভুক্ত।

যেখানে ঝুমুর গানের সৃষ্টি সেখানের নারীকণ্ঠে আমি এই ঝুমুর গান বহুবার শুনেছি অপূর্ব আকর্ষণ ও বিস্ময় সহকারে বিশেষকরে যখন আমি পঞ্চকোটরাজ দরবারে গায়করূপে ছিলাম। এর

গীতপদ্ধতির প্রথমে থাকে বিলম্বিতগতিতালে নিবদ্ধ হয়ে। এই তালের মাত্রাসমষ্টি কুড়িটি। দু'মাত্রা অন্তর তাল ও ফাঁকের রূপ ধরা দেয়— গায়িকা ও নাগাড়া বাদকের দ্বারা। উভয়েরই মধ্যে যখন তালের ছন্দে দেহ, মস্তক ডাইনে-বামে আন্দোলিত হয় তখন তার ভাবভঙ্গী অপূর্ব লাগে।

দ্রুততালের গান আড়খেম্‌টা তালে চলে। এই দুই তালের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছন্দের বিরতি থাকে। অবশ্য তখনও তালের মাত্রাসংখ্যাসমষ্টি যথাযথই বজায় থাকে। বিলম্বিত গানের সুরে পাহাড়ী ও তিলককামোদের সুরই বিশেষ করে পাওয়া যায় এবং দ্রুত গানের সুরে থাকে বিশেষ করে সারঙ্গ-রাগের সুর। এই গানের গায়কীরীতির মধ্যে এত বেশী সূক্ষ্মশ্রুতির প্রকাশ থাকে যে অন্যের পক্ষে অনুকরণ করা খুব শক্ত। ওদের মুখে এই গান শুনে মনে হয় যেন সবই স্বভাবগত হয়ে ওদের কণ্ঠে উৎপন্ন হতে থাকে, বেশী চেষ্টা করতে হয় নি। নারীদের গানের সংগে নৃত্য সে-ও এক অপূর্ব। এমন সুন্দর আঙ্গিকক্রিয়ার ভাব নিয়ে নৃত্যে সাবলীলরূপ প্রকাশ পায় যে, তা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় জনসমাজের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীদেরও দর্শনীয় বস্তু এবং তাঁদের পক্ষে শিক্ষনীয়ও মনে হবে।

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম প্রান্তের সীমানা শেষে মানভূম অঞ্চলের এক শ্রেণীর হরিজন জাতিদের স্বভাবগত হয়ে এই ঝুমুর গানের সৃষ্টি হয়েছে এবং এদের কাছেই আছে সংরক্ষিত হয়ে ঝুমুরের সামগ্রিক প্রকৃতরূপ। ঝুমুরের অর্থ সম্বন্ধে মনে হয়, নৃত্যকারিণীদের কণ্ঠে সুরেরসূক্ষ্মশ্রুতির নাচনরূপ এবং গানের ছন্দে ও নৃত্যের উপর কটিতটে নিবদ্ধ নুপূরের তোড়ার ঝুমুরঝুমুরধ্বনি মনকে আনন্দিত করার সহায়তা করে বলে ওই নৃত্যগীতের সমষ্টিগত রূপের নাম হয়েছে 'ঝুমুর'। বিরাট বিস্তৃত না হলেও এই গানের কথার ভাব, সুর, তাল, ছন্দ ও নৃত্য— সবকিছুই আকর্ষণীয় হয়ে মনের মধ্যে রেখাপাত করে, এজন্য এই গানের বিষয়ে সামান্য কিছু পরিচয় দিয়ে রাখার আবশ্যক মনে করলাম। সাধারণভাবে হয়ত মনে হয়—বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, জারি প্রভৃতি শ্রেণীর সাধারণ গ্রাম্যগীতির মতই ঝুমুর গান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাঁটি ঝুমুরগান তা নয়—এর গায়কীপদ্ধতি বেশ শক্ত। এই গীত শাস্ত্রীয়সংগীতের লঘুশ্রেণীর গানের পর্যায়ে স্থান না থাকলেও এর একটি স্বতন্ত্র উপভোগ্য স্থান আছে কৃতিত্বের শক্তি নিয়ে এবং এই গানের মধ্যে সুর-ছন্দ ও শ্রুতির প্রকাশরূপের উপর সৃষ্টিতত্ত্বেরও কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

বাল্যজীবন হতে সময় সময় প্রকৃতির বুকে বিচরণ করে, দুর্গম ও সুদুর্গম স্থানের নানান পরিবেশে উপস্থিত হয়ে সুর ও ছন্দের ছোট ছোট স্বভাবগত মূর্তি যে যে ভাবে দর্শন করতে পেরেছি তাতে করে রাগসংগীতের কোন কোন বিষয়ের সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধান এসে সত্যনিরাকরণে সহায়ক হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি।

শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেণীগত আরো কয়েকটি—

ত্রিবট,—ত্রিবটশ্রেণীর সংগীতের এই রকমভাবে অর্থ করা যায়, যথা,—একটি বৃক্ষশাখায় তিনটি

বৃন্ত নিয়ে তিনটি ফল ঝুলে থাকার যেরূপ দৃশ্য থাকে—সেই দৃষ্টান্ত ধরেই মনে হয় তৃবঁট নামকরণ হয়েছিল এর গঠন নিয়মের তাৎপর্য্য ধরে। ক্রমশঃ নামের ডাকে ত্রিবট হয়ে পড়েছে। এর রূপাবয়বে থাকে প্রথম অংশে তেলানার অক্ষর, পরের অংশে স্বরগ্রাম এবং শেষে পাখোওয়াজের বোল এবং কথা দিয়ে প্রচার থাকে তার নাম, যথা—'ত্রিবট গাওয়ে গুণী…'। হিন্দীর সংগে কোন বিষয়ের নামকরণের অর্থ যদি না মিলে তাহলে মনে হয় সে কথা বঙ্গদেশে সৃষ্টি হয়েও থাকতে পারে। কারণ সবকিছু সৃষ্টি যে একই স্থানে হয়েছে এমন মনে করার কোন হেতু নেই।

চতুরঙ্গ,—চার রকম বস্তু দিয়ে এর গঠন রূপের রং থাকে বলে ওই নাম দেওয়া হয়েছে। চারটি তুকের প্রথমটিতে থাকে চতুরঙ্গ কথা প্রয়োগ করে রচয়িতার ইচ্ছামত ভাববর্ণন, তারপর প্রায় ত্রিবটের মতই তিনটি বস্তু তিনটি অংশে থাকে॥

সপ্তরঙ্গ,—সপ্তরঙ্গের এইভাবে শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে,—যথা, এতে থাকে সাত প্রকারের সাতটি রাগ-রূপ, পাখোওয়াজ এবং বাঁওয়া-তব্‌লার সাত রকমের তাল, তার সংগে প্রত্যেকটির এক একটির উপর পৃথকভাবে বোল, অক্ষর, স্বরগ্রাম ও কয়েকটি ভাষা নিয়ে থাকে রচনা। উদাহরণ, যেমন,—আমাদের ঘরাণার একটিতে আছে প্রথমে শ্রীরাগের উপরে তেওট তাল যুক্তহয়ে হিন্দী ভাষায় উক্ত সপ্তরং বিষয়ের বর্ণনা, তারপর ইমন-কল্যাণ রাগে তেতাল তাল যুক্ত হয়ে স্বরগ্রাম, কেদাররাগে, একতাল তালে তেলানা, বাগেশ্রী রাগে, আড়াচৌতালে পাখোওয়াজের বোল, মধুমাধবীসারঙ্গ রাগে, আড়াঠেকা তালে উর্দুভাষায় কবিতাংশ, পরজরাগে,—পঞ্চমসাওয়ারীতালে আরবীভাষায় বয়াদ এবং শেষে বেহাগরাগে,—ঝাঁপতালতালে সংস্কৃতে মহাদেবের স্তোত্র। গায়ককে একটানা গেয়ে যেতে হয় এবং বাদককে সঙ্গতের জন্য পাখোয়াজ ও বাঁওয়া-তব্‌লা এক সাথে নিয়ে বসতে হয়।

তেলানা,—দের্‌-দের্‌-দানি তোম্‌-না-না-তেলানা ও-তা-তা-দের্‌না, ইত্যাদি অক্ষর নিয়ে রাগ-তালে গঠিত বস্তুকে 'তেলানা' বলে। আজকাল অনেকে তেলানাকে 'তারানা' বলেন। কিন্তু ওই বস্তুর অনেক প্রাচীন রচনার মধ্যে তেলানা বা তেলেনা কথার উল্লেখ আছে কিন্তু কোনটাতেই 'তারানা' কথা পাওয়া যায় না। আগে কারো মুখে তেলানাকে তারানা বলতে শুনিনি। বিচার করে দেখতে গেলে এর গায়কীবস্তুতে তেলানা বা তেলেনা কথা ব্যবহার করলে অন্য অক্ষরের সংগে মিলে-মিশে যাবে কিন্তু তারানা বলতে গেল ঠিক খাপ খাবে না, ও শুনতে ভাল লাগবে না।

যাই হোক্‌—তেলানা বা তারানা বলায় কিছু এসে যায় না, তবে উক্ত প্রমাণকে স্বীকার করে তেলানা বলাই সঙ্গত বলে মনে করি। প্রথমটির চেয়ে যদি পরের নামটিতে ন্যায়সঙ্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে নাম পরিবর্ত্তন ন্যায় সঙ্গত রূপেই হবে।

রাগমালা,—কতকগুলি রাগের একসংগে সুরের ফুল ফুটিয়ে যে মালা গাঁথা হয় তাকে বলে 'রাগ-মালা'। রাগমালা রচনার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বনিয়ে সুন্দর তাৎপর্য্য আছে। যেমন, রাগগুলির প্রত্যেকটির সুর তুলে তাদের যে নাম উচ্চারিত হবে সেই কথার উপর রচনার ভাব-ব্যক্ত হতে হবে।

যেমন একটি এই গানের উদাহরণ,—ইয়েমন(ইমন) 'কল্যাণ' করেঁা জপকে 'দুর্গা' নাম, 'ছায়া' রাখো 'বাগেশ্বরী' কো হৃদপর। (অন্তরায়) ইহ দরবারমে (দরবারী কানাড়া) 'বাহার' ছোড়কে 'পরজ'নমকো লিয়ে শঙ্কর (শঙ্করা) জায়া কর সার। বড় অক্ষরগুলির মধ্যে এক একটি রাগের নাম আছে। এই গানে আস্থায়ী শেষ হবার সংগে সংগেই অন্তরা ধরতে হয়। তারপর সমে এসে পুনর্বার এক একটি রাগের তান-বিস্তার দেখান যেতে পারে এবং সর্বশেষে এক দমের মধ্যে ওই রাগগুলির পর পর এক সংগে তান দেখিয়ে সমে শেষ করা হয়। ফর্‌মাস্ পেয়ে আগে এই সব শ্রেণীর গান আসরে গাইতে হত।

যুগলবন্ধ,—একজন গানের কথা নিয়ে এবং অন্যজন সেই গানের স্বরগ্রাম গুলো এক সংগে গেয়ে যাওয়াকে 'যুগলবন্ধ' গান বলে। এই গান ধ্রুপদাঙ্গের মধ্যেই গাওয়ার প্রচলন হয়েছিল। এই প্রকার রীতির গানে বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নেই, একটা রকমফের্ ছাড়া।

তালফের্‌তা,—ধ্রুপদাঙ্গের এক ধরণের গানকে 'তালফের্‌তা' বলে। এতে থাকে আস্থায়ীতে চৌতাল, অন্তরায় সুরফাঁকতাল, সঞ্চারীতে তেওরা এবং আভোগে ঝাঁপাতাল, এই চারটি তাল। শেষের তিনটি তাল পরিবর্ত্তন নিয়েও থাকতে পারে।

স্বররঙ্গ,—মাত্র সাতটি স্বরের অক্ষর নিয়ে কথারভাবে রচিত গানকে 'স্বররঙ্গ' বলে। এ-ও ধ্রুপদাঙ্গের বস্তু। এর পরিচয়ে আমাদের ঘরাণায় সরস্বতীরাগের একটি গান এইরূপ,—"সারিরংগমে রংগিরি সাগমগে সেঁা ধেমে সামনা মানো। (অন্তরা) সগরে নগরে মেঁ ধামমেঁ মেরি সারি সুধসা না মানো।" এই রকম শ্রেণীর গান স্বরের সাতটি মাত্র অক্ষর নিয়ে রচনা করা কৃতিত্বের পরিচয়। এই রাগের সুর সিন্ধুও বাগেশ্রীর রূপ নিয়ে তৈরি হয়েছে।

সঙ্গীত,—ধ্রুপদাঙ্গের মধ্যে সঙ্গীত ও গীত এই দুই নাম দিয়েও গানের শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। উক্ত সঙ্গীত নামের যে অর্থ তাতে থাকে দীর্ঘ রচনার মধ্যে এক একটি অংশে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ের নানান কথা এবং থাকে পরিপূর্ণ ত্রিসপ্তক নিয়ে গানের স্বর রচনা। যিনি এই শ্রেণীর গান রচনা করে ওই নাম দিয়েছিলেন চৌতাল তালে যুক্ত করে, তিনি যদি গাইবার সামর্থ্য রাখতে পেরেছিলেন তাহলে তাঁর রচনা শক্তি এবং কণ্ঠশক্তি, দম এবং সামর্থ্য কিরূপছিল তা বেশ উপলব্ধিতে আসে।

গীত,—গীত এবং ধারু নাম দিয়ে ধ্রুপদাঙ্গের যে গান আছে তার মধ্যে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু গীত বা ধারু কথাটি কোন কোন ধ্রুপদ গানের লঘুতালে পাওয়া যায়। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথা এল তার ব্যাখ্যা কোন গ্রন্থে আমি সঠিক পাইনি।

গুলনৃকস্ এবং কওলকলওয়ানা,—ধ্রুপদাঙ্গের শ্রেণীর নামে লঘুতাল নিয়ে এই দুটির নাম আছে কিন্তু তাৎপর্য্য বিশেষ কিছু নেই। পারস্য ভাষায় রচিত এবং গুল এই অক্ষর যুক্ত গানকে 'গুলনৃকস্' বলে। গুল্ কথার অর্থ ফুল। দ্বিতীয়টি আরবী ভাষায় রচিত মহম্মদের গুণকীর্ত্তনমাত্র।

গজল,—পারস্য বা উর্দু ভাষায় রচিত যে প্রেম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক গান বিশেষ করে পোস্তা-তাল নিয়ে গীত হয় তাকে 'গজল্' বলে। 'রেফ্‌তা' 'রুবাই' নামক গানও গজলের মত। এইরকম ভাষার রচনায় ও সুরের মত আর এক বস্তুকে 'গীত' বলা হয়॥

শোহেলা,—বিবাহ বা অন্য কোন উৎসবাদি-আনন্দ-গর্ভ গানকে যাবনিক ভাষায় 'শোহেলা' বলে।

জিগর্‌,—পরমার্থ-বিষয়ক গানকে যাবনিক ভাষায় 'জিগর্' বলে।

উপজ,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান করাকে 'উপজ' বলা হয়।

স্বরগ্রাম,—এর রচনার বিষয় আগেই জানান হ'য়েছে॥

শাস্ত্রীয়সংগীতের বহুবিধ মূল্যবান বস্তু এক সময় এসে বিষ্ণুপুরঘরাণার ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। তার কিছু তালিকা, যথা—কয়েক শত ধ্রুপদ ও খেয়াল, তার সংগে বহু টপ্পা, ঠুম্‌রী ও ভজন ইত্যাদি, বহুবিধ তারের এবং চর্মবাদ্য যন্ত্র, শাস্ত্রীয়গ্রন্থ ইত্যাদি। সেই এক দীর্ঘকালধরে যেন প্লাবন স্রোতের মত এসে ভরিয়ে দিয়েছিল বিষ্ণুপুরের বিরাট বিরাট ঘরাণা পরিখার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আমাকে বাল্যকাল হতে ঘরাণাবস্তুসমূহকে রক্ষার জন্য সমস্ত কিছুই শিখতে হয়েছিল।

অনেকের কাছেই বিষ্ণুপুর ঘরাণার দ্বারা বাংলাদেশে শাস্ত্রীয়সংগীতের ব্যাপক প্রচারের বিষয়, বহুগুণীর নাম পরিচয় এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের বিষয় পরিচিত হয়ে আছে। এইসব পরিচয়ের আরো উপরে যে পরিচয় আছে তা' হল ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত ঘরাণাগুণীদের এবং পরিব্রাজক সংগীত-সাধকদের দ্বারা তাঁদের সাধনালব্ধ বস্তু সংগৃহীত হয়ে থাকা এবং তার সঙ্গে শাশ্বতনীতি-ধারার প্রমাণের বস্তুসমূহ। বিষ্ণুপুর ঘরাণার পরিচয় জিজ্ঞাস করলে আমি এই পরিচয়ই সর্বাগ্রে প্রদান করি।

ঠুম্‌রী-গান ও ঠুম্‌রী-তালের কথা,—

ঠুম্‌রী গানের সৃষ্টি পরিচয়ের মধ্যে যেটুকু তার ইতিহাস জানা আছে তাতে পাওয়া যায়—লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজাদালীসাহেব ছিলেন সৌখিনত্বে এবং শিল্পসৌন্দর্য্যরূপের প্রতি ও লাস্যরসের প্রিয়তা পরিচয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগ ছিল গভীরতম হয়ে।

তাঁর কাছে থাকা সঙ্গীজ্ঞদের মধ্যে সনদ ও কদর এই দুজন বিখ্যাতগায়ক নবারের ইচ্ছা ও উৎসাহে নৃত্যের সংগে সংগে নর্ত্তকীদের জন্য দু'চারটি সৌখিনরাগকে ধরে গান রচনা করেন। এই গানের নাম হয় ঠুম্‌রী। হিন্দী কথায় ঠুমক্ মানে নৃত্যের গতিভঙ্গীর রূপ। তথাকার যে সব নারীরা চলন-বলনে নৃত্যের রূপ-ফুটিয়ে তুলে তাদের সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবীরা তাকে ঠুমক্‌ওয়ালী বলে সম্বোধন করতে শুনা গেছে। একটি ভজন গানেও এই কথার সমর্থন আছে। যথা,—ঠুমক্ চলত রামচন্দ্র-বাজত পাঁয়জনীয়া…।" এর অর্থে পাওয়া যায়, বাল্যাবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র পায়ের পাঁজনীর মধ্যে ছন্দবোল সৃষ্টি করে নৃত্যের ভঙ্গী নিয়ে চলাফেরা করছেন কিংবা স্বভাবগত হয়ে তাতে নৃত্যের রূপ নিচ্ছে।

তখনকার নর্ত্তকীদের নৃত্যের বিশেষ গতিভঙ্গীকে অনুসরণ করে তার মধ্যে যে ছন্দকে পেয়ে উক্ত গায়করা গান রচনা করেন তার মধ্যে কাহারওয়া তালটিই ছন্দের লঘু-গুরুর কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে বিরতির উপর অথবা গানের আরম্ভিক কথার পর তালের প্রকাশ নিয়ে। নৃত্যের গতিভঙ্গীছন্দকে তখনকার প্রয়োজনে রক্ষার জন্য গানে সেই ছন্দ স্থাপিত হওয়ায় সেই ছন্দ তালটি নৃত্যের প্রতিকরূপে ঠুম্‌রীতাল নামে অভিহিত হয়। এই তালের গান যতগুলি জানা আছে তাতে এর সত্যতা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে আছে।

ঠুম্‌রী তালের নাম পরিচয় ওই তালের গান সৃষ্টির একরকম সময় কাল থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে। অনেকে এ তত্ত্ব জানেন না বলেই মনে হয় ঠুম্‌রী নামে যে একটি তালেরও নাম আছে তার ধারণা নেই। এজন্য অনেকেই বলেন—ঠুম্‌রী আবার তালের নাম কেন হবে—সে-ত গানের শ্রেণীর নাম। এই মন্তব্যে তাঁদের উপরও তো প্রশ্ন আসতে পারে, গীতকথা সমস্ত শ্রেণীর গানের উপরই যখন ন্যায়ত প্রযোজ্য হয় তখন আলাদা করে এক শ্রেণীর গানকে কেন 'গীত' বলা হচ্ছে? যাইহোক্ মোটের উপর ঠুম্‌রীতালের নামটি যথাযথ উদ্দেশ্য ধরে যে সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে করবার নেই। ঠুম্‌রী তালের মত অনুরূপ একটি তাল কীর্ত্তন গানের মধ্যে আছে ওই রকম আড়ছন্দ নিয়ে,—তার নাম—'লোফা'।

হিন্দুস্থানীদের মুখে ডাকতে শুনা যায় বধূ অর্থাৎ স্ত্রীকে 'বহুড়ী' বলে। ঐ ভাবে নৃত্যভঙ্গী নিয়ে চলাচলকারিণী নারীদের ঠুমক্‌রী বলে সম্বোধন থাকার সম্ভাবনা আছে। উক্ত শ্রেণীর গানে এবং তালের নামে সহজ উচ্চারণের প্রয়াস এসে 'ক' কথাটি লুপ্ত হয়ে গিয়ে বা লুপ্ত করে ঠুম্‌রী নামে পরিচিত হয়েছে বলেই মনে বিশ্বাসের রেখাপাত করে। ঠুম্‌রীতালের ঠেকা নিয়ে প্রদত্ত হল। ঠেকার ছন্দ অনুধাবন করলেই সহজে বুঝা যাবে আট বা ষোল মাত্রার তালগুলি থেকে ছন্দভঙ্গীমায় বেশ পৃথক। বাদ্যে প্রকাশ করলেই যেন মনে হয় নৃত্যের ভঙ্গীমাধুর্য্যের রূপ সমুপস্থিত হল।

২´ ০ ২´ ০
ঠেকা,— –তা ঘি তা। না ধি ধা তেরেকেটে। প্রকারান্তর,— ধা–ঃ ত্তি ঘি ধা। –ধি ধা তেরেকেটে॥

২´ ০
আর এক প্রকার,— –ধা ঘি তা। না –ঃ ত্তি না তা॥ হাইফেন্ চিহ্ন একমাত্রা এবং পাশে বিসর্গ চিহ্ন আধমাত্রা॥

উক্ত তালের ঠেকাটিকে আমার বিচারে ঠুম্‌রী তাল নামে ব্যবহার করাই অতীব ন্যায়সঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা.—ঠুম্‌রী গান গাচ্ছি বলে যদি সেই গানের গায়কী-ভঙ্গীতে ঠুম্‌রী অর্থের বিশেষত্ব নিয়ে তালের ছন্দ না থাকে তাহলে সে গানকে ঠুম্‌রী বলা উচিত কি-না তা ভেবে দেখবার আছে। এখন বিলম্বিত তালে সুরের রচনা বিস্তার নিয়ে ঐ গানের নাম দিয়ে যেভাবে গাওয়া হয় তাকে ঠুম্‌রী বলা চলে না, বরং খুব হাল্‌কা ধরণের খেয়াল বললেই ঠিক সমীচীন হয়, ইচ্ছেমত তান

ইত্যাদি করার তাতে আরো সুযোগ থাকবে। বিলম্বিত শ্রেণীর ঠুম্রীগানকে অন্য নামে আনা যায় কিনা সে কথা বলার পর দেখলাম এক আশ্চর্য্য বস্তু। ওই দিনই রেডিওতে ঘোষণা হল অমুক গায়িকা যোগীয়ারাগে ঠুম্রী শুনাচ্ছেন। তিনি বর্ত্তমানের বিলম্বিতএকতালে উচ্চস্তরের না হলেও খেয়ালের বন্দেজ নিয়ে গেয়ে যেতে যেতে প্রায় শেষের দিকে ভৈরবীর সুর এক আধটুকু দেখিয়ে বোধ হয় জানাতে চাইলেন বহুদূরে অবস্থিত ঠুম্রীর রূপকে শ্রোতারা স্মরণ করুন। তারপর শেষে লগ্‌গি না কি এক বাজনার বস্তু আছে তার উপর যোগীয়ার রূপকে নাচিয়ে বিসর্জ্জন দেওয়া হল। অবাক হয়ে কেবল ভাবলাম এ কি হচ্ছে !

রাগরূপের উপর গান ও গৎএর বন্দেজ রচনা

যে কোন একটি রাগরূপ নিয়ে বিভিন্ন বন্দেজে গান বা গৎ রচনা করতে হ'লে রাগের স্বভাবগত রূপের প্রতি দৃষ্টি রাখার বিশেষ আবশ্যক থাকে, কিন্তু যখন অনেক গানে ও গৎএ এর ভীষণ ব্যতিক্রম দেখি তখন মনে হয় আমরা ভুলে যাই রাগরূপের স্বভাব ও প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখতে। এইরকম রচনা দেখে মনে হয়—রচয়িতার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা ইচ্ছা বোধ হয় অতর্কিতেই এসে পড়ে। যে-যে-রাগের সুর রচনায় মূদারার ষড়জ স্বরের পারিপার্শিক স্বর সমূহ নিয়ে তার স্বভাবগত সত্যরূপ প্রকাশিত হয়, সেই সেই রাগের গান বা গৎ যদি তারা সপ্তকের উপরে স্থান দিয়ে তাদের রূপ গঠন করা হয় তাহলে রাগের রূপ রুক্ষ না হয়ে পারে না এবং শুনতে মনও পছন্দ করে না। এ বিষয়ে উদাহরণের রাগ, যথা—তোড়ী, মালকৌশ, ভৈরবী, ভৈরব, ললিত, শ্রী, ভীমপলশ্রী, গৌড়সারঙ্গ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি। এই রকম ধরণের রাগের মধ্যে যে স্বাভাবিক রূপের প্রকাশ আছে—তা উদারা ও মুদারা সপ্তকের মধ্যেই বিশেষ করে, কিন্তু যদি তাদের উপরসপ্তকে তুলে তালের কাঠামোয় গান ও গৎকে বেঁধে রাখা হয় তাহলে যথা সঙ্গত রচনায় শিল্পীমনের পরিচয়ে তফাৎ থেকে যায়।

কেউ যদি বলেন—রচনার জন্য নির্দিষ্ট কোন নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা থাকা শিল্পীসুলভ মনের স্বাধীনতার উপর কি করে সমীচীন হতে পারে? রাগরূপের যে কোন স্থানে শিল্পী তার কৃতিত্ব নিয়ে মনের আকাঙ্খায় গান বা গৎ রচনা করতে পারেন,—এবং সে অধিকার তাঁদের থাকবেই।" এর উত্তরে আমার বক্তব্য,—উপরোক্ত যুক্তি শিল্পীর স্বাধীন অধিকারে হস্তক্ষেপের কথার উপর নয়—রাগ রূপের স্বভাব ধরে গান ও গৎএর অঙ্কননীতির কথা। পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান রাগের যে সমস্ত প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়াল আছে সেগুলির রচয়িতারাও বিখ্যাতগুণী শিল্পী ছিলেন নিশ্চয়ই। প্রাচীন পরিচিতি ধরে দেখা যায়—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রত্যেকটি গানে ও গৎএ রক্ষা করে গেছেন অঙ্গপ্রধান স্বভাবধর্মানুযায়ী রাগের রূপকে যথাযথভাবে এবং শিল্পদক্ষতা ও চাতুর্য্যের সমাবেশ শক্তি প্রকাশিত করেছেন প্রায় প্রত্যেকটির বিভিন্ন সুরসংস্থাপনার বন্দেজ রেখে। রাগরূপকে নিয়ে গান ও গৎ রচনায় রাগের স্বভাব-

ধর্মকে সঙ্গতরূপে বজায় রাখার উপর শিল্পীর অনেকখানি কৃতিত্বের পরিচয় থাকে বলে মনে করি।

বিশাল স্বরক্ষেত্রের উপর বড় বড় রাগের যেখানে যার বাসগৃহ আছে উচ্চে বা সমতলক্ষেত্রে সেখানে প্রত্যেকটির বিস্তৃত স্থান কম নয়। প্রয়োজন মত সেখানে তার অংশ নিয়ে গান বা গৎসৃষ্টির উপায়ের অভাব নেই। অবশ্য সেখানেও রচনার নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মসঙ্গত স্থান আছে—ইচ্ছে করলেই কতকগুলো সংখ্যা বাড়ান চলে না এবং সাধনার ক্ষেত্রে কতকগুলো তালিকা বৃদ্ধির দরকারও হয় না। মনভরার কথা আসতে পারে। এর উত্তরে,—মনভরার জিনিস রাগের মালমসলা নিয়ে কতকগুলো ক্ষীণ বা ক্ষুদ্ররূপ গড়ে খেলা করা বা তার নাচ দেখানই নয়। মনকে সেখানেই ভরাতে হবে, যেখানে রাগরূপের মূর্ত্তিতে থাকবে পাথরে খোদাই করা অজান্তার শিল্পমূর্ত্তির অপূর্ব কলা-নিদর্শনের মুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের মত রূপ এবং থাকবে রাগরূপের স্বভাবগত পরিচয়। গান রচনায় মন-ভরা সম্বন্ধে এ-ও বলা যায়,—মারুবেহাগ আজকাল বহু গায়ক-বাদকেরই প্রিয় হয়েছে কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেকের কাছে সেই প্রায় একই প্রকারের বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের বন্দেজ রচনা। এরকম বহু রাগের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁরা যদি ওই রকম রাগকে নিয়ে রকম রকম জায়গায় গান রচনা করার উপায় না পেয়ে অত্যধিক ভালবেসে প্রায় একই বন্দেজের গানের মধ্যে দিয়েই গাওয়ার বা বাজনার কাজ করে যেতে পারেন তাহলে বড় বড় রাগের রূপস্বভাবের উপর বিঘ্ন আনয়ন করতে যাবেন কেন? যে কোন বোধজ্ঞ গায়ক আমার এই বিচার যুক্তির পরীক্ষা নিয়ে ললিতরাগের অন্ততঃ একটা দ্রুত খেয়ালকে তার স্বভাবগত পূর্বাঙ্গপ্রধানসুরে গেয়ে তারপর যদি ওই রাগের চড়ার দিকের যে গানটির ক্ষা-দা-র্স-।-। র্সা-র্সা-র্সা-। নর্সার্ঋা র্সা-না-দা-।—এই সুরে "মাই ঘুঙ্গরওয়া—খেলনওয়া…" এই কথার আরম্ভ দিয়ে গান রচিত আছে, তাকে জানা থাকলে যদি গেয়ে দেখেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই মনে করি তাঁর মনে হবে এতক্ষণ পূর্বাঙ্গে রচিত গানের যে সুরের উপর তার যথার্থ আবেগকাতরময় রূপকে দর্শন করছিলাম সে যেন অন্তর্হিত হয়ে ভোজপুরীরূপে লাঠি ধারণ করে উপস্থিত হ'ল। অবশ্য শিল্পীর যদি এই রকমই পছন্দ হয় তাহলে আলাদা কথা।

কোন চিত্রশিল্পী যদি বলেন,—বটগাছের তলাশ্রয়ী সাধুকে আমি গাছের উপরে তুলে আঁকব,—আমার চোখে সেই দৃশ্যরূপের ভাবই তৃপ্তিদায়ক হবে" তাহলে বলবার কিছু নেই। নিয়ম-নীতি-যুক্তি আর ইচ্ছা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অবশ্য ইচ্ছা যখন আগের সত্যগুলিকে মেনে নেয় তখন আর পৃথক থাকে না ॥

গান ও গৎএর সঙ্গে চর্ম্মবাদ্যের সঙ্গত

গান ও গৎএর সংগে পাখোওয়াজ বা তব্‌লা বাদনকে সঙ্গত করা বলা হয়। সঙ্গতের অর্থ প্রকৃত। এর তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা, গায়ক বা যন্ত্রী কোন তালের উপর যখন গান বা গৎ পরিবেশন করেন তখন

সেই তালটিকে উক্ত বাদকেরা এমনভাবে রক্ষা করে ছন্দের প্রকাশ রাখবেন যেন সুরশিল্পী পরিপূর্ণ ধ্যান চিন্তা নিয়ে সুরের নানান বিস্তার ও ছন্দের সৃষ্টি করে যেতে পারেন এবং শ্রোতারা উপস্থিত থাকলে তাঁরা যেন সুর ও ছন্দের সৃষ্টি আকর্ষণে একাগ্র হয়ে রাগরূপের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারেন, তাল বাদ্যকারের দ্বারা কোন বিঘ্ন না আসে। উক্ত দুই বিভাগের তাল বাদ্যকারেরা যদি ওইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি রক্ষা করে যেতে পারেন তাহলে তিনি যথার্থ সঙ্গতকার রূপে পরিচিত হবেন অর্থাৎ তাঁর বাদ্যে সত্যই সঙ্গতের অর্থ থাকবে। কিন্তু বিশেষ করে এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়—অনেক সঙ্গতকার সঙ্গতের অর্থ বিস্মৃত হয়ে সঙ্গত করেন বলে তাঁদের বাদ্য অসঙ্গত হয়ে পড়ে। বাদক কখনই মনে করতে পারেন না–গায়ক ও যন্ত্রীর প্রতিই শ্রোতারা আকৃষ্ট না হয়ে তাঁর তৈরী কৃতিত্ব দেখানর উপরই মুহুর্মুহু আকৃষ্ট হতে থাকুক, তাহ'লে সঙ্গীতের প্রাণময় রূপের কোন সন্ধানই সেখানে থাকবে না, বারওয়ারীরক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। তব্‌লা বাদকের সাধনার কৃতিত্ব দেখানর অভিলাষ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকাই যুক্তিসঙ্গত। সঙ্গীত যেথানে হবে সেখানের পরিবেশ হবে নারায়ণের মন্দির অভ্যন্তরের মত। সুরশিল্পী সুরের পূজায় বসবেন নানান সৃষ্টি শক্তির উপকরণ নিয়ে, সঙ্গতকার প্রয়োজনের সময় অনুষ্ঠানের রূপ ও ভাবময়ের ক্রিয়ায় তার ছন্দের উপর শুধু তালের গঠনরূপ প্রকাশ করে যাবেন, আর শ্রোতারা ভক্তরূপে উপস্থিত থেকে পূজার ক্রিয়াসিদ্ধি দর্শন করবেন এবং ভক্তিভাব রক্ষায় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন এবং তার সংগে সর্ব্বদা অনুভব করবেন শিল্পপূজারী কেমনভাবে সুরের মূর্ত্তির উপর পূজার্ঘ প্রদান করে তাঁদের তৃপ্তিময় আনন্দের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের একটা চলিত কথায় আছে—'কালি, কলম, মন, লিখে তিনজন।" তেমনি শিল্পী, বাদক ও শ্রোতা এই তিন প্রকার মানুষের সমগুণ ও সমভাবের প্রতিক্রিয়ার উপর আসরের গান-বাজনার প্রকৃতরূপ নির্ভর করে। যখন দেখি শিল্পী ও বাদক সভাক্ষেত্রে সুর ও ছন্দকে নিয়ে যুদ্ধে নামিয়েছেন এবং সেই যুদ্ধ দর্শন করে শ্রোতারা উল্লসিত হচ্ছেন তখন মনে গভীর দুঃখ পেয়ে ভাবি সঙ্গীত কি বক্সিং মঞ্চ হয়ে দাড়াল!

বাল্যকাল থেকে ঠাকুরদা' আমাকে নিয়ে ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানে ঘুরিয়েছেন—আদর্শ সঙ্গীতজ্ঞদের গীত-বাদ্য শ্রবণ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে বুঝে। এ জন্য আমার ভাগ্যে বহু ঘরাণা সাধকগুণীর দর্শনলাভ এবং তাঁদের সংগীতাদি শ্রবণের সৌভাগ্য হয়েছিল,--তাঁরাও উৎসাহদানকল্পে আমার সাধনার পরিচয় নিতেন ও আশীর্ব্বাদ করতেন। সে সময় প্রত্যেক স্থানেই দেখেছি তালবাদ্যকারকে শিল্পীর গান বা গৎ পরিবেশনের সংগে শুধুমাত্র তালের ঠেকা রেখে যেতে।. এই সঙ্গত নিয়মে বাদকেরা তালের সূত্রটিকেই সুরের ছন্দমালায় রক্ষা করে যেতেন বলে গান বা গৎ যথার্থ উপভোগ্য হত।

আমার সেই ভ্রমণ সময় বিভিন্নস্থানের কোন কোন আসরে খেয়াল ইত্যাদি গানে ও সেতারে গৎ বাদনের সময় ঠাকুরদা' শুধু বাঁওয়াটি নিয়ে সঙ্গত করতেন। আমার খুব ভাল লাগত। বাঁওয়ার মৃদু-মন্দ্রধ্বনি সংগীতের মধ্যে মিশে যেত,—সুরবাঁধার হাঙ্গামা বা সময় অপব্যয় থাকত না এবং সংগীতের

সময় তব্‌লার মাথায় হাতুড়ির ঘা' পড়ে মনের মেজাজকে রুক্ষ করে দিত না। সুরের অঙ্কনধ্যানে যখন মগ্ন হয়ে থাকা যায় তখন সে সময় সুরবাঁধার নীতিহীণ তব্‌লার চড়ার সুরের উপর হাতুড়ির আঘাত পড়তে থাকলে মনের অবস্থা যে কিরূপ হয় তা ভুক্তভোগী সুর-রসিক ছাড়া কেউই উপলব্ধি করতে পারবেন না। তখন মনে হবে যেন সঙ্গতের সংগে সংগীত পরিবেশন করার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

এক প্রোগ্রামে রেডিওতে আমার খেয়ালগান চলছে,—চড়ায়বাঁধা তব্‌লার সুর গেল নেমে,—হাতুড়ির ঘা' পড়তে লাগল, তব্‌লা বশ্যতা স্বীকার করল না,—বিগড়ে গেল তার ছাউনীর ভারসাম্য,—বাদক দৌড়ে গিয়ে দু'টো তব্‌লা নিয়ে এলেন,—সে দুটোর অবস্থাও তথৈবচঃ ;—কি করবেন—খ্যাতনামা তব্‌লাবাদক সেই নেমে যাওয়া তব্‌লার উপর গাবের মাঝে চাপ দিয়ে তার সুর বন্ধ করে দিয়ে চালিয়ে গেলেন। তখনও সময় ছিল পাঁচ মিনিট, সবেমাত্র দ্রুতখেয়াল ধরেছিলাম। এই রকম অবস্থায় গানের অবস্থা কি রকম হয় তা সহজেই অনুমেয়। গানের বা গৎএর মাঝে হাতুড়ির আঘাত পড়ল না—শিল্পীদের এ রকম সৌভাগ্য বোধ হয় খুব কমই হয়।

আগে এ রকম বিপর্যয়কাণ্ড ঘট্‌ত না। তার কারণ—তব্‌লার সুর বাঁধা থাকত যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও সঙ্গত নিয়মে মুদারার ষড়জস্বরে। এখন তারা সপ্তকের ষড়জে বেঁধে খোলবাদ্যের সুরের মত তীক্ষ্ণচড়া আওয়াজ বের করবার জন্য এবং তাতে অতি সহজে অঙ্গুলি চালানর সুবিধা হয় বলে আমাদের পক্ষে এই মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটতে থাকে। এর চেয়ে বরং খোলের সংগে সঙ্গত করাও ভাল। কারণ তাতে সুর চড়ে বা নেমে যাওয়ার বিপর্য্যয় থাকবে না। যাইহোক্‌ আমার মতে ধ্রুপদ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর গান ও গৎএর জন্য সঙ্গতের প্রয়োজনে বাঁওয়াই উপযুক্ত, কারণ বিঘ্ননাশক। আসরে সঙ্গতকারেরা নিজেদের অগ্রস্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যাওয়ার মধ্যে এমন দু' একটি অদ্ভুত কাণ্ড করেন যে তখন বেশী করে মনে আসে শিল্পীরা ও শ্রোতারা কাণের সহ্যে খুব উদার ও সহশীল। উদাহরণ—তেতাল তালে দ্রুতখেয়াল বা গৎ ধরামাত্র আজকাল বেশীরভাগ তবলা বাদকেরা ত্রিমাত্রিক ছন্দের নাচের বোল্‌ জুড়ে দেন। শিল্পী যেভাবে গতি ছন্দের উপর রাগরূপ প্রকাশ করছেন তাকে ত্যাগ করে আর একটা নূতন তাল কি করে যুক্ত হতে পারে? সুরশিল্পী যেমনভাবে তালের গতি-লয় ও ছন্দ নিয়ে চলবেন ঠিক সেইভাবেই বাদককে অনুসরণ করতে হবে। এই নিয়ম বরাবরের জন্যই থাকবে। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়, সুরের মধ্যে দিয়ে গমকের রূপ ও রস আসে বহুকাল সাধনার পর। শিল্পী সেইবস্তু প্রকাশ করার সংগে সংগে অনেক বাদক বাঁওয়ার চামড়াটায় গুঁতো মেরে একটা শব্দ উৎপন্ন করে শিল্পী ও শ্রোতাদের জানিয়ে দেন বহুকাল ধরে কণ্ঠের এবং যন্ত্রের সুরযুক্তগমক সাধনার জবাব, যা অতি সহজসাধ্য। সে সময় ওই দ্রুত ঘাগ্‌-ঘাগ্‌-ঘাগ্‌-ঘাগ্‌ শব্দ এমন রসভ্রষ্ট করে যে বলার কথা নেই। সংগতের এই রকম সব ব্যাপারে মনে হয় প্রকৃত ভাবুক শিল্পীদের বিনা সঙ্গতে সঙ্গীত পরিবেশনের ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হতে বোধ হয় বেশী বিলম্ব হবে না,—যদি সঙ্গতকারদের কিছু বলবার না সামর্থ্য থাকে।

এক আসরে এক বাদক এমনভাবে বিলম্বিত একতালের ঠেকা কারুচুপি করে বাজাতে সুরু করলেন যে গায়ককে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম—বাদকের উদ্দেশ্য ছিল গায়ককে বেতালা সাবস্ত করে অপদস্থ করা এবং নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আগের দিনে কোন সুরশিল্পী এ রকম সহ্য করতেন না। এরূপ বশ্যতার অধিকার দেওয়া সংগীতের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি। শিল্পী তান-বৈচিত্র্য দিয়ে সুন্দরভাবে সমে ফেললেন, বাদক সমের ধ্বনি না দেখিয়ে সেই মুহূর্তে দীর্ঘ বোল জুড়ে দিলেন,—শিল্পী এই অসঙ্গত নিয়মকে ভদ্রতার খাতিরে মেনে নিয়ে গানের মহড়াকে ধরে বাদকের বোলচক্রে ঘুরতে লাগলেন। সে সময় প্রকৃত শ্রোতার মন ও রাগরূপের প্রভাব ও আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে। এইসব নীতিবহির্ভূত কাণ্ড নির্বিবাদে হজম করার জন্য সঙ্গীতের উপভোগ্য বস্তুর অপহ্নব ঘটছে।

শিক্ষা ও সাধনার বস্তুতে—

যেভাবে শিক্ষা ও সাধনা করলে সংগীতের আধ্যাত্ম বস্তু ও শিল্প-মাহাত্ম্য লাভ হয় সে সম্বন্ধের কথা,–

(প্রথম)—শিক্ষার উপাদানরূপে প্রধান হয়ে থাকবে, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, নিরলসসাধনা, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকর, সংযম, অন্তরে প্রেম-ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস, গভীর আকুলতা রেখে গুরু নির্ণয় অর্থাৎ সদ্‌গুরু লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা, একলব্যের মত গুরুভক্তি, সমালোচনারহিত মন, উৎসাহের শক্তি, নানান গুণী শিল্পীদের সান্নিধ্যলাভ, তরলতা বর্জ্জিত মন, উদার হৃদয়, বিনয় ব্যবহার, গুরুজন ও শিল্পীগুণীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, এবং বিলাসআড়ম্বরবর্জ্জিত মন। আমি মনে করি এগুলির যে কোন একটির অভাব থাকলে প্রকৃত সঙ্গীতকে লাভ করা খুবই শক্ত হবে।

(দ্বিতীয়)—শাস্ত্রীয়সংগীত শিক্ষার মূলে ধ্রুপদ গানের স্থান থাকা একান্ত আবশ্যক। খেয়াল গান কিংবা তারের যন্ত্রকেই প্রধান অবলম্বন করতে যাঁরা ইচ্ছা করবেন তাঁদের ধ্রুপদকে সর্বাগ্রে অধিগত করে তারপর সঙ্কল্প মত নির্দ্ধারণ বস্তু শিক্ষায় থাকবে। ধ্রুপদসংগীতই রাগসংগীতের শাশ্বত নীতি-ধারার বাহক এবং রাগরূপের যথাযথভাবে দর্শন, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ নির্ণয় কারক। শ্বাস-প্রশ্বাসের দমের ক্রিয়া নিয়ে প্রাণায়াম যোগসাধনায় যে আত্মিক উন্নতি হয় তার চেয়ে বেশী সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ধ্রুপদের মধ্যে দিয়ে নাদরূপের সাধনায়। এই সাধনা বহু সংযম ও দায়িত্ব নিয়ে করে যেতে হয়।

দীর্ঘকাল ধরে সাধনার পথে চলতে চলতে যেটুকু আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তাতে বলতে পারি রাগসংগীতকে যথার্থভাবে লাভ করতে হ'লে শিক্ষায় ধ্রুপদকে বর্জন করাত চলেই না, বিশেষভাবে অর্জন করবারই আবশ্যক থাকে। একে বাদ দিয়ে অন্যেতে হয়ত সংগীতশিল্পী হতে পারা যাবে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী ও সাধক হওয়া যাবে কি না তাতে সংশয় থেকে যাবে।

খেয়াল-ধ্রুপদ কিংবা যন্ত্র-ধ্রুপদ এই পাশাপাশি দু'টিকে শিক্ষায় এবং সাধনায় রেখে না গেলে এ কথার সত্যতা হয়ত এখনকার দিনে নির্ণীত হবে না। ধ্রুপদগান উপেক্ষিত হয়ে গেছে বলেই একথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

তৃপ্তির দিক দিয়েও বলতে পারা যায় যাঁরা রসসৃষ্টি করে ভাল খেয়ালগান করতে পারেন তাঁরা যদি আগ্রহ নিয়ে ধ্রুপদগান করেন তাহলে দেখতে পাবেন খেয়ালের চেয়ে তাঁদের গাওয়া ধ্রুপদগানের রূপমহিমা ও তার পরিবেশ এবং ভাবময়আকর্ষণ কত বেশী উচ্চে ও তৃপ্তিদায়ক। অবশ্য খেয়ালগানকে ত্যাগ করতে আমি কোন মতেই বলছি না, উদ্দেশ্য তাঁরাও এই আধ্যাত্মিক তৃপ্তিময়বস্তুকেও বাঁচিয়ে রাখুন এবং এরও মহিমা বিস্তৃত হোক।

(তৃতীয়)—রাগরূপের মধ্যে স্বরসমূহের দ্বারা তার গঠনরীতির নীতিনিয়ম কিভাবে সাজান থাকে তার বিচারের উপর প্রকৃত সিদ্ধান্তে আসতে হলে প্রাচীন ঘরাণার ধ্রুপদগানের বিস্তৃতরূপের প্রতি দৃষ্টি দিবার আবশ্যক থাকবে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে—ধ্রুপদগান রচিত হয়েছিল রাগরূপের শাশ্বত নীতিধারাকে অনুসরণ করে। এর রূপাঙ্কনের উপর বহুল পরিমাণে যে সমস্ত স্বরসংখ্যার প্রয়োগ আছে এবং কমবেশী নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তার নির্দ্ধারিত রূপ, সেই সমস্ত স্বরবস্তুর মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃতরূপের পরিচয়ে এবং নিয়মনীতির জ্ঞান লাভে সহায়ক হয়ে আছে। সুতরাং শিক্ষার্থীর নিজের বিচারবোধ রাখার জন্যও ধ্রুপদগান শিক্ষা ও তার চর্চা রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

প্রকৃত নীতিধারার ধ্রুপদগান পাওয়া সম্বন্ধে এখন যেরূপ অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তার অভিজ্ঞতা নিয়ে দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া আমাকে বলতে হচ্ছে 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে যে সমস্ত প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি সহকারে সংরক্ষিত হয়ে আছে তার মধ্যে দিয়েই পাওয়া যাবে ওই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। প্রায় সমস্ত ধ্রুপদই বিষ্ণুপুরঘরাণায় এসেছিল ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন ঘরাণা থেকে রাগরূপের একই নীতিধারা নিয়ে; এজন্য এখানকার ধ্রুপদগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যে বিরাট সাক্ষ্য স্বরূপ হয়ে আছে।

শাস্ত্রীয় সংগীত সাধনার ও শিক্ষার নীতি-ধারার নিয়ম —

খুব ভোরে উঠে সংগীত সাধনা করলে শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। এই সময়ে শরীর, মন স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে, এজন্য কণ্ঠের স্বর ভরাট ও রসাল হয়। তাছাড়া সাধনায় শীঘ্র আয়াস আসে না। নির্জন ও মুক্তবায়ুর মধ্যে সাধনা করতে পারলে খুব ভাল হয়।

বাল্যকালে শিক্ষার ঠিক নিয়ম পথে যে দিন হতে চলতে সুরু করেছিলাম সেদিন হ'তে বহু বৎসর ধরে বহুক্ষণ শুধু স্বর সাধনা করবার পর সূর্য্যের উদয়রূপ দর্শন হত। এই আদর্শ নিয়ম পালনের মধ্যে প্রত্যহ উপলব্ধি হয় অগ্রগমণ কতটুকু হ'ল। দিনের জনকোলাহলে ও তাপময়আবহাওয়ার

একাগ্রতা নিয়ে সাধনায় নানান্ বিঘ্ন আসে। মোটের উপর সাধনার সময় নির্বিঘ্ন পরিবেশ থাকা অত্যাবশ্যক।

সাধনা করবার সময় গরুড়াসন হয়ে কোলের কাছে তানপুরা দাঁড়করিয়ে তার সুর কর্ণের নিকটবর্ত্তী করে বাম হাতে মাত্রা-বা তাল রেখে গাইতে হয়। পরে পদ্মাসন হ'য়ে কোলের কাছে তানপুরা শুইয়ে তারে অঙ্গুলি চালনা করে গাওয়া যেতে পারে সুবিধা বুঝে। গাইবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাস্থ্য রক্ষায় মেরুদণ্ড ও গ্রীবা সোজা রাখা কর্ত্তব্য। শারীরিক পরিশ্রম, চিৎকার, জোরে জোরে কথাবার্ত্তা, খেলা-ধূলো, দ্রুতগমন, গুরু ভোজনের পরই এবং দুর্বল-শরীরে গান করা, এইগুলি কণ্ঠের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। একটু সামর্থ্য লাভের পর প্রত্যহ অন্ততঃ চারবারে চারঘণ্টা সাধনা করতে পারলে দ্রুত উন্নতি হবে। প্রথম থেকেই তানপুরার সাহায্যে সাধনা করাই কর্ত্তব্য। এ স্থলে একটা কথা—সুর ও ছন্দে স্বভাবগত বোধ না থাকলে সঙ্গীত শিক্ষা দুরূহ হয়ে পড়ে। তবে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে এবং সদ্‌গুরু লাভ হলে সময় সাপেক্ষে অনেকখানি পুরণ হয়ে যায়। কারো হবে না একথা বলা যায় না।

হার্মোনীয়ম নিয়ে শিক্ষায় কণ্ঠের স্বাধীন শক্তি লাভে বহু বিলম্ব হয়। সঙ্গীতের যাবতীয় শক্তি কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে আসে। সুতরাং এই বিদ্যায় কর্ণের বোধশক্তিই সবচেয়ে বড়। হার্মোনীয়মের সাহায্য নিলে ওই বোধশক্তি খুবই বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। কোন শিক্ষার্থীর জন্য যদি নিতান্তই হার্মোনীয়মের প্রয়োজন থাকে তাহলে বিশেষ যত্ন রাখতে হবে—মাত্র 'সা' সুরের পর্দা টিপে যতশীঘ্র স্বরগুলো কণ্ঠে আনাতে পারা যায় তার জন্য। অর্থাৎ ওই যন্ত্র শীঘ্র ত্যাগ করে তানপুরা ধরাতে হবে। আমাদের ভারতীয় রাগসংগীতে শ্রুতির তারতম্যে এবং আশ, মীড়, গমক ইত্যাদির উপর বিশেষ করে রাগরূপের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যমাহাত্ম্য নির্ভর করে। সুতরাং যে যন্ত্রে এই বস্তু উৎপন্ন হয় না সে যন্ত্র গ্রহণযোগ্য মোটেই নয়। একটা উদাহরণ,—জৌনপুরীরাগের কোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ দরবারীকানাড়ায় প্রয়োগ করা চলে না,—তীব্র কোমল প্রকাশ করতে হয়। শ্রুতিস্বরের এই নিয়ম বুঝতে পারবেন যাঁদের রাগরূপের উপর গভীর ধারণা আছে। হার্মোনীয়মের বাঁধা সুরে এই পার্থক্য থাকার উপায় নেই। দরবারীকানাড়ার যথাযথ কোমলের রূপ যাঁরা কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন সেই কোমল হার্মোনীয়মে আসতে পারে না—নীচে থেকে যাবে, এবং তার স্বররস রাগরূপধর্মী হবে না। সুতরাং সবদিক দিয়েই শাস্ত্রীয়সংগীতের জন্য ঐ যন্ত্র একেবারে অযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলতেন "এই বাক্স যন্ত্রটা এসে আমাদের স্বাধীনভাবে গাওয়ার ভীষণ ক্ষতি করছে এবং ওকে কোলের কাছে নিয়ে গাওয়াও শিল্পরুচির পরিচয়ে আসে না।"

আমি এমন অনেকের মধ্যে দেখেছি—চার, পাঁচ বছর ধরে হার্মোনীয়মের সঙ্গে শিক্ষা ও সাধনা করে 'সা' সুরের উপর নির্ভর করে সা, রে, গা, মা, গাইতে বেসুর হয়ে পড়ে। এর কারণ, হার্মনীয়মের সুরই তার উপরে চেপে থেকেছে, সে যেন তার বাহকমাত্র। অর্থাৎ কোন বোধই সে পায়নি—সে নিজে কি করছে। সুতরাং সবদিক দিয়েই এই যন্ত্র কণ্ঠসংগীতের উপযোগী নয়।

সঙ্গীত সাধনার সময় প্রত্যহ প্রথমতঃ 'সা' সুরে সম্ভবমত দম্ রেখে বহুবার গেয়ে যেতে হয়; তারপর অন্য স্বরগুলিও অনেকবার গাওয়ার আবশ্যক থাকে। এই নিয়মের মধ্যে দিয়ে প্রধান স্বরসমূহের রূপপ্রভাব শক্তির অপূর্ব বিকাশ উপলব্ধি হয়ে মনে আনন্দ আনে এবং তাদের শক্তির মহিমা বুঝা যায়। এই বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারার শেষ নেই।

প্রত্যেক স্বরকে যথাযথভাবে কণ্ঠে ও যন্ত্রের দ্বারা আয়ত্বে আনতে বহুকাল সময় লাগে। স্বরগুলি প্রকৃতভাবে আয়ত্তে যখন আসবে তখন তার থেকে এক মিষ্টরস উদ্ভব হবে। অবশ্য এর মধ্যে স্বভাবগত কণ্ঠ শক্তি কিছু থাকা চাই। সঙ্গীত সাধনায় বরাবরই প্রত্যহ স্বরসাধনা রেখে যেতে হয়। নিয়মিতভাবে এই সাধনা রেখে গেলে অন্ততঃ তিরিশ বৎসর পর বুঝা যাবে স্বরসমূহের রূপের মধ্যে কি বিস্ময়কর তৃপ্তির স্বাদবস্তু আছে। আর একটি কথা,— কণ্ঠে স্বর সাধনা করে করে একাগ্র হয়ে যখন বুঝা যাবে স্বরের অক্ষর বা সুর উচ্চারণ করার পর সেই স্বর বা সুর একটুও কাঁপছে না, ঠিক পুষ্টরসের স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে তখনই কণ্ঠের স্বর পরিপক্ক হয়েছে বলে মনে হবে। সা-রে-গা-মা কণ্ঠে আনা অনেকের পক্ষেই সহজ সাধ্য হয় সত্য কিন্তু সেই নির্গত স্বরই প্রকৃত স্বরের সুঠামমূর্ত্তি নয়। অনেকটা শিশুদের হাতের অ-আ-ক-খ লেখার চেহারা মত। হাতের লেখা পাকতে যতদিন সময় লাগে তার বহু বহু গুণ সময় লাগে কণ্ঠের স্বর পরিপক্ক হতে। প্রধান স্বরগুলি যথাযথভাবে পাকা-পোক্ত না হলে শ্রুতির প্রকাশ-শক্তি আসতে চায় না। শিক্ষায় ও সাধনায় এইসব অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

প্রাতঃকালে বেশী চড়ার দিকের সুর গাওয়া উচিত নয়। মুদারা ও উদারা সপ্তকের স্বরগুলিই বেশী করে প্রকাশ করতে হয়। এই নিয়মে গলার আওয়াজ রসাল এবং ভরাট ও শক্তিশালী হয়। নীচের ভিত যত মজ্‌বুত হবে তত উপরেও আসবে তার শক্তি সামর্থ্য ও রস সৌন্দর্য্য। উদারা সপ্তকের স্বরগুলিকে ক্রমশঃ নীচেরদিকে বেশী সংখ্যায় নামিয়ে নামিয়ে নীচের ষড়জে আনবার চেষ্টা রাখতে হয়।

উদারা এবং মুদারা সপ্তকেই সুরেররূপে বেশী ভাবগাম্ভীর্য্য থাকে এবং শুনতেও বেশী ভাল লাগে—তাতে রসমাধুর্য্য বেশী থাকে বলে।

লক্ষ্য রাখতে হয়, গাইবার সময় কণ্ঠের এবং ললাটের শীরা সমূহ না প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরূপ দেখা বা বুঝা গেলে তখন কণ্ঠের সামর্থ্য অনুযায়ী সুরের ওজন কিছু কমিয়ে নিতে হয়।

অনেকে মিষ্টত্বের জন্য বা কিজন্য বুঝা যায় না—গাইবার সময় আওয়াজ খোঁনা করেন। সুরের এই আওয়াজ এবং চেরা, বাজখাঁই, বেশী চাপাকণ্ঠ,— কোনটাই ভাল নয়। প্রকৃত কণ্ঠস্বর কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে সহজ ও পরিষ্কারভাবে মুখ দিয়ে বহির্গত হবে। আর একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার,— গাইবার সময় 'হা' মুখ এমন থাকবে যেন উপর পুংক্তির সামনের ত্‌' তিনটি দন্তের অল্প অংশ মাত্র

প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মুখের মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগটুকুই যেন প্রবেশ করতে পারে। এর ব্যতিক্রম হলে কণ্ঠের স্বর মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে পড়বে॥

সাধনায় মূল কথা—

আমার কাছে কেউ সাধনা সম্বন্ধে নিয়ম জানতে চাইলে আমি আগ্রহভরে সর্বাগ্রে এই কথাই বলি,—সর্বদা মনে ও প্রাণে সুরের ধ্যান করবে, আর যখন সাধনা করতে বসবে তখন একা নয়, সেই সুরস্রষ্টা-পরমপুরুষকে মনে মনে সামনে শ্রোতারূপে রেখে সাধনা করে যাবে এবং মনে গভীর অনুরাগ নিয়ে ভাববে তাঁকে শুনাচ্ছি। তাহলে দেখবে কত দ্রুত তুমি এগিয়ে যাচ্ছ। এই কথাগুলি আমি আমার প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেও জানাই।

শিক্ষার ব্যবস্থার বিষয় ও তার গ্রহণের নিয়ম—

বর্ত্তমানের অবস্থায় যথার্থ নিয়মেরভিত্তিতে বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানের সুযোগ না থাকায় দেশে প্রকৃত গুণী-শিল্পী গড়ে উঠার সম্ভাবনা খুব কম এসে গেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা নানান বস্তুতে ভারাক্রান্ত। সীমিত বর্ষের মধ্যে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা চলেছে। শিক্ষার আকর্ষণ ওই প্রাপ্ত বস্তুর উপরই যেন বিশেষ করে প্রলুব্ধ করে রেখেছে। আমার মতে শিক্ষা-মানের বর্ষসীমা দশ কিংবা অন্ততঃ আট বছর রেখে প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞশিল্পী গড়বার জন্য মহানগরীতে এবং প্রত্যেক মফঃস্বল সহরে একটি করে অন্ততঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার সম্বন্ধে বিবেচনার আবশ্যক খুবই বেশী আছে বলে মনে করি। আগেকার মত গুরুগৃহে থেকে শিক্ষার উপায় থাকলে এ কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। ওই বর্ষ সীমায় কিভাবে যথাযথ নিয়মে শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা বিধেয় তার নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে, যথা,—কমপক্ষে দু' বছর শুধু কণ্ঠে স্বর সাধনা, তারপর স্বরগুলি কণ্ঠে পাকাপোক্ত হলে প্রধান স্বর বিশিষ্ট রাগের উপর তেতাল তালে নিবদ্ধ স্বরগ্রাম কয়েকটি শিক্ষা করতে হয়। এই স্বরগ্রামের উপর রাগরূপ থাকে প্রাতঃকালের শুদ্ধ বিভাগ ও আলাইয়া প্রধান হয়ে। এই দু'টি রাগ প্রথমতঃ নির্দ্ধারণের মধ্যে যথেষ্ট নীতি যুক্তি আছে—সুর ও ছন্দজ্ঞানের সহজতম উপায় রেখে প্রধান স্বরের উপর রাগরূপ দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তি নিয়ে। আলাইয়া রাগে যাঁরা কোমল নিষাদ ব্যবহার করেন তা যেমন রাগরূপের স্বভাবধর্মানুযায়ী নয় তেমনি শিক্ষার প্রকৃত সোপান ধরে অগ্রসর হবার জন্যও নয় এবং রাগরূপের দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভেরও সহায়ক নয়। মধ্যমবর্জ্জিত হয়ে ছয়টি প্রধান স্বরের গঠনে এবং ধৈবতের বাদীত্বে বিভাসরাগের যে রূপভাব আছে তাতে মনের উপর প্রধান স্বরের প্রভাবমহিমায় আনে স্বরের রূপও রস

তাৎপর্য্যের উপলব্ধি এবং আসে প্রাতঃকালীন প্রকৃতিগত ভাবমাধুর্য্য নিয়ে প্রার্থনার বস্তু। আলাইয়া রাগের মধ্যে যেন অন্তরে আলোড়িত হয় আকুল আহ্বানের ব্যাকুলতা। পূর্বোক্ত নিয়মে স্বর সাধনায় ছাত্রদের অনেকখানি বোধ শক্তি নিয়ে স্বর সমূহের প্রভাব শক্তির উপর দখল এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় গুরুর কাছে জ্ঞাত হয়ে রাগরূপের এইভাববস্তুরক্রিয়া উপলব্ধিতে আনা সহজ হতে পারবে। শিক্ষায় ওই দুটি রাগের পর রাত্রে সাধনার জন্য ভূপালীরাগের স্বরগ্রাম দিতে হয়। ওই রাগটি প্রকৃতগত হয়ে উদ্ভুত বলে তার যে একটা প্রভাব ক্রিয়া আছে তাতে শিক্ষার প্রথম স্তরের জন্য বিশেষ উপযোগী হয়ে আছে এবং তার স্বররূপ মঙ্গল কামনা নিয়ে আসে। তাছাড়া প্রধান স্বর নিয়ে রাগ শিক্ষার নিয়মে আগের দু'টির একটি সম্পুর্ণ জাতি, অপরটি ষাড়বজাতি এবং ভূপালীটি ঔড়বজাতি বলে প্রয়োজনীয়তা এত বেশী। তারপর শিক্ষার নিয়মে থাকে পরের পর স্বরগ্রামের মধ্যে দিয়ে কড়ি মধ্যম, কোমল নিষাদ, কোমল গান্ধার ও চারটি কোমল যুক্ত রাগ। পরে এই সব রাগ ধরে তালের উপর তেলানা শেখানর ব্যবস্থা থাকে—কণ্ঠে স্বরের শক্তি লাভের জন্য দ্রুততার মধ্যে দিয়ে। পরে সহজরাগে ও সহজতালে ধ্রুপদ ও খেয়ালঅঙ্গের কতকগুলি গান শিখে নিয়ে তারপর যিনি ধ্রুপদ শিক্ষা ও সাধনাকে প্রধান অবলম্বনীয় বস্তু বলে গ্রহণ করবেন তিনি সেই পথে যাবেন এবং যিনি খেয়াল গানকেই গ্রহণ করবেন তিনি প্রত্যেকটি রাগের খেয়াল শিক্ষার আগে একটি করেও অন্ততঃ চৌতালের গান শিক্ষা করে তারপর সেই রাগের প্রয়োজন মত খেয়াল গান শিক্ষা করে যাবেন এবং এর সংগে ধারাবাহিক-রূপে শিক্ষায় ঔপপত্তিক বিষয় থাকবে। যথারীতি শিক্ষার নিয়ম ব্যবস্থা এইভাবেই রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। এই নীতি-নিয়ম ধরেই আমাদের ঘরাণায় শিক্ষার ব্যবস্থা চলে এসেছিল এবং প্রাচীন ঘরাণাতেও শিক্ষার এই নীতি ধারা ছিল বলে জ্ঞাত আছি ॥

স্বরের প্রভাবমহিমা সম্বন্ধে একটি অপূর্ব ঘটনার উল্লেখ—

বিষ্ণুপুরের সে যুগের সঙ্গীতাচার্য্য গদাধর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র—যন্ত্রসংগীতবিদ্যাবিশারদ নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন ৺মহারাজা স্যর জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সঙ্গীতাচার্য্য। ইনি আমার পিতামহের খুব নিকট সম্পর্কের মামাতো ভাই হতেন। এঁর আহিরীটোলার বাসায় মাঝে মাঝে আমি যেতাম সুরবাহার শুনতে। আলাউদ্দীন খাঁসাহেব এঁর কাছে এবং গোপালবাবুর (নুলো গোপাল) কাছে বহুদিন শিক্ষা করেছিলেন। স্বর্গত বিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রী আমার বড়কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে সুরবাহার ও এসরাজে বেশ কিছু তালিম নিয়েছিলেন। ওই দাদু একদিন স্বর সাধনায় শক্তি উদ্ভবের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "অনেক দিন আগে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক আমার কাছে প্রায়ই আসত এবং চুপ্‌টি করে বসে থেকে ছাত্রদের শেখান এবং আমার সুরবাহার বাদন শুনত। সে তখন চার-পাঁচ বছর ধরে শুধু 'সা' সুরই

সেধে চলেছে। অবাক্ তার সংযম, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা ছিল। জিজ্ঞেস করতাম আর কতকাল শুধু 'সা' সুরই সাধবে? উত্তরে বলত,—আমার সংগীত দীক্ষার সাধুগুরু বলেছিলেন—এইভাবে দম্‌রেখে শুধু 'সা' সুরই বহুকাল ধরে সাধবে,—দেখবে তাতেই কত আনন্দ পাবে এবং এতেই প্রাণায়াম যোগেরও কাজ হবে,—তাই আমি 'সা' সুরই সেধে চলেছি এবং এখন আমি এতে বেশ তৃপ্তি পাই।" জিজ্ঞেস করেছিলেম— কতবার করে প্রত্যেক দিন সাধনা কর? বলেছিল,—"যখনই সময় পাই তখনই তানপুরা নিয়ে ঘরে খিল্ দিয়ে সাধি।" তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম—বোধ হয় লোকটার মাথার গোলমাল আছে, অথচ তাকে আমার খুব ভাল লাগত। একদিন এল,—আমি বললাম—আজ সন্ধ্যার পর মহারাজার দরবারে অনেকের গান বাজনা আছে, যাবে শুনতে? উত্তরে জানাল,—"অতবড় গান-বাজনার আমি কি বুঝব? বলছেন আপনি যাব।" মানুষটা যেন সর্বদা কি এক ভাবে মজে থাকত। সেদিন দরবারে গান-বাজনা হ'ল,—প্রথমতঃ গাইলেন বিখ্যাতগুণী-ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশিরজী, পরে বিখ্যাতখেয়ালগায়ক-গুরুপ্রসাদ মিশিরজী ও গোপালবাবু গাইলেন খেয়াল, তারপর হল ভারত বিখ্যাত টপ্পাগায়ক রম্‌জান খাঁসাহেবের টপ্পা, পরে হল পিয়ারা-সাহেবের ঠুম্‌রী, গুণী সজ্জাদমহম্মদ খাঁসাহেবের সুরবাহার এবং সবশেষে ওস্তাদ ইম্‌দাদ্ খাঁএর সেতার।

আসর শেষ হতে সকলকে উদ্দেশ করে বললাম,—এই যে আমার পেছনে অনড় হয়ে যুবকটি বসে আছে, ও আজ পাঁচ বছর ধরে প্রায় সর্বদাই 'সা' সুরই সেধে চলেছে। আমার এই কথা শুনে মাত্র একটি স্বরের সাধনা নিয়ে এতবড় ধৈর্য্যের আশ্চর্য্য শক্তি দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকে 'সা' সুর শুনাতে বললেন। তাঁরাও মনে হয় তখন তাকে পাগলই মনে করলেন,—তবুও মজাদেখবার জন্যই হোক আর যাইহোক সকলের একটা কৌতুহল হল শুনবার জন্য। যুবক ভীষণ লজ্জা পেয়ে হাত জোড়করে বল্‌ল—"এখনও আমার ঠিক হয়নি।" মহারাজ বললেন,—"তা হোক্ যা হয়েছে তাই আমাদের একটু শুনাও,— আমার মন বলছে নিশ্চয়ই তুমি পেয়েছ ওর মধ্যেই এক পরম বস্তুর স্বাদ, তোমার মুখ দিকে তাকিয়েও তাই মনে হচ্ছে।" যুবক চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে তারপর তানপুরার তারগুলোয় অঙ্গুলি চালনা করে 'সা' সুরের উপর ওঙ্কারধ্বনি তুলল। ধারণাতীত দম্ রেখে যখন ছেড়ে দিলে তখন মনে হল যেন হলঘরের মধ্যে ষড়জস্বরের স্তম্ভ দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ কথা বলতে পারলেন না—সকলের চোখ তখন অশ্রুসিক্ত। আমি আচ্ছন্নের মত যুবকটিকে ভক্তিসহকারে উঠিয়ে নিয়ে এলাম; অন্যান্য সকলে বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মত বসেই রইলেন। তারপর থেকে ছেলেটিকে আর দেখিনি। মাঝে মাঝে মন খুব আকুল করে এবং চোখ দিয়ে দু' এক ফোঁটা জলও এসে যায়। ছেলেটি বোধ হয় লোকালয় ত্যাগ করে কোথাও চলে গেছে।" এই কাহিনী শুনে আমি খুব বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তখন পর্য্যন্ত এ রকম ধারণাই ছিল না—স্বরের প্রভাব শক্তির এতবড় আশ্চর্য্য মহিমা আছে বলে এবং শিক্ষা ও সাধনার মধ্যে দিয়ে তার সম্ভাবনার কথা শুনা বা জানাও যায় নি। তবে অতি শৈশবকাল হতে স্বরসাধনা করতে করতে পরে নানানভাবে স্বরগুলিকে কণ্ঠে স্থাপনা করে

যখন উৎপন্ন করি তখন তৃপ্তি ও ভাবের মধ্যে দিয়ে তার ভেতর যে বস্তু পাই তাতে রসের মাদকতা এনে সেগুলির উপর আগ্রহের ঘোর বেড়েই চলে। ধ্যান ও ভাবের বৈচিত্র্য নিয়ে তারা যখন কণ্ঠে আবির্ভূত হয় তখন তার দর্শনের উপর তৃপ্তিতে মন ভরে যায়। মনে হয় এ-ও এক রাগরূপের মত সুন্দর এবং প্রাণবন্ত রূপ। রাগরূপ সাধনাতেও মনে হয় প্রত্যেকটি বড় রাগের যে রকম অফুরন্ত বিস্তারের শক্তি নিয়ে লীলাবৈচিত্র্যের মহিমা আছে তাকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারা ও আয়ত্তে আনা এক জন্মের সাধনায় হবার নয়। ওই রকমের যে কোন রাগকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ বার গেয়ে এবং যন্ত্রে প্রকাশ করে এসে তাকে আবার যখন যে সময় একাগ্রচিত্তে অঙ্কন করি তখন মনে হয় অঙ্কনদক্ষতায় আরো একটু এগোতে পারলাম। দু' দশ দিন কোন কারণে সাধনা বন্ধ থাকলে আবার পিছিয়ে পড়তে হয়, এমনই সাধনার এই বিদ্যা। আমার জ্ঞান ও উপলব্ধিমত বলতে পারি বড় বড় রাগরূপের শক্তির প্রভাবমাহাত্ম্য যথাযথ উপলব্ধি করতে হলে সংখ্যার দিক দিয়ে পাঁচ-ছ'টি রাগকে নিয়েই তাদের রূপ কণ্ঠে বা যন্ত্রের সিংহাসনে স্থাপন করে সুরের পুষ্পে আজীবন পূজা করে যেতে পারলেই ভাল হত।

আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে তেত্রিশকোটি দেবতা কিন্তু অত দেবতার কেউ পূজা করতে পারেন না এবং অত মূর্ত্তিররূপ ভাবাও অসম্ভব। তাই প্রধান পাঁচটিকে যে কোন পূজা না শুভানুষ্ঠানে অপরিহার্য্যরূপে ধরা আছে—পূজার্ঘ প্রদানের জন্য। সেই পাঁচটি হলেন—মানুষের সিদ্ধিদান কল্পে সিদ্ধিদাতা গণেশ, অন্তর-মন আলোকিত করে রাখবার জন্য সূর্য্যদেবতা, হৃদয়কে সর্বজীবে ব্যাপ্ত করে রাখবার জন্য বিষ্ণুর প্রভাব কামনা, মঙ্গলের জন্য শিব এবং শক্তি লাভের জন্য দুর্গা। রাগ সংগীতের চর্চাতেও ওমনিভাবে বেছে নিয়ে যদি আজীবন সাধনা করে যাওয়া যেত তাহলেও অনেক কিছু দর্শন লাভ হত। কতকগুলো রাগরূপকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেলে কোনটাকেই ভাল করে বুঝবার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু চলিত রাগগুলির প্রভাব মায়া অন্তরে এমনই এসে যায় যে সবগুলিকে যথাযথ লালন-পালন করবার সামর্থ্য না থাকলেও তাদের ত্যাগ করা যায় না। তবে একথা খুবই সত্যবলে মনে হয়,—এক একটা বিষয়ের চিকিৎসকদের মত কিংবা এক একটা বিষয় নিয়ে বিদ্বান ও পণ্ডিতদের মত ওতে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না। আমি এটুকু বলতে পারি,—যদি কেউ ইমন, কানড়া, ভৈরব, তোড়ী—এই রকম বড় বড় রাগের মধ্যে যে কোন একটিকে মনোনীত করে সাধনার ক্ষেত্রে প্রধান স্থান দেন, আর যদি অন্যেরা সময়কে সমভাবে বণ্টন করে বহুরাগের উপর সাধনা করে যান তাহলে আমার বিশ্বাস প্রথম ব্যক্তির নির্বাচিত রাগরূপের উপর দক্ষতার মত তাঁরা কখনই দক্ষতা ও প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন না। অবশ্য এই পরীক্ষার উপর প্রত্যেকেরই অঙ্কন প্রতিভা সমশক্তি সম্পন্ন থাকবার আবশ্যক নিশ্চয়ই আছে॥

কণ্ঠ স্বরের বিকাশ শক্তি—

বাল্যকাল থেকে প্রকৃত সংযম ও নিয়মে থেকে সঙ্গত নীতিতে যদি স্বর সাধনা করে যেতে পারা যায়

তাহলে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, ক্রমশঃ অতি উদারা ও অতিতারার অনেকখানি পর্য্যন্ত কণ্ঠে স্বর উৎপন্ন হওয়া আশ্চর্য্যের কিছু থাকবে না। অর্থাৎ নীচে-উপরে মিলে চারসপ্তকেরও বেশী আসতে পারে।

এক সময় সাধনার মাধ্যমে এক প্রেরণার আকর্ষণে কেমন এক প্রক্রিয়া এসে গিয়ে 'তারা'র 'সা'এ ছুটো স্বর এক সংগে সা-পা, রূপে এসে গেছল। এই প্রক্রিয়া কৌশলকে আয়ত্তে রেখে সেদিন বাড়ীর গৃহ পরিজনদের এবং এক অধ্যাপক শিষ্যকে ও ছাত্রদের শুনিয়ে ছিলাম। তারপর ছেড়ে দেওয়াতে আর আনতে পারা শক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ সেই প্রক্রিয়ার মোচড়টি কি কৌশলের উপর ধরা দিয়েছিল তা অনুধাবণ করা ছুরূহের মত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এই বস্তু উৎপন্ন করা খুব কষ্ট সাধ্যও বটে। আর একটা প্রণালী যথা,—শ্বাস নেবার সময়ও কণ্ঠে রাগালাপ ইত্যাদি করা যায়। তখন সুরের আওয়াজ সরু গোলাকার মত শুনালেও এ বিশ্বাস রাখি—সাধনার মাধ্যমে সুরের আওয়াজ জোরাল হবার সম্ভাবনা আছেই। সুরের এই সাধনা শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে প্রাণায়াম যোগসাধনার চেয়েও বেশী সুফল পাওয়া যায়—এ কথা সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ কাশীর এক যোগীগুরু বলেছিলেন।

শিক্ষাদানে ঐকান্তিকতা —

বাল্যকালে আমাদের বাড়ীর টোলগৃহে ছাত্রদের উপর সংস্কৃত এবং সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও তার ধর্মনীতি দেখে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম, শিক্ষা দেওয়ার ভার নিলে তার দায়িত্ব পালনের স্থান থাকে নিজের সব কিছুর সর্বোচ্চ স্থানে। আমার পিতাঠাকুর বলতেন—"কারো সময় নষ্ট করে দেবার অধিকার কারোরই নেই,—তাতে মহা অধর্মতো আছেই তাছাড়া যে বিদ্যা নিয়ে চর্চা করা হয় সে বিদ্যাও যথার্থ উপলব্ধিতে আসে না। শুধু তাই নয়, বংশ থেকেও বিদ্যা লোপ পেয়ে যায়,—সুতরাং গুরুর যে দায়িত্ব আছে তা পালনে সর্বদা যত্ন রাখতে হবে।"

শিক্ষা দেওয়ার মধ্যেদিয়ে বিদ্যার উপর যে দখল শক্তি বাড়তে থাকে তাতে আমি মনে করি ছাত্ররাও গুরুর মত কাজ করে। কারণ তাদের মাধ্যমেই বিশেষ করে অভিজ্ঞতা আসে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় সম্বন্ধে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে যদি আমার সাধনালব্ধ বস্তু রেখে যেতে পারি তাহলে সাধনা সার্থক হবে এবং আমি চলে গেলেও মনে হবে তাদের মধ্যে দিয়ে থেকে গেলাম; —সেইটাই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য ও তৃপ্তি॥

সর্বদা স্মরণ -

সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, সঙ্গীত শিক্ষা ও সাধনার মধ্যে দিয়ে যেন আত্মোন্নতি লাভ হয় এবং ভগবৎ প্রেমিক হওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক ভাবধারায় শাস্ত্রীয়সংগীতের যত উচ্চস্তরে উঠা যাবে ততই মনে আকুলতা আসবে আরো উঠবার জন্য। এই উঠার শেষ নেই এবং তৃপ্তিরও শেষ নেই।

স্বনামধন্য যদুভট্ট যখন সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠ, চতুর্দিকে নামের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়েছে এবং 'তানরাজ' ও 'রঙ্গনাথ' উপাধি পেয়েছেন—গুণীজনমণ্ডিত দুই বড় রাজদরবার থেকে, তখন সাধনার শক্তিতে সুনামের উচ্চস্তরে পৌঁছেও জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করে নিম্নের গানটি রচনা করেছিলেন। যথা,—"নাদ পরম বিদ্যা দেহি ভবানী, নিশদিন মাঙ্গ তুঁসে রাগ-তাল-বাণী। সুত'রঙ্গনাথ' তুঁহ চরণযুগল-ধ্যানী, গাওয়ে বজাওয়ে জয় জয় শিবরাণী। আগম, নিগম গণেশ-নারদ-শূলপাণি, বিরিঞ্চিআদি মুনিগণ পূজ জোড়পাণি। ইথে নহি অন্ত কই না-পাওয়ে জননী, অপনাই যশকৃপাকীজে মূঢ় কর জ্ঞানী॥"

রচনার মূল ভাবার্থ,—নাদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা লাভের জন্য মাতাভবানীর কাছে তিনি যাজ্ঞা করছেন। এই মনোভাব আমাদের রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শুনা যায়, একদিন নদিয়ায় নিমাইকে তাঁর গুরুদেব বলেছিলেন,—"নিমাই! তুমি আজকাল আর তেমনভাবে টোলের ছাত্রদের পাঠ দান করনা—কেবল কি এক ভাবেরঘোরে সর্বদা থাক, ছাত্ররা এই কথা বল্‌ছিল।" উত্তরে নিমাই বলেছিলেন, গুরুদেব! আমি কি করে ছাত্রদের পাঠ দেবো, পুঁথি খুলে পাতার প্রত্যেকটি কাল অক্ষরকে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না…।" আমরাও যদি এই রকম প্রত্যেকটি স্বরের এবং সুরের ও রাগরূপের ও তান বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁকে দেখাকেই কাম্য মনে করতে পারি তাহলে সংগীতকে সাধনায় লওয়ার সার্থকতা আসবে এবং পরম চৈতন্য লাভ হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা,—এমন সংগীত শুনবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে যাতে নিজের সত্যই উপকার হয়, অর্থাৎ রাগসংগীতের লীলাবৈচিত্র্য ও তার ভাবমাহাত্ম্যের প্রভাব অন্তরে প্রবেশ করে উন্নতির পথে নিয়ে যায় এবং মনকে বিচারযোগ্য করে যেন গড়ে তুলতে পারে। অর্থাৎ বুঝে নিতে যেন পারা যায় কোন্ সংগীতের মধ্যে সত্যই শিক্ষা, সাধনা, বিরাটত্ব ও মহিমা নিহিত আছে। বিচারের এই ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে সংগীত সম্বন্ধে ভাল-মন্দের কোন জ্ঞানই আসবে না,—অন্ধের মত হয়ে থাকতে হবে। এর উপর অভিজ্ঞতার আর একটা কথা,—প্রকৃত সংগীতের উপর অনুরাগ না থাকলে অন্য বিদ্যাতে যথেষ্ট অধিকার থাকলেও অন্তরস্থমধ্যস্থলের বিশেষ স্থানে এক অতি মূল্যবান উজ্জ্বল বস্তুর একান্ত অভাব থেকে যায়। মনে হয় যেন সবই আছে কিন্তু আসলটিই নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় আছে,—"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তাঁরে চিনি—তখন তাঁরে জানি……॥"

সঙ্গীতে ও গীতে বাহা এবং আহা—

সংগীতে ও গীতে 'বাহা'র বস্তু হল তার শিল্প ঐশ্বর্য্যরূপ এবং তাতে আহা আসে যখন সেই

শিল্পের মূর্ত্তির মধ্যে শিল্প দেবতার অনুভব স্পর্শ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সংগীত ও গীতের যে প্রাণ বস্তু সেই বস্তুর বিকাশ হলে তবে আহা আসে।

'বাহা'কে আনতে হাল চাই শিক্ষা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং তপস্যার মত সাধনা। 'আহা'কে আনার জন্য এ সকলের বিশেষ দরকার হয় না,—কেবল থাকতে হয় ভাব, ভালবাসা, প্রেম, অনুরাগ এই গুণগুলি। অবশ্য এই গুণ বস্তুগুলি না থাকলে শিল্পের মধ্যেও ভাবমূর্ত্তির অভাব থাকে, অর্থাৎ আগেই বলেছি যাকে বলে শিল্পের প্রাণ। যদি ভাষাবোধ-গানের ভাব বর্ণনা ভাল থাকে ও সহজবোধগম্য হয় এবং কণ্ঠ সুমিষ্ট হয় তাহলে যে কোন সাধারণ শ্রেণীর গানে 'আহা' এসে যায়। অর্থাৎ অতি সাধারণ মানুষের অন্তরেও তার প্রভাব স্পর্শ করে। কিন্তু প্রকৃত 'বাহা'র বস্তু উপস্থাপিত করা যেমন শক্ত তেমনি তাকে উপলব্ধি করাও শক্ত। সেখানে আহা থাকলেও তার উপর জ্ঞান ও বিচার বোধ না থাকলে তাকে ধরা যাবে না।

যাইহোক—প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূল বক্তব্য,—সংগীত ও গীতের মূল্যমান যথার্থ হয়ে থাকে যদি তাতে শিল্প সাধনার বাহা বস্তু থাকে এবং তার প্রাণবস্তুকে উপস্থাপিত করে আহা আনতে পারা যায়। সহজ কথায় সংগীত বা গীতের 'বাহা' হল দেহ ও শরীর এবং সর্বগুণান্বিতমূর্ত্তি আর আহা হল তার প্রাণ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আগেই বলেছি শাস্ত্রীয়সংগীতের গানে তার প্রাণবস্তুকে উপস্থাপিত করতে হলে বিশেষ করে নিজস্ব মাতৃভাষায় রচিত গানের মধ্যে দিয়েই তার সাফল্য বেশী করে আসবে এবং এজন্য তাকেই অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ের দু'একটি উদাহরণ,—যেমন,—আশাবরীর হিন্দী খেয়াল—"বলাও লায়ো লায়োরে···" এর সামগ্রিক কথার পরিবর্ত্তে—"মনরে ধাও ধাওরে যাও যাওরে খোঁজ নিয়ত তাঁর চরণ। (অন্তরা) বাহিরে না পাও যদি ফিরে এস অন্তরে রাখরে মুদিয়া সেখানে নয়ন।" যদি এইভাবে নিজের ভাষা দিয়ে গাই,—মালকৌশের হিন্দী খেয়াল "রঙ্গরলিয়াঁ করত সোঁতন কী সঙ্গ···।" এর পরিবর্ত্তে যদি "এস মদনমোহন বেশে নন্দদুলাল···।" এই রচনায় গাই তাহলে গানের যথাযথ অর্থ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে। আমাদের দেশে শাস্ত্রীয়সংগীত প্রচারের বিস্তৃত কামনা নিয়ে তার প্রকৃত পথে ওই ভাবে যেতে চেয়েছিলাম প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্থলে। সেখান থেকে নির্দেশ ও আদেশ এল—বাংলা ভাষায় খেয়াল ইত্যাদি গান গাওয়া চলবে না। না চলবার কারণ কি তাও তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারলাম না। সুতরাং তাঁদের এই অবাস্তব নিষেধ মানতে না পারার দরুণ ১৯৬২ সাল হতে আমাকে সেখানের সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হল।

হিন্দীভাষায় নিবদ্ধসংগীতরূপে শাস্ত্রীয়সংগীতের রাগসমূহ রক্ষিত হয়েছিল যে সময় হতে সে সময় থেকে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ তাকেই গ্রহণ করে এসেছেন সত্য কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে এবং অন্তরের প্রেরণা নিয়ে যদি কেউ নিজভাষায় ওই সমস্ত শ্রেণীগত গান গাইতে ইচ্ছে করেন—প্রত্যেকটির যথাযথ বন্দেজ রেখে ও প্রকৃত গায়কী নীতিধারায়; তাহলে তার উপর বাধা-নিষেধ কারোরই থাকতে

পারে না এবং বাধাদানের কথা কল্পনাও করা যায় না।

রাগসংগীতের সুর ও তার নীতিধারা কোন একটি নির্দিষ্ট ভাষার উপরই থাকতে পারে না। "রামচন্দ্র ভজ মন নিশিদিন···।" কিংবা "ধ্যান ধর মন···" এই কথাগুলি একটু বেঁকিয়ে খেয়ালের মত বা ভজনের মত করে গাইলে তাকে খেয়াল বা ভজন বলা হবে, আর ওই কথার অকারান্তগুলি সরলভাবে বাংলা ভাষার মত করে খেয়ালের এবং ভজনের প্রকৃত ঢংএ গাইলে—তা খেয়াল বা ভজন বলা হবে না এ যুক্তির কোনই মূল্য নেই। কেউই বলতে পারবেন না কথার বাঁকটুকুই রাগসঙ্গীতের মূলধন। রাগসঙ্গীতে প্রত্যেকের মাতৃভাষার স্থান থাকা যে অত্যাবশ্যক সে চিন্তার এখন অভাব থাকলেও একদিন এই কর্তব্যে সজাগতা আসবেই। বিষ্ণুপুরে দু'শ বছর আগেকার খাঁটি বাংলা খেয়াল ইত্যাদি গান আছে। আগেকার গায়করা সেগুলি ঠিক শ্রেণী নাম দিয়েই গেয়ে এসেছেন। যে সব শিল্পী বাংলা ভাষার মাধ্যমে শাস্ত্রীয়সংগীতের শ্রেণীগত গান বিশুদ্ধপ্রথায় পরিবেশন করেন তাঁদের সেইসব গানকে যথাযথ নিয়মে খেয়াল, ঠুম্‌রী, ভজন না বলে বলা হয় রাগপ্রধান ইত্যাদি। নামের কৌলিন্য না পাওয়ার একমাত্র অপরাধ গানের বাণী বাংলা ভাষা বলে। ভাষার প্রতি এরূপ বিরূপ মনোভাব ও নামের এই রকম সম্বোধন সুস্থ মন এবং স্বচ্ছ বিচারবোধের একেবারেই পরিচায়ক নয়॥

ধ্রুপদ—খেয়ালের ইতিহাস সম্বন্ধে—

ধ্রুপদ, খেয়ালের সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয়ে আবুলফজল্ আল্লামীর প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী'র লেখা উদ্ধৃত করে একটি গ্রন্থে সে সম্বন্ধে কিছু এবং বিস্তৃতভাবে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর দীর্ঘ এক প্রবন্ধে যা প্রকাশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে—"বকসু, তানসেন প্রভৃতি প্রতিভাবান গায়কেরা আগ্‌রা, মথুরা প্রভৃতি প্রদেশের প্রচলিত জনগণের যে সুরকে দরবারে উন্নীত করলেন সেই নূতন পদ্ধতির সুরই হল 'ধ্রুপদ'। তোমর বংশীয় মানসিংহের দরবারের অসাধারণ কলাবত বকসু ও মধুসূদন যখন এই নবরীতির সংগীতকে আহ্বান করলেন তখন পণ্ডিতদের আর ক্রোধের সীমা রইল না। কারণ ধ্রুপদ গান রাস্তার মেয়েদের। মেয়েদের কাছে এই গান গেয়ে ওই মেয়েরা জীবিকা নির্বাহ করত। ধ্রুপদ তখন তাদের পুরুষদের অযোগ্য গান ছিল।" সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়েও প্রশ্ন আসে, যে গান ওই জাতির পুরুষরা অযোগ্য বলে গ্রহণ করেনি সেই গান দরবারের অসাধারণ প্রতিভাবান কলাবত গায়কদের দীর্ঘদিনের সাধনার স্বরূপ হয়ে যে সংগীত ছিল তাকে কি অযোগ্য বলে মনে করে নিয়ে তাঁরা রাস্তার মেয়েদের গানকেই সমাদরে দরবারে স্থান দিলেন? তাঁরা যে অসাধারণ কলাবত হলেন সে কোন্ কলার চর্চা করে? দরবারে স্থান পেয়েছিলেন কি গুণে? সে বিষয়ের কেন পরিচয় অপ্রকাশ রইল? তার পর প্রবন্ধে আছে—"ওই ধ্রুপদের মধ্যে কি বিরাট ভবিষ্যত আছে তা বুঝলেন বকসু ও

ভন্নু গুণীর দল। ধ্রুপদের এই ইতিহাস 'আইন-ই-অকবরী' প্রভৃতি গ্রন্থে ভাল করে জানা যায়; (প্রশ্ন, প্রভৃতি গ্রন্থের নামগুলির উল্লেখ রইল না কেন?) তাতে দেখা যায় পেশাদার নট-নটীরা পথে পথে বাজনা বাজিয়ে ধ্রুপদ গানকে নিয়েই নাচ-গান করত। ঢাড়ী এক প্রকার নটচারণ সম্প্রদায়। আগে মেয়েরা অন্তঃপুরে মেয়েদের কাছেই ধ্রুপদ প্রভৃতি দেশী গান গাইত। তানসেন প্রভৃতি গুণীর দল এই ধ্রুপদের পথ আরো পরিষ্কার করলেন।" প্রশ্ন,—পুরুষদের ওই গান অযোগ্য যদি ছিল তাহলে পেশাদার নটীদের সংগে নট নাম এবং নটচারণ সম্প্রদায় কথা কি করে ব্যবহার হতে পারে?

ভারতে যাযাবরের মত শ্রেণী সম্প্রদায়ের পুরুষরা তাদের নারীদের গানকে অযোগ্য মনে করে থাকে, একথা প্রমাণ করা খুবই দুরূহ। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ 'সঙ্গীত-সার'এ লিখিত আছে—" 'কড়্খা' এক শ্রেণী গানের নাম। স্তুতিপাঠকবন্দিবর্গ যে সকল গান সহকারে রাজাদির গুণকীর্ত্তন বা স্তুতিবাদ করে, সেই গানকে কড়্খা গান বলে। কোন কোন কড়্খা গানে যুদ্ধাদির বর্ণনও থাকে। কড়্খা প্রায় রাজপুত-ভাষায় রচিত হয়। যারা এই প্রকার গানের ব্যবসা করে তাদের ঢাড়ি বলে। একথা ট্রিটিজ্ অন্ দি হিন্দু মিউজিক গ্রন্থেও লেখা আছে।" সুতরাং ঢাড়ি সম্প্রদায়রা কি ধরণের গান গাইত তার প্রমাণ উক্ত তথ্যের মধ্যেই সত্য হয়ে আছে বলে মানতে দ্বিধা আসবে না।

আশ্চর্য্য! তানসেন যে গান হরিদাসস্বামীর কাছে শিক্ষা লাভ করে সেই গানের সাধনায় অপূর্ব কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে সম্রাট আকবরের কাছে তানসেন উপাধি লাভ করেছিলেন এবং নব-রত্নের একটি রত্নবিশেষ হয়েছিলেন—সেই ধ্রুপদ বলে পরিচিত তাঁর সাধনার সম্পদ গানকে বিসর্জন দিয়ে বা সরিয়ে রেখে ঢাড়ীমেয়েদের গান দরবারে এনে উচ্চ সিংহাসনে বসালেন? লেখার মধ্যে আছে—"তানসেনের চেষ্টায় বকস্থু প্রভৃতির দ্বারা বহু ধ্রুপদ সংগৃহীত হয় ও বহু নব নব রাগ সৃষ্টি হয়।" আবুল ফজলের কথায় বুঝতে হবে এইসব ধ্রুপদ তাহলে ঢাড়ীদের কাছ থেকেই সংগ্রহ হয়েছিল এবং সেই সব ধ্রুপদ নিয়েই নব নব রাগের সৃষ্টি হয়েছিল। ধ্রুপদের এই সৃষ্টি পরিচয় বোধজ্ঞ ব্যক্তিরা কি বিশ্বাস করবেন? খেয়ালগানের সৃষ্টি ইতিহাসও ওই রকম অদ্ভুত ধরণের। বলা হয়েছে—"খয়রাবাদ জেলার পথে ঘাটে নারী ও প্রাকৃতজনের মধ্যে যে গান প্রচলিত ছিল, দরবার ও গুণীদের সমাজে খেয়াল নামে সেই গান প্রতিষ্ঠিত করলেন সুলতান হুসেনশাহসির্কী।"

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত এই প্রবন্ধ ১৩৬৭ সালের ২৫শে বৈশাখ 'গীতবিতান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ধ্রুপদ, খেয়ালের এই রকম উদ্ঘাটিত সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করে আমি অবাক ও আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। যে ধ্রুপদগানের পরিচয়ে পাচ্ছি তানসেনের বহু পুর্ব্বে নায়কগোপাল থেকে সৃষ্ট ও তাঁর রচিত গানে এবং পরবর্ত্তী বহু গুণী গায়কের রচনা গানের মধ্যেও এবং শুধু তাই নয় যে ধ্রুপদ গানের সাধনায় সিদ্ধ সাধক ছিলেন হরিদাসস্বামী, শিক্ষা করেছিলেন তাঁর কাছে তানসেন, যে ধ্রুপদের অধিকাংশ রচনায়

আছে কবিত্ব সমৃদ্ধি নিয়ে দেব-দেবী ও ঈশ্বর বিষয়ক ভাববর্ণন এবং প্রত্যেকটি গানই গায়কগুণীদের দ্বারা রচিত হয়ে আছে, যে গানকে প্রকৃতভাবে আয়ত্তে আনতে হলে বিশিষ্ট সাধকগুণীর কাছে দীর্ঘকাল নিষ্ঠা-সংযম নিয়ে শিক্ষা এবং তপস্যার মত সাধনা করতে হয়, যার সুরে ও কথারভাবে আছে আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব বিকাশ, যার সাধনার আসে সিদ্ধিলাভ এবং রবীন্দ্রনাথও যার রূপপ্রভাবশক্তিতে আকর্ষিত হয়ে রাগসঙ্গীতে জ্ঞানলাভ করেছিলেন এবং রেখেগেছেন তাঁর প্রায় সমস্ত রচিত গানের সুরে ধ্রুপদের ভাবধারাকেই বেশী করে,—সেই শাশ্বাতসংগীতের বাহক ধ্রুপদগান ঢাড়ীজাতিদের অধিগত হয়েছিল ? আমি মনে করি, একথা বিশ্বাস করতে হলে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারবোধকে বিসর্জন দিতে হবে।

খেয়ালগান শাস্ত্রীয় সংগীতের এক বিরাট ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত গান। এই গানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে আদর্শ গায়কের কাছে বহুকাল ধরে শিক্ষা করতে হয়। এর সাধনাতেও বিশ্রাম-বিরতি নেই এবং অন্তও নেই ; যতই এগোনো যাবে ততই তার শিল্পবৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। কিন্তু আশ্চর্য্য—এত বড় গান হুসেনসির্কী রাস্তার ধূলো থেকে কুড়িয়ে পেলেন !

সংগীত সাধনার মধ্যে দিয়ে আমার যেটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার দ্বারা বলতে পারি—যে বস্তুর মধ্যে বিস্ময়কর সৃষ্টি আছে, সাধনার পরম সম্পদ আছে সে বস্তুর জন্মবৃত্তান্ত এ রকম হওয়া সম্ভব বলে মনে ধরে না। তাছাড়া এ রকম উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত রূপকৌলিন্যময় আভিজাত্য শ্রদ্ধাবস্তুর জন্মবৃত্তান্ত এ রকমভাবে লোক চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে দেখান উচিত কিনা তা বিজ্ঞ পাঠকগণই বিচার করে দেখবেন। এ কথা সকলেই জানেন—বিরাট পুরুষের জন্ম যেখানে সেখানে হতে পারে কিন্তু আদর্শগত বড়রকমের বিদ্যার, বিজ্ঞানের এবং শিল্পসাধনার বস্তু বড় বড় ক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই উদ্ভাবন হয়। যদি মনের মধ্যে এই প্রশ্ন আসে যে, অতিক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে বিরাট তেজস্কর বস্তু যদি নিহিত হয়ে থাকতে পারে তাহলে তেমনিভাবে ওই দুই বিরাট শ্রেণীর গান ওই জাতিদের মধ্যে থেকে তার বিরাট তেজস্কর শক্তি আছে বুঝেই গুণীর দল গ্রহণ করেছিলেন ;” তাহলে মনের এ প্রশ্নের উত্তরে মনের বিচার বুদ্ধিকে নিয়েই মনকে বলতে হবে—বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের পরমাণুকে তেজস্করে আনতে বহু গবেষণা ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তবেই তার বিরাট শক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে ঢাড়ীদের এবং খয়রাবাদ জেলার অতি সাধারণ শ্রেণীর ওই গানে আদর্শগত বিস্ময়কর এমন কোন সাধনা সম্পদের বস্তু থাকতে পারে কি যার জন্য অসাধারণ গায়কগুণীরা তাঁদের সাধনার সম্পদকে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে করে একেবারে তাকে বিসর্জন দিয়ে ওইগানকে দরবারের সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন করে ঢাড়িদের গানের সুর সাধনায় নিমগ্ন হলেন ? এর চেয়ে অবাস্তব কথা কি আছে !

এই প্রসঙ্গের সমালোচনায় খেয়ালের উক্ত জন্মবৃত্তান্তের উপর মন্তব্য করে আমাকে একজন বলেছিলেন—“মহারাষ্ট্র দেশের ভিখারীরা একতারা নিয়ে কোলকাতার রাস্তায় বা অনেকের গৃহদ্বারে

যখন গান গায় তখন তাদের মধ্যে অনেকের কাছে খেয়ালগানের মত ছোট ছোট তান বিস্তার দিয়ে বেশ সুন্দর সুর শুনতে পাওয়া যায়। সুতরাং সুলতান হুসেন-সির্কীর কথা ধরে তাদের সেই গান অর্থাৎ খেয়ালগান বহুকাল ধরে পূর্বাপর ওদের মত জাতির মধ্যে দিয়েই স্বভাবগত হয়ে চলে আসছে বলে বিশ্বাস করা যাবে না কেন? কারণ ওরা তো কোন ওস্তাদের কাছে শিখে নাই?" এর উত্তরে বলেছিলাম, যে কোন দেশে যদি শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা বহু পূর্বে থেকে বিপুল প্রসস্ততার উপর প্রচার চলে আসে তাহলে তার শক্তি অনেকখানি স্বভাবশক্তির মত মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে থাকে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর দুঃখজীবিদের গভীর আকাঙ্ক্ষায় তা সুন্দরভাবে ধরা দেয়। তারা সেই মূল্যবান শক্তিকে সহায় করে অনুকরণের প্রতিভায় রাগরূপের চিত্রাংশ কণ্ঠে তুলে ধরতে পারে। এই রকম পরিচয় বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের সমগ্র অঞ্চলে বিশেষ করে এক সময় কয়েক শতাব্দী ধরে রাগ-সংগীতের বিপুল প্রচারের প্রতিক্রিয়ায় নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর মানুষের অন্ততে প্রবেশ করে তার প্রকাশ শক্তির পরিচয় এসেছিল। বিশেষ করে অতি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে সুর শক্তি বেশী করে প্রতিফলিত হয়েছিল। খেয়ালের অনুকরণে বাংলা কথা দিয়ে রচনাভাবের উপর বেশ সুন্দর করে তান-বৈচিত্র্যের সাংক্ষেপিক ক্রিয়া দিয়ে অনেকেই গাইতে পারত। এস্‌রাজে, সাঁনাইএ এবং বেহালায় ঢুলীসম্প্রদায়ের লোকেরা গৎ ও আলাপ বাজাতে পারত তান ও রাগবিস্তারের সংযোজনা দিয়ে। ঢুলীরা ঢোলে, ঢাকে এবং হরিজন জাতিদের মধ্যে অনেকে অতি উত্তমভাবে মাদোল বাদ্যে পাখোওয়াজের বোল—পরণ ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারত। এখনও এ পরিচয় তাদের মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। অথচ ওই সকল ব্যক্তিরা কেউই যথাযথ গুরুমুখী নয়। শুনে শুনেই তাদের গ্রহণশক্তি এসে গেছল—ধারাবাহিকতার প্রভাববেগের আকর্ষণে। এই রকম চর্চা প্রভাবের মধ্যে দিয়েই মহারাষ্ট্র দেশের ওই শ্রেণীর জাতিদের মধ্যে রাগসঙ্গীত কিছু অধিগত যে হয়ে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রাগরূপের নীতিনিয়ম নিয়ে গঠিত সুর বা শ্রেণীগত গান মানুষের স্বভাবজাত কখনই হতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে সংগীতসাধকদের দ্বারা জ্ঞানাধিগত হয়েই সৃষ্টি হয়ে এসেছে। ভাষার স্বরবর্ণকে স্বভাবজাত বলা যেতে পারে, কিন্তু তার ব্যাকরণ ও বিজ্ঞানকে কি স্বভাবজাত বলতে পারা যায়? ভাষাকে সুনিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ নিয়মের উপর সংরক্ষণের জন্য যেমন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছে, তদ্রুপ শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের বিধিবদ্ধ শ্রেণীগত গানও;—বিশেষ করে ধ্রুপদ ও খেয়ালগান। কোন জায়গা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হয় নি। অনেক স্থান হতে স্বভাবজাত সুর আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হতেও পারে কিন্তু তাতে যথাযথ বিজ্ঞান-ব্যাকরণ থাকে না, থাকে শুধু ক্ষুদ্ররূপে সুরই মাত্র। ঢাড়ি জাতিরা যে আদি জাতি তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তাদের গানে যে সুর থাকবে সে সুর তাদের স্বভাবজাত নিজস্ব হতে পারে এ ধারণা প্রামাণিক যুক্তি দ্বারা হবার নয়। যাইহোক মোটের উপর সাধকগুণীরা আদর্শগত যে সাধনায় মগ্ন থাকেন সেই একাগ্র সাধনাকে ত্যাগ করে অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কোন সহজ বস্তুকে গ্রহণ করতে পারেন এ কথা কোন রকমেই ভাবা

যায় না। আর একটা কথা,—বিশুদ্ধ রাগ-তাল ও বাণী নিয়ে যে সমস্ত ধ্রুপদ, খেয়ালের গান আছে—সেগুলির সবই বড় বড় গায়কদের দ্বারাই রচিত। তাহলে ওই সৃষ্টিতত্ত্ব ধরে লিখিত মত ধ্রুপদ-খেয়ালগান কোন্‌গুলি এবং সেগুলির কি রকম রূপ পরিচয়—তার উদাহরণ ও প্রমাণ কৈ ?

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের কথা আমার মনে আসে,—শাস্ত্রীয়সংগীতের ঔপপত্তিক-বিষয়ক গ্রন্থ বহুকাল আগে থাকতেই ভারতে লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে এবং তার সংখ্যাও বড় কম নেই ; তার সংগে নানান প্রকারের ইতিহাসও। কিন্তু রাগরূপের, গানের এবং তার-বাদ্যযন্ত্রের ক্রিয়াসিদ্ধকে কিভাবে যথাযথরূপে ধরে রাখা যায় তার সম্বন্ধে কেউ তেমন চিন্তা করেন নি। তখন বিজ্ঞান উদ্ভাবিত গ্রামোফন ও টেপমিসিন্ সৃষ্টি না হলেও তাঁদের কেউ যদি স্বরলিপিপদ্ধতির উন্নতক্রিয়া আবিষ্কার করে উক্ত বস্তুগুলিকে সংরক্ষণ করে যাওয়ার উপায় দেখিয়ে যেতে পারতেন তাহলে সেই হত প্রকৃতপক্ষে বেশী করে উপকারের বস্তু। আমরা বুঝে নিতে পারতাম, অন্ততঃ নায়কগোপাল থেকে আরম্ভ করে পরের পর গায়ক-বাদকদের রাগরূপের উপর স্বরাঙ্কন পদ্ধতি কিরূপ ছিল এবং তার মূর্ত্তির গঠনে কি-রকম শিল্পসৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়েছিল। তাছাড়া তার সংগে রাগরূপ অঙ্কনের উপর নীতি-নিয়মের ধারাবাহিকতার প্রমাণও পাওয়া যেত। এই অভাবের জন্য সঙ্গীতজ্ঞদের যথাযথ নীতি-নিয়ম ধরে চলার অসুবিধা হয়েছে। মুখে মুখে প্রচারের জন্য অনেকক্ষেত্রে সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে বহু বিষয়ে মনগড়া বস্তুর সৃষ্টি হয়ে নীতি-বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা এসেগেছে, বিশেষ করে খেয়ালের প্রাধান্য যুগ থেকে রাগ সংগীতের শিল্পকেই বড় করে ভেবে নেওয়ার জন্য। তাই এখন রাগরূপের যথার্থ সন্ধানে প্রাচীন ধ্রুপদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং চিন্তাও জ্ঞানলব্ধ শক্তির দ্বারাই বিচার করে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করে যেতে হয়।

আর একটা কথা,—যদি আগে সঙ্গীতজ্ঞদের বর্ত্তমানের মত স্বরলিপিতে দক্ষতা থাকত তাহলে অন্ততঃ অনেকখানি জানবার সুযোগ থাকত যাঁরা নামে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন তাঁদের পরের চর্চারত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সত্যই তাঁদেরকে ছাড়িয়ে ছিলেন ও ছাড়িয়ে আছেন কিনা। স্বরলিপি যথাযথ করতে জানলে বিচারের এই উপায় অনেকখানি থাকেই। দেখা যায় নামের শীর্ষস্থানের ব্যক্তিরা প্রধানতঃ ধ্রুপদগানেই ছিলেন। ওই পরিচয়ের উপর সত্যের মধ্যে দিয়ে বলা চলে, ধ্রুপদ বস্তুতে রাগরূপের চিত্র যেভাবে যতদূর সম্ভাবনার উপর প্রতিফলিত হতে পারে তারচেয়ে বিপুল বিস্তারিত ও অলংকার সমৃদ্ধ হয়ে খেয়ালগানের বস্তুতে থাকে। ওর চর্চারত ব্যক্তিদের ধ্রুপদ অপেক্ষা অনেক বেশী কঠোর পরিশ্রম করে কণ্ঠের দ্বারা সাধনার শ্রেষ্ঠ স্তরে নিয়ে যেতে হয়। সুতরাং তাঁদের স্থান নামের কোঠায় কোথায় থাকা উচিত তার তুলনামূলক বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারণ হবার উপায় নেই। যাই হোক্ এখন বিশেষ আগ্রহ ও কর্ত্তব্য নিয়ে যোগ্যশিল্পীদের সাধনালব্ধবস্তুকে সংরক্ষণ করে যাওয়া অতীব প্রয়োজন বলেই মনে করি। টেপ্‌মেসিন্ হওয়ায় এ বিষয়ের যথেষ্ট সুযোগ এসেছে॥

রাগ প্রকাশের সময় নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে—

রাগসমূহের সময় ধার্য্য ইত্যাদির ব্যবস্থা দেখিয়ে একজন পরিচিত শিক্ষাবিদ্ সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা উত্থাপন করে যুক্তি নির্দেশ দিয়েছেন, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব কেন মনে হল সে বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক আছে বলে বুঝলাম।

প্রবন্ধের সূত্রপাতে তিনি বলেছেন,—"সময়ের সংগে যে রাগসমূহের প্রকাশ তা দুইভাগে বিভক্ত যথা,—পূর্বভাগ এবং উত্তরভাগ। এই দুই ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগ বেলা ১২টা হতে রাত ১২টা পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগ রাত ১২টা থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত। ওই দুটির প্রথমটি দিনের পূর্বাঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি দিনের উত্তরাঙ্গ। যে রাগ দিনের পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ বেলা ১২টা থেকে গীত হয়ে থাকে তার বাদীস্বর প্রায়ই সপ্তকের পূর্বাঙ্গে হয়, অর্থাৎ সা-রে-গা-মা, স্বরের কোন একটি।" দিনের পূর্ব্বাঙ্গ বেলা ১২টার সময় হতে বলেছেন। বেলা ১২টার আগের অতখানি সময়কে দিনের পূর্ব্বাঙ্গ নয়, একথা তিনি কি করে বলতে পারেন?

আমার মনে হয় এসব প্রশ্ন তাঁর উপর আসার যে সম্ভাবনা আছে সে দিকে তিনি খেয়ালই রাখেননি। এজন্য তাঁর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ অবাস্তবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দিনের পূর্ব্বাঙ্গ আবাহমানকাল থেকে আমাদের দেশে ব্রহ্মমুহূর্ত্তের সময় অর্থাৎ সূর্য্য উদয়ের সময় থেকেই নিরাকৃত হয়ে আছে। এই বাস্তব নিয়মকে তিনি একেবারে পরিবর্ত্তনে আনতে গেলেন কোন্ যুক্তিতে তা বিশদভাবে তাঁকে জানাতে হত।

দিনের ওই প্রারম্ভ সময়ের পরিমাপ ধরে অষ্টপ্রহর নির্মিত হয়ে আছে এবং তার প্রথম গণনা ধরে প্রথম প্রহরের প্রথম সময় থেকে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রথম রাগ ভৈরবকে ধার্য্য করে পরের পর সময়ের সংগে ভাবসামঞ্জস্য রেখে অন্য সমস্ত রাগ প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হয়ে আছে।

বেলা ১২টা থেকে রাত ১২টা দিনের পূর্ব্বাঙ্গ এবং রাত ১২টা থেকে বেলা ১২টার আগে পর্য্যন্ত দিনের উত্তরাঙ্গ একথা যেন হাস্যকৌতুকের মত শুনায়।

দিবা-রাত্রির যামার্দ্ধগুলির মধ্যে যে সমস্ত নিয়ম-ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক শুভাদি অনুষ্ঠানের ক্রিয়া আছে তার অনেক বিষয় আমাদের শাস্ত্রীয়সংগীতেও ধরা আছে। দিনের কোন এক নিদিষ্ট সময়ের পরিমাপ দিনের পূর্বাঙ্গের অর্থাৎ সূর্যউদয়ের প্রথম সময় থেকেই গননা ধরে চলে আসছে। নিশাকালের কথা নিয়ে রাগের সম্বন্ধ ধরে বলা যায়, ললিতরাগের সুরের মধ্যে যে মিলনকাতর ও করুণরসাত্মকরূপ-ভাব আছে সেইভাবের সম্বন্ধ যেন প্রেমাস্পদের জন্য প্রতিক্ষারত প্রাণের আকুলি। তখন কণ্ঠে আবেগ নিয়ে যে সুর প্রকাশিত হয়, তা নিশাকালের শেষ মূহুর্তের উপযোগী হয়ে ললিতরাগের মাধ্যমে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। এজন্য ওই রাগের প্রকাশ সময়ের মূহুর্ত্তটিকে বলে নিশাকালের শেষ সময়। ওই সময়কে তিনি দিনের উত্তরাঙ্গ বলেছেন। সূর্য্যের উদয়কাল থেকে অস্তকাল পর্য্যন্ত সময়কেই যে

একমাত্র দিন বলে এ কথা আমাদের দেশে কে না জানেন। আশ্চর্য্য হচ্ছি—এই সত্যের স্বীকৃতিকে তিনি কেন পরিবর্তনের প্রয়াসী হলেন।

প্রবন্ধকার বলেছেন,—"পূর্বাঙ্গরাগে পঞ্চমবাদী থাকতে পারে এবং উত্তরাঙ্গরাগে মধ্যমবাদী থাকতে পারে।" সঠিক নিরাকরণে যথেষ্ঠ অসুবিধা আছে বুঝেই লেখক এটাও হ'তে পারে ওটাও হতে পারে বলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি নিজের বক্তব্যকে নিজেই দুর্বল করে দিয়েছেন। উক্ত নজির ধরে ওইরূপ খেয়াল-খুসী নিয়ে কেউ বলতে পারেন, পূর্বাঙ্গে 'ধা' পর্য্যন্ত এবং উত্তরাঙ্গে 'গা' পর্য্যন্ত বাদীস্বর থাকতে পারে। ভাল করে বিচার.বোধ নিয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে নিয়মসঙ্গত-রূপে রাগের বাদীস্বর দিবা-রাত্রির মধ্যে সমস্তরাগের কিছু কম বেশী নিয়ে দুই স্বরাঙ্গের মধ্যেই আছে। সুতরাং বাদী-সংবাদীর দ্বারা অঙ্গ নির্দ্ধারণ তাঁর বক্তব্য মত নয় এবং হতে পারে না। তাছাড়া সালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর অনেক প্রাচীন রাগের মধ্যেই লেখকের মতের পূর্বরাগ ও উত্তররাগ মিশ্রিত হয়ে আছে। যেমন, দিবা প্রথম প্রহরের অর্থাৎ লেখকের নির্দেশ মত দিনের উত্তরাঙ্গের আলাইয়া রাগের-সংগে রাত্রি প্রথম প্রহরের অর্থাৎ তাঁর মতে দিনের পূর্ব্বাঙ্গের কামোদরাগ যুক্ত করে সর্ফর্দ্দারাগের সৃষ্টি, আলাইয়ার সংগে রাত্রি প্রথম প্রহরের তিলককামোদ মিশ্রিত করে শুক্লবেলাবলীরাগের সৃষ্টি, অনুরূপভাবে দেশরাগ মিশ্রিত করে ককুভারাগের সৃষ্টি হয়ে আছে এবং এগুলির প্রকাশ সময় দিবা প্রথম প্রহরের মধ্যেই, লেখকের মতে দিনের উত্তরাঙ্গে। তাঁর এই যুক্তি নির্দেশের মধ্যেও গ্রহণযোগ্য কিছু নেই। লেখক বলেছেন,—"রাত ১২টার পর থেকে দিনের উত্তর ভাগ এবং তখন থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত যে সমস্ত রাগ আছে তাদের বাদীস্বর উত্তরাঙ্গের।" আবার একস্থানে একথাও বলেছেন, "ললিতরাগের মধ্যমবাদী কিন্তু উহা পূর্বরাগ না হইয়া উত্তররাগ হইয়াছে।". শুধু ললিতরাগই নয়, পূর্ব্বাঙ্গ স্বরের বাদী নিয়ে অনেক রাগই আছে যা তাঁর আবিষ্কারের মতে উত্তর রাগের পর্য্যায়ে আছে। যথা, ভৈরবের বাদী মধ্যম, দেশীরাগের বাদী ঋষভ, তোড়ীরাগের বাদী গান্ধার ইত্যাদি। এই রাগগুলির প্রকাশ বেলা ১২টার সময় থেকে নয়। উক্ত রাগগুলির বাদীত্বের বিষয় নিয়ে আগে যথোপযুক্ত বিচার যুক্তি দিয়ে আলোচনা করেছি, সেই যুক্তি রাগবিজ্ঞান ও দর্শনের উপর স্থাপিত। যাই হোক্, তিনি নিজেই উক্ত বিষয়ের নির্দ্ধারণ একই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি, ললিতের বাদীস্বর দিকে তাকিয়ে তা নিজেই প্রমাণ করেছেন।

কোন গুরুত্ব বিষয়ের নির্দ্ধারণ যুক্তি একই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে তার কোন মূল্য থাকে না। রাগরূপের বাদী-সংবাদীর উপর সঠিক অঙ্গধার্য্যের যে সম্ভাবনা নেই তা তিনি যদি মনযোগ সহকারে বিচার চিন্তা রাখতে পারতেন তাহলে এ ভাবে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা তাঁর কোন মতেই আসত না বলে আমি মনে করি।

প্রবন্ধের আর এক স্থানে তিনি বলেছেন,—"ইমনের বাদীস্বর গান্ধার এজন্য এই রাগ গাইবার সময় বেলা ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্য্যন্ত হওয়া উচিত।" তাঁর এ কথাকে বোধজ্ঞরা যাতে হেসে

উড়িয়ে না দেন তারজন্য নির্ঘাত যুক্তি কি আছে তা বিচার পূর্বক বিশ্লেষণ করে দেখাতে হত।

গৌড়সারঙ্গ রাগে, পুরিয়া, পূরবী, ভূপালী, কল্যাণ, খাম্বাজ, ঝিঁঝি ট, হিন্দোল, বেহাগ ইত্যাদি রাগে গান্ধার বাদীস্বর হয়ে আছে। তাঁর কথামত গান্ধার বাদী থাকার জন্য উক্ত রাগগুলি কেন ইমনের মত বেলা ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্য্যন্ত প্রকাশের অধিকার পাবে না, তার সম্বন্ধেও যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করে দেখাতে হত। তাঁর উক্তিমত ইমনের বাদী স্বরের উদাহরণ ধরে কেউ বলতে পারেন, ভৈরবরাগের বাদীস্বর মধ্যম, সেই স্বরের অধিষ্ঠাতা দেবতা মহাদেব, সুতরাং সেই শক্তির অধিকার নিয়ে এই রাগ গাইবার সময় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হওয়া উচিত এবং মধ্যমবাদী বিশিষ্ট সমস্ত রাগকেই যদি এই অধিকার দেওয়া হয় তাহলেও আমার আপত্তি নেই,"—তাহলে প্রতিবাদ নিয়ে প্রবন্ধকারের কিছু বলার থাকবে কি? সূর্য্যদেবের উদয় সময় থেকেই প্রায় সমস্ত বস্তুর মধ্যে সৃষ্টির স্ফুরণ হয় এবং নানান সৃষ্টি কামনায় অন্তরে প্রেরণা জাগায়,—সেই প্রেরণা আসে সময়ের মহিমায় আনন্দের মূর্ত্তি ধরে। রাগরূপের সৃষ্টি কামনাও এইভাবেই বিশেষ করে এসেছে সময়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় ভৈরব ইত্যাদি রাগের মূর্ত্তির মধ্যে দিয়ে। শাস্ত্রেও লিখিত আছে—মহাদেবের পঞ্চমুখের প্রধান মুখ থেকে ভৈরব রাগের উৎপত্তির কথা। তাই মঙ্গলময় মহাদেবের সৃষ্ট প্রথম রাগ যথাযথ সময়োপযোগী হয়ে সূর্য্য উদয়ের প্রথম মূহুর্ত্তে অর্থাৎ দিবাকালের সর্বপ্রথম অংশে প্রকাশের সময় ধার্য্য হয়ে আছে। এই ধার্য্য বিষয়ে রাগরূপ আলোচনায় আমি যথাযথ আরো প্রমাণ দেখিয়েছি—মধ্যম স্বরের বাদীত্বের অধিকার সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে। ভৈরবরাগ এবং প্রাতঃকালের অন্যান্য রাগকে দিনের উত্তরাঙ্গ রাগ বললে সে কথাকে কোন বোধজ্ঞ ব্যক্তি গ্রহণ করবেন বলে কি তিনি মনে করেন?

লেখক প্রবন্ধের আর একস্থানে বলেছেন,—"রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বেহাগ যখন গাওয়া হয় তখন অল্প অল্প করে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ বিশেষ রূপে হতে থাকে। এইভাবে রাত যত বাড়তে থাকে তীব্র মধ্যম অপেক্ষা শুদ্ধ মধ্যমের প্রাধান্য বর্দ্ধিত হয়,— এর পরই মালকৌশ, দরবারীকানাড়া, আড়ানা, বাগেশ্রী প্রভৃতি রাগের গাইবার সময় আসে।" এই উক্তিতে তাহলে তিনি স্বীকার করছেন ওই রাগগুলির বাদী মধ্যম, কারণ রাগের মধ্যে কোন স্বরের প্রাধান্য বলতে প্রকৃতপক্ষে বাদীকেই বুঝায়। তিনি প্রথমেই বলেছেন দিনের পূর্ব্বাঙ্গে অর্থাৎ বেলা ১২টা থেকে রাত ১২টার মধ্যে যে সমস্ত রাগ আছে তাদের বাদীস্বর স-র-গ-ম এই পূর্বাঙ্গের স্বরের যে কোন একটি হবে। তাহলে তিনি কি করে মধ্যমের প্রাধান্য রাত ১২টার পর থেকে দিতে পারেন? তাছাড়া—কানড়ায়, আড়ানায় মধ্যমের প্রাধান্য আছে এ কথা তিনি কি করে বলতে পারলেন? ওই দুই রাগে ওই স্বরের প্রাধান্য দিলে রাগের চেহারার কি দুরবস্থা হবে তার কথা কি করে বিস্মৃত হলেন? কানড়ায় ইচ্ছা করলে মধ্যম অনেকবার ব্যবহার করা যায় কিন্তু খুব কম স্থায়ীত্ব দিয়ে, তাকে প্রাধান্য বলে না। কেদার, মেঘ, মল্লার, হাম্বীর, সুরট, দেশ, প্রভৃতি রাগে মধ্যমের প্রভাব যে কত বেশী তা আশাকরি তাঁর অজানা

থাকার কথা নয়। তাহলে কি তিনি ওই রাগগুলিকেও ওই সময়ের অন্তর্গত বলে মনে করে আছেন, তাঁর মতে ওগুলি কি রাত্রি ১২টার আগের নয় ? এ সবই বিচার যুক্তিহীন পরিকল্পনা। সময়ের সংগে সম্পর্ক রেখে রাগরূপ প্রকাশের জন্য যে সুন্দর নিয়ম ও দর্শনের পরিচয় আছে তাতে শুধু ওই রাগগুলিই নয় তাঁর ওই নামের রাগগুলির কোন একটিও রাত ১২টার পরে ব্যবহারের জন্য নয়। তাছাড়া কোন একটিমাত্র স্বরের শুধু প্রভাবের উপরই সময়ের আকর্ষণ আসে না, স্বর সংযোজনার পদ্ধতিতে রাগের মধ্যে যে রস ও ভাবের সৃষ্টি হয় তার উপরই বিশেষ করে সময়ের সংগে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ললিতরাগের প্রধান মধ্যমের প্রভাবই শুধু তার রূপের সংগে নিশাশেষের সংযোগ রক্ষা করেনি,—কড়ি মধ্যমেরও প্রভাব যথেষ্ট আছে। ওই রাগের উপর দুই মধ্যমের সংযোগ সুরই তার প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। কড়িমধ্যমকেও যদি প্রাধান্য দিয়ে না গাওয়া হয় তাহলে ললিতের চেহারা অন্ধের মত দেখাবে। রাগরূপের সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করে এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার দ্বারা বেহাগের পর যে যে রাগকে স্থান দিয়েছি তা যথেষ্ট যুক্তির উপর খুঁজে নির্দ্ধারণের সন্ধান পেয়েছি বলেই আমি মনে করি। প্রাচীন নির্ঘণ্ট ধরেই শুধু অনুসরণ করিনি।

বেহাগের পর শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, বিহঙ্গড়া, হিন্দোল, সোহিনী, বসন্ত, পরজ এবং পরিশেষে ললিত, এইগুলিই সময়ের সম্পর্ক স্থাপনে যথোপযুক্ত হয়েছে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর নিশা-প্রকৃতির অবস্থা যেরূপ হয়ে উঠে সে সময়ে কানড়া, আড়ানা, বাগেশ্রী, বাহার, মালকৌশের মত জম্‌কাল মজলিসীরাগ অর্থাৎ নিশাকালের সজীবতা সময়ের রাগ, ভাবুক-শিল্পীর অন্তরে ধরা দিতে পারে বলে আমার ধ্যান-ধারণায় আসে না। কারণ মনের ভাব সাধনার স্বভাব তাদের তখন টেনে আনতে চায় না। অবশ্য আসরে সময়েয় নীতি-নিয়ম মেনে চলা বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না কিন্তু ধার্য্য ঠিক সঙ্গত রূপই আছে। যাঁরা প্রকৃতির পরিবেশে থাকেন বা থেকেছেন তাঁদের মধ্যে সুর সাধকরা যদি এ সব বিষয়ে সন্ধানের আগ্রহী হতে পেরেছেন তাহলে আমার এই নির্দ্ধারণ তাঁদের উপলব্ধিতে আসতে পারে। অধিক রাত্রে কর্ম সমাধার পর বিরহিণীর অন্তরে যে বিয়োগব্যথা সঞ্চিত হয়ে থাকে তাই তখন উদ্বেগ নিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে করুণ-ক্রন্দনের মূর্ত্তি ধরে। সেই সময় সেই স্থানসংলগ্ন নির্জন স্থানের সুর সাধকের কণ্ঠেও আসে আকুলতা নিয়ে বেহাগের সুর এবং সেই আবেগবিধুর সুরের ধ্বনি বিরহিণীর কাতর ক্রন্দনের সংগে মিলে যায়। ওই সময়ের অনেক ধ্রুপদগানের ভাব-ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে। তারপর মনের এই অবস্থা ক্রমশঃ যখন অবসাদের ভারে নেমে আসে তখন অন্তরে এনে দেয় মানসিক চাঞ্চল্য,—এই চাঞ্চল্যভাবের উপর মায়াময় শান্তনার বলিষ্ঠ রূপ ধরে যেন প্রকৃতির আহ্বানেই এসে পড়তে থাকে হিন্দোলের রূপ অন্তরে দোলা দিয়ে। তারপর সোহিনী, বসন্ত, পরজ, ঠিক সময়োপযোগীর, রূপে আসে। সেই সময় সেই ব্যথাতুর প্রাণ কিছু প্রকৃতস্থ হলেও ক্রমশঃ নিশাশেষে লুটিয়ে পড়ে ললিতরাগের ভাবনিহিত সুরের উপর সেই সুর-সাধকের আরাধনার প্রভাব ক্রিয়ায়। পূর্ব কথিত শঙ্করা, শঙ্করাভরণ এবং বিহঙ্গড়ারাগগুলি বেহাগ-

রাগেরই সমভাবাপন্ন বলে সময়ের সংগে সম্বন্ধ প্রায় একই। এদের সুরের সীমা সময়ের সংগে অনেকখানি সম্পর্কে থাকার পর—উক্তরাগগুলির ওইভাবে ক্রিয়ায় এসেছে।

সুরসাধকদের কাছে এই মানসিক ভাবধারা অন্তরে প্রবাহিত হয়েছিল এবং হয় বলেই রাগগুলির সময় নির্বাচন সেইভাবেই হয়ে এসেছে। মানা বা না মানা সে আলাদা কথা। আমি যে ব্যাখ্যা দিলাম তা ভাবুলতার উপর কল্পনা-প্রসূত নয়, অন্তরে রাগরূপের এই ভাবময় বস্তু প্রকৃতির পরিবেশের উপর বাস্তব চিন্তা রেখে খুঁজে পেয়েছি বলেই আমি রাগ নির্দ্ধারণের এই নিয়মের উপর মুগ্ধ এবং বিশেষরূপে বিশ্বাসী।

এ বিষয়ে আর একটু বলবার আছে,— সাধারণ ভাবেও আমি হিণ্ডোল, সোহিনী, বসন্ত ও পরজ, এই রাগগুলিকে প্রকাশ করবার জন্য রাত্রি ২য় প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ বেহাগের পূর্ব্বে কোন স্থানে দেওয়া যায় কিনা সেজন্য আমি বিশেষ চিন্তা নিয়ে ভেবে দেখেছি কিন্তু অতিসঙ্গত কারণেই সেই স্থানসমূহে মনোনীত হয় নি। ওই রাগগুলির স্বরশক্তির উপর স্বাভাবগত যে সুরের রূপ ও তার প্রভাব আছে তাতে রাত্রি ৩য় প্রহরের সময়ই তাদের রূপ সম্পর্ক যথাযথ বলে সত্যের রূপে ধরা দিয়েছে। নিশাকালের প্রত্যেক প্রহরের মুখে প্রাণীকুলের জাগরণ আসে প্রকৃতির প্রেরণায়। সময়ের সম্মুখভাগে রাগ নির্ণয়ও সেইরূপ চেতনার সামঞ্জস্য রেখেই ধার্য্য করা হয়েছে। উক্ত রাগগুলির যে কোন একটিকে নিয়ে বহুদিন ধরে বহুবার সন্ধ্যার পর থেকে বেহাগের আগে পর্য্যন্ত অন্যান্য রাগের আগে পেছু করে কণ্ঠে ও যন্ত্রে প্রকাশ করে দেখেছি, ওই মধ্যবর্ত্তী সময়ের কোন রাগের সংগে এবং সময় অনুযায়ী প্রকৃতির সংগে যোগাযোগের মিলনে উপযোগী হয়নি।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য বলা যাবে, রাগরূপ শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্রে সময়ের নিয়ম-বিধি পালন করা সম্ভব হতে পারে না সত্য এবং আসরেও সব সময় তা রক্ষা করা যায় না কিন্তু প্রত্যেক রাগের প্রকাশ সময় যেভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে গেলে নিজের ধ্যানধারণার অভাব থেকে যাবে। আমি এটুকু বলতে পারি,—কোন ব্যবস্থায় সূর্য্য উদয় থেকে আরম্ভ করে অষ্টপ্রহরের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার নির্দ্ধারণ মতের মধ্যে দিয়ে যেভাবে রাগগুলিকে সময়ের উপর সাজান আছে সেগুলিকে ঠিক সময়ে সময়ে যদি প্রকাশ করে যাওয়া হয় তাহলে এর সত্য নিরাকৃত হতে পারে বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

পরিশেষে প্রবন্ধ লেখকের একটি কথার বিষয়ে আমার বলবার আছে। তিনি বার বার শাস্ত্রীয়সঙ্গীতকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলেছেন। আর্য্যযুগ হতে যে সঙ্গীতের নীতিধারা চলে এসেছে তারই বাহক শাস্ত্রীয়সংগীত। এই সংগীতের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে বাংলা দেশেও শত শত বৎসর আগে থেকেই। গৌড়ের রাজা বল্লাল সেনের প্রথম রাজ্যবর্ষ সময়ে তাঁর দরবারের সঙ্গীতাচার্য্য লোচনপণ্ডিত তাঁর গ্রন্থ 'রাগ-তরঙ্গিনী'তে লিখেছেন, তাঁর আগের বহু পূর্বে থেকে সঙ্গীতাচার্য্যদের পুঁথি আকারে সংগীতের বিশদ গ্রন্থসমূহ ছিল এবং তাতে রাগরূপের বিস্তৃত আলোচনা ও স্বরগ্রামের পরিচয় ছিল।

(এই সংবাদ আমি ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাপার অক্ষরে আলোচনার মধ্যে বিশেষ করে প্রামাণ্যরূপে পেয়েছি।) বাংলার রাঢ়ভূমে শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রচারপরিচয় বহু শত বৎসরের প্রাচীন নিদর্শন ও তথ্য নিয়ে আছে। সুতরাং এই সমস্ত প্রমাণ থাকায় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতকে শুধুমাত্র হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলা কর্ত্তব্য নয়। এরূপ সম্বোধন এতবড় দর্শন, বিজ্ঞান ও নীতিআদর্শমূলক আধ্যাত্ম বিদ্যা-বস্তুর প্রতিও যথাযথ নয়। হিন্দুস্থানের সংগীত বলে তাই হিন্দুস্থানী সংগীত বলা হচ্ছে, একথা সত্যের যুক্তি মধ্যে আসে না। কারণ দাক্ষিণাত্যও হিন্দুস্থান, তাদের সঙ্গীতকেও তাহলে কার্ণাটিক সঙ্গীত না বলে হিন্দুস্থানী সংগীত বলতে হয়। যদি বলা হয় ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি শ্রেণীগত গান সমস্তই হিন্দীভাষায় রচিত এবং তাকেই শাস্ত্রীয়সংগীত বলা হচ্ছে, সুতরাং হিন্দুস্থানী সংগীত বলতে দোষ কি ?" দোষ ঠিক না বলে আপত্তি আছে বলব। কারণ সঙ্গীত বলতে বুঝায় সুর, তার থেকে হয়েছে নানাবিধ রাগরূপ, সেই রাগরূপকে নিয়ে হয়েছে বিধি, ব্যবস্থা, নীতি, নিয়ম, বিজ্ঞান ব্যাকরণ ইত্যাদির সৃষ্টি। এই সমস্ত সৃষ্টবস্তুকে নানানভাবে বিধি ব্যবস্থার দ্বারা রক্ষিত হয়ে এসেছে বহু গ্রন্থের মাধ্যমে—শ্রেষ্ঠ বিদ্যার পরিচয় স্বরূপ হয়ে। কোন একটি নির্দিষ্ট ভাষার উপর দিয়ে রাগরূপের পরিচয় এসেছে একথা কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে আমি খুঁজে পাইনি। রাগরূপের সৃষ্টিকাল থেকে যাঁরা বীণাদিযন্ত্রে রাগরূপের সাধনা করে এসেছেন ও আসছেন এবং যাঁরা শুধু "অনন্ত নারায়ণ হরি ওঁ" বলে রাগালাপের দ্বারা সাধনা করে এসেছেন এবং জানা হয়ে আছে এর দ্বারাতেই রাগরূপের চরমোৎকর্ষ দেখান যায়, যাঁরা নিজের মাতৃভাষাতে রাগসংগীতের মহিমা প্রকাশ করতে পারেন—তাঁরা সেই সাধনার বস্তুকে শুধু শাস্ত্রীয়সংগীত ছাড়া হিন্দুস্থানী সংগীত বলবেন কি ? সংগীত আবার হিন্দুস্থানী কি ! সংগীত শুধু সংগীতই। বাংলা ধ্রুপদ-খেয়াল, হিন্দী ধ্রুপদ-খেয়াল, গুজরাঠী ধ্রুপদ-খেয়াল বলতে পারি কিন্তু আসল পরিচয়ে সেগুলি শাস্ত্রীয়সংগীত। এজন্য আজকাল এই ন্যায়সঙ্গত শুদ্ধ কথাই বোধজ্ঞরা ব্যবহার করছেন।

শিল্পী —

শিল্পী কথার অর্থ শিল্পকার, শিল্পী, চিত্রাদি বা বস্তু নির্মাণাদি কর্মকারী কারিকর। এই অর্থের মধ্যে সঙ্গত নিয়মে বুঝতে হয় শিল্পী হল বস্তুরচয়িতা, কোন তৈরি বস্তুর প্রদর্শনকারী বা বিক্রেতা নয়।

গায়ক বা বাদককে শিল্পী বলতে গেলেও এই সঙ্গত বিচারই থাকবে। কারো তৈরি গান, তা সে ধ্রুপদ, খেয়াল বা যে কোন শ্রেণীর গানই হোক না কেন যদি গীত রচয়িতার সেই গান তাঁর দেওয়া হুবহু সেই সুরে গেয়ে মাত্র সমাধা করা হয় তাহলে সেই গানের গায়ক কখনই শিল্পী নামের যোগ্য নন বুঝতে হবে। এমন কি গুরুর শেখান তান-বৈচিত্র্য দিয়েও যদি গাওয়া হয় তাহলেও তাঁর শিল্পী নাম প্রাপ্য হবে না। তার বাদ্য ইত্যাদি যন্ত্র বাদকদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সংগীতের শিল্পী

বলতে তাঁকেই বুঝাবে—যিনি সংগীতের উচ্চ সাধনার কৃতিত্ব শক্তি নিয়ে বৈজ্ঞানীক প্রণালী অনুসৃত রাগরূপের উপর নিজ প্রতিভায় সর্বদাই সুরের নূতন নূতন ক্রিয়াবৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে পারেন। অবশ্য এর মধ্যে গুণানুসারে ছোট বড় থাকতে পারে।

এ স্থলে আরো দু' একটি বিষয়ের কথা বলার আবশ্যক হয়ে পড়ল, অনেক স্থলেই দেখে আসছি, কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞদের নামের পূর্বে ওস্তাদ, পণ্ডিত ইত্যাদি গুণবাচক সম্বোধন থাকে, আবার অনুরূপ সমস্তরের বা আরো উচ্চস্তরের সঙ্গীতজ্ঞদের নামের পূর্বে কোন গুণবাচক সম্বোধন থাকে না। এ বিষয়ে খুব সতর্ক জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

২) শিক্ষার প্রথম সোপানে উঠার মধ্যেই—'সংগীত-বিশারদ', 'সংগীত-প্রভাকর', 'সংগীত-ভারতী', 'সংগীততীর্থ' ইত্যাদি অতি উচ্চস্থানের উপাধি দেওয়া আমার বিচারে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই সব উপাধি নাম করা উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞদেরই অধিকার ভুক্ত হতে পারে।

৩) অনেক সংগীতচর্চারত ব্যক্তির নামের পূর্বে যে সব বড় বড় উপাধি থাকে তা যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন তার প্রাপ্তির প্রমাণসহ পরিচয়পত্র যথাযথভাবে থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। কারণ যথোপযুক্ত স্থান থেকে উপাধি পত্রের প্রমাণ পরিচয় থাকলে অনেকের নিজের দ্বারা উপাধি ব্যবহার বন্ধ হয়ে সাধারণের সংশয় ও ভ্রান্তি নিরসন হতে পারবে॥

——:*:——

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাগসমূহের স্বর নির্দ্ধারণ ইত্যাদি—

রাগভৈরব (১)

এই রাগের ব্যবহারের সময় দিবা প্রথম প্রহরের প্রথম মূহুর্ত্ত। গতি সরল। বিস্তার বহুল বড় প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধ শ্রেণী। ঋষভ–ধৈবত কোমল। বিবাদীরূপে বক্রগতিতে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। বাদীমধ্যম, সংবাদী ষড়জ। সম্পুর্ণজাতি। কোমল ঋষভ ও ধৈবত বলীস্বর। পূর্বাঙ্গ প্রধান। নিষাদ তুর্বল।

রাগের স্বরগতি বা ঠাট,—স-ঋ-গ-ম-প-দ-ন-স´-স´-ন-দ-প-ম-গ-ঋ-স। কোমল নিষাদ এইরূপ ভাবে প্রয়োগ হবে, যথা,—ম-ণদ্-প, ণদ্-ণদ্-প-, অর্থাৎ গা, মা, কিংবা পা, সুরকে গ্রহণ করে প্রয়োজন বুঝে কোমল নিষাদ ব্যবহার করেই নীচের স্বরে চলে আসতে হয়। ওই কোমল স্বরটি ওইরূপ ব্যবহারের দ্বারা প্রাতঃকালের প্রকৃতির কোমলতা ও মাধুর্য্যময় রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে। এই কোমল স্বর বিবাদীরূপে এলেও ভৈরবের স্বভাবগত রূপের সংগে তার যে সম্পর্ক আছে তা বেশ প্রমাণ দেয়। রাগরূপের বিবাদীস্বর ঠিক এই রকম প্রয়োজন নিয়েই দেখা দিতে পারে।

বাদীস্বর নির্ণয়ের নিয়ম-নীতি বিষয়ে পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে, তত্রাচ এ স্থলে আরো কিছু আলোচনা করে দেখাবার আবশ্যক আছে। আজকাল দেখা যায়, ভৈরবরাগের বাদী, সংবাদী, ধৈবত-ঋষভকে গ্রহণ করতে। এই স্বর তুটি ওই স্থলের জন্য নির্দ্ধারিত হওয়া রাগরূপের স্বভাবগত ও বিজ্ঞান-সম্মত যে নয় তার সম্বন্ধে বিচার যুক্তি দিয়ে আগেই বলেছি,—যদি দেখা যায় রাগরূপের পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ ষড়জস্বর হতে মধ্যম পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে তার নির্মাণ পদ্ধতি সুন্দররূপে এবং স্বভাবগত আকর্ষণ নিয়ে ভাবপবিত্রতার দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে তাহলে সেই ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রধান কর্ত্তারূপে যে স্বরটির বিশেষ আধিপত্য আসে বা যে স্বয়টিকে গ্রহণ করতে হয় সেইটিই হয় রাগধর্মানুসারে ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে 'বাদী' স্বর।

এই বিচার ধরে দেখা যাচ্ছে ভৈরবরাগের রূপ ষড়জ থেকে তু'টি স্বরের পর মধ্যমের প্রাধান্যে যখন যথার্থভাবে তার রূপ প্রকাশিত হচ্ছে এবং মধ্যমের প্রয়োগ-নীতির প্রভাবে রাগের মহিমময় মূর্ত্তিটি গড়ে উঠছে তখন ওই স্বরই তার ন্যায়সঙ্গত ও নীতিগতরূপে বাদীস্বর বলে স্বীকার করতেই হবে। এর উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্বরাঙ্কন, যথা,—স-ঋ-গ-ম, ম-গ-ঋ,-স, ঋ-গ-ম,-ম-গ-ঋ-স, স-ম,-ঋ-স, গ-ঋ-ম-গ-ম,—ম-ঋ-স, ঋ-স-ঋ-গ-ম, ঋ-ম-গ, ম-ঋ, গ-ম,-ঋ, গ-ঋ,-স, ইত্যাদি। রাগের এই

রূপাংশগুলির দ্বারা প্রাতঃকালের প্রকৃতিগত স্নিগ্ধ ও মধুর ভাবরূপের সংগে রাগের ভাবরূপের পরিচয় সম্বন্ধ যথার্থ হয়ে আছে—না, স-ঋ-গ-ম-প-দ, দ-প-ম-গ-গ-ম-প-দ, প-দ-ন-দ-প-দ, ন-দ-প-দ-প-ম-প-গ-ম-প-দ,—এই রকম স্বরাঙ্কনের উপর ধৈবতের বাদীত্ব শক্তিকে ধরে তার ন্যায্য অধিকার দিয়ে রাগের প্রকৃত ভাবময় মূর্ত্তি অঙ্কিত হচ্ছে? আমি নিশ্চয়ই করে বলব্ রাগরূপের যথার্থ লক্ষণ কি এবং তার তাৎপর্য্য ও প্রকৃতিগত সম্বন্ধ কি, সে বিষয় নিয়ে যিনি বিচার করে দেখতে পারবেন তিনি কখনই ভৈরবের বাদীস্বর ধৈবত হতে পারে না—এ কথাই বলবেন। প্রধান স্বরের গতায়তে বিঘ্ন না থাকলে এবং স্থায়ীভাবে ব্যবহার হলে কোমল স্বর বাদী হতে পারে না সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করেছি।

মধ্যম স্বরের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন মহাদেব। আর ভৈরব রাগের ধ্যানেও মহাদেবেরই রূপ বর্ণন আছে এবং শাস্ত্রে উল্লেখ আছে মহাদেবের মুখ থেকে সর্ব্বপ্রথম এই সুরের উৎপত্তি হয়ে ভৈরব নামকরণ হয়েছিল। এর মধ্যে যে সাধনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে তার কথা সপ্তস্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর প্রভাব বর্ণনায় কিছু উল্লেখ করেছি।

বাদীস্বর প্রসঙ্গে আরো দু'চার কথা,— পূর্ব্বাঙ্গের দিকে রাগের বাদীস্বরকে যথার্থভাবে পেয়েও উত্তরাঙ্গের কোন অন্য একটি রাগের বিশেষ ব্যবহৃত স্বরকে বাদী বলতে গেলে বাদীস্বরের নিয়ম নির্ণয় সম্বন্ধে এবং রাগের প্রকৃতরূপদর্শন সম্বন্ধে অজানা থেকে যাবে।

ভৈরব রাগের সমস্ত প্রাচীন এবং বর্ত্তমানের ধ্রুপদ-খেয়ালে দেখা যায় বাদীস্বরের গুরুত্বে মধ্যম স্বরেরই প্রভাব বেশী। কয়েকটি গান ধৈবত স্বরের উপর সমের তাল থাকায় বাদীস্বর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস হয়। কিন্তু ওই সব গানেও আছে মধ্যম স্বরকে ধরে অর্থাৎ গ্রহস্বর করে আরম্ভ এবং যখন ম-গ-ঋ-, ঋ-গ-ম, ম-ঋ,—এই রকম সুর প্রকাশিত হয়, তখনই এনে দেয় অপূর্ব্বতায় রাগের নিবিড় ভাব-সম্পর্ক এবং যথার্থ রূপসম্বন্ধ ও মধ্যমের বাদীত্ব শক্তির প্রভাব। সুতরাং ওই সব গানের নজিরেও ধৈবত স্বরের বাদীত্ব অধিকার নেই, যদি আমরা বাদীর গুরুত্ব ও অর্থ স্বীকার করি।

এ সম্বন্ধে আরো একটা কথা,—আমার ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এটুকু বলতে পারি—যদি রাগকে পূর্ব্বাঙ্গ প্রধানের মধ্যে পাই তাহলে সেই রাগের রূপভাবের উপর রসলালিত্য বেশী প্রদান করে মনকে অধিকতর আনন্দ ও তৃপ্তির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়। শাল, তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল প্রভৃতি দীর্ঘকায়বিশিষ্ট বৃক্ষের সৌন্দর্য্য আছে সত্য এবং তাদের আঙ্গিক-দৃশ্য কবিভাবুকের মনকে আকৃষ্ট করে এ-ও সত্য কিন্তু আমরা আরাম ও তৃপ্তি পাই—বট, আম্র, অশ্বত্থ, কদম্ব, বকুল প্রভৃতির মত যে সব বৃক্ষ শাখা-পল্লবে সুশোভিত ও ধরিত্রী সন্নিকট হয়ে বিস্তৃত এবং সুন্দর মনোরম স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার সৃষ্টি করে আছে তার তলদেশে উপবেশন ও বিশ্রাম করে। তেমনি উত্তরাঙ্গ ও পূর্ব্বাঙ্গ রাগগুলিকেও ওই উদাহরণে ধরা যায়। এই তৃপ্তির ও মেজাজের আকর্ষণে শিল্পীরা উত্তরাঙ্গের

রাগগুলিকেও প্রথম আলাপে ও স্বরবিস্তারে পূর্ব্বাঙ্গ থেকেই রচনার সূত্রপাত করেন। অবশ্য গানের মধ্যে প্রায় সমস্ত উত্তরাঙ্গের রাগ যথাযথ নীতিনিয়মের উপরই রচিত হয়ে আছে।

ভৈরবরাগের মধ্যম বাদীর প্রভাব এতবেশী বিস্তৃত যে আমাদের দেশে বৈষ্ণব, বৈরাগীরা অতি-প্রত্যুষে যখন ভগবানের নাম গান ক'রে গ্রাম পরিক্রমণ করে তখন তাদের কণ্ঠে মধ্যমের বাদীত্বে ভৈরবরাগের সুরই প্রকাশ পায়। সেই গানের অংশ,—

"সা মা মা গা | ঋা-া-সা-া | ন্া-ন্া সা-া | দ্া-া-ন্া-া | সা মা মা-া | মা গা পমা-া | গা-া-ঋা-া |
ভ জ গো ০ বি ০ ন্দে০ প র মা০ ন ০ ন্দে ল হ গো০ বি ০ ন্দে র না ০ ম

গা-া-মা-া | "
রে ০ ০০

এই সুরে একটি খুব পুরাতন হিন্দী খেয়াল গান আছে। সেই গানের হুবহু সুরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন "বিমল-প্রভাতে মিলি একসাথে বিশ্বনাথে কর প্রণাম······।" সমস্ত বিচার ও পরিচয়ের দ্বারা ভৈরবরাগের মধ্যম স্বরই বাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

এই আলোচনায় রাগের ডাক নাম নিয়ে কিছু বলবার আছে। সঙ্গীতচর্চারত অনেক ব্যক্তির মুখে শুনি ভৈরবরাগকে তাঁরা ভ্যাঁয়রো বলে ব্যবহার করেন। আগে আমাদের দেশের কোন সঙ্গীতজ্ঞই এইভাবে উচ্চারণ করতেন না এবং কোন শাস্ত্রীয়গ্রন্থে এবং আমাদের দেশের গুণীদের গ্রন্থেও ভ্যাঁয়রো নাম লিখিত হয় নি। তাছাড়া উত্তম নামকে এরকম ভাবে বিকৃত করে আমরা ডাকবই বা কেন? যাঁরা ভৈরবকে ভ্যাঁয়রো বলেন তাঁরা কি নামের মাহাত্ম্য ও তার প্রভাবশক্তির মধ্যে যে কল্যাণ আছে সেই দিকে স্মরণ রাখার কথা বিস্মৃত হয়ে নিছক অন্যের বলাকে অনুসরণ করেই বলেন? অর্থাৎ ওই রকম বলা শুনে তাঁদের মনের মধ্যে কি এসে গেছে ভৈরবনাম আদি ও ভাগবত বিশুদ্ধ হলেও উচ্চারণটা বাংলার ধরণে হয়ে যায় বলে তাই তাঁরা ওইরকম ভাবে বলতে ও লিখতে সুরু করেছেন? তাই যদি হয় তাহলে এরপর কোন নামকরা ব্যক্তি যদি ভৈরবীকে ভৈরী বা ভৈবী বলেন তাহলে আমরাও তাই বলতে বোধ হয় ইতস্তত করব না। যদি কেউ বলেন ভ্যাঁয়রো (ভৈঁরো) কথাটা সহজ সংক্ষেপে হয় বলেই এইভাবে ব্যবহার করা হয়। এ উত্তর তাঁদের যথাযথ নয়, কারণ নাগধ্বনি, সুখরাই, ভীমপলশ্রী, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগগুলির নামোচ্চারণ ভৈরব থেকে বেশ বড়।

আমার মন বলে—প্রকৃত নামের ডাকে যদি কোন নির্দিষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে তার প্রভাবে নিশ্চয়ই মনের কল্যাণ এনে দেয়। আমাদের দেশে এই প্রভাবক্রিয়ার সম্ভাবনার কামনা নিয়ে সন্তানদের দেব-দেবীর নাম রাখার আকাঙ্ক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল।

সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয়গ্রন্থ 'সঙ্গীত-রত্নাকর', থেকে ভৈরবরাগের ধ্যানটি উদ্ধৃত করে দিলাম। ধ্যানটি পাঠ করলেই রাগের নাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয় এবং চিত্তে পরম ভক্তিভাবের উদয় হয়ে মনকে উর্দ্ধে তুলে দেয়।

> "শুভ্রাঙ্গঃ শুভ্রবাসাঃ শিরসিশশিধরঃ শৃঙ্গবাদ্যশ্চহারী
> শম্ভোর্বক্ত্রাব্জজাতো ধৃতগরলগলো ভৈরবো রক্তনেত্রঃ।
> হস্তে শূলং কপালং জলজলজমনিময়ং কুণ্ডলে কর্ণ যুগ্মে
> তারং জুটেজ্জটানাং শরদি সুরগণৈর্গীয়তে প্রাতঃরেষঃ ॥"

ভৈরব রাগের এই ধ্যানের বর্ণনা সম্পূর্ণ মহাদেবের। সেই ধ্যানমূর্ত্তির ভৈরব নামকে আমরা ভ্যাঁয়রো বল্‌ব ? এবং এইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে রাগের মাহাত্ম্যপূর্ণ আসল নাম ভুলিয়ে দেবো ? অনুকরণ ও অনুসরণ নিজের ধ্যান-চিন্তা ও বিচার বুদ্ধিকে সরিয়ে রেখে নয়।

আর একটা কথা,—আজকাল দেখতে পাই—ভৈরব রাগের উপর এক এক সময় কড়িমধ্যম লাগিয়ে বলা হচ্ছে 'প্রভাত ভৈরব'। কি করে এমনভাবে নামকরণ ও সুর করণের চিন্তা মনে আসে তাই ভেবে বাস্তবিকই খুব আশ্চর্য্য লাগে। স্বভাবতই প্রশ্ন লোকে করবে, এই সুরকে প্রভাতভৈরব বললে তাহলে তাঁদের মতে সময়ের স্থানান্তর নিয়ে আরো কয়েক প্রকার ভৈরব আছে। সত্যকারের ভৈরবরাগকে তাঁরা তাহলে প্রভাত সময়ের বলে গণ্য করছেন না, তাহলে তার স্থান কোন্ সময়ে দিচ্ছেন ? এই সব আশ্চর্য্যকাণ্ডর মধ্যে আর একটি দুঃখের বিষয় থাকে, গায়ক-বাদকরা সুরের নাম সম্বন্ধে যা বলেন কর্ত্তৃপক্ষের ঘোষকদের তাই আওড়ে যেতে হয়; তাঁদের এই সব বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও কোন কিছু বলবার নেই। ১২।১০।৬৮ তারিখে রেডিওতে একজন খেয়াল গাইলেন, আদিম-ভোঁরো নাম দিয়ে। সুরের রচনায় কেবল কোমলঋষভ, বাকী সব প্রধান স্বর ছিল। কোন দিক দিয়েই কখনও শুনিনি এই রকম সুরে ওই রকম নাম। আদিম বলতে সৃষ্টির আদি যুগকেই বুঝায় বলে জানি। সুতরাং সে সময় আদিম মানুষের দ্বারা রাগ সৃষ্টি হতে পারে বলে কোন প্রকারেই সম্ভাবনায় আসে না। রাগসৃষ্টি বহুপরে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশের সময় হয়েছিল—এই প্রমাণে আসে। এই ধরণের নাম প্রচারক গায়ক-বাদকরা বোধ হয় মনে করে থাকেন যা খুসী একটা নাম দিয়ে যা খুসী একটা সুর গেয়ে দিলে বলবার কেউ নেই। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা উচিত প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কাছে নিজের পরিচয়ই সত্যকারের পরিচয় এবং সে রকম বিজ্ঞব্যক্তির অভাব নেই এ কথা মনে থাকা অত্যাবশ্যক। যাই হোক্ মোটের উপর, শাস্ত্রীয়সংগীতের মত সর্ব্বোচ্চবিদ্যাকে যথাযথ-ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই সব নানান যথেচ্ছাচার ও গর্হিতকাণ্ড থেকে রক্ষা করবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পরিচালনা বোর্ড থাকা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। নচেৎ ক্রমশঃ যা-খুসীর মধ্যে দিয়ে এই বিদ্যার সমূহ ক্ষতি হয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত এবং বিচারবোধ ও জ্ঞানহীন করে তুলবে। অনেক আগে থাকতেই বহু অশিক্ষিত শিল্পীদের হাতে পড়ে শাস্ত্রীয়সংগীতের বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু ক্ষতি হয়েছে। এখন আমাদের সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে- আরো বড় করে তুলতে হবে। কারণ সঙ্গীত বিদ্যা এখন শিক্ষা বিভাগের সর্বস্তরে এসেছে।

রাগ রামকেলী (২)

জাতি ষাড়ব-সম্পুর্ণ। আরোহণে ঋষভবর্জ্জিত। সরলগতি। বাদী পঞ্চম, সংবাদী ষড়জ। কোমল-ঋষভ ও ধৈবত। সময় সময় ভৈরবের মত কোমল নিষাদ বক্রভাবে ব্যবহার হয়। উত্তরাঙ্গ-প্রধান। মধ্যম ও নিষাদ তুর্ব্বল। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। শুদ্ধ শ্রেণী।

স্বরগতি বা ঠাট,—স-গ-ম-প-দ-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-ম-গ-ঋ-স। কয়েকটি প্রধান রূপাঙ্গ,—স-গ-ম-প-দ-প। প-ম-গ-ঋ-গ-ম-দ-প। প-দ-ম-ণ-দ-প-ম-প-দ-ম-প। ন-দ-প-স-গ-ম-প। প-গ-ম-ণ-দ-প। র্স-ন-দ-প-ন-দ-প-দ-প। ন-র্স-দ-প। গ-ঋ-স-গ-ম-দ-প ॥

আলোচনা,—আরোহণে ঋষভ বর্জিত এবং পঞ্চমস্বরের বাদীত্বে এই রাগের স্বররূপ ভৈরব হতে অনেকখানি পৃথক হয়ে আছে। ভৈরব থেকে প্রথম প্রয়াসে এই রাগের যে উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এজন্য এই রাগের ভাবরস অনেকখানিই ভৈরবের মত এবং সময় নির্ণয়ে তারই সান্নিধ্য পরিবেশের উপযোগী হয়েছে, প্রয়োজন মত সামান্য পরে ধার্য্য করে। ওই সময়োপযোগী রামকেলী রাগের স্বভাবগত রূপের উপর যাঁরা কড়িমধ্যম ব্যবহার করেন তাঁরা কোন্ নীতি ও যুক্তিতে এ রকম স্বভাব বিরুদ্ধ স্বর ব্যবহার করেন তা কোন বিচার-বুদ্ধিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোমল ঋষভ ও ধৈবতের সংগে কড়িমধ্যমকে যুক্ত করে প্রধান গান্ধারের সহযোগীতায় তখন সুরের যে ভাব-রস উৎপন্ন হয় তা বিশেষ করে সান্ধ্যকালীন রাগগোষ্ঠীর সংগেই তার রূপ সম্পর্ক এসে যায়,—প্রাতঃকালের সংগে নয়। প্রাচীনত্বের প্রমাণে বলা যায় কোন ধ্রুপদে কড়িমধ্যমের ব্যবহার আমি আজ পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি। এমন কি কোন প্রাচীন খেয়ালে এবং আগেকার গুণীদের কাছেও কড়ি-মধ্যমের ব্যবহার হয়নি। রবীন্দ্রনাথের রচিত হুবহু খেয়াল ভাঙ্গা যে গান আছে রামকেলী রাগের উপর তাতেও আমার মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের সময় থেকে প্রাচীন গায়কদের সংস্পর্শে আসার বর্ষকাল এবং তার পূর্বের সূত্র ধরে নিরূপণ করলেও দেখা যাবে রাগরূপের নীতিধারার প্রকৃত প্রমাণ কয়েক শত বৎসরের মত হয়ে আছে এবং সেই নীতি-ধারা একইরূপে প্রবাহিত হয়ে এসেছে বিষ্ণুপুর ঘরাণায়।

যাইহোক্—রামকেলীতে যখন কড়িমধ্যমের সুর কাণে আসে তখন মনে হয় যেন মধুর রসের সংগে হঠাৎ লবণরসের স্বাদ এসে বিস্বাদে ভরে গেল।

কয়েকটি বড় রাগের বিপুল শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে তাকে জনকরূপে ধার্য্য করে নিয়ে এবং তার স্বভাবও প্রকৃতিগত ধারাকে অনুসরণ করে আরো যে যে রাগের সৃষ্টি হয়েছে সেই সব রাগের কোনটাই তাদের জনক সদৃশ রাগের স্বররূপের ভাবগত প্রভাবসম্পর্ক ছাড়িয়ে যায় নি। যেমন প্রধান কানড়া হতে আরো সতেরটি কানড়াগোষ্ঠীর রাগ সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই আকৃতি ও প্রকৃতিতে তেমন শক্তিশালী না হলেও এবং সীমাসংকীর্ণ রূপে গঠিত হয়েও তাদের কানড়া-

সুরের ঘরওয়া পরিবেশের সংগ ছাড়া করে সৃষ্টি করা হয়নি, অর্থাৎ কোমল সুরের ভাব-রস নষ্ট হয়নি। এই নীতি নিয়মের মধ্যে দিয়ে বারমল্লার, নবমনট, সপ্তসারঙ্গ এবং আশাবরী গোষ্ঠীভুক্ত রাগগুলির ঘরওয়া পরিবেশের সংগে যে বেশ সদ্ভাব আছে তা লক্ষ্য করা যায়। এখন যদি এর অভাব ঘটতে থাকে তাহলে চিন্তাশক্তির একান্ত অভাব নিয়েই ঘটবে।

এস্থলে একটা কথা,—কানড়াগোষ্ঠীর কোন রাগে যদি কড়িমধাম বা কোমল ঋষভ ব্যবহার থাকত তাহলে আমি বলতাম রামকেলীতে, কামোদে কড়িমধ্যম এবং ছায়ানট, আলাইয়া, কেদাররাগে কোমল নিষাদের ব্যবহার দেখে নীতি ও বিচারবোধের যে অভাব দেখতে পাচ্ছি, সেই দোষ তাঁদের উপরও প্রয়োগ হত। আগেই বলেছি—নিজের ধ্যান-চিন্তা ও বিচারবোধকে পশ্চাতে রেখে নিছক কারো অনুকরণ করার মত দুর্বলতা আর নেই। যদি দেখি আমার ধরাণাতেও কোন কিছুতে ভুল ত্রুটি আছে তাহলে তাকেও বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সংশোধন করে নিতেই হবে এবং তা করতেও হয়েছে।

রামকেলীতে কড়িমধ্যম ব্যবহার নিয়ে আর একটা কথা,—হ্ম-প-দ, হ্ম-প-দ-প, হ্ম-প-দ-ন-দ-প, —এই ধরণের প্রত্যেকটি বিভাগীয় অংশে সুরের যে রূপপ্রভাব উৎপন্ন হয় তাকে কি আমরা রামকেলীর প্রাতঃকালীন স্বভাবগত রূপের সংগে সম্পর্ক আছে বলে মনে করতে পারি? সাধারণ বোধ নিয়েও ধরে নিতে দেরী হবে না যে, রামকেলীর রূপে কড়িমধাম ব্যবহার হতেই পারে না, ওই স্বরগুলির সুররূপ সান্ধ্যকালীন শ্রীরাগের মতই মনে হবে।

ন্যায় যুক্তির উপর দিয়ে মানতেই হবে আমরা অপপ্রয়োগ করেই রামকেলীতে কড়িমধ্যম ব্যবহার করে রাগের সত্যরূপকে নষ্ট করে ফেলেছি। এই রকম অনেক রাগের মধ্যেই চিন্তার অবকাশ না রেখে স্বরের অপপ্রয়োগ এসে যাচ্ছে। রাগরূপের উপর আমাদের প্রকৃত দখল রেখে বিচারবোধ রাখতেই হবে—কোন স্বর কোন রাগের উপরে আনলে তার যে সুররূপ আছে তা সেই রাগের স্বভাব-ধর্ম্মীস্বর না অন্য রাগের স্বভাবধর্মী সুরের প্রকাশ এসে যায়, কিংবা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

কোন স্বর যদি রাগরূপের সংগে মিশে না যায় পৃথক ভাবে দেখা দিচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে সে স্বরকে নিশ্চয়ই সেই রাগে আসতে দেওয়া সমীচীন হবে না। শাস্ত্রকাররা বলেছেন—"...একং সঙ্গীত বিজ্ঞানং চতুবর্গ ফলপ্রদম্।" সংগীতের মধ্যে যে বিরাট বিজ্ঞান আছে তাকে জানতে হলে অন্তঃদৃষ্টি নিয়ে বুঝবার দরকার।

যোগীয়া (৩)

কোমল-ঋষভ ও ধৈবত। সরলগতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। জাতি-ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে গান্ধার-নিষাদ বর্জিত। উত্তরাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধশ্রেণী। বাদী পঞ্চম, সংবাদী ষড়জ। মুদারার মধ্যম এবং তারার ষড়জ বলীস্বর।

ঠাট—স-ঋ-ম-প-দ-র্স-র্স-ন-দ-প-ম-গ-ঋ-স ॥ কয়েকটি প্রধান রূপাঙ্গ-যথা,—স-ঋ-ম-প, স-ঋ-প-ম, প-ন-দ-প, দ-র্ঋ-র্স-ন-প-দ-প, ঋ-ম-প-দ-ম-গ-ঋ, স-ঋ-গ-স, ম—প-দ-র্স, স-ঋ-প-ম-গ-স-ঋ-গ-স ॥

আলোচনা,—ভৈরবরাগের নীতি-গতিযুক্ত স্বররূপ হতে কোন কোন স্বর লঙ্ঘন বা বাদ দিয়ে যে কয়টি রাগের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে রামকেলী, যোগীয়া, কলিঙ্গড়া'র মত রাগগুলিকেই বিশেষভাবে ধরা যায়। রাগরূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে তার তথ্যের উপর নির্ভর করে বিচার আলোচনার দ্বারা দেখা যায়— কোমল স্বর সংযোজিত রাগসমূহের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই মানুষের সাধনালব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট। যেমন স্বভাব ও প্রকৃতিগত প্রধান সুরের দ্বারা উদ্ভূত হয়ে যে সকল সুর রাগরূপের মূর্ত্তি নিয়ে প্রথমে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাকে কণ্ঠে আহরণ করে তার এক একটি থেকে আরো রাগের সৃষ্টি করেছিল—তেমনিভাবে সৃষ্টি পথের নিদর্শনকে অনুসরণ করে কোমল সুর নিয়ে যখন রাগ তৈরি হল তখন সেই রাগের এক একটির প্রথমটিকে ধরে আরো বহু রাগের সৃষ্টি হয় এবং হতে থাকে। যেমন ভৈরব রাগ থেকে পূর্ব্ববর্ণিত রামকেলী ইত্যাদির জন্ম। পরে কোমল স্বরের ওই রাগ থেকে নূতন নূতন রূপসৃষ্টির প্রয়াস নিয়ে গন্ধার-নিষাদের কোমলত্বের সন্ধান পেয়ে চারটি কোমলকে যুক্ত করে ভৈরবী নাম দিয়ে এক অপূর্ব্ব রাগতৈরি হয়ে উঠে। তারপর চার কোমলযুক্ত ভৈরবীকে আর এক আকৃতিতে গড়া হল আরোহণে ঋষভ, নিষাদকে বাদ দিয়ে আশাবরী নামে। এই প্রণালী ধরে আশাবরীতে ঋষভ কোমলের পরিবর্ত্তে প্রধান ঋষভ দিয়ে আরোহণে শুধু মধ্যম ত্যাগ করে পঞ্চমের উপর বাদীত্ব শক্তি দিয়ে সৃষ্টি হল জৌনপুরী নামে এক রাগ। তারপর ওরই স্বর-বিন্যাসের কিছু কিছু তারতম্য রেখে এক এক নামে এল গান্ধারী, গুর্জ্জরী, দেশী প্রভৃতি আরো অনেক।

ক্রমে প্রথম প্রহরের শেষ সময়ের প্রকৃতির স্বভাবরূপের সংগে মিলন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বর স্থাপন করে অনুসরণীয় পথে তোড়ীরাগের জন্ম হয়। অবশ্য প্রত্যেকটির নির্দিষ্টরূপকে যথাযথভাবে স্থায়ী করে রাখবার জন্য নিয়ম-নীতির উপর তাদের রূপাবয়বকে বিজ্ঞান সম্মত করে রাখার সব কিছুই ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সৃষ্ট রাগগুলিকে সময়ের সংগে নিবিড় সম্পর্ক রেখেই গড়া হয়েছিল। সাধক শিল্পী দ্বারা সৃষ্ট বড় বড় রাগগুলির মধ্যে শুধু মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য ও বিরাটত্ব থাকাই নয়—প্রত্যেকটির মধ্যে আধ্যাত্মিক রূপভাবও পাওয়া যায়। এই সব রাগের স্রষ্টারা সত্যই যে বড় বড় ভাবুকসাধক ও রাগ বিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ তাঁদের বড় বড় সৃষ্ট রাগগুলির মধ্যে দিয়ে রেখে গেছেন। যে যে রাগের রূপ প্রভাবের মহিমায় সংসারের অলিক চিন্তা সরে যায় এবং নিয়ে আসে অপার আনন্দ ও ধ্যানস্থ করে রেখে দেয় সেই সেই রাগের মূর্ত্তি তো শুধু সুরের মূর্ত্তিই নয়—তার মধ্যে থাকে তাঁর স্বরূপের সন্ধানও।

আগের তথ্য আলোচনার বিষয়ের উপর কেউ যদি প্রশ্ন করেন পূর্ব্বোক্ত রাগগুলির আদি বা জনক ভৈরবকে না বলে যদি ভৈরবী থেকে হয়েছিল বলা যায় তাহলে ভুল কিসে হবে ? এর উত্তর,—

প্রাতঃকালে সূর্য্যের প্রথম উদয় মুহুর্ত্তে প্রকৃতির ভাবরূপের সংগে ভৈরব রাগের রূপভাবের মিলনই যথার্থভাবে সামঞ্জস্য পূর্ণ। ভৈরবীর স্থান তার অনেকখানি পারে। সময় নির্ণয়ের এই নিরাকৃত ব্যবস্থার মধ্যে কোন সন্দেহই আসে না। ভৈরব রাগের—স-ম,-গ-ঋ-স, স-ঋ-গ-ম, ম-গ-ম-প, প-ম-গ-ঋ, গ-ম-ঋ-স,—গ-ম-ণদ-প-দ-ম-প-গ-ম, গ-ঋ-স ; মীড় ও আশযুক্ত করে এই সুরের রূপ ঠিক সেই মূহুর্তে যেন মনে হয় তাঁর চরণে মাথা নেবে আসছে এবং প্রাত্যহিক কার্য্যের প্রেরণায় জীবন-সত্তায় যেন আনন্দ উজ্জীবিত করে দেয়।

যোগীয়া রাগ সম্বন্ধে আরো হু'চার কথা বলার আগ্রহ আছে। এই রাগটির সুরের রূপ মনকে আলোড়িত ক'রে যেন টেনে নিয়ে যায় গিরিসংলগ্ন তপোবনের ধ্যানমগ্ন ঋষি সন্নিকটে। মন যেন—সেই পরিবেশে ঘুরতে থাকে। প্রকৃতির এইরূপাঞ্চলের স্বভাবগত পাহাড়ীরাগের বিয়োগবিধুর প্রভাব যোগীয়ার সুরে মিশেছে বলেই মনে এই ভাব বিশেষ করে এনে দেয়। কোমলের মধ্যে দিয়ে সেই সুরের প্রভাব আমেজ, যথা,—স-ঋ-প-ম-গ-স-ঋ-গ-স, ন-দ-প-দ-ম-গ-স ঋ-গ-স, ঋ-ম-প-দ-প-ম-গ-স-ঋ-গ-স, স-ঋ-ম—প-দ-ম-গ-স-ঋ-গ-স-ঋ-স। যোগীয়ার এই প্রকৃত সুরের রূপাংশগুলি যদি প্রধান ঋষভ ও ধৈবত দিয়ে প্রকাশ করা যায় তাহলে মনে হবে পাহাড়ীরাগের সুর শুনছি। তত্রাচ কোমলের মধ্যেও তার নিজস্বরূপের যে প্রভাব আছে তা বেশ বুঝা যায়। সুরের এই রূপভাব মনে আসা সত্বেও তার সঠিক নির্দ্ধারিত স্বর যোগীয়ায় না থাকার জন্য শ্রেণীপর্য্যায়ে সালঙ্কে ফেলা গেল না।

কেউ কেউ যোগীয়ায় কোমল নিষাদও খুব কম সময়ের উপর বক্রভাবে ব্যবহার করেন, কিন্তু আমার মতে ওই স্বরের ব্যবহার না রাখাই ওর রূপের স্বভাবধর্ম সঙ্গত কাজ হবে। কারণ যোগীয়ার রূপে পূর্ব্বোক্ত পরিবেশের যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে—তার সেই তপস্বীরূপের উপর কোমল নিষাদের সুররূপ স্বভাবধর্মী ও উপযোগী নয়।

এই প্রসঙ্গে কোমল স্বরের প্রয়োগ ঘটিত বিষয়ের কথা ধরে আর একটা বিষয় বলবার আছে,—দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কোমল যুক্ত যে সকল রাগ আছে তাতে প্রকৃত কোমলের সুরই প্রকাশ পাবে, নচেৎ ওই সব রাগের রূপ যথাযথভাবে রসসৃষ্টি করবে না। অর্থাৎ তাদের সময়োপযোগী হয়ে গঠিত সুরের রূপে যে স্নিগ্ধ-সরস ভাব আছে তাকে বিঘ্নিত করা হবে। এইজন্য এর প্রমাণেও পাওয়া যায় ওই সময়ের কোমল যুক্ত রাগগুলিও সৃষ্টিতে আদি। তারপরে অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরের পর মধুমাধবী এবং ভীমপলশ্রী রাগ হতে যে সমস্ত কোমলযুক্ত রাগ আছে সে সব রাগের কোমলস্বর স্বাভাবিক থেকে শ্রুতির উচ্চতা নিয়ে রাগরূপের উপর প্রকাশ থাকে—সময়ের সংগে যোগাযোগের তাৎপর্য্য রেখে। প্রধান কোমল স্বর বিশিষ্ট রাগে কখনই তীব্রকোমল ব্যবহার হবে না, কিন্তু তীব্রকোমল স্বরবিশিষ্ট রাগে কোন কোন সময় মেজাজের প্রেরণায় যদি প্রধান কোমল আকর্ষণ করে তাহলে দেখতে হয় ঠিক প্রয়োজনের স্থানে এল কিনা। অর্থাৎ সেই স্বর রাগরূপের স্বভাবধর্মে ক্ষতি না করে রসসৌন্দর্য্য বাড়াতে পারল কি না।

আর একটি বিষয়ের কথা আগে জানান হয়নি,—কেউ কেউ মনে করেন স্বরের আরোহণের উপরই রাগকে চেনা যাবে,—অবরোহণস্বরের অপেক্ষা রাখবে না। এ ধারণা সকল রাগের ক্ষেত্রে মোটেই সত্য নয়। বিশেষ করে শালঙ্ক ও সংকীর্ণশ্রেণীর রাগসমূহের পরিচয়ে পাওয়া যায় উক্ত গতির উপরই তাদের রূপ নির্ভর করে আছে। তাছাড়া এমনও দু'একটি রাগ আছে যাদের আরোহণের স্বররূপ অন্যরাগের কিন্তু অবরোহণের স্বর কোন রাগের নয়—নিজস্ব হয়ে তৈরি,—এজন্য শালঙ্ক শ্রেণীতে ফেলা যায় না, অথচ সেই রাগ শুধু অবরোহণের স্বরসমূহের দ্বারাই পরিচিত হয়ে আছে। যেমন প্রাচীন মতের অকৃত্রিম 'মেঘরাগ'। এর আরোহণ সারঙ্গ রাগের এবং অবরোহণে সম্পূর্ণ পৃথক স্বরসত্তা নিয়ে আছে র্স-ন-প-ম-গ-র-স এই স্বরসমূহের সুররূপ। যোগীয়ারাগের আরোহণ এবং আশাবরীরাগের আরোহণ একই কিন্তু যোগীয়ার অবরোহণের সুরকে ধরেই তার রূপ পরিচয় নির্ভর করে আছে। আড়ানা, সুরট, জয়জয়ন্তীরাগেরও তাই। কল্যাণ রাগের রূপ আরোহণেই শুধু নির্ভর করে নেই—অবরোহণের স্বরকে ধরে যুক্তভাবে প্রয়োগের পর তার প্রকৃত রূপকে পাওয়া যাবে। এ রকম উদাহরণ বহু আছে।

রাগ কলিঙ্গড়া (৪)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ, আরোহণে ঋষভ পঞ্চম বর্জিত। কোমলস্বরে ঋষভ ও ধৈবত নিযুক্ত। গান্ধারবাদী, নিষাদ সংবাদী। সরলগতি। মধ্যপ্রকৃতিররাগ। শুদ্ধশ্রেণী। উত্তরাঙ্গ-প্রধান।

স্বরগতি বা ঠাট—স-গ-ম-দ-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—গ-ম-দ-প গ-ম-গ। স-গ-ম-দ-প-গ-ম-গ। র্স-ন-দ-প-ম-গ-ম-ন-দ-গ-ম-গ,—ম-গ-ঋ-স, ইত্যাদি।

আলোচনা,—এই রাগের গীতাদির মধ্যে কোন কোন স্থানে আরোহণে পঞ্চম ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত স্বরের আরোহণের উপর ব্যবহার স্বীকার করলে নীতি সঙ্গতভাবে উক্তরাগের ঠাট নির্মাণ যথাযথ হবে না। কারণ রামকেলীর ঠাটে ওই স্বর নির্মিত হয়ে আছে। সুতরাং এক রাগের স্বরগতি বা ঠাট আর এক অন্য রাগে হতে পারে না। আমার মনে হয় ওই স্বর কলিঙ্গড়ায় ঠিক নীতি বিচারের দ্বারা আসে নি, অনবধান বশতই এসেছে। যাইহোক্, দায়িত্ব নিয়েই নীতি-নিয়ম ধরে উক্ত রাগের ঠাট নির্মিত হল। এ স্থলে আর একটা কথা,—যে যে স্বরের সংযোগ নিয়ে কলিঙ্গগড়ার মূর্ত্তি প্রকাশ পায় তা'তে আরোহণে পঞ্চমের তেমন কিছু গুরুত্ব নেই, বরং বর্জনের উপরই যথাযথ গুরুত্ব আছে। রাগ-বিজ্ঞানের উপর অনুশীলন করে যে বিচার-যুক্তি পাওয়া যায় তাতে প্রত্যেক রাগের স্বর গতিতে ঠাট নির্মাণ পৃথকত্ব নিয়ে থাকবে—এই সত্যেকেই বুঝা যায়। তবে রাগের মূর্ত্তি যখন কণ্ঠে বা যন্ত্রে বিস্তৃত হয়ে তার রূপ ও প্রভাব প্রকাশিত হয় তখন কোন লঙ্ঘিত স্বর যদি ব্যবহারে এসে যায়—

স্বভাবগত প্রেরণায় এবং যদি মিশে যায় রাগরূপের তাৎপর্য্যের মধ্যে তাহলে বিশেষ দোষের হয় না, ব্যাকরণের আর্ষ প্রয়োগের মতই ধরে নিতে হয়।

উদাহরণ যেমন কলিঙ্গড়ায়—গ-ম-প-দ-ন-দ-প-গ-ম-গ, গ-ম-প-দ-প-গ-ম-গ,—এইভাবে বাদী-স্বরে গান্ধারের উপর স্থায়ীত্ব দিয়ে। আরোহণে পঞ্চমের এই রকম ব্যবহার রাগ রূপের কোন বিঘ্নতাই সৃষ্টি করছে না, তার এক বিশেষ কারণ বাদীস্বব যথেষ্ট প্রভাবের উপর আছে।

ভাটিয়ারী (৫)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ, আরোহণে মধ্যম বর্জ্জিত। সরলগতি। কোমল-ঋষভ ও ধৈবত। বাদী পঞ্চম, সংবাদী ষড়জ। গান্ধার ও নিষাদ বলীস্বর। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,—স-ঋ-গ-প-দ-ন-র্স, র্স-ন দ-প-ম-গ-ঋ-স ॥ প্রধান রূপাঙ্গ,—ম-গ-প-ম-গ-স-ন্। স-ঋ-গ-প-গ-ঋ-স। গ-প-দ-ম-গ-স-ঋ-গ-প-গ-ম-গ-স-ঋ-স, ইত্যাদি ॥

আলোচনা,—এই রাগেও আরোহণে সময় সময় মধ্যম ব্যবহার আছে দেখতে পাই কিন্তু পৃথকত্ব নিয়ে ঠাট ও রাগরূপ রক্ষায় আরোহণে ওই স্বর রাখা বিচারগত হয় না। প্রাচীন ধ্রুপদী নীতি-ধারায় এই রাগকে স্বমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবার বাসনা নিয়ে যখন তৈরী হয়েছিল—মনে হয় তখন আরোহণে নিশ্চয়ই মধ্যম ছিল না, কিংবা হয়ত রাগরূপ রচনায় স্বরের উঠা-নামার ঘোর-ফেরের উপর এবং বাদী-সংবাদীর পৃথকত্ব রাখার উপরই দৃষ্টি থাকত,—স্বরগতির উপর ঠাট নির্মাণের উপর যে নীতি-বিজ্ঞান আছে এবং রাগরূপকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে রাখবার যে ব্যবস্থা ও আবশ্যক আছে তার দিকে দৃষ্টির অভাব ছিল। কিংবা এমনও হতে পারে আরোহণে মধ্যম ব্যবহার ছিল না, ক্রমে মুখে মুখে গানশিক্ষা করে তার প্রচারের মাধ্যমে ইচ্ছাগত হয়ে স্বরের এইরূপ অপপ্রয়োগ ঘটে থাকবে। এইরূপ অবস্থার পরিণতি ঘটে যাওয়ার বিষয় অনেক রাগের মধ্যে বিচার দৃষ্টি দিয়ে বেশ বুঝা যায়, বিশেষ করে এখন।

বর্ত্তমানে প্রচারিত ভাটিয়ারী রাগ সম্বন্ধের কথা,—আগেকার গুণীসম্প্রদায়ের মধ্যে মঙ্গলরাগের রূপ যেভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছিল এবং প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে সেই স্বররূপ যেভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে, অর্থাৎ ভৈরব ও বিভাসের যুক্তরূপ অঙ্কিত হয়ে, তাকেই এখন রাগ ভাটিয়ারী বলা হচ্ছে। মঙ্গলরাগের রূপ এখনকার শিল্পীরা কি রকমভাবে তৈরি করে নিয়েছেন তা আমার জানা নেই।

ভাটিয়ারী রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা গেছে, ভট্টিহরি নামে এক গায়ক ছিলেন,—তিনি নিজের নাম দিয়ে ভৈরবের সুরের উপর কিছু তফাৎ রেখে এই রাগ রচনা করেছিলেন। এই রাগটির ধ্রুপদ পশ্চিমের কোন ওস্তাদের দ্বারা বিষ্ণুপুর ঘরাণায় যখন আসে তখন সেই ওস্তাদই এই সংবাদ দিয়েছিলেন।

ভাটিয়ারীর এই সুরে তিন স্বরের দ্বারা তার মূর্ত্তি চিহ্নিত করতে পারে যথা—ঋ-গ-প,—অবশ্য এর এই রকম স্বররূপে সান্ধ্যকালীন রাগের রূপপ্রভাব এসে যায়। যাইহোক মোটের উপর ওর স্বভাবগত স্বরের প্রভাবে তিন স্বরের উপর রাগকে যখন চিনিয়ে দিতে পারছে তখন বুঝতে হবে মধ্যম বর্জ্জিত হয়ে নীতি বিজ্ঞান নিয়েই রচিত হয়েছিল, সুতরাং এই রাগের নামে এই সুরের রূপই আদি এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গালী (ঙ)

জাতি ঔড়ব,—মধ্যম-নিষাদ বর্জ্জিত। ঋষভ ও ধৈবত কোমল। বাদীপঞ্চম—সংবাদীষড়জ। শুদ্ধশ্রেণী। সরল গতি। বড় প্রকৃতির রাগ বলা চলে। পূর্বাঙ্গ প্রধান। তিন স্বরে মূর্ত্তি এইভাবে হতে পারে—প—গ-ঋ।

ঠাট—স-ঋ-গ—প—দ-র্স—র্স—দ—প—গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—প-গ-স-ঋ-স। গ—প-স-ঋ-প—গ-ঋ-স। গ-ঋ-স-প-গ-প-দ-প। স-প-গ-ঋ-গ,—ঋ,-স।

আলোচনা,—প্রাচীন মতে এবং ধ্রুপদের ভেতর এই রাগটির রূপ বিস্তারের ক্ষমতা নিয়ে শক্তিশালী হলেও পাঁচ সুরের সমন্বয়ে সুরের যে রূপভাব উৎপন্ন হয় তাতে প্রাতঃকালের সম্পর্কের সংগে যথাযথ মিলন হয়ে উঠে না,—সন্ধ্যার দিকেই যেন টেনে নিয়ে যায় শ্রীরাগের রূপ মেজাজ ধরে।

এই রাগটির সৃষ্টি, আদি ও অকৃত্রিম বিভাস রাগের নিষাদ বর্জ্জিত করে উক্ত কোমল দিয়ে কিংবা ভূপালীর উপর ওই কোমল ব্যবহার করে নূতনত্বের প্রয়াস নিয়েই হয়েছিল বলেই মনে হয়। তবে সত্যের ভিত্তিতে বেশী সম্ভাব্য ভূপালীকে ধরেই হয়েছে। সেই জন্যই প্রভাতের সংগে সুরের ভাবধারা নষ্ট হয়েছে এবং এ রকম রচনা সময়ের ভিত্তিতে যথাযথ হয়নি।

আদি বিভাসকে অজানা থেকে গিয়ে কিংবা ইচ্ছে করে ত্যাগ করে উক্ত বঙ্গালী রাগকে এখন বিভাস বলা হচ্ছে। বঙ্গালী রাগকে মতান্তরে বিভাস বলে এ কথা আমি আগে কখনও শুনিনি এবং তাঁরা বঙ্গালীরাগ কোন্ সুরের রূপকে বলেন তাও জানা যায়নি। আমার পিতামহ শুনেছিলেন বঙ্গালী রাগটি নাকি বাংলা দেশের কোন সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। যাই হোক্—বঙ্গালী রাগ ধ্রুপদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, অথচ বিভাস নামে ওই রকম সুরের মতান্তর নিয়েও কোন ধ্রুপদ আমরা দেখতে পাইনি। আমাদের জানা প্রাচীন বিভাসের সুরে বহু ধ্রুপদ-খেয়াল রচিত হয়ে আছে। বঙ্গালী রাগের উপর বিভাস নাম কি করে অর্পে গেল তার মধ্যে যদি কিছু কারণ থাকে তাহলে মনে হয় প্রাচীন বিভাসের আদি পরিচিত রূপ জানা না থাকায় এবং বঙ্গালী রাগের সন্ধানে অপারগ থাকার কোন ঘরাণার দ্বারা ওই সুরের উপর বিভাস নাম এসে গেছে এবং আসল বিভাসকে দেশকার নামে

ফেলে, দেশকারের সুর অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। আগেই বলেছি সত্যানুসন্ধানের অভাব বশতঃই এই রকম ভাবে মতান্তর ও রাগরূপের বিভ্রাট ঘটে এসেছে। রাগের সত্যকারের পরিচয় প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা তা আগে দেখা দরকার, তবেই মতান্তরের উপর সৃষ্টি সম্ভাবনার বিচার থাকবে।

মঙ্গল (৭)

জাতি ষাড়ব-সম্পুর্ণ,—আরোহণে নিষাদ বর্জ্জিত। কোমল ঋষভ। ধৈবতবাদী, গান্ধার সংবাদী। সালঙ্ক শ্রেণী,—ভৈরব ও বিভাসরাগের সংযোগে এর উৎপত্তি। উত্তরাঙ্গে বিভাসের রূপ। সরল গতি। মধ্যাকৃতির রাগ। তিনস্বরে রাগ নির্ণয়—যথা, ধ-গ-ঋ।

ঠাট,—স ঋ-গ-ম-প-ধ-র্স-র্স-ন-ধ-প-ম-গ-ঋ-স ॥ প্রধান রূপাঙ্গ,—ঋ-ম-প-ধ-প-ম-গ-ঋ-স। ধ-প-ধ-র্স-ন-ধ-প-ম-গ-গ-ঋ-স। স-ঋ-গ-ঋ-গ-ম-প-ধ। প-ন-ধ-প-ম-গ-ঋ-স ॥

আলোচনা,—উক্ত দুটি রাগই প্রভাতী আবহাওয়ার সংগে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থাকায় এবং ভৈরব-রাগের প্রভাব বেশী থাকায় প্রকাশ সময়ের স্থান ধার্য্য হয়ে আছে ভৈরবের ব্যবহার পরিবেশের মধ্যে। ভৈরব, ভৈরবী, আশাবরী—এই রকম কোমল স্বভাবযুক্ত রাগের উপর প্রধান স্বরবিশিষ্ট রাগকে নিয়ে যুক্ত রাগ-রচনায় পরস্পরের রসসম্বন্ধ থাকে না। কোন দুটি রাগের মিলিতরূপে যদি নিবিড় সম্পর্ক না থাকে তাহলে সে রকম রচনার রাগরূপ নিরর্থক বলে মনে হয়। তাছাড়া ভৈরব বিভাসকে মঙ্গল নাম কি প্রয়োজনে দেওয়া আবশ্যক হল তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার মতে 'ভৈরব-বিভাস' নাম থাকলেই সহজ ও সঙ্গত হত।

আগেই জানিয়েছি—এই রকম সুরকে এখন ভাটিয়ারী বলা হচ্ছে।

বিভাস (৮)

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব,— আরোহণে মধ্যম-নিষাদ বর্জ্জিত এবং অবরোহণে মধ্যম বর্জ্জিত। বাদী ধৈবত, সংবাদী গান্ধার। সরল-গতি। বড় প্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট—স-র-গ-প-ধ-র্স-র্স-ন-ধ-প-গ-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-র-গ-প-ধ। প-ধ-প-ন-ধ। প-র্স-ন-ধ। ধ-প-গ-র-স-র-গ-র-গ-র-স। স-ধ,-প-র্র-র্স-ন-ধ,—গ-র,-স-র-গ-র-স ॥

আলোচনা,—প্রধান স্বরবিশিষ্ট বিভাসের রূপ প্রাতঃকালের কোমল স্বরযুক্ত রাগসমূহের পরিবেশে কি করে এবং কি প্রভাব নিয়ে আসতে পারল তার বিষয় আগে কিছু ব্যক্ত করেছি। এস্থলে আরো কিছু বলবার আছে। আগেই জানিয়েছি— প্রধান স্বরবিশিষ্ট সরল গতির রাগগুলির-

সুর প্রকৃতিগত স্বভাব থেকে এসেছে মানুষের কণ্ঠে। আমাদের এই বিভাসের আদিরূপটির যে সুর-প্রভাব আছে তাতে বেশ উপলব্ধি হয় রাঢ় ভূমের প্রকৃতির আবহাওয়ার সংগে তার ঘনিষ্ঠ মিলন সম্পর্কের কথা। এই অঞ্চলের বনানী এবং তার সম্মুখবর্ত্তী মৃত্তিকাবলীর যে দৃশ্য, তাতে মনে হয় যেন ধরিত্রীর বৈরাগ্যবিধুর তপস্বিনীর সেই মূর্ত্তির কাছে আসার বাসনা নিয়ে প্রাতঃকালে বিভাসের সুর যেন সাধকের কণ্ঠে সমুপস্থিত হয়ে বলে আমাকে নিয়ে এখন তাঁকে ডাকো। অন্তরের এই আকর্ষণীয় প্রেরণা মূলক কথা, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমের গ্রামপ্রান্তের দৃশ্যাবলীর সন্নিকটে ভাবানুরাগ নিয়ে বিচরণ না করলে উপলব্ধি হবে না।

বিভাস রাগের এই প্রার্থনা মূলক ও ভক্তিভাবময় সুর প্রভাতের প্রথমে সময়োপযোগীরূপে ভৈরব রাগের প্রভাব প্রতিপত্তির স্থানেও প্রকাশিত হতে পারে। এই রাগের বিচার যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত এই আদি সুর—বহুকাল হতে বাংলা দেশের আগমনী গানে, বাউল ও পল্লী-গীতিতে, কীর্ত্তনে, রামায়ণ ও কথকতার গানে, সাধক-কবিদের গানে বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়ে এ দেশের ভক্তি–সাধনার আবহাওয়ায় মিশে আছে। বিষ্ণুপুর ঘরাণায় যে সমস্ত ধ্রুপদ-খেয়াল বহু সংখ্যা নিয়ে পশ্চিমের নানান ঘরাণা থেকে এসেছে তাতেও ওই সুরই সংযোজিত হয়ে আছে। ভূপালীর উপর কোমল ঋষভ-ধৈবত-যুক্ত এখনকার বিভাসের সুর কি করে প্রচারিত হল—প্রাচীনের কোন্ প্রমাণের নিদর্শন ধারারপ্রবাহে তার তথ্যের সংবাদ খুঁজে পাইনি এবং প্রামাণ্যরূপে কোন প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যেও তার নজির নেই। যদি মতান্তরে ঐ রকম সুর প্রচলিত থাকত তাহলে নিশ্চয়ই বিষ্ণুপুরের মত প্রাচীন ঘরাণায় বা বাংলা দেশের অন্য কোথাও সামান্যতমও তার পরিচয় পাওয়া যেত।

আমাদের পরিচিত এই রাগের সুর আগেকার কতকগুলি বিশিষ্ট প্রাচীনঘরাণায় একই মতে ছিল, তার কয়েকটির নামের উল্লেখ। যথা,—সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ এর বীণা ও ধ্রুপদ গানের প্রাচীন ঘরাণা, বিখ্যাত ধ্রুপদী বিশ্বনাথজীর মহারাষ্ট্র ঘরাণা, কাশীর মিশ্রবংশের বহু প্রাচীন ঘরাণা, বিখ্যাত ধ্রুপদী দৌলতখাঁএর ঘরাণা ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলব—প্রাচীন রাগরূপের দেশপরিচিত ও জানিত মূর্ত্তিকে পরিত্যাগ করার পূর্বে সত্যকারের বিচার মন নিয়ে দেখা অত্যাবশ্যক—সেই রাগের স্বরমূর্ত্তি ত্যাগের যোগ্য কিনা এবং তাকে ছেড়ে যাকে ধরলাম তার দ্বারা আমার রাগরূপ রচনার কৃতিত্বের পরিচয়ে কি সাহায্য করছে এবং সত্যই সেই ধরা রূপটি সবদিক দিয়েই উন্নত কিনা। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে এখন দেখতে পাই, যেন শুধু নূতন ধরার মোহেই ধরা হচ্ছে।

উক্ত রাগের বিষয় নিয়ে আর একটু জানাবার আছে। বহুপূর্ব্বে প্রকৃতির স্থানমাহাত্ম্যের প্রভাবে বিভাসরাগের অবরোহণে এবং নিম্নস্বরের উপর বক্রভাবে প্রধান মধ্যম ব্যবহার হত। এখনও এই পরিচয় গ্রাম্যগীতে পাওয়া যায়। তার স্বররূপ যথা—গ-প-ধ-ন-ধ,-প-ম-গ,-র-স-স-র-গ-র-স, বক্রভাবে স-র-গ-মগ্-র-স। মধ্যমযুক্ত স্বরের এইরূপ পাহাড়ী রাগের বিয়োগ-ব্যথার ভাবরস আনে এবং

তাতে ভক্তিরস বিঘ্নিত হয়ে পড়ে বলেই মনে হয় পরে মধ্যম স্বরকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বর্জন করে দেওয়া হয়েছে। সেদিন বহুদূরের এক বেতারকেন্দ্র থেকে একটি গজল্‌গান শুনে বুঝতে পারলাম, তার সুর হুবহু আমাদের জানিত বিভাসের মত এবং তাতেও মাঝে মাঝে প্রধান মধ্যমের সুর পাওয়া যাচ্ছিল। স্বভাবগত মধ্যম স্বরের প্রকাশ দেখে মনে এই ধারণা এসে গেল, রাঢ়ভূমের মত ধরিত্রীর রূপদৃশ্যাবলী ভারতের বিভিন্ন স্থানের যেখানে আছে সেখানে এই সুর স্বভাবগত হয়ে রাগরূপের সন্ধান অজ্ঞানাদের কণ্ঠেও ধরা দিয়েছিল তাদের নিজস্ব গীতে।

ভৈরবী (৯)

জাতি সম্পূর্ণ। কোমল-ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। বাদী মধ্যম—সংবাদী ষড়জ। পঞ্চম বলীস্বর। সরলগতি। বড় প্রকৃতিররাগ। শুদ্ধশ্রেণী। পূর্বাঙ্গ-প্রধান।

ঠাট—স-ঋ-জ্ঞ-ম-প-দ-ণ-র্স-র্স-ণ-দ-প-ম-জ্ঞ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—ঋ-জ্ঞ-ম। ম-জ্ঞ-ঋ-স। স-ম-জ্ঞ-ঋ-স-দ্-ণ্-স-ঋ-জ্ঞ-ম-ঋ-স। স-জ্ঞ-ম-প-জ্ঞ-ম, ঋ-জ্ঞ ম, ম-জ্ঞ-ঋ-স ইত্যাদি।

আলোচনা,—বাদীর বিষয়ে মধ্যম স্বর ছাড়া ভৈরবীতে আর অন্য কোন স্বরই হতে পারে না—সত্যকারের রাগরূপের বিচারের উপর। এ কথা অন্যত্রে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এবং উক্ত প্রধান রূপাঙ্গের স্বররূপ অনুধাবনের দ্বারাও বুঝতে বিলম্ব হবে না। তিনস্বরে রাগরূপ নির্ণয়ে মধ্যমের প্রভাবই বিশেষ করে এসেছে।

ভৈরবী এমন একটি অপূর্ব্ব বিস্ময়কর মূর্ত্তির রাগ—যেন সুরের সুধাভাণ্ডের রসে তার রূপমাধুর্য্য-মণ্ডিত হয়ে আছে। এর রূপের উপর প্রয়োগ কৌশলে শাস্ত্রীয় লঘুশ্রেণীর গানে এবং যন্ত্রের সুরে বারটি সুরই প্রকাশিত হতে পারে, যা আর অন্য কোন রাগে হয় না, বা হবার উপায় নেই।

অনেকেই ভৈরবীরাগে খেয়ালগান যথাযথ বন্দেজ ও গায়কীর উপর হয় না বলে মনে করে গান না, কিন্তু ভৈরবীর প্রাচীন খেয়াল গান রচিত হয়ে আছে। ওই রাগে আমার মতে খেয়াল গানের বৈশিষ্ট্য বজায় না থাকার আশঙ্কা নেই।

আশাবরী (১০)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার-নিষাদ বর্জিত। বাদী তারাসপ্তকের ষাড়ব, সংবাদী পঞ্চম। কোমল-ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। সরল গতি। বড় প্রকৃতির রাগ। সালঙ্ক-শ্রেণী,—আরোহণের উপর স্থাপিত স্বর যোগীয়ারাগের এবং অবরোহণের ভৈরবীর।

ঠাট,—স-ঋ-ম-প-দ-র্স-র্স-ণ-দ-প-ম-জ্ঞ-ঋ-স ॥ প্রধান রূপাঙ্গ—দ-র্ঋ-র্স। র্ঋ-ণ-দ-প। ঋ-ম-প-র্স-দ-প। প-দ-র্ঋ-র্স। ণ-দ-ম-ঋ,-স। ঋ-ম-প-দ-ম-প-জ্ঞ,-ম-ঋ-স-। ঋ-ম-প-র্স। দ-র্স-র্ঋ-ণ-র্ঋ-র্স ইত্যাদি ॥

আলোচনা,—আশাবরী রাগের মূর্ত্তি উক্ত দুটি রাগের দুই দিকের স্বরগতি নিয়ে গঠিত হলেও অতি সুন্দর ভাবে মিশে গিয়ে এক নিজস্ব মূর্ত্তির মতই স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশকালীন উক্ত দুটি রাগের পৃথকভাবে চিহ্নিত রূপপ্রভাব এসে পড়ছে বলে তেমন গুরুত্ব নিয়ে বুঝা যায় না।

আশাবরী রাগের মধ্যে করুণ আবেগময় রূপের যে সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে তার প্রকাশ বিশেষ করে থাকে উত্তরাঙ্গের দিকে এবং তারাসপ্তকের ষড়জের উপর নির্ভর করে। তাই নিয়মসঙ্গত-রূপে ওই স্বরই বাদীস্বর রূপে গণ্য হয়েছে। অবশ্য রাগরূপের উত্থান পূর্ব্বাঙ্গের ষড়জ স্বর থেকেই হবে এবং তাই নিয়ম। ইচ্ছে করলে সমগ্র রাগরূপ মুদারার ষড়জকে কেন্দ্র করে আলাপের অর্থাৎ স্বর বিস্তারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা যায় কিন্তু উত্তরাঙ্গে অধিষ্ঠিত হয়ে যে সকল রাগ আছে তাদের সেখানে যতক্ষণ না রূপাঙ্কিত হয় ততক্ষণ সেই সব রাগের প্রকৃত স্বভাবগতরূপ প্রতিফলিত হয় না। এজন্য এই রকম প্রকৃতিবিশিষ্ট রাগের রূপকে নিয়ে প্রথম দিকে উদারা এবং মুদারার মধ্যবর্ত্তী স্থানে নিয়মের অতিরিক্ত সময় অঙ্কন করা রাগরূপের স্বভাব বিরোধী হয়ে পড়ে এবং তা করা উচিতও নয়। যতশীঘ্র সম্ভব তার নিজের স্থানে তাকে আগে স্থাপিত করে তারপর সবকিছু অঙ্কনক্রিয়া বিভিন্ন উপযোগী ক্ষেত্রস্থলে করতে হয়।

আশাবরী রাগের ম—ঋ-স,-দ-র্ঋ-স এই দুটি সুরের অঙ্গরূপ অতিশয় প্রভাবশালী ও সুন্দর। যাঁরা আশাবরীতে প্রধান ঋষভ দিয়ে রূপ পরিচয় দেন তাঁদের ওই অতিআকর্ষণীয়-রসসুন্দর রূপ প্রকাশ করবার উপায় নেই। তাছাড়া উক্ত রাগে প্রধান ঋষভ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলেই ওই মতকে গ্রহণ করার ব্যক্তিসংখ্যা অতাল্প। আশাবরীতে প্রধান ঋষভ ব্যবহার করলে জৌনপুরী হতে পার্থক্যের অনেকখানি অভাব ঘটে। বিজ্ঞান ও রাগরূপধর্মসম্মত তিন স্বরের দ্বারা যে রূপ চিহ্নিত হয় তা প্রধান ঋষভ ব্যবহার করলে হবে না। সুতরাং প্রধান ঋষভ ব্যবহার হতেই পারে না।

জৌনপুরী (১১)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ, আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত। বাদী পঞ্চম, সংবাদী ঋষভ। গান্ধার-ধৈবত ও নিষাদ কোমল। আশাবরীর প্রভাব যথেষ্ঠ থাকলেও অন্যরাগের পৃথক প্রভাব নেই, এজন্য জৌনপুরী শুদ্ধশ্রেণীর রাগ পর্য্যায়ভুক্ত। এই রাগ বড় প্রকৃতিগত। সরলগতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-ম-প-দ-ণ-র্স-র্স-ণ-দ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—র-ম-প-দ, প। ম-প-জ্ঞ. র, স। প-ম-প-ণ-দ-প। ম-প-দ-ণ-দ-ম-প। প-দ-ণ-র্স-ণ-র্স-ণদ-প। জ্ঞ-র-স।

আলোচনা,—জৌনপুরীরাগের রূপ প্রায় সমস্ত ঘরাণাতে একই নিয়ম-নীতিতে অঙ্কিত হয়। সুতরাং আলোচনার বস্তুতে বিশেষ কিছু নেই। শুনা যায় জৌনপুরনিবাসী কোন এক গায়ক আশাবরীকে অবলম্বন করে এই রাগ রচনা করে নিজের দেশের নামে প্রচার করেন। এই রাগে আশাবরীর প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও প্রধান ঋষভ থাকায় এবং আরোহণে নিষাদ ব্যবহারের দ্বারা এবং পঞ্চমবাদী হওয়ার জন্য এর রূপ স্বতন্ত্র হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তবে জানার বিষয়,—উত্তরাঙ্গের দিকেই বেশী করে অর্থাৎ 'পা' এর থেকে চড়ার 'সা' এর মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্বরাঙ্কনের উপর এর রূপের অঙ্কনচিত্র বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

জাতি নির্ণয় নিয়ে এইরাগে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুপদগানের পরিচয়ের উপর লক্ষ্যরেখে এক বিশেষগ্রন্থে আরোহণে নিষাদবর্জ্জিত করে ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতিতে ফেলা হয়েছে, কিন্তু সেই গ্রন্থে খেয়াল গানের বিলম্বিত ও দ্রুতের উপর আরোহণে বিশেষভাবে নিষাদ ব্যবহার করা আছে। আমার মতে রাগের নিয়ম-নীতি ও যুক্তির উপর বিচার রেখে জৌনপুরীর আরোহণে নিষাদ ব্যবহার থাকা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। আরোহণে নিষাদ বাদ দিলে উত্তরাঙ্গের ক্রিয়ায় আশাবরী থেকে জৌনপুরীকে তফাতে রাখা দুরূহ হয়ে পড়বে, বিশেষ করে যাঁরা আশাবরীতে প্রধান ঋষভ ব্যবহার করেন তাঁদের পক্ষে খুবই বেশী। আরোহণে নিষাদ বর্জ্জিত থাকার নির্দেশে যখন ম-প-দ-র্স, করে উঠা হবে তখন জৌনপুরীর রূপ সরে গিয়ে আশাবরী কিংবা যোগীয়ার রূপ সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। বড় বড় রাগের প্রত্যেকেরই রূপ পরিচয় আরোহণের সুরের মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকাই বিচার ও নীতিসম্মত। এই নীতিনিয়ম পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ এই দুইএর মধ্যেই থাকবে। যথাযথ রাগবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে জৌনপুরীর আরোহণে নিষাদকে বাদ দেওয়া চলে না। ধ্রুপদেও ওই পথে নিষাদ ব্যবহার করা নিশ্চয়ই আবশ্যক থাকবে। বিচার শুধু গানের নজির ধরেই সকল ক্ষেত্রে যথাযথ সম্ভব হয় না। নিজের ধ্যান-চিন্তার দ্বারা সাধনার ফলস্বরূপ জ্ঞান-বিচারের আবশ্যক আগে থাকবে।

গান্ধারী (১২)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে ধৈবত-নিষাদ বর্জ্জিত। কোমল—গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। বাদী পঞ্চম,—সংবাদী—ঋষভ। সরলগতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,—স-র-জ্ঞ-ম প-র্স, র্স-ণ-দ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ণ-দ-প-ম-জ্ঞ—র—জ্ঞ—ম-প। ম-জ্ঞ-র-ম-প-ণ-দ-প। র-জ্ঞ-ম-প-র্স-দ, প। র়-জ্ঞ-ম-র-ম-প। র—জ্ঞ-ম—র়—প—ম—দ—প। জ্ঞ—জ্ঞ—ম-ম—প-প।

আলোচনা,—গান্ধারীরাগের যে সকল প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়াল আমাদের ঘরাণায় আছে তাতে বিশেষ ভাবে দেখা যায়, কোমলঙ্গ নিয়ে স্বর-সংখ্যা এবং বাদী-সংবাদী জৌনপুরীরই মত। জৌনপুরীকেই নূতন করে একটু গঠন ও পরিধান বেশের উপর নজরের পার্থক্য রেখে গান্ধারী নাম দেওয়া হয়েছে একথা মনে হলেও এর পৃথক সত্ত্বাও অনেকখানি আছে। পার্থক্যের চিহ্নিতরূপকে বিশেষ করে পরিচয়ে রাখার জন্য আরোহণে ধ্রুপদাদি গানের মধ্যে গান্ধার ব্যবহার করা আছে এবং রূপ নির্মাণ প্রথমতঃ উত্তরাঙ্গের উপর থেকে নিম্নে নেমে এসে পঞ্চমের উপর দাঁড়িয়ে থাকাই এর বিশেষত্ব বিশেষ করে দৃষ্টিগোচর হয়। এই রাগটির রূপের উপর যথাযথ বিচার দৃষ্টি দিয়ে, এবং রচনার উদ্দেশ্য ও ভাবতাৎপর্য্যকে উপলব্ধি দ্বারা সেই অনুসরণীয় পথকে ধরে এর রূপকে অনেকখানি পৃথকত্বে রাখার যে হদিস্ পেলাম তাতে আরোহণে ধৈবত ও নিষাদের স্থান থাকা অনেক কিছু সঙ্গত কারণে যথোপযুক্ত মনে হল না।

কেউ কেউ গান্ধারীরাগের আরোহণে গান্ধার নেই এই কথাই মনে করেন কিন্তু বিশেষভাবে বিচার করে দেখলেই বুঝা যাবে আরোহণের দিকে গান্ধার স্বরটির প্রয়োগের দ্বারা স্বররূপের মধ্যে নূতন এক তাৎপর্য্য রেখেই গান্ধারী নাম করণের উদ্দেশ্য এসেছিল। এই রাগটির রূপকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে—পূর্বাঙ্গস্বরের ঊর্দ্ধগতি মুখ এবং উত্তরাঙ্গের নিম্নগতি মুখ। একথা বলার বিশেষ প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক রাগের নিজস্ব মূর্ত্তিতে স্বাধীন সত্ত্বা যত বেশী থাকবে ততই তাকে নিয়ে সাধনার উদ্দেশ্য সফল হবে।

দেবগান্ধার (১৩)

জাতি সম্পুর্ণ। কোমল নিষাদ এবং দুই গান্ধার দুই ধৈবত ব্যবহার হয়। মিশ্রগতি। বাদী পঞ্চম, সংবাদী ঋষভ।

আলোচনা,—এই রাগের নামটি সুন্দর কিন্তু রূপের গঠনে নীতি-নিয়ম ধরে রচনায় যথাযথ ব্যবস্থার অভাব আছে, যার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ঠাটনির্মাণের পক্ষে সহায়ক নয়। প্রধান গান্ধার ও ধৈবতের এমনভাবে ব্যবহার থাকে যে তাদের রূপগঠনের আরোহণ-অবরোহণের মধ্যে নিয়মমাফিক ব্যবহার থাকে না—জৌনপুরীর মতই রূপ প্রকাশ করতে করতে এক এক সময় ওই দুটি স্বরের প্রকাশ রাখা হয়। স-র-গ-ম, ণ-ধ-ণ-দ-প— এই রকম ভাবে। সুতরাং বুঝা যায় খেয়ালখুসীর উপর জৌনপুরীর মধ্যে ওই দুটি স্বর সময় সময় ঢুকিয়ে দিয়ে দেবগান্ধার নাম দেওয়া হয়েছিল এবং এই ভাবেই এর কিছু প্রচার থেকে গেছে। পূর্বে সল্পমাত্রায় প্রধান গান্ধার ও ধৈবত ব্যবহার থাকত, এখন কেউ কেউ যখন এই রাগ প্রকাশ করেন তখন জৌনপুরী ও গান্ধারী রাগের ঘনিষ্ট প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার বাসনা নিয়ে কঠোরভাবে মাত্রাধিক্যে ওই দুটি স্বর ব্যবহার করেন তখন সুরের রূপ খুব রুক্ষ হয়ে গিয়ে প্রাতঃকালের ভাব-রস নষ্ট হয়ে যায়।

যাই হোক্—আমার মতে এই সব রাগ নিয়ে সাধনায় লালন-পালন করার কোন অর্থ হয় না।

রাগের পুঁজি দেখানই হয়,—মনের পুঁজির ক্ষয় হয়।

বড় বড় রাগের রূপকে টেনে তার পাথরে খোদাই করা সুন্দর-সুঠাম মূর্ত্তির উপর খামখেয়ালের বাটালী চালিয়ে একটু পরিবর্ত্তন করে দিয়ে কিংবা হাতুড়ির ঘা' বসিয়ে মুখের বা অন্য স্থানের কোন জায়গার খানিকটা অংশ কেটে দিয়ে অন্য রূপের সামান্য অংশ তুলে নিয়ে তার উপর বসিয়ে দিয়ে এক ভিন্ন আকৃতি করার প্রয়াস কেবলমাত্র শিল্পসৃষ্টির ক্ষতিই করে।

এ স্থলে রাগরূপ রচনা সম্বন্ধে কয়েকটির পরিচয় জানাতে হল। আজকাল বৈরাগী, ভূপালতোড়ী নাম দিয়ে রাগের রূপ যে ভাবে প্রচার হচ্ছে তাতে রাগ বিজ্ঞানের কোন সন্ধানই থাকে না। 'নট-ভৈরব' নাম দিয়ে তার সুর যেভাবে অঙ্কিত হয় তাতেও তার রূপ সৃষ্টির উপর সুস্থ মনের পরিচয় থাকে না ;—পূর্বাঙ্গে প্রধান ঋষভ ব্যবহার করে তাতে সুরের রূপ যেভাবে আসে—সেইটুকুতে নটের সত্যরূপ প্রকাশ পায় না। প্রধান ঋষভের ব্যবহার ওই স্থানে করলেই নটের রূপ এসে যাবে এ ধারণা রাগ বিজ্ঞানের সহায়ক নয় এবং উত্তরাঙ্গে কোমল ধৈবত লাগালেই ভৈরবের প্রকৃত রূপ এসে যাবে—এরূপ মনে করাও অত্যন্ত ভুল। ভৈরবের রূপ প্রকাশের স্থান থাকবে পূর্ব্বাঙ্গের উপরই প্রধানতম হয়ে এবং রাগ নির্দ্ধারণের ক্ষেত্র হয়ে।

আজকাল গুর্জ্জরীরাগটি তোড়ীরই নিষাদ-পঞ্চম বাদ দিয়ে তারই এক দুর্বল রূপ ; —নূতনত্বে কোন আকর্ষণ এবং শুনার মধ্যে আগ্রহই থাকে না বরং মনে হয় বড় রাগের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ। কেউ যদি মনে করেন পাঁচ সুরবিশিষ্ট গুর্জ্জরী রাগই আদি—তার থেকেই তোড়ীর উৎপত্তি, তাহলে তার যথাযথ উত্তর এই—গুর্জ্জরী রাগের রূপ নিয়ে অনেক মতান্তর আছে কিন্তু তোড়ীর রূপ সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞের কাছে একই ভাবে অঙ্কিত হয়ে আসছে বহুকাল হতে।

খাঁটি ভৈরব, ভৈরবী, আশাবরী, তোড়ী প্রভৃতি প্রাতঃকালের যে সব বড় বড় রাগ আছে, ওই সময়ের জন্য তাদের নিয়ে সাধনার মাধ্যমে প্রকাশ করে যাওয়ার উপর যে রূপশক্তির মহিমা উপলব্ধিতে আসে এবং তাদের অফুরন্ত শক্তির যে সন্ধান পাওয়া যায় সেই তার মধ্যেই তো থাকে সত্যকারের পথকে ধরে থাকবার নির্দেশ এবং রাগবিজ্ঞানের মহান তাৎপর্য্যের পরিচয়। যে কথায় শাস্ত্রকার মুনিরা বলেছেন—"……একং সঙ্গীত বিজ্ঞানং চতুর্বর্গ ফলপ্রদম্।" এইসব নির্দ্দেশের ধ্যানচিন্তাকে যদি সরিয়ে রাখি তাহলে শুধু সুরের জাবর কাটাই সার হবে ॥

দেশী (১৪)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত। গান্ধার, নিষাদ-কোমল এবং দুই ধৈবত ব্যবহার হয়। বাদী ঋষভ,—সংবাদী পঞ্চম। পূর্বাঙ্গ প্রধান। মিশ্রগতি—আরোহণে সরল এবং অবরোহণে বক্র। সালঙ্ক শ্রেণী,—সিন্ধু এবং জৌনপুরীর মিশ্রণে তৈরী। মধ্যপ্রকৃতির রাগ।

ঠাট,—স-র-ম-প-দ-ণ-র্স-(জৌনপুরী) র্স-ণ-ধ-প-(সিন্ধু) দ-ম-প-জ্ঞ-র-স (জৌনপুরী) ॥

রাগের রূপ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে—র-জ্ঞ-স-র-ণ্-স। ধ-ম-প-জ্ঞ-র-জ্ঞ-স-র-ণ্-স। র-ণ্-স-র-ম-প- এই স্বরের রূপ সিন্ধু এবং জৌনপুরী এই দু'এরই হতে পারে। আগের দুটি সিন্ধুরাগের। ণ-ধ-প-দ-ম প-র-জ্ঞ-স-র-ণ্-স। ধ-ণ-প-দ-ম-প-জ্ঞ-র-স,—স্বরসমূহের এইরূপ উক্ত দুই রাগ যুক্ত হয়ে আসে। স-ণ্-স-ধ্-ণ্ স-র,-সিন্ধুরাগের এই রকম সুরের প্রকাশ খেয়ালগানের মধ্যে পাওয়া যায়।

আলোচনা,—এই রাগটির নাম দেশী বা দেশীতোড়ী কি সম্পর্ক ধরে এল তা বুঝা যায় না। এর রূপের মধ্যে দেশ এবং তোড়ী রাগের প্রকাশ নেই। সুতরাং দেশীতোড়ী না বলে শুধুমাত্র নাম হিসেবেই একে দেশী নামে রাখাই ভাল।

আগেকার ধ্রুপদগানে এই রাগের স্বররূপ যেভাবে গঠিত ছিল—বিশেষ করে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় উক্ত গানের প্রাচীন পরিচিতির মাধ্যমে, সেই রূপের সংগে মতান্তরে প্রচারিত বর্ত্তমানের দেশীরাগের রূপ স্বতন্ত্র হয়ে গঠিত। পূর্বোক্ত ঘরাণায় এর স্বররূপে আছে আরোহণে ঋষভবর্জিত এবং বেশী করে ভৈরবীর এবং তার সঙ্গে জৌনপুরীর রূপাংশ নিয়ে। তার ঠাট এবং আকৃতির বিশেষ পরিচয়ের স্বররূপ এই প্রকার, যথা, ঠাট—স-জ্ঞ-ম-প-দ-ণ-র্স, র্স-ণ-দ-প-ম-জ্ঞ-র-জ্ঞ-স ॥ র-জ্ঞ-স। দ-ম-জ্ঞ-র জ্ঞ-স। স-জ্ঞ-স-জ্ঞ-ম-প-দ-ম-প-জ্ঞ-স-র-স। দ-ম-দ-র্স, ণ-র্স-র্জ্ঞ-র্র-ণ-র্স-দ-প-ম-জ্ঞ-স-ণ্-র-স ॥ অবরোহণে র্স-ণ-র্স-দ-প, এই রকম ভাবে বেশীর ভাগ সময় স্বর নেমে আসে।

সঙ্গত বিচার নিয়ে দেখলে মতান্তরের প্রচলিত দেশীরাগে পূর্বাঙ্গের স্বররচনায় মিষ্টরসের একটি পরিবেশ থাকলেও আমাদের প্রাচীন ঘরাণায় ওই রাগের স্বরমূর্ত্তি যেভাবে প্রবেশ করেছিল তারমধ্যে যথার্থভাবে আছে প্রাতঃকালীন সময়ের সংগে তার যথেষ্ঠ প্রভাব সম্পর্ক।

ভিন্নমতের রূপটিও যে বহুকাল ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে তার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম, ১৯১৯ সালে ৺কাশীর নিখিল-ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনে যখন নিমন্ত্রিত হয়ে যাই পঞ্চকোটের রাজ দরবারের তরফ থেকে রাজগায়ক হয়ে তখন রামপুর ষ্টেটের এক বিখ্যাত বীণকারের বাদনে ওই রাগ শুনেছিলাম বর্ত্তমানের প্রচলিতরূপের নীতিধারায় দুই ধৈবতের উপর। যাই হোক্ মোটের উপর আমাদের ঘরাণার রূপটি এখন এমন চাপাপড়ে গেছে যে তার আর সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের কাছে প্রকাশ পেয়ে ঠাঁই করে নেবার সম্ভাবনা নেই। বর্ত্তমানের রূপটি আমরাও সমাদরে গ্রহণ করে নিয়েছি। বিচার বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে বর্ত্তমানের রূপটির ধারাই বিপুল প্রসস্ততা নিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যদিও সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে তার স্থান পরেই থাকতে হয়। কারণ আমাদের ঘরাণার সুরটি সকালের দুটি রাগে মিশ্রিত। পরেরটি রাত্রের সিন্ধু এবং সকালের জৌনপুরীর সুরে রচিত।

এই প্রসঙ্গের আর একটা কথা,—দেশী তোড়ীকে প্রয়োদশ তোড়ীর মধ্যে ধরা আছে। প্রধান তোড়ী হতে সৃষ্ট বলে আরো যে বারটি তোড়ী বিভিন্ন নামে আছে—তা আমার বিচারে তারা সবাই তোড়ীগোষ্ঠীভুক্ত মোটেই নয়। কারণ—আশাবরী, জৌনপুরী, গান্ধারী, দেশী ইত্যাদি রাগগুলিতে

তোড়ীর রূপপ্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই রাগগুলির তোড়ীই জনক হলে তার সাদৃশ্য অন্ততঃ কিছু থাকার উপরই সে কথার সত্য নিরাকৃত হত। ভৈরবীকে প্রধান ধরে আশাবরীর মাধ্যমে ওই রাগগুলির সৃষ্টি হয়েছে, এই পরিচয়ই যথার্থ বলে বিচারে আসে।

অষ্টাদশ কানড়া, সপ্তসারঙ্গ, দ্বাদশ মল্লার, নবম-নট প্রভৃতির মধ্যে তাদের প্রত্যেকের গোষ্ঠি মধ্যে প্রধানের সংগে রূপ সম্পর্কের পরিচয় আছে, কোনটির মধ্যেই অস্বাভাবিক রূপে গোষ্ঠির সম্পর্কহীন হয়ে পড়েনি। শুদ্ধসারঙ্গ নামে একটি রাগের সপ্তসারঙ্গের নামের তালিকায় থাকবে না এবং ওর সুররূপের পরিচয়ে শুদ্ধ-সারঙ্গ নাম থাকা কোন প্রকারেই অর্থ সঙ্গত নয়। এই নামটির যথাযথ পরিচয়ে প্রথমে হয়ত ছিল 'সাধ-সারঙ্গ' এবং সে কথাই সত্য বলে মনে করতে হবে। 'নট' রাগের অন্তর্গত কোন রাগের সুরে যদি কড়ি মধ্যম ব্যবহার হয়ে পড়ে তাহলে তা-ও অসঙ্গত ভাবেই হবে।

দেশীরাগ সম্বন্ধে আর একটু বলবার আছে। সম্প্রতি দেখা যায় কেউ কেউ প্রধান ধৈবত ব্যবহার করছেন না। আমি কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত এই দেশীরাগে প্রধান ধৈবতকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতি নই। রূপস্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তার কার্য্যকারীতা আছে। আগেই জানিয়েছি দুই ধৈবত ব্যবহারের পরিচয় আমার কম সময়ের নয়। তখনই বুঝেছিলাম ওই রাগটি দুই ধৈবতযুক্ত হয়ে মতান্তর রূপে আছে এবং সেই থেকে বহু বিশিষ্ট গায়ক-বাদকদের কাছেও দুই ধৈবত যুক্ত সুরই শুনে এসেছি। এই রাগকে উত্তরাঙ্গে জৌনপুরী থেকে বেশ কিছু তফাতে রাখবার জন্য দুই ধৈবত থাকাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। রাগের রূপ পরিচয় দুই অঙ্গের মধ্যেই থাকার যে নীতি-নিয়ম আছে তাকে অতি সঙ্গত রূপেই মানতে হবে। রাগরূপকে যতদূর সম্ভব পৃথক করে রাখাই বিচার যুক্তিসম্মত। সুতরাং দেশীরাগের উপর কোন ধৈবতকেই বাদ দেওয়া উচিত হবে না। এই রাগে দুই ধৈবতের ব্যবহারে রস সৃষ্টির তেমন ব্যাঘাত হয় না, যদিও তাতে রূপ রচনায় বৈজ্ঞানীক নীতি-নিয়ম কিছু পাওয়া যায় না কিন্তু ভৈরব রাগ থেকে উৎপত্তি এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগসম্পন্ন রামকেলীরাগের রূপকে যাঁরা মড়িমধ্যম দিয়ে ব্যবহার করেন তাঁরা সময়ের সংগে সম্পর্ক এবং রাগের স্বভাব ও প্রভাবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচারবোধের অবকাশ রাখেন না।

ষঠ্ বা খট্‌রাগ (১৫)

প্রাতঃকালের ছয়টি রাগকে ধরে উক্তরাগের উৎপত্তি। এই ধরণের রাগ তৈরির যা উদ্দেশ্য তাতে মনে হয় এ কেবল রাগরূপের উপর দখল এবং একত্রে যুক্তকরে দেখানর শক্তি পরীক্ষামাত্র। সমসাময়িক রাগগুলি নিয়ে একত্র সমাবেশের দ্বারা এর যে স্বাদবস্তু উৎপন্ন হয় তা যেন শাত্বিকবস্তুর সমাবেশে খিচুড়ী-পাক করার মত।

ষঠ্‌রাগের মধ্যে থাকে যে ছয়টি রাগ তা এই, — যোগীয়া, ভৈরব, রামকেলী, আশাবরী,

জৌনপুরী এবং ভৈরবী। এতে দুই গান্ধার, দুই ঋষভ, দুই নিষাদ এবং কোমল ধৈবত ব্যবহার হয়। বাদী সংবাদী নির্ভাবনা নিয়ে পঞ্চম ও ষড়জকে করা যায়। ধ্রুপদ-খেয়ালে এর মিশ্ররূপ এইভাবে পাওয়া যায়। স-ঋ-ম-ম-প-প-দ-র্স (যোগীয়া), প-দ-দ-প-ম-প-প-ম-গ-ম-প-ণ-দ-প–(রামকেলী), প-দ-র্স-র্ঋ-ণ-দ-প-(আশাবরী), দ-দ-প-ণ-দ-প-ম-প-জ্ঞ-ম–(ভৈরবী), ম-ণ-দ-প-ম-গ-ম-ঋ-গ-ম-ঋ-স (ভৈরব), ম-প-দ-ণ-র্স-র্স-র্র-র্স-র্জ্ঞ-র্র-র্স-র্স-র্র-ণ-দ-প—(জৌনপুরী)। রাগগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়েও প্রকাশ করা চলে।

বসন্তমুখারী (১৬)

জাতি সম্পূর্ণ। সরল গতি। বাদী-সংবাদীরূপে—মধ্যম,-ষড়জ স্বরকেই ধার্য্য করতে হয়। কোমল ঋষভ, দুই গান্ধার কোমল ধৈবত ও নিষাদ। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান। ওই অঙ্গে সম্পূর্ণ ভৈরবের রূপ, উত্তরাঙ্গে ভৈরবীর এবং অবরোহণে আছে ভৈরবীর রূপ।

ঠাট,—স-ঋ-গ-ম-প-দ-ণ-র্স-র্স-ণ-দ-প-ম-জ্ঞ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গের সংগে কেউ কেউ উত্তরাঙ্গে আশাবরীর রূপও আঁকেন।

আলোচনা,—এই রাগের প্রাচীন ধ্রুপদ বা খেয়ালের কোন পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। এই রাগের খেয়াল-গান যা শুনা যায় তা সদারঙ্গের যুগের নয়। যদি তা হত তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের বিষ্ণুপুর ঘরাণায় আসতে না পারা হত না। যাইহোক্ সে নিয়ে বড় বিশেষ কিছু এসে যায় না। তবে একথা বলা যায় এইসব বিলাসী ধরণের রাগরূপ রচনায় শিল্পের বিদ্যাবত্তার পরিচয় বিশেষ থাকে না। যাঁরা সংযম ও নিষ্ঠা নিয়ে বড় বড় রাগের রূপ অঙ্কন করবার মত ধৈর্য্য রাখতে পারেন না তাঁরাই এই সব রাগ বেশী পছন্দ করেন। ভৈরব, ভৈরবী এবং আশাবরী, এই তিনটিই বিরাট রাগ। প্রত্যহ নিয়মিত দীর্ঘ সময় ধরে সারাজীবন সাধনা করে গেলেও উক্ত কোন একটির উপরও তার রূপের লীলা-বৈচিত্র্যের অঙ্কন শেষ হবে না।

এই রাগ সম্বন্ধে আর একটি কথা,—মধ্যমের প্রাধান্যে অর্থাৎ সেখানে ওই স্বরকে কেন্দ্র করে নির্দ্ধারিত স্বরের দ্বারা যখন বিস্তার করা হয় তখন এসে যায় উক্ত স্বর ষড়জপরিবর্ত্তনের রূপধরে একেবারে পিলুরাগের রূপ। তখন মনেই আসে না অন্য কোন রাগ শুনছি বলে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আছে,—আমাদের ঘরাণায় 'মুখারী' রাগ আছে কিন্তু তার স্বরের রূপ প্রভাতী রাগের সংগে সম্পর্কহীন। সিন্ধু ও সিন্ধুড়ার স্বররূপ নিয়ে তার রূপ তৈরি। যথা—র-ম-প-ধ-র্স-ণ-ধ-প-র-ম-প-ধ-প-ম-প-ম-জ্ঞ-র-স, জ্ঞ-র-ণ্-ধ্-স-র-ম-জ্ঞ-র-স। বর্তমানের প্রচলিত বসন্তমুখারীতে বসন্তের সুরও নেই এবং মুখারীরও নেই। পরিচিত রাগের সুর-সম্পর্ক-বিহীন করে সেই নাম দেওয়া বিচারবোধের কথা নয়॥

লুম (১৭)

সম্পূর্ণ জাতি। বক্রগতি। বাদীগান্ধার, সংবাদী নিষাদ। ক্ষুদ্রাকৃতি। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,—স-গ-র-প-ম-প-ধ-ন-র্স, র্স-ন-ধ-প-ম-গ·র-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—গ-র·গ,-স-ন্-র·গ। গ-ম-প-গ-ম-র-। ন্-র-স-গ·র-স। ন্-গ-র·গ-ম-প-গ। ন-ধ-ন-প-ন-র্র-র্স-ন,-ধ-প। প-ন্-ধ প·ন-ধ-প·ম-গ। গ-ন·ধ·প-মগ।

আলোচনা,—এই রাগটি রচনার উদ্দেশ্যতে মনে হয়, স্বরসাধনায় স্বরাঙ্কনের মাধ্যমে রাগরূপের মত সুরের যে ভাবরূপ সৃষ্টি হয় তারই প্রতীকরূপে এই সুরকে ধরে লুম নাম দেওয়া হয়েছিল। সুরের সংগে নাম সম্পর্কের অর্থ কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না; লুম এই বানানের অর্থ লাঙ্গুল, লেজ। এই বানানের অর্থ ধরে রাগের মধ্যে কোনই স্থান নেই। লুন কথার অর্থ কর্ত্তিত, ছিন্ন। স্বরসাধনার মধ্যে দিয়ে এর রূপ প্রথমে এসে পড়ায় সেখান থেকে ছিন্ন করে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি তৈরি হয়ে ছিল বলেই হয়ত লুন নাম দেওয়া হয়েছিল। পরে লুম নামে পরিণত হ'য়েছে। স্বর সাধনার মধ্যে দিয়ে তার বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গীর দ্বারা মনের মধ্যে সুন্দর তৃপ্তি নিয়ে সুরের গঠন আকৃতির রূপ এসে দাঁড়ায়। এই ভাবেই লুম রাগটি মানুষের দ্বারা প্রথম সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে বেশ বুঝা যায়। বিভাস, আলাইয়া প্রভৃতির সৃষ্টি যে লুমরাগের পরেই হয়েছে—তার ধারণার মূলে ওই কারণই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান স্বরযুক্ত আদি বিভাসরাগের সৃষ্টির পরিচয় সম্বন্ধে আমি এটুকু বলতে পারি—প্রভাতী রাগের সময়ে ওই রাগটিই প্রথম নির্দিষ্ট হয়েছিল কোমল স্বর সৃষ্টির বহু পূর্বে। ওই বিভাসের রূপ উক্ত সময়ের সংগে যথোপযুক্তভাবে সম্বন্ধ রাখার যে অধিকার রাখে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এবং এই সব রাগ স্বরসাধনের মাধ্যমে প্রকৃতিগত হয়েই ধরা দিয়েছিল, যখন প্রথম অবস্থায় রাগবিজ্ঞানের নিয়মনীতি ধরে সৃষ্টির গুরুত্ব তেমন ভাবে উপস্থিত হয়নি, মনের মধ্যে উদয়ই তখন প্রধান উপকরণ ছিল।

লুম রাগ আদি এবং অতি সংক্ষিপ্ত। তাকে আদি বলে ধরতে পারায় আমার বিচারমত নীতি-নিয়মের ব্যবস্থায় রাখবার জন্য তার রূপের উপর গভীর অনুধাবনা নিয়ে ঠাট, বাদী-সংবাদী এবং রূপাঙ্গের আকৃতি প্রদান করলাম। এই রাগ চর্চ্চায় একটা দিক দিয়ে যে উপকার আছে তা হ'ল প্রত্যেকটি প্রধান-স্বরের প্রভাব মহিমার স্বরূপ সন্ধানের উপায় পাওয়া। সুতরাং রাগবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই ধরণের রাগ নিয়ে চিন্তা ও সাধনা করার মধ্যে মূল্যবান অভিজ্ঞতার সন্ধান আছে।

এস্থলে একটা বিশেষকথা,—কেউ কেউ কোন কোন রাগের ঠাট নির্মাণের হদিস্ পাওয়া দুরূহ ভেবে প্রধান স্বর সমূহের আরোহণ অবরোহণকে অর্থাৎ স্বর-সাধনার বস্তুকে সেই সেই রাগের 'ঠাট' বলে পরিচয় দিয়েছেন্। আগেই জানিয়েছি ওই রকম স্বরসাধনার বস্তু কোন রাগের 'ঠাট' হতে পারে না, কারণ রাগ-রূপকে চিহ্নিত করতে পারে না। রাগের যদি প্রকৃতরূপ থাকে তাহলে তারমধ্যে গঠনভঙ্গীর কাঠামোও নিশ্চিয়ই থাকবে সম্পূর্ণ পৃথকত্ব নিয়ে, একথা সহজেই স্বীকার করতে হবে। পঞ্চাশটি রাগের মধ্যে যদি

আটচল্লিশটি রাগের কাঠামোয় ঠাটে রূপ চিহ্নিত হয় তাহলে বাকী দু'টিরও নিশ্চয় হতে হবে, এবং খুঁজে পাওয়া যাবেই তার সন্ধান, যদি নিতান্তই খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হ'বে সেই সুরের মধ্যে সত্যকারের রাগরূপ বলে কিছু নেই।

আলাইয়া (১৮)

জাতি সম্পূর্ণ। বাদী তারা সপ্তকের ষড়জ এবং সংবাদী পঞ্চম। গান্ধার বলীস্বর। উত্তরাঙ্গ প্রধান। বড় প্রকৃতির রাগ। মিশ্রগতি। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,—স-গ-ম-র-গ,-প-ধ-ন-র্স, র্স-ন-ধ-প-ম-গ-র-স। গ-প-ধ-ন-র্স,—সুরের এইরূপ রাগরূপের প্রধান পরিচয় জ্ঞাপক। রাগরূপ গঠনের নীতিনিয়মে আরোহণে মধ্যম নেই কিন্তু র-গ-ম-প, করে সময় সময় স্বর উঠে। 'রে' সুর থেকে উঠে বলেই রাগ রূপের বিস্তার সময়ে মিশে যায়। তবে র-গ-ম-প,-এইভাবে উপর দিকে স্বর তুলে নিয়ে যাবার কোনই আবশ্যক করে না। রাগরূপের নীতি-বিজ্ঞানকে রক্ষা করে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন-ধ-ন-র্স। গ-প-ন-ধ-ন-র্স। গ-ম-র-গ-প-ধ-ন-র্স। স-র-গ-র-গ-প-ধ-ন-র্স। প-ম-গ-ম-র-গ-প—ন-ধ-ন-র্স।

এই রাগের রূপ রচনা অনেকখানি কৌশলের উপর নির্ভর করে; বিশেষ করে আরোহণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এই রকম ধরণের রাগের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা শক্তিশালী রাগঅভিজ্ঞব্যক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না।

আলোচনা,—আলাইয়া রাগের বিষয় নিয়ে আগেই অনেক কিছু বলা হয়েছে। সুতরাং আর অধিক আলোচনার অবশ্যক নেই।

প্রাতঃকালের অন্য রাগগুলির পর ভৈরবীরাগের সুরু থেকে খটরাগ পর্য্যন্ত সময়ের সম্পর্ক ধরে যেভাবে তাদের রূপ, রস ও প্রভাব সৃষ্টি হয় তার পরিবর্ত্তন সময়োপযোগী হয়ে নিয়ে আসে লুম, আলাইয়া প্রভৃতি রাগেদের। তারপর কড়ি মধ্যমযুক্ত তোড়ী রাগকে প্রথম প্রহরের শেষ মহূর্ত্তে রাখা হয়েছে—তার দীপ্তিময় বিপুল রূপ সেই সময়ের উপযোগী বলে।

সর্‌ফর্দ্দা (১৯)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। দুই নিষাদ ব্যবহার। বাদী পঞ্চম, সংবাদী ঋষভ। মধ্য প্রকৃতির রাগ। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। ` সালঙ্ক শ্রেণী,—কামোদ এবং আলাইয়ার রূপাংশ নিয়ে এর রূপ রচিত হয়েছে।

ঠাট—স–র-প-ম–প (কামোদ) গ-প–ন-ধ-ন-র্স, (আলাইয়া) র্স-ন-ধ-ণ-প (কামোদ) ম-গ-ম-র-স-র-স (আলাইয়া)।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স–র-প,-ধ-ণ-প, গ-প-ন-ধ-ন-র্স। ম-গ-ম-গ-র-গ-প-ধ-ন। প-ন-ধ-ন-র্স,-র্স-ন-র্স-ধ-ণ-প, ইত্যাদি ॥

আলোচনা,—আলাইয়ার সংগে রাত্রের সম্ভাব্য রাগের যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যসম্বন্ধের কথা আগেই জানিয়েছি।

প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা সরফর্দ্দা ইত্যাদি রাগগুলির 'ধ্রুপদ' 'খেয়াল' রচিত হয়ে আছে বলে এবং তার মধ্যে তাদের পরিচয়ও কিছু জড়িত আছে বলে এইসব রাগের রূপাঙ্কনের নিয়ম প্রদত্ত হ'ল।

মিশ্ররাগের মধ্যে যেগুলি সুষ্ঠ আকৃতি নিয়ে গঠিত হ'য়েছে সেগুলি চিরকালই সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে আদরের বস্তু হয়ে থাকবে। যেমন,—আড়ানা, সেনীমল্লার (মিয়াঁমল্লার), জয়জয়ন্তী, ভীমপলশ্রী, ইমনকল্যাণ—ইত্যাদি।

কুকভা (২০)

জাতি সম্পুর্ণ,—বক্রগতি। দুই নিষাদ ব্যবহার। ক্ষুদ্র প্রকৃতি। বাদী ঋষভ, সংবাদী-পঞ্চম। মধ্যম বলীস্বর। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী।

এই রাগের রূপ গঠনের উপর পূর্বাঙ্গের উত্থানে সারঙ্গ, উত্তরাঙ্গে আলাইয়া, অবরোহণে দেশরাগ মিশ্রিত হয়ে থাকে এবং কোন কোন ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের রূপবিস্তারের মধ্যে ছায়ানটের রূপাংশও পাওয়া যায়,—তবে তাকে ঠাট নির্মাণে বা রাগরূপ পরিচয়ে আনা যায় না।

ঠাট,—স-র-ম–প-(সারঙ্গ) ন-ধ-ন-র্স (আলাইয়া) ণ-ধ-ম-গ-র-গ-স (দেশ)।

প্রধান রূপাঙ্গ—ণ-ধ-প-ম-গ–র-গ-স-র। স-ধ্‌-প্‌-র (ছায়ানট)। র-গ-স-র-ম-প-ধ-ন-ধ-ন-র্স। ণ-ধ-ম-গ-র-গ-ম,—ইত্যাদি।

আলোচনা,—এই রকম মিশ্ররাগের আলোচনায় গুরুত্ব কিছু নেই। যৎসামান্য আছে কেবল মিশ্রনের মিলন কৃতিত্বটুকুই। এই সব ধরণের রাগ শুনতে ভাল লাগলেও মন ভরে না এবং আকর্ষণীয়ও নয়।

শুক্লবেলাবলী (হিন্দী উচ্চারণে 'সুখল্‌বেলাওল') (২১)

সম্পুর্ণ জাতি। দুই নিষাদ। বাদী মধ্যম, সংবাদী-ষড়জ। বক্রগতি। ক্ষুদ্র প্রকৃতি। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী। তিলক কামোদ ও আলাইয়া এর রূপে প্রধান এবং ছায়ানটের অল্প কিছু অংশ নিয়ে এর

রূপ তৈরি হয়েছে।

ঠাট,—স-গ-র-গ-ম-প-ন-ধ-ন-র্স (আলাইয়া) র্স-প-ণ-ধ-ম-গ (তিলককামোদ) র-গ-ম-প-র-স (ছায়ানট)।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ম-গ-র-গ-স-গ-র-গ-ম। র-র-গ-র-গ-ম-। গ-র-গ-ম-প-ন-ধ-ন-র্স। ধ-ম-গ-র-স-গ-ম। র-র-প-প-ম,-গ-র-গ-স-গ-ম। র-র-গ-গ-স-গ-র-গ-ম। গ-র-গ-প-ধ-ন-ধ-ণ-ধ-প-ম-র-গ-ম ইত্যাদি।

আলোচনা,—এই রাগের যে কয়েকটি ধ্রুপদ ও খেয়াল জানা আছে—প্রাচীন পরিচিতির মাধ্যমে তাতে বুঝা গেছে এই রাগের রূপ প্রধানতঃ আলাইয়া এবং তিলককামোদের রূপাংশ নিয়েই এর রূপ গঠিত ; তার সংগে ছায়ানটের রূপ সামান্য আছে এবং তিলককামোদের মধ্যে দিয়ে অনবধান বশতই কোন কোন স্থানে দেশরাগের স্পর্শও এসে গেছে বলে মনে হয়। একটি বিখ্যাত ধ্রুপদ গানের প্রথমাংশের অনেকগুলি কথা ঋষভস্বরের উপর থাকায় তার রূপপ্রভাবে মনে হবে যেন ঋষভস্বরই বাদী কিন্তু গানের সখ্যাধিক্যের উপর সুরের বিচার ধরে মধ্যম স্বরই বাদী হবে। এইসব রাগের রূপরচনা বিজ্ঞানের উপর সঠিক নির্ভরশীল নয় বলে গানের সংখ্যাবৃদ্ধির কামনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরের নির্দিষ্ট রূপকে যথাযথ নিয়মে রাখা সম্ভব হয় না।

দেবগিরি (২২)

সম্পূর্ণ-জাতি। বক্রগতি। বাদী-গান্ধার-সংবাদী-ধৈবত। সালঙ্কশ্রেণী, আলাইয়া এবং লুমের স্বররূপ ধরে এর রূপ তৈরী। ক্ষুদ্র প্রকৃতির-রাগ।

ঠাট,—স-র-গ-প-ম-প-ধ-ন-ধ-র্স, র্স-ধ-প-ন-প-ধ-প-ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-গ-র-স-র-স। স-ন্-ধ্-ন্-র-স। ম-গ-র-গ-প-ন-ধ-প-ধ,-প। ধ-প-ম-প-ম-গ। র-গ-প-ধ-প-ম-গ-ম-গ-র-স।

আলোচনা,—এই রাগটি লুম রাগেরই এক উন্নত স্তর। মোটেই বিস্তারবহুল নয়, তবে কেউ কেউ কল্যাণরাগের রূপকে বেশী করে পূর্বাঙ্গে টেনে এনে রাগকে বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়াল যা দু'চারটে আছে—অন্ততঃ আমাদের ঘরাণায় সেগুলির চেহারার দিকে তাকালে কল্যাণ-রাগের প্রভাব স্পর্শ স্বচ্ছ নয়—আবছায়ার মত কোন কোন স্থানে অনুভব হয় মাত্র। এই সব রাগ বেশীক্ষণ ধরে বৈচিত্র্য প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গঠন করবার নয়, এই প্রয়াস নিলে আসল রূপটিকে ধরে রাখা অসম্ভবের মতই হবে।

দেশকার (২৩)

জাতি ষাড়ব,—মধ্যম বর্জিত। বাদী-সংবাদী—গান্ধার-ধৈবত। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী। সরলগতি। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট.—স-র-গ-প-ধ-ন-র্স, র্স-ন-ধ-প-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ— স–র্–গ–প–গ–ন্–র–স। ধ্–প্–গ–র–ন্–র–প–গ–ধ্-ন্-র-স। র-গ-প-ধ-ন–ধ-প-গ। ধ-গ-প-ন-প-গ র ধ্-গ-ন্-র স।

আলোচনা, - আগেই বলেছি—দেশকাররাগের প্রাচীনরূপ এখন অনেকের- কাছে প্রাচীন বিভাসের রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কেবলমাত্র তার অবরোহণের সময় নিষাদটি মাত্র বাদ পড়েছে। প্রায় দু'শ বছর আগেকার মৌলাবক্স ঘিঁসে খাঁ সাহেবের স্বরলিপিযুক্ত গানের পুস্তকে "দেশকার কাঞ্চন বরণকে পিয়াকো সংগ আয়ে…" দেশকারের এই তেওটতালের খেয়াল গানটির স্বররূপ আমাদের ঘরাণার সংগে হুবহু মিলে আছে। ঠিক ওই সুরে 'দেশকার' বলে পরিচিত হয়ে এসেছে কতকগুলি বিখ্যাত প্রাচীন ঘরাণাতেও বহুকাল থেকে। অল্প কয়েক বছর আগে বিভাসকে দেশকার বলতে শুনে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। এখন বুঝছি আশ্চর্য্য হবার আর কিছু নেই,—কারণ প্রাচীন ধারার ধ্রুপদী ও বীণকার গুণী-সম্প্রদায় এক রকম লুপ্ত হয়ে গেছে। অবশ্য দেশকার রাগের রূপ তেমন স্বাতন্ত্র্যতায় গঠিত নয়, ভূপালী এবং ইমন ঘেঁসা সুর। তবে যেমনই তার সুর হোক না কেন তাকে তার আসল নামেই রাখতে হবে,—বিশেষ করে প্রাচীন ধ্রুপদের উপর তার রূপের স্বীকৃতিকে মূল্য দিয়ে এবং প্রাচীন ঘরাণাগুলির মধ্যে তার প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিয়ে। আসল ধ্রুপদী-দেশকারের রূপ দেশকার নামেই থাকবে এবং আসল বিভাসের সুরকে বিভাস নামেই রাখতে হবে।

গুণকেলী (২৪)

সম্পূর্ণ জাতি। ঋষভ ধৈবত কোমল এবং দুই মধ্যম ব্যবহার। মধ্যমবাদী, ষড়জ সংবাদী, পঞ্চম বলীস্বর। সালঙ্কশ্রেণী, ভৈরব এবং শ্রীরাগের মিশ্রণে এর রূপের উৎপত্তি। সরলগতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ।

ঠাট—স-ঋ-গ-ম-প-দ-ন-র্স, র্স-ন-দ-প-হ্ম-গ—ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ঋ-গ-ম-ঋ—গ-প-হ্ম-দ-প-হ্ম-গ-ঋ-স। প-ম-প-দ-প-হ্ম-প-ঋ-গ-স-ঋ-গ-ম-ঋ,-স। স-ম-গ-প-ম-ন-দ, হ্ম-প-দ-ন-দ-প-হ্ম-প-ঋ-গ, প-গ-ম-ঋ-স।

আলোচনা,— এই রকম রাগসৃষ্টির প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ এক খেয়ালখুসীর উপরই হয় সে কথা আগে যথেষ্ট বলেছি। এই রকম ধরণের রাগকে সমর্থন করতে হলে প্রকৃতির সংগে সংযোগ রেখে রাগ

নির্ণয়ের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ তাহলে সকালে শ্রীরাগ এবং সন্ধ্যায় ভৈরবরাগ প্রকাশে দোষ থাকছে না। আমি এই রকম সৃষ্ট রাগের ঘোরতর বিরোধী। তবে প্রাচীনের সৃষ্ট ধারা জানাবার জন্য অমনোনীত রাগগুলির পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক আছে মনে করলাম, বিশেষ করে আমাদের প্রাচীন ঘরাণার সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে বলে॥

বর্ত্তমানে গুণকেলী রাগ যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে তার সংগে আমাদের ধ্রুপদী ঘরাণায় মোটেই মিল নেই। অথচ বর্ত্তমান মতের খেয়াল ছাড়া প্রাচীন ধ্রুপদ পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে অন্ততঃ মতান্তরের মধ্যে বিচার পরিচয় পাওয়া যেত। যাই হোক, বর্ত্তমানের গুণকেলীর রূপ যোগীয়া রাগের স্বররূপের উপর গান্ধার-নিষাদকে বাদ দিয়ে প্রচারিত হচ্ছে। যোগীয়ার স্বরসমষ্টির সংখ্যায় যেভাবে তার বিস্তৃত রূপের প্রকাশ ও রসসৃষ্টি হয় এই গুণকেলীতে তার একান্ত অভাব থাকে। তবে আমি বলব, শ্রী ও ভৈরব মিশ্রিত গুণকেলীর চেয়ে এই গুণকেলীকেই বরং সময়ের স্বভাব সম্পর্ক ধরে এবং রুচির দিক দিয়ে সমর্থন করা যায়।

দরবারীতোড়ী (২৫)

সময় দিবা প্রথমপ্রহরের শেষ ভাগ। জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে পঞ্চম বর্জ্জিত। ব্যবহার কোমল-ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত, তার সংগে কড়ি মধ্যম। বাদী-সংবাদী—গান্ধার, ধৈবত। শুদ্ধশ্রেণী। বড় প্রকৃতির রাগ। সরলগতি। অবরোহণেও পঞ্চমের ব্যবহার কম। নিষাদ তীব্র কোমল রূপে প্রকাশিত হবে।

ঠাট,—স-ঋ-জ্ঞ-হ্ম-দ-ন-র্স, র্স-ন-দ-প-হ্ম-জ্ঞ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—দ্‌-জ্ঞ-ঋ-স। ঋ-জ্ঞ-হ্ম-ঋ-জ্ঞ-ঋ-স। স-ঋ-জ্ঞ-হ্ম-দ-প-হ্ম-জ্ঞ-ঋ-জ্ঞ-ঋ-স। স-দ—প-হ্ম-দ-ন-দ-হ্ম-দ-প-হ্ম-জ্ঞ—ইত্যাদি।

আলোচনা,— এই বিরাট রাগের পরিচয় সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে সমানভাবে প্রায় একই নীতিধারায় চলে আসছে। রাগমাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তোড়ী এবং কানড়া এই দু'টি রাগকে সম্রাট-অক্‌বর্‌শা অপূর্ব ভেবে দরবারীতোড়ী এবং দরবারীকানড়া নাম্‌ দিয়েছিলেন। এই তোড়ীরাগ সম্বন্ধে অন্য বিষয়ের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

বেলাবলী (২৬)

দিবা দ্বিতীয় প্রহর। জাতি সম্পূর্ণ। দুই মধ্যম ব্যবহার। বক্রগতি। বাদী-সংবাদী—গান্ধার ও ধৈবত। পঞ্চম বলীস্বর। সালঙ্ক শ্রেণী। ক্ষুদ্রপ্রকৃতির রাগ। আলাইয়া এবং কল্যাণ মিশ্রণে তৈরি।

ঠাট,—স-গ-র-গ-ম-প-হ্ম-ধ-প-ন-ধ-ন-র্স-র্স-ন-ধ-প-হ্ম-প-ম-গ-র-গ-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-ম-র-গ-ম-র-স। প-ধ-প-হ্ম-প-গ-ম-র-গ-র-স। প-র্স-ন-র্স-ধ-প-গ-র-গ-প-ন-ধ-প-হ্ম-প-গ-ম-র-স ॥

আলোচনা,—বেলাবলীকে বর্ত্তমানের উচ্চারণে বেলাওল বলা হয়। আলাইয়া এবং বেলাবলীর পরিচয় সম্বন্ধে ঠাটের আলোচনায় সবিশেষ জানিয়েছি। বেলাবলীর উক্ত রূপই আমাদের ঘরাণায় প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়ালের মধ্যে আছে এবং আগেকার ধ্রুপদীগুণীদের কাছেও ওই রকম স্বররূপই স্বীকৃত হয়েছিল। আলাইয়ার স্বররূপকে বেলাবলী (বেলাওল) কি করে বলা হল তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে মতান্তর নিয়েও কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি—প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য স্বরূপে। তানসেনবংশধর রবাবী মহম্মদ আলি খাঁসাহেবের কাছে আমাদের জানিত রূপের মতই বেলাবলী রাগের রূপ শুনেছিলাম। নাম উচ্চারণ সম্বন্ধেও বলেছিলেন এই রাগকে সহজ কথায় এখন অনেকে বেলাওল বলেন। রাগরূপ পরিচয়ের সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ অনেক স্থানেই আমি তখন স্ব-মতের সংগে মিল পেয়েছিলাম। আলাইয়ার প্রকৃত রূপকে বলাওল বলা এবং সেই রূপের উপর কোমল 'নি' ছুঁইয়ে তাকে পৃথক করলাম ভেবে আলাইয়া করা এ যেন কোন আকৃতির কাণে ফুল পরিয়ে ভিন্ন নামে পরিচয় প্রদানের মত। কয়েকটি প্রধানস্বরবিশিষ্ট রাগের উপর কড়িমধ্যম বা কোমল নিষাদ ব্যবহার হয়ে পড়া অসতর্কতা কিংবা মেজাজের সহজ লভ্যতার জন্যই খেয়াল গানে এবং গৎএর উপর এসে গেছে—এ বেশ বুঝা যায়।

এই রাগটির প্রকাশ সময় উক্ত নির্দ্ধারণ সময়ের কিছু পশ্চাতে ছিল কিন্তু আমি বিচার করে দেখলাম প্রধানস্বরের সংগে কড়ি মধ্যমযুক্ত রাগ প্রকৃতির রূপপ্রভাবগত সেই সময়ের উপযোগী নয়, দ্বিতীয় প্রহরের প্রথমেই অর্থাৎ গৌড়সারঙ্গের পূর্ব্বেই তার যথার্থ স্থান। শাস্ত্রীয় শ্লোকেও তাই আছে।

আমাদের ঘরাণায় ও অন্যান্য গ্রন্থে সময়ের সংগে রাগসমূহের প্রকাশ নিরূপণ যেভাবে করা আছে তারমধ্যে কোন কোন রাগকে আমার চিন্তাধারার উপর বিচারকে নির্ভর করে প্রকৃতির সংগে যথাযথ সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনে স্থান পরিবর্ত্তন করে দিতে বাধ্য হলাম। আশাকরি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই তার উপযোগীতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন।

গৌড়সারঙ্গ (২৭)

জাতি সম্পূর্ণ। দুই মধ্যম ব্যবহার। বক্রগতি। বাদী-সংবাদী—গান্ধার ও নিষাদ। পঞ্চম বলীস্বর। বড় প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধ শ্রেণীভুক্ত।

ঠাট,—স-গ-র-ম-গ-প-হ্ম-প-ধ-ন-র্স, র্স-ন-ধ-প-হ্ম-প-গ-ম-র-স।

রাগরূপকে ধ্যান চিন্তার মধ্যে এনে র-ম-গ, এই তিনটি স্বর প্রকাশ করলে রাগের মূর্ত্তি মনের মধ্যে

উদিত হয়। গ-র-ম-গ, সুর উৎপন্ন করলে সহজেই রাগরূপ ধরা দেয়।

প্রধান রূপাঙ্গ—গ-র-ম গ। ন্-স-গ-র-ম-গ। হ্মা-প-গ-ম-র ম-গ। হ্মা-প-ধ্-ন-ধ-প-হ্মা-প-গ ম-র-ম-গ-প-র-স। ন-হ্মা-প-র-ম-গ ইত্যাদি।

আলোচনা,—আগের মধুর রাগগুলির মধ্যে এই রাগটিও অন্যতম। এই রাগ যেমন বিস্তার বহুল তেমনি করুণ মধুর ভাবময়। এর রূপকে বিস্তার বহুল করে গড়ে তুলতে বিশেষ দক্ষতার যে প্রয়োজন থাকে তারজন্য বেশী সংখ্যক ধ্রুপদ জানতে পারলে অনেক সহজ হতে পারবে। প্রত্যেক বক্রগতি স্বরবিশিষ্ট রাগ সম্বন্ধেও ওই কথা প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গে গৌড়সারঙ্গ রাগটির নামকরণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার আবশ্যক আছে। এর সুররূপের উপর সারঙ্গ কথার পূর্ব্বে গৌড় কথা বসিয়ে গৌড়সারঙ্গ নামের এই রাগটির সারঙ্গরূপের রূপসম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। গৌড়নামে একটি রাগ আছে তাকে গৌড় বা গৌঁড়মল্লার বলা হয়। কিন্তু তার সংগেও গৌড়সারঙ্গের গৌড়রাগের কোন সম্পর্ক নেই।

এ স্থলে গৌড় বা গৌড়মল্লার রাগের পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক নিয়ে দেখা যাচ্ছে—'সঙ্গীত-সার' গ্রন্থের মধ্যে আলাপের মাধ্যমে যেভাবে এর স্বররূপ অঙ্কিত আছে তাতে দেখা যায় সেনী মল্লারের (মিঁয়ামল্লারের) রূপভাবই সমধিক। কেবল মাত্র মধ্যে মধ্যে প্রধান গান্ধারের ব্যবহার থাকায় পার্থক্য কিছু পরিলক্ষিত হয়। আমার মনে হয় উক্তগ্রন্থকর্ত্তাকে গৌড় বা গৌঁড়কে সেনীমল্লার হতে পৃথক করে রাখবার জন্য মল্লারের রূপ মধ্যের প্রধান গান্ধারের রূপাশ্রয় নিতে হয়েছিল। সুতরাং এর দ্বারা বেশ বুঝা যাচ্ছে তাঁর গ্রন্থের দুই গান্ধার, দুই নিষাদযুক্ত গৌড়রাগ প্রকৃত পক্ষে গৌড়মল্লার নামেরই উপযোগী। আমাদের জানিত তানসেন রচিত ধ্রুপদে গৌড়রাগের যেভাবে রূপ-পরিচয় আছে তাতে রাগের নিজস্বরূপ অনেকখানি নির্ভর করে আছে; অর্থাৎ সেনীমল্ল'রে যে প্রধান রূপ-চিহ্নস্বর—সেই দুই নিষাদের পরস্পর সুরের উৎপন্ন চিত্ররূপ নেই কিন্তু মল্লারের প্রভাবমুক্ত নয়। বেশ বুঝা যায় মল্লারের প্রধান গান্ধারকে ধরে যেখানে তার রূপবিন্যাস আছে সেখানে তার স্থানে কোমল গান্ধারএর ওই রাগের অন্যান্য অংশরূপ সংযোজিত হয়ে গৌড় নামকরণ হয়েছে, এজন্য এর নাম প্রকৃতপক্ষে গৌড়মল্লার নামে থাকাই বিধেয়। এখন গৌড় কথার উৎপত্তি কিভাবে এল তা দেখা দরকার। আমার সবিশেষ ধারণা— বঙ্গদেশের গৌড় রাজধানীর কোন গায়ক প্রাচীন পরিচিত মল্লার রাগের সুরকে ধরে দেশের নাম দিয়ে কোমলযুক্ত করে তার রূপ অঙ্কনের দ্বারা গৌড় (গৌঁড়) বা গৌড়মল্লাররূপে রাগের নাম প্রচার করেন।

সারঙ্গ সম্বন্ধে,—সারঙ্গ রাগটির সুর যদিও আদি জাতিদের স্বভাবগত সুর থেকে সংগৃহীত হয়ে উক্ত নামে পরিচিত হয়েছে অতি প্রাচীনকাল হতেই, তত্রাচ দেখতে পাওয়া যায় ওর পরিণতরূপ রাগ সংগীতেরক্ষেত্রে বাংলা দেশে বহু পূর্ব্বে স্থান পায়নি। এর প্রমাণে ওই রাগটির নামোল্লেখ লুইপাদের চর্য্যাপদে এবং পরবর্ত্তী কবিদের গীতাবলীতে এমন কি প্রায় ছ'শ' বছর আগের রচিত বড়ু চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের ৩৩টি রাগের মধ্যেও স্থান নেই। অথচ পাহাড়ীয়া রাগের পরিচয়

যথেষ্ট আছে।

গৌড় রাজধানীতে সংগীতচর্চার প্রাচীন ইতিহাস এখন যা পাওয়া গেছে তাতে লুইপাদ সময়ের সংগীতচর্চার অনেক পরে। সুতরাং একথা মনে করতে পারা যায় গৌড়ের সেই সংগীতসাধকের সময়েও সারঙ্গ রাগের চর্চা ছিল না। তিনি মধ্যাহ্নকালের প্রকৃতিগত সময়ের সংগে ভাবগত সম্বন্ধ রক্ষার প্রেরণা নিয়ে ওই যোগ্য স্থানের উপযোগী সুর সৃষ্টি করে নিজ দেশের নাম দিয়ে গৌড়সারঙ্গ নামে পরিচিত করেন। এর স্বররূপের মধ্যে মধ্যাহ্নকালের উপযোগী যে ভাবরূপ আছে তার সম্পর্ক কিছু আছে মধ্যরাত্রির বেহাগের সংগে। এর কারণধরে মনে হয় মধ্যরাত্রিতে প্রকৃতির ক্রিয়া আকর্ষণে বিরহিণীর অন্তরে যে উদাস ও বিয়োগব্যথা আসে সেই অবস্থার ক্রিয়া মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতাতেও প্রকৃতির বুকে নিয়ে আসে নিরালা-নিঃসঙ্গতার এক রূপ। তাই গৌড়সারঙ্গের মধ্যেও বেহাগের মত অনেকখানি মনের সংগে সেই প্রভাব থাকে। এজন্য অনেক গায়ক-গুণী গৌড়সারঙ্গকে দিনের বেহাগ বলে এসেছেন। সারঙ্গ কথাটির ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক নামের পরিচয় আছে,—তার থেকে কোনটির অর্থতাৎপর্য্যকে ধরেই মনে হয় সারঙ্গ কথাটি যুক্ত হয়েছিল। রাগসমূহে যে সমস্ত নাম আছে তার মধ্যে অধিকাংশরই নামের অর্থের উপর সুরের রূপ-ভাবের কি সম্পর্ক আছে তা কিছুই বুঝা যায় না এবং তার উদ্দেশ্যের কোন পরিচয়ও পাওয়া যায় না কিন্তু উক্ত দুটি রাগের নামের উপর গৌড় কথা থাকায় নামের সংগে স্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান আকর্ষণ থেকে গেছে তার সত্য আবিষ্কারের জন্য। তাই আমার চিন্তালব্ধ বিচারকে উপস্থাপিত করে রাখলাম। আমার বিশ্বাস চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে এই তথ্য মনের মধ্যে রেখাপাত করতে পারবে ॥

সারঙ্গ (২৮)

জাতি ঔড়ব,—গান্ধার-ধৈবত বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী—ঋষভ, পঞ্চম। শুদ্ধশ্রেণী। বড়-প্রকৃতির রাগ। সরলগতি। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-ম-প-ন-র্স-র্স-ন-প-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-প-ম-র-স। ম,-র-স-ন্-র-স-র। ম-প-ম-র-ন্-র-স।

আলোচনা,—সারঙ্গ রাগটিকে বৃন্দাবনীসারঙ্গও বলা হয়। আগে একস্থানে জানিয়েছি—এক শ্রেণীর আদি জাতিদের স্বভাবজাত সুর হতে সারঙ্গ নাম দিয়ে এই রাগ প্রচারিত হয়েছে।

মল্লভূম এবং সিংহভূম অঞ্চলের আদীবাসী সাওতালদের কণ্ঠে এই রকম সুর আমি শুনতে পাই বাল্য জীবনে। সেই সুরকে দেখাচ্ছি স্বরের মধ্যে দিয়ে তাদের উচ্চারণ ভঙ্গীকে রেখে,—যথা,—রেমাং রে সা রে-সা, রেমাং পামাং রে-সা-মারে-সা, নি-পামাং-রে-সা, মারে-সা, মারে-সাসাং রে-সা।

প্রধান স্বর নিয়ে পঞ্চস্বরের সমষ্টিতে যে দু'একটি রাগ আমরা পাই, সেগুলি সর্বপ্রথম আদি

জাতিদের সুর হতে যে উদ্ভূত তা বেশ বুঝা যায়। যুবাকালেও কোন কোন সময় আমি পাহাড়ী-অঞ্চলে ঘুরে ফিরে দেখেছি সাওতাল রমণীরা মধ্যাহ্নে নানান কাজে যখন নিযুক্ত থাকে তখন তাদের কণ্ঠে গানের আবেগ যেন বেশী করে আসে ক্লান্তি অপনোদনের জন্যই মনে হয়। সেই সময় ওই সুর অর্থাৎ যে সুর হতে সারঙ্গ রাগের রূপ এসেছে—তা যেন তখন প্রকৃতির নিঝুম-নিস্তব্ধভাব পরিবেশের যথার্থ উপযোগী মনে হত এবং আমি নিভৃতে সে সময় সারঙ্গ রাগ গেয়ে অনুভব করতাম যেন প্রকৃতির সেই স্বভাব রূপের সংগে আমার মন মিশে গেছে ওই সুরকে ধরে। মনে হত এই সুর ছাড়া অন্য কোন রাগের সুর এই সময়ের উপযোগী নয়। আশ্চর্য্য হয়ে মনে করতাম যে শিল্পসাধক ওই সুরকে ওই সময়ের জন্য ধার্য্য করেছেন তাঁর নির্দ্ধারণ শক্তি সত্যই অপূর্ব্ব। সারঙ্গ সুরে যাঁরা কোমল নিষাদ ব্যবহার করেন তাঁদের সুর সৃষ্টির মহিমা এবং তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, চিন্তাশূন্য মনের ইচ্ছে নিয়ে চলাই প্রধান হয়ে থাকে। সারঙ্গরাগের সুরটি যেভাবে সংগ্রহ হয়ে প্রকৃতির যে সময়ে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়ে আছে সে সময়ে প্রকৃতির কোমল রস উৎপাদক রূপভাব নয়। ধরিত্রীর উপর তখন রৌদ্র প্রখরভাবে বর্ষিত হয়, চতুর্দিক ঝিল্ ঝিল্ করতে থাকে, বৃক্ষের উপর পাখীরা থাকে নিঝুম হয়ে, গাভীরা বৃক্ষ ছায়াতলে শায়িত থাকে, রাখালেরা ঝোপের আড়ালে থেকে বাঁশীতে উদাসী সুর বাজায়—সেই সুরে থাকে পাহাড়ী কিংবা সারঙ্গ রাগের রূপ আমেজ, বাহির মন তখন সবই শূন্য শূন্য মনে হয়।

যাই হোক্—সারঙ্গরাগের বহু প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়াল বিষ্ণুপুর ঘরাণায় আছে কিন্তু কোনটাতেই কোমল নিষাদ নেই এবং আমি আগে কোন সঙ্গীতজ্ঞের কাছেও কোমল ব্যবহার করতে শুনিনি।

সারঙ্গ রাগটির পূর্বে বৃন্দাবনী নাম কি কারণ নিয়ে হয়েছিল তার সত্য নিরাকরণ করা শক্ত আছে, তবে আমার মনে হয় শ্রীবৃন্দাবন যখন বনাঞ্চলে পরিণত ছিল, তখন সেই সময়ে ওখানকার আদি জাতিদেরও কণ্ঠে ওই সুরই ছিল এবং হয়ত ওইখান থেকেই প্রথম এই সুর আবিষ্কৃত হয়ে কোন সাধকের কণ্ঠে এসে পৌঁছে এবং তিনিই হয়ত স্থানের নাম দিয়ে বৃন্দাবনীসারঙ্গ বলে এর রূপ প্রচারিত করেন।

আমরা চলিত কথায় এখন সারং বলি কিন্তু ওই শব্দাক্ষরের কোন মানে নেই, সারঙ্গনামই প্রকৃত। সারং কথা অভিধানে পাওয়া যায় না। সারঙ্গর মানে অনেক প্রকার আছে, যথা,—চাতক পক্ষী, ময়ুর, ভ্রমর, সিংহ, হস্তী, হরিণ, চিত্রমৃগ, ধনুক, মেঘ, চন্দন, কর্পূর, ছত্র, পক্ষীবিশেষ, রাজহংস, বস্ত্র, বিবিধবর্ণ, কামদেব, কেশ, স্বর্ণ, আভরণ, পদ্ম, বাদ্যবিশেষ, শঙ্খ, পুষ্প, কোকিল, পৃথিবী, রাত্রি, দীপ্তি। এ গুলির মধ্যে নামকারক কোন্‌টিকে গ্রহণ করে সারঙ্গ নাম দিয়েছিলেন তা আমাদের ধারণামত সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে অর্থাৎ সুরের প্রভাব ও মিলন উপযোগী মত কোন একটিকে রাখতে পারা যাবে। একটি নামের উপর বহু বস্তুর রূপ পরিচয় কিভাবে কি নিদর্শনের সন্ধান পেয়ে প্রদান করা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ কিছু পাওয়া যায় না, অর্থাৎ কেন হ'ল তার সমাধান নেই।

সামন্তসারঙ্গ (২৯)

জাতি ঔড়ব,—গান্ধার-নিষাদ বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী-ধৈবত ও ঋষভ। সালঙ্ক শ্রেণী—আরোহণ-অবরোহণের প্রথম অর্দ্ধাংশ সারঙ্গরাগের এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ ভূপালীরাগের মিশ্রণে তৈরি। সরল গতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-ম-প-ধ-র্স-র্স-ধ-প-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ধ-ম-র-ধ্-স। ম-র-ম-প-ধ-ম-র-ধ্-স। ম-প-ধ-র-ম-স-র-ম-র-স-ধ্-স॥

আলোচনা,—এই রাগটির রূপ মতান্তরে দুর্গানামে পরিচিত। শেষোক্ত নামের ব্যাপকতা এখন এত বেশী যে, আমাদের ঘরাণা ছাড়া বোধ হয় সামন্তসারঙ্গ নাম অজ্ঞাত হয়ে গেছে। আমরাও এখন দুর্গা নামেই ব্যবহার করছি—নামের মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে। যে নামকে ধরে সমস্ত সুরের মধ্যে দিয়ে ডাকার আকুলতা থাকে সেই নাম যদি কোন রাগের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেও কি কম লাভ! তবে রাগরূপের উপর পরিচয় ধরে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে—সামন্তসারঙ্গ নামটির রূপার্থ আছে। সে কথা উক্ত রূপ নির্ণীত পরিচয়ে জানিয়েছি। আদি জাতিদের সুর থেকে সংগৃহীত সারঙ্গ-ভূপালীর যুক্ত রূপে এর রূপ সৃষ্টি। প্রথমেই সারঙ্গের রূপ আছে বলে উক্ত নামকরণ সঙ্গত কারণেই হয়েছিল বলা যায়। তাছাড়া এ-ও মনে হয় সামন্ত রাজাদের কোন ব্যক্তিই এই সুর রচনা করে ওই নাম দিয়েছিলেন। হয়ত বাংলার দক্ষিণ রাঢ়ভূমের সামন্ত রাজাদের ঘরাণা থেকেই হয়েছিল। কারণ সারঙ্গ এবং ভূপালীর সুরের সৃষ্টিতত্ত্ব এই অঞ্চলের সংগে বিশেষ সম্বন্ধ নিয়ে আছে আদি জাতিদের মাধ্যমে। সুতরাং একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না—এখান থেকে প্রচারিত হয়ে অন্যস্থানে কোন সাধকের কামনায় দুর্গানাম হয়েছিল॥

শুদ্ধসারঙ্গ (৩০)

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব, আরোহণে গান্ধার-ধৈবত এবং অবরোহণে গান্ধার বর্জিত। দুই মধ্যম ব্যবহার। বাদী-সংবাদী—পঞ্চম-ঋষভ। সরলগতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-হ্ম-প-ন-র্স-ন-ধ-প-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-হ্ম-প-ন-ধ-প। হ্ম-প-ধ-প-ম-র। হ্ম-প-ন-র্স-ন-ধ-প-ম-র-ন্-র-স।

আলোচনা,—এই সুরের নাম শুদ্ধ-সারঙ্গ কেন হল তার সম্বন্ধে কোন বিচার-যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। যেভাবে স্বর সংযোজনার উপর এর রূপ গঠিত হয়েছে তাতে পাওয়া যায় পূর্বাঙ্গে সারঙ্গেরই রূপ, কিন্তু আরোহণে কড়ি মধ্যম ব্যবহারের পর পঞ্চম ইত্যাদি স্বরগুলির যেভাবে উত্তরাঙ্গে উঠা নামার দ্বারা সুরের রূপ আসে তাতে সঠিক কোন রাগের রূপকে ধরা শক্ত। ওই স্থানে স্বর রচনা করে যেভাবে

মধ্যম ও ঋষভে নেমে এসে সুর উৎপন্ন করে তাতে মনে হয় যেন কেদারারই রূপভাব। আবার খেয়াল গানে কেউ কেউ উপর দিকে এক এক সময় যখন স্বর-বিস্তার দেখান তখন বেহাগের আমেজ এসে যায়। এই সব কারণ জন্য এই রাগকে সালঙ্ক না সংকীর্ণ জাতিতে ফেলা হবে তা নিরাকরণে গণ্ডগোল বাধে। যাই হোক্ মোটের উপর যদি সারঙ্গ ও কেদার রাগ মিশ্রণেই এর উৎপত্তি ধরা হয় তাহলে ওই যুক্ত নামেই এর নাম থাকা উচিত, শুদ্ধসারঙ্গ নাম কদাচই হবে না, বরং সাধ সারঙ্গ বলতে পারা যায় কিংবা সারঙ্গ নামের 'সা' কথাটা এবং কেদার নামের 'কে' কথাটা বাদ দিয়ে বেশ এক নূতন নামে রঙ্গদার নাম রাখাও চলে। এই রাগকে প্রকাশের যথাযথ নিয়ম ধরে স্থান ধার্য্য করাও শক্ত। রাগ বিজ্ঞানের অভাব যুক্ত এই রকম ধরণের রাগ বহুদিন হতে রাগ চর্চায় চলে আসছে বলে এর পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক হল। আমাদের ঘরাণায় এই রাগের সুর আসে নি।

মধুমাধবীসারঙ্গ (৩১)

জাতি-ঔড়ব,—গান্ধার-ধৈবতবর্জিত। কোমল নিষাদ। বাদী-সংবাদী-পঞ্চম ও নিষাদ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। সরলগতি। শুদ্ধশ্রেণী। মধ্যপ্রকৃতির রাগ।

ঠাট,— স-র-ম-প-ণ-স́-স́-ণ-প-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ণ-প-ম-প। র-ম-প। ণ-স́-প-স́-ণ-ম-প। ম-র-স-ণ্-র-স।

আলোচনা,—এ কথাই সত্য বলে মনে হয় যে, রাগরূপ-সৃষ্টির প্রথম মুখে যে কয়েকটি রাগ সীমিত সংখ্যা নিয়ে ধরা দিয়েছিল সেগুলি যখন প্রকৃতির ভাবরূপের সংগে সংযোগ রক্ষা করে তাদের প্রকাশের সময়স্থাপিত হয় তখন এক একটির সময়ব্যাপ্তি অনেকখানি নিয়ে ছিল প্রকৃতির ভাবরূপ পরিবর্ত্তনের সীমা পর্য্যন্ত। এই যথোপযুক্ত নিয়মের মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে সারঙ্গরাগটির রূপপ্রভাব প্রকৃতির মধ্যাহ্নের রূপ প্রভাবের সংগে অনেকখানি স্থান যুক্ত হ'য়ে আছে। তারপর সময়ের গুণে প্রকৃতির রুক্ষ নিঝুমভাব পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে প্রাণীকুলের নূতন উদ্দীপনার আলোড়নের মুখে সামান্য স্নিগ্ধ কোমলরূপের সংঙ্গে সুরের প্রভাবসামঞ্জস্য রক্ষা কল্লে সারঙ্গরাগের উপর প্রয়োজনের উপযুক্ততা বুঝে কোমল নিষাদ প্রয়োগ করে মধুমাধবী নাম দিয়ে সেই সময়ে প্রকাশের জন্য রাখা হয়। এই তাৎপর্য্যপূর্ণ সুন্দর নিয়মের মধ্যে দিয়েই সময়ের সংগে রাগগুলির প্রকাশের সময় নিরূপণ হয়ে আছে।

অনেকে মধুমাধবীসারঙ্গে প্রধাননিষাদও ব্যবহার করেন কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার উক্ত পরিচয় প্রদানের বিচারযুক্তিকে যাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরা প্রধান নিষাদ ব্যবহার যে অযৌক্তিক তা ভাল ভাবেই স্বীকৃত হবে। সারঙ্গ সীমানায় আরো সারঙ্গজাতীয় রাগ আছে—হয়ত বেশীও থাকতে পারে, কারণ সংখ্যা বাড়াতে মনগড়ার কোন অসুবিধে বা বাধা নেই। যদি বেশী থাকে তাহলে সেগুলির সংগে

আমার পরিচয়ে আসেনি। তবে এ স্থলে বল্‌ব—গৌড়সারঙ্গরাগকে সারঙ্গ-গোষ্ঠীর রাগ একেবারেই বলতে পারা যাবে না। কারণ সারঙ্গ-জাতীয় রাগদের সংগে তার কোনই সম্পর্ক নেই।

মিঁয়াসারঙ্গ (৩২)

জাতি ষাড়ব, গান্ধার বর্জ্জিত। দুই নিষাদ। বাদী—সংবাসী—ঋষব পঞ্চম। মধ্যপ্রকৃতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান। বক্রগতি।

ঠাট,—স-র-ম-প-ন-র্স-র্স-ন-ধ-ণ-প-ম-র-স।

আলোচনা,—এই রাগের ধ্রুপদ বা খেয়াল বিষ্ণুপুর ঘরাণায় ছিল বা আছে বলে আমার জানা নেই। রাগটির মধ্যে বিশেষত্ব এমন কিছু আছে বলেও মনে হয় না। তবে প্রচার পরিচয় কিছু আছে। এর সুরের রূপ তৈরী হয়েছে সেনীমল্লারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপাংশ নিয়ে সারঙ্গের সংগে মিশিয়ে।

যথা,—ন্-ণ্-ধ্-ম্-প্-ন্-স, ণ্-ধ্-ন্-স, র-ন্-ণ্,-ন-স। এই স্বরসমূহের সুররূপ সেনীমল্লারের, তারপর থাকে সারঙ্গের সুর।

ভীমপলশ্রী (৩৩)

দিবা তৃতীয় প্রহর। জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে ঋষভ-ধৈবত বর্জ্জিত। কোমল গান্ধার ও নিষাদ। বাদী-সংবাদী—মধ্যম ও ষড়জ। পঞ্চম বলীস্বর। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। বড় প্রকৃতির রাগ। সরল গতি। সালঙ্ক শ্রেণী,—আরোহণে প্রাচীন নট রাগের স্বররূপ এবং অবরোহণে সিন্ধুর স্বররূপ নিয়ে তৈরি।

ঠাট,—স-জ্ঞ-ম-প-ণ-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ম-জ্ঞ,-র,-স। ণ্-স-ম-জ্ঞ-র-স। ম-জ্ঞ-প-ম-প-জ্ঞ-ম-ণ্-স-জ্ঞ-ম-প-জ্ঞ-ম-জ্ঞ-র-স। জ্ঞ-ম-প-ণ-ধ-প-ণ্-স-ম-জ্ঞ-প-ম-জ্ঞ,-র,-স॥

আলোচনা,—ভীমপলশ্রী রাগটি অতিশয় সরস ও ভাবসমৃদ্ধ এবং বিস্তার বহুল। আধ্যাত্মিক ভাবধারার গানে এর প্রভাব যথেষ্ট। পূর্ববর্ণিত প্রকৃতির রূপভাবের পরিবর্ত্তনের উপর প্রাণীকুলের উদ্দাম-আনন্দবৃদ্ধির সম্পর্ককে ধরে ভীমপলশ্রী রাগটি তৃতীয় প্রহরের সম্মুখে প্রকাশের সময়ধার্য্য হয়েছে। এই প্রহরের ব্যবধানের মধ্যে প্রকৃতির রূপের পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু ধরা যায় না বলে তৃতীয় প্রহরে রাগধার্য্যের সংখ্যা কম। কোন কোন গ্রন্থকার ভীমপলশ্রীর আরোহণে কেবল প্রধান নিষাদ ব্যবহার করেছেন। আমার মতে আরোহণে প্রধান নিষাদ ব্যবহার করা রাগের সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে সম্পুর্ণ ভুল হবে। তাছাড়া ওই স্বর রাগের রূপধর্ম্মীও নয়। প্রধান নিষাদ বলে যেখানে মনে

হয় সেখানে থাকে কোমলই তীব্ররূপে। প্রধান নিষাদ ব্যবহার করলে পট-দীপের রূপ সেখানে পরিষ্কাররূপে এসে যাবে। স´-ন-স´—এই রকম স্বর প্রকাশের সময় তীব্র কোমল ব্যবহার হতে পারে কিন্তু প্রধান নিষাদ কদাচ ব্যবহার হবে না।

কারো কারো ধারণা ভীম এবং পলাশী নামে দুটি রাগ আছে, তাদের মিশ্রণে এই ভীমপলশ্রী রাগের উৎপত্তি। এই রাগের রূপ পরিচয়ের মধ্যে ওই ধারণার মূলে কোন সম্ভাব্য যুক্তি নেই। যথাযথ এর রূপ দর্শনের দ্বারা বিচারে প্রথমোক্ত দুটি রাগ থেকেই যে এর উৎপত্তি তাতে কোনই সংশয় নেই।

রাজবিজয় (৩৪)

জাতি-ষাড়ব-সম্পুর্ণ—আরোহণে ঋষভবর্জিত। বাদী-সংবাদী-পঞ্চম ও ষড়জ। মধ্যম বলীস্বর। উত্তরাঙ্গ প্রধান। বাদীস্বরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই রাগের সুর উৎপাদন শক্তি বেশী। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। সরল গতি। আরোহণের স্বরসংযোজনা অন্য রাগের সম্পর্ক শূন্য বলে শ্রেণী নিরাকরণে সালঙ্কে আসে না।

ঠাট,—স-জ্ঞ-ম-প-ধ-ণ-স´-স´-ণ-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—প-ম-জ্ঞ-ম-প,-ধ-ণ-ধ-প। জ্ঞ-প-ম-জ্ঞ-প-ধ-ণ-ধ-প-ম-প। ধ-ণ-স´,-প-জ্ঞ-ম-প-জ্ঞ-র-স।

আলোচনা,—এই রাগটিতে বিস্তার করে গাইবার জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধে থাকলেও ভীমপলশ্রীর রূপের দিকেই দৃষ্টি দিতে মনের আকর্ষণ বেশী আসে বলে একে ঠিক মেজাজিরাগ বলা যায় না॥

পটদীপ (৩৫)

জাতি ঔড়ব-সম্পুর্ণ,—আরোহণে ঋষভ-ধৈবত বর্জিত। তবে সময় সময় নিষাদ থেকে ধৈবতে নেমে ন-স´ সুরের দিকে যাওয়া হয়। বাদী-সংবাদী পঞ্চম ও তারাসপ্তকের ষড়জ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। গান্ধার কোমল। সরল গতি। সালঙ্ক শ্রেণী। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। নিষাদ বলীস্বর।

ঠাট,—স-জ্ঞ-ম-প-ন-স´-স´-ন-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—প-জ্ঞ-ম-ন,-ন-স´। ন-ধ-প, জ্ঞ-ম-প-ন-স´। ন-ধ-ন-স´-ন-ধ-প।

আলোচনা,—এই রাগটির সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় নিয়ে নূতনত্ব কিছু নেই। ভীমপলশ্রী রাগটির

স্বরের উপর কোমল নিষাদকে সরিয়ে প্রধান নিষাদ দিয়ে পার্থক্য রাখা হয়েছে মাত্র। অবশ্যপৃথক করে রাখবার উপযোগী অনেকগুলি ক্ষেত্রস্থল আছে।

নাট (৩৬)

জাতি ঔড়ব,—ঋষভ-ধৈবত বর্জ্জিত। কোমল গান্ধার-নিষাদ। বাদী-সংবাদী পঞ্চম ও ষড়জ। সরলগতি। বড়প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-জ্ঞ-ম-প-ণ-র্স-ণ-প-ম-জ্ঞ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—প-জ্ঞ-ণ্-স-জ্ঞ,-স। ম-প-ণ-প-র্স-ণ-প-জ্ঞ-ম-প।-স—জ্ঞ—ম—প—স-জ্ঞ-ণ্-স-জ্ঞ-স।

আলোচনা,—আমাদের ঘরাণায় ধ্রুপদ—খেয়ালের মধ্যে এই রাগের পরিচয় বহুকাল হতে আছে এবং আগের বহু ঘরাণাতেও ছিল কিন্তু এখন নাট নামের উপর এর সুর একরকম শুনতেই পাওয়া যায় না।

এই রাগের স্বররূপের প্রতি দৃষ্টি দিলেই মনে হয় ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগদের জনক। ভীমপলশ্রীর আগেই এর রূপ প্রকাশের স্থান যথাযথ ভাবেই রাখতে পারা যায়, তবে সময়ের সম্পর্ক ধরে স্নিগ্ধ-রসের কথা বিবেচনা করে, বিচার আলোচনার মাধ্যমে ভীমপলশ্রীকেই প্রথমে স্থান না দিয়ে পারা গেল না। তাছাড়া সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের বেশী সংখ্যক লোকের নাটরাগ অজানা থাকায় তৃতীয় প্রহরের সম্মুখবর্ত্তীর স্থানে ধার্য্য করা হলে সময়ের সংগে এর রূপ প্রভাব বুঝবার হয়ত অসুবিধে হত। যাই হোক ওই সময়ের জন্য মাত্র ওই দু'তিনটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত রাগকে ইচ্ছে করলে আগে পিছু করে প্রকাশ করায় সময়ের সম্পর্ক ব্যাহত হবে না। প্রথমাবস্থার কোন পাঁচসুর বিশিষ্ট আদিসুরের উৎস থেকে নিয়ে কোমলযুক্ত করে নাট নামে প্রচারিত হয়েছে বলেই বিচারে আসে। ভাষাগত কোন্ অর্থে নাট নামকরণ হয়েছিল তার হদিস্ কিছু পাওয়া যায় না।

মুলতান (৩৭)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে ঋষভ-ধৈবত বর্জ্জিত। ব্যবহার কড়ি মধ্যম এবং ঋষভ-গান্ধার-ধৈবত-কোমল। বড় প্রকৃতিররাগ। বাদী-সংবাদী পঞ্চম ও ষড়জ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। সরল-গতি। নিজরূপশক্তিতে পৃথক হয়ে থাকলেও ভীমপলশ্রীর ভাবধারায় আরোহণ অবরোণের স্বর-সংযোজনার উপর 'তোড়ী'র কোমলগুলি বসিয়ে সময়ের সংগে সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তায় সেগুলি তীব্রতায় রেখে মূলতান রাগের যে উৎপত্তি তা বেশ বুঝা যায়।

ঠাট,—স-জ্ঞ-ক্ষা—প-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-ক্ষা-জ্ঞ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন্‌-স-জ্ঞ-হ্ম-প। জ্ঞ-হ্ম-প-ন-দ-প। ন্‌-স-প-হ্ম-জ্ঞ-ঋ-স। এই রাগের আলোচনার বিশেষ কিছু নেই।

মধুমন্তি (৩৮)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে ঋষভ—ধৈবত বর্জ্জিত। কোমল গান্ধার এবং কড়ি মধ্যম ব্যবহার। বাদী-সংবাদী-পঞ্চম ও ষড়জ। সরলগতি। মধ্য প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী। উত্তরাঙ্গ-প্রধান।

ঠাট,—স-জ্ঞ-হ্ম-প-ন-র্স-ন-ধ-প-হ্ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—প-ন-ধ-প-হ্ম-জ্ঞ-র-স। স-জ্ঞ-হ্ম-প-ধ-প-হ্ম-জ্ঞ-র,-স।

আলোচনা,—এই রাগটি আমাদের ঘরাণার পরিচয়ে নেই। প্রচলিত মূলতান রাগে যেরূপ স্বর সংযোজনা আছে তার ঋষভ-ধৈবত কোমলকে সরিয়ে তার পরিবর্ত্তে ওই স্বর প্রধান দিয়ে মধুমন্তি নামে প্রকাশ পেয়েছে। মধুমন্তি নামটি কার্ণাটিক সংগীত থেকে এসেছে বলেই মনে হয়। ওর সুরের রূপও এসেছে কি-না তা আমার জানা নেই।

পুরিয়া (৩৯)

দিবা চতুর্থ প্রহর। জাতি ষাড়ব,-পঞ্চম বর্জ্জিত। কোমল ঋষভ এবং কড়ি মধ্যম। বাদী-সংবাদী-গান্ধার ও নিষাদ। পূর্বাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধশ্রেণী। সরলগতি। বড় প্রকৃতিরাগ।

ঠাট,—স-ঋ-গ-হ্ম-ধ-ন-র্স-র্স-ন-ধ-হ্ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন্‌-ঋ-গ-ন্‌-ঋ-স। ন্‌-ঋ-গ-হ্ম-ঋ-গ-হ্ম-গ-ন্‌-ঋ-স। স-ঋ-গ-হ্ম-গ-ঋ-ন্‌-ঋ,-স।

আলোচনা,—এই রাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বেশ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই রাগের ন্‌-ঋ-গ এবং ন্‌-ঋ স, এই স্বররূপ বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ এবং রাগরূপের উত্থানে বেশী ব্যবহৃত হয়। খুব সতর্ক হয়ে এই রাগের উপর ওই ধরণের স্বরগুলি প্রকাশ করতে হয়। বেশ লক্ষ্য করা যায়, সতর্কতার অভাবে ন-ঋ-গ কিংবা ন-ঋ-ন স্বর অনেকের কণ্ঠে কোন কোন সময় ন-স-গ,-ন-স-ন হয়ে পড়ে। এতে রাগ-রূপের বিশুদ্ধ ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম স্বরস্বভাববিশিষ্ট রাগকে প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠের সাধনা শক্তি নিয়ে পাকা বোধ থাকা অত্যাবশ্যক।

আজকাল পুরিয়া কল্যাণ নাম দিয়ে যে রাগ গাওয়া হয় তার সুরের মধ্যে কল্যাণ রাগের সম্পর্ক থাকে না, ইমনের সুরই তাতে থাকে। উত্তরাঙ্গে—ন-ধ-হ্ম-প, র্স-ন-ধ-প-হ্ম-ন-ধ-প, ইত্যাদি এই রকম ধরণের খাঁটি ইমনের সুর প্রকাশ ক'রে পুরিয়া-ইমন না বলে কি করে কোন্ বিচার যুক্তিতে পুরিয়া-

কল্যাণ বলা হয় ? নিজের খুসী চলতে পারে কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তা চলতে পারে না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই রাগের যথার্থ পরিচয় এবং তার উপর জ্ঞানঅর্জনের কথা চিন্তা করেন না, শুধু গানে বা যন্ত্রে রাগ বা সুর তৈরী করাকেই যথেষ্ট মনে করে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই অভাব বিশেষভাবে দেখেছি বহু স্থানে পরীক্ষক হয়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে যেটুকু ঔপপত্তিক বিষয় সেখান হয় তা তাঁরা মুখস্ত বুলির মত আওড়ে যান—কোন রকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ! আমারও এই সব গুরুত্ব বিষয়ে পাশ কাটিয়ে চলি। ক্রিয়া সিদ্ধের বিষয়টুকু শিখিয়ে দিতে পারলেই যথেষ্ট দেওয়া হয়ে গেল মনে করি। শিল্পী করে গড়ে তুলার উদ্দেশ্যই প্রধানতম হবে সত্য কিন্তু অন্ধ করে রেখে নয়, জ্ঞানী-গুণী হতে হবে, নচেৎ তাঁদের মধ্যে বিচার ও সংযম বোধ থাকবে না। এই সকলের অভাবের জন্য পুরিয়া-ইমনকে পুরিয়া কল্যাণ বলছি এবং আরো বহু ত্রুটিকে উপেক্ষা করে চলেছি। আমার এই সব আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য যাঁরা সহৃদয়তার সহিত অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করবেন, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়ে কোন বিরূপ মনোভাব থাকবে না বলেই আশা করি। আমি এ কথাও মনে করি আদর্শ রক্ষার প্রতি যদি বিশেষ যত্ন দেওয়া যায় তাহলে কোন কিছুই অপ্রিয় হয় না।

মারওয়া (৪০)

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব। আরোহণে পঞ্চম—নিষাদ এবং অবরোহণে পঞ্চম বর্জিত। ঋষভ কোমল এবং কড়িমধ্যম। বাদী—সংবাদী—ধৈবত-গান্ধার। উত্তরাঙ্গ প্রধান। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী। সরলগতি।

ঠাট,—স-ঋ-গ-হ্ম-ধ-র্স-র্স-ন-ধ-হ্ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—গ-ঋ-ধ্-স-ন্-ধ্-ঋ-স। ঋ-গ-হ্ম-ধ,—ধ,-হ্ম-গ-ঋ-গ-ধ-হ্ম-গ-ঋ-স-ধ্ ন্-ধ্-হ্ম্-ধ্-স,-ঋ-স।

আলোচনা,—ঠাটের পর্যায়ে এই রাগ সম্বন্ধে অনেক কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছি। আজকাল এই রাগে ঋষভ ধৈবতের সংযোগ বেশী করে দেওয়া হয়, ষড়জ, নিষাদ এবং গান্ধারের প্রকাশ-প্রয়োজনীয়তাকে বেশ অনেকখানি উপেক্ষা করে।

সে দিন রেডিওর মাধ্যমে সঙ্গীতজ্ঞসমাজের কাছে বিশেষ নাম করা একজন গায়কের কাছে মারওয়া রাগ শুনে খুব আশ্চর্য্য বোধ করলাম—রাগরূপ রচনার নীতি—নিয়ম দেখে। আরম্ভের সময় থেকে পূর্ব্বাঙ্গের স্বর রচনা এমনভাবে পুনরাবৃত্তির অতিশয্যে চলতে লাগল যে তারমধ্যে 'সা' সুরকে যেন মনে হতে লাগল ব্যাকরণের লুপ্ত 'অ' অক্ষরের মত। এক এক সময় 'সা' সুরকে বর্জিত সুর বলেও মনে হচ্ছিল। 'সা' সুরকে অনেকক্ষণ ত্যাগ করে ঋ—ধ সুরের অনবরত গঠন যে কি অদ্ভুত হয় তা সেদিন বেশ অনুভব

করেছিলাম। এই রকম শিল্পীরা কিসের ঘোরে যে থাকেন বুঝা যায় না। বহুদিনের একটা কথা সেদিন মনে পড়ে গেছল। এক আসরে একব্যক্তি বলেছিলেন—'সা' সুর ছাড়া একটা রাগের গান করুন তো দেখি ?" শ্রোতারা শুনে হেসে অস্থির। এখন মনে হচ্ছে সেই ভদ্রলোককে বোধ হয় এই রকম ভাবে গাওয়া মারওয়ারাগের খানিক সুর মিনিট পনর ধরে শুনে তারপর প্রয়োজনে উঠে যেতে হয়েছিল—'সা' সুর বর্জিত রাগের ধারণা নিয়ে। আগে জানিয়েছি,—ষড়জ স্বরের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন অগ্নি। অগ্নির প্রতীকই হল উত্তাপ এবং প্রত্যেক জীবের প্রাণরক্ষক। সঙ্গীতেও তাই.—ষড়জ-স্বরের শক্তি নিয়েই রাগের মূর্ত্তি বেঁচে আছে। সুতরাং স্বরের সেই প্রাণস্বরূপ ষড়জকে রাগরূপের উপর সরিয়ে রাখলে রূপের কি অবস্থা হয় তা শিল্পীর না জানা থাকবে কেন ? তাছাড়া রাগে কোমলঋষভের সংগে নিষাদ গান্ধারের যোগাযোগ সম্পর্কই সুন্দরভাবে রস সৃষ্টি করে কিন্তু কোমল ঋষভের সংগে প্রধান ধৈবতের সংযোগ মোটেই সঙ্গত নিয়মের উপর নয় এবং তাতে রূপ-রসের মিলন সামঞ্জস্য থাকে না। তার প্রকাশ ভঙ্গীতে মনে হয় যেন কোমল ঋষভ আসমান থেকে বেজায়গায় পড়ে গেল প্রধান-ধৈবতের উপর।

জয়ন্ত (৪১)

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব,—আরোহণে ঋষভ-পঞ্চম এবং অবরোহণে পঞ্চম বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী—গান্ধার-ধৈবত। কোমল ঋষভ এবং কড়ি মধ্যম। সরল গতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। অবরোহণ প্রধান এবং পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। সালঙ্ক শ্রেণী,—হিণ্ডোল-পুরিয়া মিশ্রণে তৈরি।

ঠাট,—স-গ-হ্ম-ধ-ন-র্স-র্স-ন-ধ-হ্ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-ঋ-স-স-হ্ম-গ। ধ-গ-হ্ম-গ-ঋ-স। ন্-ধ্-স-গ-হ্ম-গ-ঋ-স। গ-হ্ম-ধ-ন-ধ-হ্ম-গ-ঋ-গ-ঋ-স ॥

আলোচনার বিশেষ কিছু নেই ॥

মালশ্রী (৪২)

জাতি ঔড়ব—ঋষভ-ধৈবত-বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী পঞ্চম ও ষড়জ। মধ্য প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধ শ্রেণী। উত্তরাঙ্গ প্রধান। সরল গতি।

ঠাট,—স-গ-হ্ম-প-ন-র্স-র্স-ন-প-হ্ম-গ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-প-হ্ম-গ-স। ধ্-ন্-স-প-ন-হ্ম-প-গ-প-গ,-স। প-ন,-প, প-হ্ম-গ-র্স,-ন-প-হ্ম-গ-স-প,-গ-স-ন্-ধ্-স ॥

আলোচনা,—স্বাভাবিক জীবনে প্রাতঃকাল হতে প্রকৃতির বুকে নানান ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত থেকে এবং

বিচরণ করে চতুর্থ প্রহরের যে সময় গৃহাভিমুখী হবার আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং মনের অন্তরাল হতে সঙ্গীতের যে ধ্বনি তখন প্রকাশ পেতে চায় তার রূপে থাকে আহ্বানের শিহরণ। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতের উপর মালশ্রী রাগের রূপটি যেন মিশে যেতে চায় তার সুরের স্বরলঙ্ঘনের রূপঢেউগুলি। দুলিয়ে দুলিয়ে যেন ডেকে বলে এবার চল। এই সব ভাববস্তু বাস্তব উপলব্ধির দ্বারা যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাই উপস্থাপিত হল। আমার অভিজ্ঞতার মন সর্বদা বলে রাগসংগীতকে এবং তার দেবতাকে যথাযথ উপলব্ধির জন্য সংসারত্যাগী সাধকদের মত প্রকৃতির পরিবেশে থেকে জীবনের কোন এক সময় ধ্যান-চিন্তা ও সাধনা করতে পারলে সত্যানুসন্ধানের পথ বিস্তৃত হতে পারত।

কুমারী (৪৩)

জাতি ষাড়ব,—ধৈবত বর্জ্জিত। কোমল ঋষভ এবং কড়ি মধ্যম। মধ্য প্রকৃতির রাগ। বাদী-সংবাদী, পঞ্চম ও ষড়জ। সরলগতি। শুদ্ধশ্রেণী। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-ঋ-গ-হ্মা-প-ন-স´-স´-ন-প-হ্মা-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ঋ-গ-হ্মা-প,-ন-প,-হ্ম-গ-ঋ-প-গ-ঋ-স।

আলোচনা,—বৈকালের ও অন্য সময়ের এই রকম নিয়মে রচিত কয়েকটি রাগ-বিস্তার রচনার ক্ষেত্রে বেশী শক্তি সম্পন্ন না হলেও বক্রগতির রাগ নয় বলে প্রত্যেকটির মধ্যে রূপরচনার নীতি-নিয়মের সুন্দর বন্দবস্ত আছে এবং রাগরূপ সহজ নিয়মের মধ্যেই গঠন হয়।

মালবী (৪৪)

জাতি সম্পুর্ণ। ঋষভ কোমল, এবং কড়ি মধ্যম॥ বাদী, সংবাদী-গান্ধার ও ধৈবত। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। সরলগতি। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,—স-ঋ-গ-হ্মা-প-ধ-ন-স´-স´-ন-ধ-প-হ্মা-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ঋ-গ,-প-হ্ম-ধ-প-হ্ম-গ-ঋ-স। ঋ-গ-হ্ম-প-হ্ম-ধ-প-হ্ম-গ-ধ-প-হ্ম-গ-ঋ-স। গ-হ্ম-প-ধ-হ্ম-প-গ-ধ-গ-হ্ম-গ-ঋ-স। গ-ঋ-গ-প-গ-ঋ-স-ধ্-ন্-ঋ-স।

আলোচনা,—এই রাগটির পরই পূরবীরাগ ধার্য্য হয়েছে—সময়ের ঠিক উপযোগী হয়ে। এই দুই রাগের পাশাপাশি সংযোগের মধ্যে সুন্দর তাৎপর্য্য পরিলক্ষিত হয়। সময়ের প্রভাব তাৎপর্য্য অনুভব করে মালবীর উপর প্রধান মধ্যম থেকে বক্রভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা রেখে এবং নিষাদকে সংবাদী স্থান দিয়ে পূরবী রাগের নামকরণ হয়েছে বলেই বেশ বিশ্বাস আসে।

পূরবী (৪৫)

জাতি সম্পূর্ণ। কোমল ঋষভ, দুই মধ্যম। বাদী—সংবাদী—গান্ধার নিষাদ। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান। মিশ্রগতি। পঞ্চম বলীস্বর। শুদ্ধশ্রেণী। আরোহণের গতি সরল, অবরোহণের গতি পূর্ব্বাঙ্গেবক্র।

ঠাট,—স-ঋ-গ-ম্ম-প-ধ-ন-র্স-র্স-ন-ধ-প-ম্ম-গ-ম-গ-ঋ-স।

প্রধানরূপাঙ্গ,—স-ঋ-গ-ম্ম-প,-ম্ম-গ-ম-গ। ন-ধ-ম্ম-গ-ম-গ,-ঋ,-স। প-ম্ম-গ-ম-গ-ঋ,-স। গ,-ম্ম-ধ-ন-র্স-ন-র্ঋ-র্স,-প,-গ-ম-গ। ন-ধ-পম্ম-গ-ম-গ,-ঋ-গ-ম-গ-ঋ,-স।

আলোচনা,—পূরবীর প্রকৃতরূপের পরিচয় আগে ঠাটের আলোচনার স্থানে দেওয়া হয়েছে, তত্রাচ এ স্থলে আরো কিছু বলার প্রয়োজন আছে। পূরবীররূপ প্রকাশের জন্য দিবাকালের যে সময়ে নিয়মসঙ্গত বিচার বোধ রেখে ধার্য্য হয়ে আছে, সেই স্থানে কোমল ধৈবতের রূপভাব আসার তখনও সময় নয়। অর্থাৎ প্রকৃতির রূপ তখন সান্ধ্য ভাবধারার নয়, প্রধানধৈবতের তীব্রতার তখনও প্রয়োজন আছে। এইজন্য কোমল ঋষভ এবং কড়িমধ্যমযুক্ত পূর্ব্বের রাগগুলি সেই সময়ের সংগে নিবিড় সম্পর্ক রেখে পূরবীর সংগে যুক্ত হয়েছে বা পূরবীকে স্বভাবের উপর প্রকাশিত করেছে। পূরবীর সুরের পূর্ব্বে পশ্চাতের রাগগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলেই বেশ বুঝা যায় কেমন সুন্দরভাবে সুরের প্রভাব সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে যথা সময়ে পূরবীকে স্থাপন করা আছে। দিবাকালের এই সময় তপনদেব পশ্চিমাকাশে নেমে পড়লেও তাঁর কিরণের উত্তাপ তখনও থাকে বলে ওই সময়ের প্রয়োজনীয় পূরবীরাগের উপর কোমল-ধৈবত প্রয়োগ করা আমার মতে কখনই বিচার যুক্তি সম্মত নয়। কোমলধৈবতের প্রয়োজন যখনই এসেছে তখনই রাগের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে তা পূরবীর পরে—সূর্য্যদেবের আরো পশ্চিমাকাশে গড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে।

সেখানে সর্বাগ্রে এসেছে 'সাঁঝগিরি' রাগের রূপ যথাযথ সম্বন্ধ ধরে। এ স্থলে একটা প্রশ্ন আসতে পারে—দক্ষিণায়নের সময়-সুরু থেকে দিবাকালের দণ্ড সময় সংক্ষেপ হতে থাকে এবং পরিশেষে শীতকালে অনেকখানি কমে যায়, সুতরাং উত্তরায়নের যে সময় পূরবীর সুর যথোপযুক্ত হয়, উক্ত সময়ের অন্ততঃ শেষের দিকের সময়ের সংগে পূরবীর প্রভাবরূপের মিলন সম্পর্ক থাকছে কৈ? এর উত্তরে, এই বলতে পারা যায়—দু'টি অয়নের সময় সীমা ধরে শুধু ওই সময়েই নয় সমস্ত সময়ের উপরই সূর্য্যের অয়নের বিকাশ অনুযায়ী নির্দ্ধারণ রেখে রাগসমূহকে প্রয়োজনানুযায়ী অগ্র-পশ্চতকরে ব্যবহার করার আবশ্যক থাকবে। কোমল ধৈবত প্রসঙ্গে বলা যায়, সময়ের সংগে ক্রমশঃ যথোপযুক্ত হয়ে ওই স্বর ধানশ্রী, ত্রিবেণী, শ্রী, এইগুলির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে প্রকৃতির সংগে সম্পর্ক রেখে চলতে চলতে একেবারে সন্ধ্যার গৌরী রাগের সংগে মিশে গেছে। দিবাকালের শেষ সময়ের দিকে পর পর কয়েকটি রাগের উপর কোমল ধৈবতের প্রভাবশক্তি যথেষ্ঠভাবে উপলব্ধি হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা, পূরবীরাগের বহু প্রাচীন ধ্রুপদ খেয়াল আছে কিন্তু কোনটাতেই কোমল ধৈবত নেই। বাংলাদেশে শস্ত্রীয়সংগীত চর্চ্চার প্রাচীনকাল থেকে পূরবীতে প্রধান ধৈবত দিয়ে রূপের গঠনই চলে এসেছে এবং কোলকাতায় পশ্চিমাগত

বিভিন্ন ঘরাণার গুণীরাও এই মতের ধারাকেই অনুসরণ করে চলতেন। পূরবীতে যাঁরা কোমল ধৈবত দেন তাঁদের প্রাচীন ঘরাণার উপর পরিচিতির শুধু অভাবই থাকছে না, সময়ের সংগে সম্পর্ক জ্ঞানেরও অভাব থেকে যাচ্ছে। ব্যবহারের বিষয় নিয়ে দেখা গেছে প্রধান ধৈবত বিশিষ্ট পূরবীর রূপস্বাতন্ত্র্যতায়, বৈশিষ্ট্যে এবং ভাবরূপের বিচারে কোমল ধৈবত বিশিষ্ট পূরবী অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এবং নিয়ম সঙ্গতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোমল ধৈবতযুক্ত পূরবীরূপ যদি প্রধান ধৈবতযুক্ত পূরবীর রূপ অপেক্ষা সত্যই উন্নত এবং লিখিত সময়ের সম্পর্ক অনুযায়ী তার রূপ স্থাপিত হতে পারত তাহলে কোন কথাই ছিল না। সুতরাং শত শত বৎসরের দেশ প্রচলিত আমাদের পূরবীর বিজ্ঞানসম্মত রূপকে গ্রহণ করে থাকলে এমন কি অনুপযুক্ত হত ? একটু আগ্রহ নিয়ে প্রধান ধৈবত যুক্ত পূরবীর রূপ অঙ্কন করে দেখলে সহজেই বুঝা যাবে পৃথকত্ব নিয়ে কোমল ধৈবতযুক্ত অপেক্ষা সত্যই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কি না।

সাঁঝগিরি (৪৬)

জাতি ষাড়ব। ঋষভ-বর্জ্জিত। কোমল-ধৈবত ও কড়িমধ্যম। বাদী-সংবাদী—পঞ্চম-ষড়জ। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। শুদ্ধ শ্রেণী। সরল গতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট, —স-গ-হ্ম-প-দ-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-হ্ম-গ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-গ-হ্ম-প-গ-প-দ-প। স-প-হ্ম-দ-প। ন-দ-প-গ-হ্ম-গ-প। স-প-হ্ম-গ-ন্-দ্-স॥

আলোচনা,—সাঁঝগিরির সুররূপের মধ্যে যে ভাবরূপ আছে তাতে তার নামের সংগে সময় সম্পর্কের সন্ধান মিলে। পশ্চিমের শেষ প্রান্ত হতে সূর্য্যের কিরণরশ্মি গিরিশীর্ষে যে সময় পতিত হয়ে ধরণীর বুকে শীতল ছায়া নেমে আসে—সেই সময়ের উপযোগী হয়ে এর স্বররূপ সৃষ্টি হওয়ায় তাই মনে হয় সাঁঝগিরি নাম হয়েছে। অনেকে সাজগিরি বলেন কিন্তু অর্থসঙ্গত নিয়মে সাঁঝগিরি নামই যথার্থ। সময়ের দিকে তাকিয়ে এবং নিজের কথা ভেবে কোমলধৈবতের প্রভাবের উপর দ-প-হ্ম-গ-স-ন্-দ্-স, স-প-র্স-ন-দ-প-হ্ম-গ-প-গ-স-ন্-দ্-স,— মীড় দিয়ে গড়িয়ে পড়া এই রকম ধরণের সুরের উদাস রূপগুলি যেন জীবনসায়াহ্নের অবস্থার উপর সতর্কতার সংকেত দিয়ে আহ্বান জানিয়ে যায়।

নির্দ্ধারিত সময়ের রাগগুলি যখন বিশেষ করে দিবাকালে নির্জনে, বনে ও প্রান্তরে গেয়েছি তখন বুঝেছি প্রকৃতির সংগে তাদের যোগাযোগ সত্যই অপূর্ব হয়ে আছে। বাল্যকাল হতে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির নির্জন পরিবেশে এই আগ্রহের ধারা অব্যাহত ছিল।

পুরিয়া-ধানশ্রী (৪৭)

জাতি সম্পূর্ণ। কোমল ঋষভ-ধৈবত, কড়ি মধ্যম। বাদী-সংবাদী-গান্ধার ও নিষাদ। পঞ্চম

বলীস্বর। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। সালঙ্কশ্রেণী। সরলগতি।

ঠাট,—স-ঋ-গ-হ্ম-প-দ-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-হ্ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন্-ঋ-গ,-প-হ্ম-দ-প। হ্ম-দ-হ্ম-গ-প-গ-ন্-ঋ-হ্ম-গ-ন্-ঋ-স। প-দ-ন-দ-র্স-ন-দ-প-ঋ-গ-ন-দ-হ্ম-গ-প-হ্ম-গ-প-দ-প। গ-ঋ-ন্-ঋ-গ-ন্-ঋ-স।

আলোচনা,—ত্রিবেণীরাগটির প্রচলন খুব কমে যাওয়ায় কিংবা জানা না থাকায় উক্ত রাগটিরই এখন বিশেষ পরিচয়ে এসে গেছে। নচেৎ ত্রিবেণীর রূপ যখন পুরিয়া, পূরবী এবং শ্রীরাগের রূপ নিয়ে তৈরী তখন পুরিয়াধানশ্রীকে নিয়ে প্রকাশের বা প্রচারের আগ্রহ তেমন থাকত না।

পুরিয়া ধানশ্রীকে ধানশ্রীর পূর্বে স্থান দিতে হল পরিয়াররূপ আছে বলে। সময়ের সংগে সংযোগ রক্ষায় পুরিয়ার রূপভাবকে ধানশ্রীর পরে স্থান দেওয়া যায় না।

ধানশ্রী (৪৮)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে ঋষভ—ধৈবত বর্জিত। ঋষভ, ধৈবত কোমল এবং কড়িমধ্যম। বাদী-সংবাদী, পঞ্চম ও ষড়্জ। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। সরলগতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধ শ্রেণী।

ঠাট,—স-গ-হ্ম-প-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-হ্ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-হ্ম-প-প-হ্ম-গ-ঋ-স। গ-প-হ্ম-দ-প-হ্ম-গ-হ্ম-গ-ঋ-স। গ-হ্ম-প-ন-র্স, র্স-ন-দ-প-স-গ-হ্ম-প।

আলোচনা,—মূলতানের উপর প্রধান গান্ধার দিলে যে সুর উৎপন্ন হয় সেই সুরই ধানশ্রী নামে পরিচিত হয়েছে। প্রধান গান্ধারের প্রভাবই তাকে সন্ধ্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই পরিচয়ে আমরা পাই প্রধান স্বরের প্রভাব কত বেশী থাকে তারই সাক্ষ্য রেখেছে এই রাগের উপরও প্রধান গান্ধারটির ক্রিয়ায়। উক্ত ঠাটের উপর কোমল গান্ধার দিলেই মূলতান হবে। সুতরাং এই দুটি রাগের পারস্পরিক ঠাটের বিচারে দেখা যাচ্ছে কোমলগান্ধারই এখানে মূলতানের রূপে প্রধান হয়ে আছে। এজন্য মূলতানে কোমল-গান্ধারের আকর্ষণ নিয়ে পূর্বাঙ্গেই তার চিত্ররূপ ফুটে উঠে। যেমন—ন্-স-হ্ম-জ্ঞ-ঋ-স। কিন্তু প্রথমতঃ শুধু উত্তরাঙ্গকে ধরে যদি প-ন-দ-প, হ্ম-প-ন-দ-প, প-ন-র্স-ন-দ-প,—এই-ভাবে সুর অঙ্কন করা যায় তাহলে মূলতানের রূপপ্রভাব যথাযথ থাকার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে, সন্ধ্যার রাগগুলির রূপের সংগে সৌহার্দ্য এসে যাবে। সুতরাং কোমল গান্ধারই তার প্রভাব শক্তির পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য শক্তির পরিচয় থাকলেও গতায়তে পঞ্চমের প্রতিষ্ঠা থাকায় স্বরসমূহের মধ্যে প্রধানতম হয়ে বাদীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাগরূপ বিশ্লেষণে এক একটি স্বরের রূপমহিমার পরিচয় পেয়ে মনকে মোহিত করে। যাইহোক্—সুরের প্রভাব বিচারে ধানশ্রী নাম দিয়ে তার সুরের রূপ যোগ্য স্থানেই নির্বাচিত হয়ে আছে বলেই বিচারে আসে ॥

ত্রিবেণী (৪৯)

জাতি যাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে ধৈবত বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী, পঞ্চম ও ষড়জ। কোমল ঋষভ ধৈবত, কড়িমধ্যম। গান্ধার-বলীস্বর। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী। বক্রগতি। মধ্যপ্রকৃতিররাগ। উত্তরাঙ্গ-প্রধান। পুরিয়া, পুরবী এবং শ্রীরাগের মিশ্রনে তৈরী।

ঠাট,—স-ঋ-গ-হ্মা-প-হ্মা-দ-ন-র্স, র্স-ন-দ-প-হ্মা-গ-হ্ম-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—প-হ্মা-গ-ঋ-গ (পূরবী), ন্-ঋ-গ-হ্মা-গ-ন্-ঋ-স-(পুরিয়া) প-হ্মা-দ-প-ন-দ-প-ঋ-প-হ্মা-ঋ-গ-ঋ-স।

আলোচনা,—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলিত স্থানকে যেমন ত্রিবেণী নাম দেওয়া হয়েছে তেমনি উক্ত তিনটি রাগকে যুক্ত করে ওই নামে পরিচিত করা হয়েছে বলেই যুক্তিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা এবং স্বররূপের দ্বারা উক্ত তিন রাগের রূপধারাকে নিয়ম সংগত কোন্ প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ করে এর রূপরচনার পদ্ধতি আছে তার পরিচয় কিছু পাইনি। আমাদের ঘরাণায় এর ধ্রুপদ-খেয়ালের সংখ্যা কম থাকলেও যে কয়েকটি আছে তার দ্বারা সুরের যে পরিচয় আসে তাতে উক্ত তিন রাগের সমাবেশে ত্রিবেণী নামের অর্থে তার যথাযথ স্বরূপসন্ধানের অভাব আছে। অর্থাৎ পুরিয়ার রূপ ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য উক্ত নামের তাৎপর্য্য রক্ষায় আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নীতিসংগত নিয়মের উপর এর পরিচয় প্রদত্ত হল।

এক গ্রন্থকার আরোহণে ঋষভ বর্জ্জিত করে ষড়াব-সম্পূর্ণ জাতি করেছেন। আমার বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হল না। আরোহণে ঋষভকে বাদ দিলে পুরিয়ার রূপ থাকে না। উক্ত ত্রিধারার সমাবেশে পুরিয়ারাগ নেই বললে তার পরিবর্ত্তে ওই সময়ের কোন পৃথক ভাবধারার একটি রাগকে স্থাপন করার মত উপযুক্ত রাগকে পাওয়া যায় না। কারণ শ্রীরাগের পূর্ব্বসুরী রাগে শ্রী'র প্রভাব আকর্ষণ থাকতে হয়,—সুতরাং শ্রীরাগকে বাদ দেওয়া চলে না। পুরিয়া, পূরবী এবং শ্রী, বৈকালের এই তিনটি রাগই বিশেষ পরিচয়ের রাগ। গৌরীরাগের মধ্যে দুই মধ্যমের ক্রিয়ায় প্রধান মধ্যমই তাকে শ্রীরাগ হতে স্বতন্ত্র করে রূপের পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং ত্রিবেণীর মধ্যে গৌরীকে আনা যায় না। যথার্থ বিচারে উক্ত তিনটি রাগের সমাবেশই যথার্থ বলে স্বীকৃত হবে। আগেই বলেছি এইসব রাগ রচনা কেবলমাত্র সুরশিল্পীর আকাঙ্ক্ষা মেটানর এক খেয়াল এবং রাগরূপের উপর অধিকার সাব্যস্ত করা মাত্র। তিন দেবতা নিয়ে এক রকম মূর্ত্তি আছে, তারমধ্যে একটিতে দেখতে পাওয়া যায় মুখ একটিই, কেবলমাত্র নির্দ্ধারিত তিন দেবতার হাতই ছ'টি থাকে। একে বলা হয় 'ষড়ভূজ'। আর একটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে গ্রীবার উপর তিন দেবতার তিনটি মুখাকৃতি। শরীরের উপর এ রকম তিনটি মুখের সমাবেশ দেখে যেমন মনের মধ্যে আকর্ষণ নিয়ে ভাব-ভক্তির গভীরতা আসতে চায় না, অর্থাৎ কারদিকে তাকিয়ে মনের আকাঙ্ক্ষা জানাব সে কথা ভাবতে যেমন সবগুলিয়ে যায়,

তেমনি বড় বড় রাগকে কেটে জোড়া লাগান দেখেও মনের সেই অবস্থা আসে।

এই সমস্ত রাগের পরিচয় দেওয়ার মধ্যে প্রধানতম হয়ে রইল,—বিষ্ণুপুর ঘরাণায় প্রাচীন রাগ-সমূহের প্রবেশ ও তার চর্চার নিদর্শন এবং সংরক্ষণ।

শ্রীরাগ (৫০)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত। কোমল-ঋষভ-ধৈবত, কড়িমধ্যম। বাদী-সংবাদী, পঞ্চম-ষড়জ। বলীস্বর ঋষভ-ধৈবত। উত্তরাঙ্গ প্রধান। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। সরল গতি। শুদ্ধ শ্রেণী।

ঠাট,—স-ঋ-হ্ম-প-দ-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-হ্ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ঋ-হ্ম-প,-দ-প-ঋ-গ-ঋ-স। হ্ম-প-দ-র্স-ন-দ-প,- হ্ম-প-দ,-প-ঋ-প-গ-ঋ-হ্ম-প-ঋ,-স। স-প-দ-র্স-র্ঋ,-র্স-ন-দ-প। প-স-ঋ-হ্ম-গ-ঋ-স॥

আলোচনা,—কোন গ্রন্থকার এই রাগের বাদী-সংবাদী ঋষভ-ধৈবতকে ধার্য্য করেছেন, কিন্তু স্বর-প্রভাব ও স্বরসংযোগের উপর রাগবিজ্ঞানে ওই দুটি স্বর বাদী-সংবাদী কেন হবে না এবং রাগরূপের নিয়মধর্মী নয় সে কথা আগেই জানিয়েছি। শ্রীরাগে ধৈবত-ঋষভের সংযোগ-শক্তি আছে দেখে ওই দুটি স্বর বাদী-সংবাদী হবে এ ধারণা বিচারদৃষ্টিসঙ্গত নয়। মালকৌশে ধৈবত এবং গান্ধারের ক্রিয়া, কানড়ায় গান্ধার-ধৈবতের প্রভাব-ক্রিয়া যথেষ্ঠ আছে কিন্তু তারা বাদী-সংবাদী নয় এবং রাগের স্বরূপ অনুযায়ী হতেই পারে না। মালকৌশের মধ্যম এবং কানড়ার ঋষভ স্বরই বাদীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। নীতি-নিয়ম ও বিজ্ঞান সমস্ত রাগের উপরই সমান প্রযোজ্য হবে—সেখানে ইচ্ছা বলে কোন জিনিস নেই॥

গৌরী (৫১)

জাতি—সম্পুর্ণ, কোমল—ঋষভ—ধৈবত এবং আরোহণে কড়িমধ্যম। অবরোহণে প্রধান মধ্যম। বাদী—সংবাদী, পঞ্চম ও ষড়জ। উত্তরাঙ্গ-প্রধান। ক্ষুদ্রপ্রকৃতির রাগ। বক্রগতি।

ঠাট,—স-ঋ-গ-প-হ্ম-প-দ-প-দ-ন-র্স-র্স-ন-দ-প-ম-প-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ঋ-গ-প-হ্ম-দ-প,-হ্ম-প-দ-ম-গ-ঋ-স। প-দ-প-দ-ন-র্স,র্স-ন-দ-প-ম-প-গ-ঋ-স। হ্ম—প—গ—ঋ—প—গ—ঋ—স।

আলোচনা,—এক বিরাটগ্রন্থের মধ্যে এই রাগের উপরও ধৈবত ঋষভকে বাদী সংবাদীরূপে ধার্য্য করা আছে। পূর্ব্বে একস্থানে বলেছি—এই রাগটির পরিচয়ে শ্রীরাগের সম্পর্কের কথা, তত্রাচ একে

সম্ভবমত স্বতন্ত্র করে রাখবার প্রয়োজনীয়তায় অনুসরণীয় পথকে অনেকখানি প্রসস্ত করে অঙ্কিত করলাম। এর দ্বারা মনে করি রাগটির প্রকাশবিস্তৃতির সুযোগ ঘটবে। গৌরীরাগের উপর প্রধান মাধ্যমের ক্রিয়ার ভিতর সুরের যে রূপভাব সৃষ্টি হয় তাতে প্রভাতের এবং সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণের মধ্যে প্রকৃতির মিলন সম্বন্ধ অনেকখানি থাকে—তাই এই রাগের রূপপ্রভাবের মধ্যে ভৈরবের সামান্য প্রভাব সম্পর্ক স্বভাবের প্রেরণা নিয়ে সংস্থাপিত হয়েছে।

ভূপালী (৫২)

রাত্রি প্রথম প্রহর। জাতি—ঔড়ব, মধ্যম-নিষাদ-বর্জিত। বাদী—সংবাদী গান্ধার ও ধৈবত। বড়-প্রকৃতির রাগ। সরলগতি। শুদ্ধশ্রেণী। পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান।

ঠাট,— স-র-গ-প-ধ-র্স-র্স-ধ-প-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,— স-ধ্-গ, গ-র-স-ধ্-স। গ-প-গ,-ধ-প-গ-র-গ, ধ্-গ-র-স।

আলোচনা,—এই রাগের সুর লোক সমাজে এল কোথা থেকে তা আগে জানিয়েছি। ভূপালীরাগে ভাবগাম্ভীর্য্যই বেশী। যখন কড়ি-কোমল স্বরের শক্তি যথাযথ আয়ত্তে আসেনি তার পূর্বে থেকে প্রধান পাঁচ স্বরবিশিষ্ট রাগগুলির রূপমাহাত্ম্য যে প্রচারিত হয়েছিল শাস্ত্রগত নিয়মনির্দ্ধারণের দ্বারা সৃষ্টি করে—তাতে সন্দেহ আসে না।

কল্যাণ (৫৩)

জাতি ষাড়ব-সম্পুর্ণ,—আরোহণে মধ্যম-বর্জিত। পূর্বাঙ্গ প্রধান। বাদী-সংবাদী, গান্ধার ও ধৈবত। পঞ্চম বলীস্বর। সরল গতি। শুদ্ধ শ্রেণী। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। পূর্ব্বে একস্থানে বলেছি—স্বচ্ছন্দ চিন্তাধারা নিয়ে যে সমস্ত রাগের রূপ অফুরন্তভাবে বিস্তার রচনা করবার পরিপূর্ণ সামর্থ্য থাকে—সম্পুর্ণ বৈশিষ্ট্যতা বজায় রাখার উপর—সেই সেই রাগগুলিই বড়প্রকৃতির রাগ। এই রাগের উভয় পথেই নিষাদ তুর্বল এবং অবরোহণের কড়িমধ্যমও।

ঠাট,—স-র-গ-প-ধ-ন-র্স-ন-ধ-প-হ্ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ, —স-ধ্-প্-স-ন্-র-স-গ,-র,-স। গ-প-ধ-প-হ্ম-গ-প-র-গ,-র-স-গ,-র-স-ন্-র-স। গ-প-ধ-প-ধ-ন-ধ-র্স-ন-ধ-প-হ্ম-গ-র-প-র-গ-প-হ্ম-গ-র-গ-র-প-গ-র-স-ন্-র,—স॥

আলোচনা—আগে বলা হয়েছে ভূপালীর স্বররূপের উপর কড়িমধ্যম ও নিষাদস্বর যুক্ত করে কল্যাণকর-রূপে কল্যাণ রাগের সৃষ্টি হয়েছে। কোন গ্রন্থকার কল্যাণের আরোহণে নিষাদকেও বর্জন করেছেন কিন্তু তা রাগবিজ্ঞান ও নীতিসঙ্গত নয়। কারণ আগেই জানিয়েছি—শুদ্ধশ্রেণী রাগের মধ্যে

কোন দু'টির আরোহণে স্বর সংযোজনা একই প্রকার কদাচ হবে না। স-র-গ-প-ধ-র্স করলে স্বরাক্ষরগুলি ভূপালীরূপেই গণ্য হবে এবং প্রশ্নের মধ্যে দিয়েও এই উত্তরই আসবে।

প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে কড়িমধাম ও নিষাদ আরোহণেও ব্যবহৃত হয়ে আছে। এই ব্যবহার সঙ্গত কারণ নিয়ে এবং রাগরূপের নিজস্ব মূর্ত্তির প্রভাবমহিমার প্রতীক রূপেই ছিল। তারপর ইমন রাগের সৃষ্টি হওয়ায়, পার্থক্যরক্ষার সহজতম উপায়কে অনুসরণ করে কল্যাণের আরোহণ স্বর থেকে কড়িমধ্যমকে বাতিল করে দেওয়ার আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া পূর্ব্বোক্ত নীতি-নিয়মকে রক্ষার জন্যও বটে। প্রয়োগের বিচার ধরে কল্যাণের আরোহণে অল্পমাত্রায় রাগরূপ অঙ্কন করার সময় কড়িমধ্যম ব্যবহার করলে ইমনের সুর হয়ে যাবার কোনই আশঙ্কা নেই। কারণ ইমনের কড়িমধ্যম এবং গান্ধার—নিষাদ ও অন্যান্য স্বরকে ধরে যথেষ্ঠ প্রয়োগ হয় এবং প্রয়োগ করে ইমনকে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়; শিল্পী সকলে তাই করেন।

আরোহণের উপর কল্যাণে এইভাবে কড়িমধ্যম ব্যবহার করা চলে এবং করা হত এবং প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়ালেও হয়ে আছে। যথা—গ-হ্ম-প-গ-ধ-প। হ্ম-ধ-প-র্স-ধ-ন—প-হ্ম-ধ-প-গ। র-গ-হ্ম-প-গ-প-র-ধ-প-গ-প-হ্ম-গ-র-গ-র-স। কড়িমধ্যমের ব্যবহার নিয়ে এই স্বররচনার মধ্যেও কল্যাণের রূপ যথাযথ বজায় আছে। ওই রকম ভূপালী ঘেঁসা স্বর রচনা ইমনে কদাচ হবে না এবং কল্যাণে ন্-র-গ-হ্ম-গ, গ-হ্ম-গ-হ্ম-প, প-হ্ম-ধ-হ্ম,-গ, হ্ম-ধ-ন-হ্ম র-গ, গ-ন-হ্ম-ধ-প, হ্ম-গ-হ্ম-র-ন্-গ-ন্-র-স, এই রকম ধরণের কড়িমধ্যম এবং নিষাদের প্রবলত্ব নিয়ে স্বর রচনা কদাচ হবে না,—ওই স্বরের রচনারূপ সম্পূর্ণ ইমনের। কড়িমধ্যম ও নিষাদকে নিয়ে রাগরূপ রচনায় ওই দুটি রাগের ব্যবধান বহুদূরে থাকলেও পূর্ব্বোক্ত বিচার যুক্তি ও রাগবিজ্ঞানের উপর বোধ দৃষ্টি রেখে কল্যাণের আরোহণে কড়িমধ্যমকে বর্জনই করতে হ'বে।

ইমন (৫৪)

জাতি সম্পূর্ণ। কড়িমধ্যম। বাদী-সংবাদী-গান্ধার ও নিষাদ। পঞ্চম বলীস্বর। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। বড় প্রকৃতির রাগ। সরলগতি। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,— স-র-গ-হ্ম-প-ধ-ন-র্স, র্স-ন-ধ-প-হ্ম-গ-র-স।

রূপাঙ্গ এর পূর্ব্বেই দেখান হয়েছে।

আলোচনা,—শুনা যায় কল্যাণরাগের উপর কড়ি মধ্যম এবং নিষাদকে দুই গতির মধ্যে অধিকতর ভাবে প্রয়োগ করে এবং স্থায়ীত্ব দিয়ে আমিরখসরু-দেহলবীই নাকি এই ইমন নামের রাগটি রচনা করেন। ইয়ামন্ অর্থাৎ মন থেকে স্বরসংযোজনার এই আকাঙ্ক্ষা এসে নামকরণে ইয়ামন্ নামের পরিবর্ত্তে ইমন কথার প্রচলন হয়ে পড়েছে,—এই কথাই নামের ব্যাখ্যায় শুনা যায়। যাইহোক্—রাগটি কিন্তু সত্যই সুন্দর ও বিরাটত্বে অন্যতম শীর্ষস্থান অধিকারী। অবশ্য কড়ি মধ্যমের এবং নিষাদের প্রাবল্য হেতু

কল্যাণের মত যদিও অত স্নিগ্ধ ও আধ্যাত্মিক ভাব সমৃদ্ধ নয় কিন্তু রূপরচনার ক্ষেত্র প্রচুর সহজ সুযোগ নিয়ে আছে এবং শিল্পীর অন্তরে আনে আগ্রহের আনন্দ। মন্তব্যে বলা যায়,—কোন একটি রাগকে অবলম্বন করে আর এক পৃথকভাবে রূপসৃষ্টির বাসনা নিয়ে মনের তুলিতে এইরূপ অঙ্কন করে রাগের মূর্ত্তি স্থাপিত করতে পারলে সত্যই সার্থকতা থাকে এবং তার অবদানের উপর চর্চারত ব্যক্তির মনে শ্রদ্ধা জাগায়।

ইমন-কল্যাণ (৫৫)

জাতি সম্পূর্ণ। তুই মধ্যম। বাদী-সংবাদী, গান্ধার-নিষাদ। পঞ্চম বলীস্বর। সালঙ্ক শ্রেণী। পূর্বাঙ্গ প্রধান। বড় প্রকৃতির রাগ। মিশ্র-জাতি অর্থাৎ—আরোহণে সরল এবং অবরোহণে গান্ধার পর্য্যন্ত নেমে এসে প্রধান মধ্যমকে বক্রভাবে ব্যবহার করে নেমে আসতে হয়।

ঠাট,—স-র-গ-হ্ম-প-ধ-ন-র্স-র্স-ন-ধ-প-হ্ম-গ-ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন্-র-গ-র-প-গ-হ্ম-প, ধ-প-র-গ-হ্ম-র-গ-ম-গ-র-ন্-র-স। গ-প-হ্ম-ধ,-প-প-ধ-প-র্স-ন-র্র-র্স-ন-ধ-প-হ্ম-গ-হ্ম-র-গ-ধ-প-র- গ-ম-গ,-র-ন্-র-স। এই স্বররচনার মধ্যে দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাবে ইমন ও কল্যাণের যুক্তরূপ কি রকম প্রকাশিত হয়ে রূপকে অঙ্কিত করে।

আলোচনা,—নির্ভাবনা নিয়ে এই রাগের স্বরাঙ্কন করা যায়, অর্থাৎ উক্ত তুটি রাগকে যে কোন ভাবে ইচ্ছানুযায়ী মেশান যায়। এজন্য এর ধ্রুপদ সংখ্যা অন্য তুটির অপেক্ষা অনেক বেশী এবং আগের গায়ক-বাদকরা এই যুক্তরূপের রাগটিকেই বেশী পছন্দ করতেন। কারণ আগেই বলেছি নির্ভাবনায় শিল্পরূপ রচনায় তৃপ্তি আছে এবং তার সংগে সুন্দর মিলন নিয়ে একের মধ্যেই তুটি বড় রাগের রূপকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান মধ্যম না থাকলেও ইমন-কল্যাণকে চিনে নিতে কোন অসুবিধা নেই, তার পরিচয় উক্ত স্বরাঙ্কনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রধান মধ্যম কি জন্য এল তার কথা এক স্থানে জানিয়েছি,—তাছাড়া অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজে চিনবারও সহায়তা করেছে।

একটি বিশেষ গ্রন্থের গ্রন্থকার ইমন-কল্যাণ রাগে প্রধান মধ্যমের ব্যবহারের উপর তার সুরের রূপকে যেভাবে দেখতে পেয়েছেন তাতে আলাইয়ার রূপকে খুঁজে পেয়ে বলেছেন, "ইহা ইমন, কল্যাণ এবং আলাইয়ার মিশ্রণে তৈরী হয়ে ইমনকল্যাণ রাগের সৃষ্টি হয়েছে।" এর উত্তরে আমার বক্তব্য, ওই যুক্ত-রাগে প্রধান মধ্যমের ব্যবহারে যে সুর উৎপন্ন হয় তাতে আলাইয়ার রূপের স্পর্শ কিছুমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। প-হ্ম-গ-ম-গ-র-গ র-ন্-র-স, এই রকম স্বরপদ্ধতির উপর স্বর রচনায় প্রধান মধ্যমের ব্যবহার থাকে। সেখানে ওই সুরের সংযোগে আলাইয়ার কোনই সংস্রব নেই। এরূপ ধারণা করবার পূর্বে এ কথা ভাববারও আবশ্যক ছিল বলে মনে করি যে, যদি আলাইয়ার রূপ থাকত তাহলে নিয়মের বিচারে ইমন-কলাণ নাম থাকা কখনই সঙ্গত হত না, হয় একটা নূতন নামে পরিচিত হত কিংবা তিন

নাম যুক্ত হ'য়ে থাকতে হত। পূর্বেই জানিয়েছি প্রধান মধ্যমের ব্যবহার কিভাবে ও কি জন্য এসেছে॥

ছায়ানট (৫৬)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। বাদী-সংবাদী, ঋষভ ও ধৈবত। পঞ্চম বলীস্বর। মধ্যম ও নিষাদস্বর অতি দুর্বল। বড় প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান।

ঠাট,—স-র-গ-র-গ-ম-প-ধ-র্স-ন-র্স-ধ-প-গ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র,-গ-ম-ধ-প। স-ধ্-র। প-র-গ-ম-ধ-প-র। ধ-র্র–র্স-ন-র্স-ধ-প-র-গ-ম-র,-স।

আলোচনা,—পূর্ব্বেই বলেছি, ছায়ানটের মধ্যে যে বলিষ্ঠ রসঘন রূপভাব আছে, তাতে তার উপর নিষাদ ব্যবহার করা রাগরূপের একান্ত স্বভাব বিরোধী। আমার বিশ্বাস রাগরূপের কয়েকটি বিশেষস্থান দেখাবার আবশ্যক হেতু মুদারার ষড়জ থেকে তারার ষড়জকে স্পর্শ করে ধৈবতে আসবার সময় সহজ সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই হোক্ বা অসতর্কতার দরুণই হোক্ কোমল নিষাদকে দেখান হয় বা এসে পড়ে। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই ব্যবহারকারীদের কাছে ছায়ানটের উপর কোমল নিষাদের ব্যবহার আছে বলে ধার্য্য হয়ে গেছে। প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়ালের মধ্যে ওই স্বর ধার্য্য আছে বলে আমি আজ পর্য্যন্ত কোন গানে দেখতে পাইনি এবং প্রাচীনকাল হতে রূপ পরিচয়ের মধ্যেও নয়। যদি কোন গানে থাকে তাহলে আমি বল্‌ব উক্ত রাগের স্বভাবগত বিচারের উপর চিন্তার অভাব বশতই অপপ্রয়োগ ঘটেছে। রাগে কোন্ স্বর থাকা উচিত বা উচিত নয়—সে সম্বন্ধে রাগরূপের স্বভাবধারা অনুধাবন করতে পারলে বিচার সহজ হয়ে যায়। প্রধান স্বরসমূহ নিয়ে ছায়ানটের গঠিত রূপে উন্নত ভাবধারার প্রভাব দেখতে পাই। তার উপর কোমল নিষাদ প্রকাশিত হয়ে সেই সুর কানে যখন আসে তখন স্বভাবতই মনে এসে যায় যেন অন্যায়ভাবে রাগরূপকে তার বিশিষ্ট স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। গ-ম-ণ,-ধ-প। র-গ-ম-ণ,-ধ-প। স-ণ,-ধ-প। র্স-ধ-ণ-ধ-প। র্স-ন-ধ-ণ-ধ-প। সুর রচনায় এই রকমভাবে যখন কোমল নিষাদকে দেখান হয় তখন বুঝতে দেরি হয় না, কি রকম তরলতার উপর রাগের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করা হয়ে পড়ছে। ওই স্বররূপগুলি প্রকৃতপক্ষে এইভাবে থাকে, যথা,—র-গ-ম-ধ-প, স-র্স-র্স-ধ-প, স-ধ,-প, র্স-ন-র্স-ধ,-প, ইত্যাদি।

আর এক কথা, ছায়ানট রাগই নটজাতীয় রাগের মধ্যে প্রধান ও আদি। কারণ, ছায়ানটের রূপ সম্পূর্ণ সাতন্ত্রোর উপর গঠিত হয়ে আছে এবং এরই সুরের ভাবধারা নিয়ে নটজাতীয় নানান রাগের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক গ্রন্থের লেখক বলেছেন বৃহন্নট বা নটনারায়ণ রাগটিই নট জাতীয় রাগের আদি ও জনক। কিন্তু উক্ত রাগের যে প্রাচীনধ্রুপদ আছে এবং আমরা শিক্ষা করেছি তাতে আছে কেদার রাগের কিছু ছায়া নিয়ে তার এক ধরণের ক্ষুদ্র সীমার উপর সুর।

এই প্রসঙ্গে আর একটি যুক্তির কথা, ছায়ানটের রূপ তিনস্বরে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু বৃহন্নটে তা

হয় না। সুতরাং বৃহন্নটকে উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত রাগ বলা যায় না। তাছাড়া নটনারায়ণ বা বৃহন্নট রাগের রূপকে ঠাটের উপর তার স্বরসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করা খুব শক্ত, সবিশেষ চিন্তার অবকাশ না রেখে কতকগুলি রাগ সৃষ্টির প্রচেষ্টার মতই এই রাগের অবস্থা হয়ে আছে।

কোন বিশেষ গ্রন্থকার ইমন-কল্যাণের পর হাম্বীর রাগকে সময়ের নির্দেশে ধার্য্য করেছেন—বোধ হয় পূর্ব্বাঙ্গের উত্থানে ইমনের স্বররূপ আছে দেখে এবং দুই মধ্যম থাকায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারটি রাগের রূপপ্রভাবধারা সন্ধ্যার পর হতে বিস্তৃত হয়ে যেভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছে তারপরে অনুকুল-বায়ুসদৃশ ছায়ানটই যোগ্য বলে বিবেচিত হল। উক্ত আবহাওয়ায় হাম্বীরের রূপ যেন বিরাট ঢেউএর-ধাক্কার মত মনে এসে যায়, বরং কেদার রাগকে ওই স্থানে দেওয়া যেতে পারত কিন্তু না দেওয়ার কারণ আগেই বলেছি। অর্থাৎ বিশেষ করে কড়িমধ্যমকে সময়ের আবহাওয়ার সংগে যুক্তকরে যখন অনেকক্ষণ ধরে স্থান দেওয়া হয়েছে তখন তাকে আর বেশী দীর্ঘায়ত না করে পরিবর্তন করার আবশ্যক বুঝে ছায়ানটকেই ধার্য্য করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলাম। অবশ্য এর মধ্যে নিয়মপালনের কঠোরতা কিছু নেই, ভাবগত বিচার নিয়েই ওই সময়ের উপর ওই রাগকে ধার্য্য করা হল।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটু কথা,—ছায়া ও নট এই দুটি নামের অর্থ নিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের ঘরাণায় ছায়ানামের রাগটির দু'একটি প্রাচীন যে ধ্রুপদ আছে তারমধ্যে স্বরবিন্যাসের যে সুর পাওয়া যায়, সেই সুরের প্রভাব ছায়ানটের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। সুতরাং ছায়ানট রাগের অর্দ্ধাংশ ছায়া-রাগ থেকে নেওয়া হয়েছে এ কথা মোটেই বলা চলে না। ছায়ারাগের ধ্রুপদের সুর এই রকম;—"স-র-গ-র-স-ন্-ধ্-ন্-ধ্-প্-স-র-স-ন্-স, র-গ-স-গ-র-স, প-প-ম-গ-ম-র-গ-র-গ-র-স, প-প-স´-প-প-ধ-র´-স´। (স´-ন-স´-ধ-প-র-গ-ম—প-গ-ম-র-স)।" এই বন্ধনীর স্বরগুলি ছায়ানটের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু ওগুলি যে ছায়ানট থেকে নেওয়া হয়নি একথা মনে আসে না। কারণ রাগের আস্থায়ীর মধ্যেই রাগের সত্যকারের রূপ প্রকাশ পায়, শেষের দিকের সুর ধরে নির্দ্ধারণ বিচার চলে না। ছায়ারাগ নামের খেয়ালের মধ্যে যে সুর পাওয়া যায় তাতে ছায়ানটের রূপই পনর আনা এবং এক আনার মধ্যে কোমল নিষাদের সুর ও ছায়ার সেই ধ্রুপদের সুর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছায়ারাগের আসলরূপ খেয়ালের প্রথম যুগে কোমল নিষাদ যুক্ত হয়ে তার সংগে বেশী করে ছায়ানট মিশিয়ে দিয়ে তার মূর্ত্তি রূপান্তরিত হয়ে গেছল। অতএব বিচার-যুক্তির দ্বারা দেখা যাচ্ছে ছায়া থেকে ছায়ানটের সৃষ্টি নয়। ছায়া ক্ষুদ্র রাগ বলেই তার ধ্রুপদ-খেয়াল অত্যল্প কিন্তু ছায়ানট বিরাট রাগ বলে তার ধ্রুপদ, খেয়ালের সংখ্যা বহু। এরপর নটের কথা,—আমার বিচারে ছায়ানটের নটই হচ্ছে তার প্রকৃত নাম। পূর্ব্বেই বলেছি—বৃহন্নটকে নট রাগের আদি বলা যায় না। এ বিষয় পরে আরো আলোচনা করেছি। ছায়ানটের প্রথম কথাটি ছায়া রাগের সুর ধরে যে আসে নি সে কথা আগেই জানিয়েছি। আমার বিশ্বাস ছায়া কথার কতকগুলি যে মানে আছে তার থেকে রাগরচয়িতা মনোমত কোন একটিকে গ্রহণ করে থাকবেন। যথা—কান্তি, দীপ্তি, পালন, দুর্গা, সূর্য্যপ্রিয়া ইত্যাদির কোন

একটি। এর মধ্যে প্রথম তুটির একটিকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তু'টি রাগের নামের মত যদি কোন রাগের নাম থাকে অথচ সেই তুটি রাগের রূপ পরিচয় যদি সেখানে যথাযথ না থাকে তাহলে নামের ভাষাগত অর্থকে গ্রহণ করা ভিন্ন সত্যনিরাকৃত হবার আর উপায় কি থাকতে পারে! আর একটা কথা,—নামকরা গায়কদের মধ্যেও দেখা যায় ছায়ানটের খেয়ালে যখন দ্রুতগতিতে—পাপা ধাপা মাপা মাগা সারে—স্বর উচ্চারণ হয় তখন মধ্যম-স্বর প্রায়ই কড়িতে এসে যায়, অবশ্য অসাবধান বশতই হয়ে পড়ে। এই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়েই কয়েকটি রাগে বিরুদ্ধ স্বর ব্যবহারের সূত্রপাত হয়ে ক্রমশঃ সেই স্বরকে কায়েম করে দেওয়া হয়েছে—সহজ সুযোগের বাসনা নিয়ে।

কেদার (৫৭)

জাতি ঔড়ব সম্পূর্ণ, আরোহণে ঋষভ নিষাদ বর্জ্জিত। তুই মধ্যম। বাদী-সংবাদী, মধ্যম ও ষড়জ। পঞ্চম বলীস্বর। পূর্বাঙ্গপ্রধান। বক্রগতি। শুদ্ধশ্রেণী। বড় প্রকৃতির রাগ।

ঠাট,—স-ম-গ-প-হ্ম-ধ-প-র্স, র্স-ন-ধ-প-হ্ম-প-ম-গ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ম-গ-প-হ্ম-প-ধ-প-ম। ন-ধ-প-ধ-প-ম। হ্ম-প-ম-গ-ম-র-স ॥

আলোচনা,—আগের ছায়ানট রাগটিকে সবিস্তারে ভাল করে প্রকাশ করবার দক্ষতা রাখতে পারলে অনেকখানি সময় নিয়ে সময়ের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে প্রভাববিস্তার করে থেকে যেতে পারবে। তারপর ছায়ানটকে সরিয়ে যোগ্যরূপে কেদারকে আবাহন করাই সঙ্গত বলে বিবেচিত হল। ওইস্থানে কামোদকে উপযুক্ত বলে মনে করতে পারা গেল না। কারণ সময়ের বিচারে কোমল নিষাদের সুরের প্রভাব তখনও আনবার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া কামোদ তত শক্তিশালী রাগও নয়। সেজন্য ছায়ানটের মত বৃহৎ রাগের পর কেদার রাগই যোগ্য বলে বিবেচিত হল। কেদার রাগকে কেউ কেউ কল্যাণঠাটের রাগ বলেন, এ-এক অদ্ভুত বলা। যে রাগের রূপে প্রধান মধ্যম তার মুখ সদৃশ হয়ে রাগের রূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, কড়িমধ্যম ব্যবহার না দেখিয়েও যার রূপকে সুন্দরভাবে চেনা যায়—সেই রাগকে যদি কল্যাণ ঠাটের রাগ বলতে হয় তাহলে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়ে অপরের অনুগত হয়ে থাকতে হবে। কড়িমধ্যম বাদ দিয়ে স্বরাঙ্কনে রূপ গঠন, যথা,—স-ম,—গ-প—ধ-প-র্স,-ধ-প-ধ-প-ম, ম-গ-প-ম-গ-ম-র-স, ন্-স-ধ্-প্-স-ম-প-ন-ধ,-প-ধ-প-ম,-ম-র-স- ইত্যাদি ॥

হাম্বীর (৫৮)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। তুই মধ্যম। বাদী-সংবাদী-ধৈবত ও গান্ধার। পঞ্চম বলীস্বর। বড়-প্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধ শ্রেণী।

ঠাট,—স-র-গ-হ্মা-প-গ-ম-ধ-ন-ধ-ন-র্স, ন-ধ-প-হ্মা-প-গ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-ম-ধ। প-হ্মা-প-গ-ম-ধ। স-র-গ-হ্মা-প-গ-ম-ধ। প-হ্মা-প-গ-ম-র-প-গ-ম-র-স॥

আলোচনা,—কোন গ্রন্থকার বলেছেন,—এই রাগটি কেদার ও কল্যাণ রাগের মিশ্রণে তৈরি। অবরোহণের নীচের দিকে কেদার রাগের রূপ ছাড়াও অন্যান্য কোন কোন স্থানেও আছে কিন্তু কল্যাণের রূপ পরিচয়ের সন্ধান এর রূপের মধ্যে কোথাও নেই। এ বিষয়ে ঠাটের স্বর রচনায় এবং রূপাঙ্গের পরিচয়ের মধ্যে সহজেই বুঝা যাবে। আরোহণে কড়িমধ্যম থাকায় সেখানের সুরে কল্যাণের রূপ আসে না, তাছাড়া 'পা' এর পর নির্দ্ধারণ নিয়মে গা-মা (কড়ি)-ধা-স্বরে এলে ইমন সুরেরও কোন সন্ধান আসে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির কৌশলে এই রাগটির রূপ স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এজন্য বিচারের দিকে দিয়ে শুদ্ধ শ্রেণীভুক্ত করতে হল। কারণ রূপকৌলিন্য-হিসেবে বহু ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের মধ্যে দৃষ্টি রেখে এই সিদ্ধান্তই আসে। স্বরসংযোজনায় ধৈবত-গান্ধারের বাদী ও সংবাদীত্ব শক্তির প্রভাবই এর বিশেষ মূল কারণ।

কোন গ্রন্থকার আরোহণে স-র-গ-ম-প-ধ-ন-র্স—এই রকম স্বর স্থাপন করে ঠাট ধার্য্য করেছেন। এরূপ নিয়মে রাগের ঠাট নির্মাণ যে হতে পারে না তা আগেই বিশেষভাবে জানিয়েছি। পরের পর স্বরবর্ণ সাজিয়ে বাক্য প্রকাশের ইচ্ছা যেমন অবাস্তব, ওইরূপ স্বর সাজিয়ে ঠাট বলাও তদ্রূপ। ওই-রকম স্বরসমূহ রাগের উপর দ্রুত বিস্তার দেখানর সময় কখন-কখনও ব্যবহার হয়ে পড়ে বলে তা রাগের নীতি-নিয়ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে ধর্ত্তব্য হয়ে আসে না। অবশ্য ঐরকম হয়ে পড়া উচিত বলেও মনে করা যায় না। এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

এই বিষয় নিয়ে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বক্তব্য আছে;—

কেউ কেউ মনে করেন সমস্ত বক্রগতির রাগের ঠাটের উপর নির্দিষ্টভাবে রাগকে চিহ্নিত করার মধ্যে বিতর্কের অবকাশ আছে। অর্থাৎ সেই সব রাগে বক্রগতিতে স্বর নির্মাণ ছাড়াও অনেক সময় সেই বক্রস্বর সরলগতিতেও উঠে। সুতরাং ওইসব রাগের উপর নির্দিষ্ট স্বর সংস্থাপন একই নিয়মে কি করে চলতে পারে? এরূপ ধারণার উত্তর এর আগেই এক স্থানে দিয়েছি, তত্রাচ এ স্থলে আর একবার জানাই,—আরোহণ-অবরোহণে বা ওর যে কোন এক দিকে স্বরবক্রভাবে যাওয়ার উপর যে যে রাগের স্বররূপ নির্ভর করে তার প্রথমটিকে বক্রগতির এবং পরেরটিকে মিশ্রগতির রাগ যখন বলা হয় সঙ্গত নিয়মে, তখন বুঝতে হবে সেই গতির নিয়মেই তাদের রূপ প্রকাশ হয়। সরলগতিতে সেই রাগের স্বর নির্মাণ করলে তাকে কখনই চেনা যাবে না, উক্ত নিয়মের উপরই নির্দ্ধারিত স্বরকে নিয়ে রাগবিজ্ঞানের আইনতঃ নিয়মেই ঠাট নির্মিত হবে।

শ্যাম (৫৯)

জাতি ষাড়র–সম্পুর্ণ,—আরোহণে ঋষভ বর্জিত। দুই মধ্যম। বাদী-সংবাদী-গান্ধার ও ধৈবত। মধ্যম বলীস্বর। সালঙ্কশ্রেণী,—কেদার ও হাম্বীরের মিশ্রণে তৈরি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। বক্রগতি। উভয়াঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স–ম–গ,–হ্ম–প–গ–ম–ধ–ন–র্স, ন-ধ-প-হ্ম প-গ,-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ম-গ-হ্ম–প-গ-ম-ধ। প-হ্ম-প-ধ-প-ম, গ-ন-ধ-প। গ-ম-প—গ-ম-র-স। ন-ধ-প-গ–ম–ধ–প।

আলোচনা,—শ্যাম রাগের ধ্রুপদ বেশী পাওয়া যায় না, বরং খেয়াল গান কিছু পাওয়া যায়। এই রাগের বৈশিষ্ট্য কেবল দু'টি পরস্পর সম্বন্ধ সম্পন্ন রাগকে কেমন ভাবে মিশিয়ে দেওয়া চলে সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মনে হয় এর রূপসৃষ্টি। শ্যাম-কল্যাণ নামে একটি রাগের প্রচার আছে। তারমধ্যে যে বিচার পাওয়া যায় তাতেও প্রমাণ হয় শ্যামের ভিতর হাম্বীরের মধ্যেও কল্যাণের রূপ নেই।

বৃহন্নট বা নটনারায়ণ (৬০)

জাতি সম্পুর্ণ। বক্রগতি। বাদী-সংবাদী, মধ্যম ও ষড়জ। পূর্বাঙ্গপ্রধান। শুদ্ধশ্রেণী। এই রাগ বিস্তার বহুল নয়। গান্ধার-বলীস্বর।

ঠাট,—স-ম,-র-গ-ম-প-ধ-ন-র্স–ন-ধ-প-ম-র-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ম-গ-র-ম-গ। প-র্স-ধ-প-ম-গ-ম। র-গ-ম,-ন্-র-স।

আলোচনা,—এই রাগের অবস্থার বিষয় পূর্বে জানিয়েছি। শাস্ত্রীয় রাগসংগীতে ব্রহ্মার মতানুযায়ী ছয় রাগের মধ্যে এটি একটি অন্যতম রাগ। এই রাগের শ্লোকের মধ্যে যেভাবে রূপবর্ণনা ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা আছে তা এইরূপ,—অশ্বারূঢ় হয়ে রাগরূপ রণে উন্মত্ত হয়ে অসি চালনা করছেন এবং সর্ব্বশরীর রক্তসিক্ত হয়ে গেছে ইত্যাদি বর্ণনের এই বীরত্বপূর্ণ রূপ রাগরূপের সুরে কিভাবে দর্শন হতে পারে তা বোধগম্যে আনা দুঃসাধ্য। সংগীতের সুর মনমুগ্ধ কর,—প্রত্যেক রাগের মধ্যেই তার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই রকম ভীতিজনক দৃশ্যের রূপ ও ভাব সংগীতের সুরের উপর আসতে পারে এ আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর।

কাব্যশাস্ত্রে সারভুত আস্বাদন নিয়ে নয়টি রস আছে, যথা, শৃঙ্গার (আদিরস), বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রুদ্র এবং শান্ত। কারো কারো মতে বাৎসল্যও একটি রস।

যাইহোক্, বিশেষ করে আমাদের শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের রাগরূপের মধ্যে বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, এই রকম রসের প্রকাশ আছে বলে যারা মনে করেন, তাঁরা তা করতে পারেন। আমার কাছে ওই

রসগুলির কোন স্থান নেই। আমি কেবল জানি সঙ্গীতের মধ্যে সেই প্রেমময়ের পূজা উপচারের প্রধান বস্তুই রাগসংগীতের রূপ এবং প্রত্যেকটি রাগরূপের সাহায্যে শিল্পসম্ভার দিয়ে মন্দির তৈরী করে তার মধ্যে প্রেমের বেদীতে তিনি স্থাপিত হয়ে থাকবেন।

সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বজোড়া শিল্প সৃষ্টিকে বুঝতে হলে সুরের শিল্পকে যতবেশী করে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারা যাবে—ততই তাঁকে বুঝতে পারা যাবে। প্রতিটি রাগের রূপ যদি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক না হয় তাহলে সেই রাগ সাধনারযোগ্য নয়। অর্থাৎ যে কোন সুরে আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিকাশ যদি না থাকে তাহলে তাকে প্রকৃত রাগসংগীত বা গীত বলা যায় না,-তারা কেবল সুরের বাহ্যিক আবরণ মাত্র। এই আলোচনার শেষে বক্তব্য এই,—বৃহন্নট রাগে কেদার রাগের সুর পাওয়া গেলেও মনে হয় রাগটি কেদার রাগের বহু পূর্বে সৃষ্ট। কারণ এর যেটুকু অবয়ব আছে তার উপর চিন্তা নিয়ে যে সন্ধানের কথা আসে তাতে এই ধারণা হয়, এর এই সিমীত অবয়ব রাগ সৃষ্টির প্রথম যুগে প্রধান স্বরের প্রভাব মাহাত্ম্যে উৎপন্ন হয়েছিল এবং নৃত্যের সংগে প্রধান হয়ে যুক্ত ছিল বলেই বোধ হয় বৃহন্নট নামকরণ হয়। তাছাড়া নট-নারায়ণের সামনে এই সুর বিশেষভাবে হয়ত তখন গীত হত বলে কোন সাধক উক্তনাম দিয়েছিলেন এবং সেই থেকে দু'টি নামই যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। যাই হোক্, বিচার সাব্যস্ত মতে বৃহন্নট নটজাতীয় রাগের জনক বা প্রধান নয়, ছায়ানটই জনক বা প্রধান॥

কামোদ (৬১)

সম্পূর্ণ জাতি। বক্রগতি। দুই নিষাদ ব্যবহার। বাদী-সংবাদী, পঞ্চম ও ঋষভ। গান্ধার বলীস্বর। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। ছায়ানটের অংশোদ্ভূত কিন্তু শুদ্ধশ্রেণী, কারণ আর অন্য কোন রাগের মিশ্রণ নেই।

ঠাট,—স-র-প-গ-ম-ধ-প-ন-র্স-র্স-ন-র্স-ধ-ণ-প-গ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-প-ম-প। প-গ-ম-র-গ-ম-প,-র,-স। ধ-ণ-প-গ-ম-প-র, স।

আলোচনা,—কামোদ রাগটি নটজাতীয় অর্থাৎ ছায়ানট জাতীয় রাগ। কিছুকাল হতে দেখছি—কামোদে কড়িমধ্যমেরও ব্যবহার। ১৯১৫ সালে গিধৌড় রাজবাটীতে যখন গান শুনাতে গেছলাম তখন সেখানে ছিলেন তানসেন বংশধর বিখ্যাত রবাব্‌বাদক গুণী মহম্মদআলি খাঁ সাহেব। তাঁর বাসস্থানে গিয়ে আর একদিন তাঁর কাছে কামোদরাগ শুনতে চেয়ে ছিলাম,—তিনি সাগ্রহে কামোদের যে সুর শুনিয়েছিলেন তা আমাদের ঘরাণার মত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় এসেছিলেন গোওয়ালীয়র হতে বিখ্যাত খেয়াল গায়ক ভাতৃদ্বয় আহম্মদ খাঁ ও ফজল্ খাঁ সাহেব। তাঁরা বৌ-বাজারের এক বিরাট আসরে কামোদ রাগ গেয়েছিলেন, তার সুরের রূপছিল আমাদের ঘরাণার হুবহুর মত। কামোদের প্রকৃত রূপ কি তার প্রমাণ পরিচয়ে দু'টি বিখ্যাত ঘরাণার পরিচয় দিলাম। আমাদের ঘরাণায় এই রাগের বহুসংখ্যক

ধ্রুপদ, খেয়ালের মধ্যে কোনটাতেই কড়িমধ্যমের প্রয়োগ পরিচয় নিয়ে আসে নি। তাছাড়া বিচারের দিক দিয়ে কড়িমধ্যম ব্যবহার করা এই রাগের স্বভাবগত ভাব বিরোধী। কেদাররাগ হতে কামোদ রাগ যদি উদ্ভুত হত, তাহলে কড়িমধ্যমের ব্যবহার আসতে পারত কিন্তু কামোদরাগে কেদাররাগের কিছুমাত্রও স্পর্শ সম্পর্ক নেই। ছায়ানট হতেই যে তার জন্মোপত্তি এবং তারই স্বর সমূহের দ্বারা বিভিন্ন প্রকরণ দিয়েই যে কামোদের রূপ গঠিত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আসে না।

মেঘ (৬২)

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব,—আরোহণে গান্ধার-ধৈবত বর্জ্জিত এবং অবরোহণে-ধৈবত-বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী, মধ্যম ও ষড়জ। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। সরলগতি। এই রাগের আরোহণের স্বরসমূহ সারঙ্গ রাগের মত কিন্তু অবরোহণের স্বরগুলি কোন রাগের মত নয় বলে শুদ্ধশ্রেণীর অন্তর্গত হবে।

ঠাট,— স-র-ম-প-ন-র্স-র্স-ন-প-ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—ম-প-ন-প-ম, গ-ম-র-ম-র-স। প-ন-র্স-ন-প-ম-র-ম-গ-র-স। ন্-স-র-প্-স-ম-র-ম-গ-ম,-স-র-স-ম,-গ-র,-স। রাগরূপ রচনায় ম-গ-ম এই রকমভাবে গান্ধারের প্রয়োগ অনেক সময় হয়।

আলোচনা,—মেঘরাগকে আমরা এক বিরাট রাগ বলে হয়ত মনে করে থাকি কিন্তু আসলে তার রূপের মধ্যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যতার অনেকখানি অভাব আছে। বাদীস্বরের প্রভাব এবং বিশেষ করে গান্ধারের ব্যবহার আছে বা রাখতে হয় বলেই সারঙ্গ থেকে পৃথক্ করে রেখেছে।

আকাশে মেঘের অবস্থায় ধরিত্রীর সেই সময়ের মূর্ত্তির সংগে এই সুরের আকর্ষিত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বলেই মনে হয় রাগটির মেঘ নামকরণ হয়েছে। এখন এই রাগে কোমল নিষাদ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রাগের রূপে গান্ধার ব্যবহার যে থাকা উচিত সে কথা বোধ হয় অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

সময়ের নিয়মে অর্থাৎ গ্রীষ্মের মধ্যে এবং বর্ষাকালের প্রথম মুখে যখন মেঘ উদয় হয় তখন সেই সময়ের সংগে ন্যায়ত-ভাবে মেঘরাগের সুরসম্পর্ককে স্বীকার করে দেখলেই বুঝা যাবে বর্ষণের পূর্বমুখী সময়ে ধরিত্রীর ও আকাশের যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন তাতে কোমলতার স্থান থাকে না। সুতরাং ওই সময়ের ওই নির্দিষ্ট রাগে কোমলস্বর স্বাভাবিক কারণেই থাকা বিধেয় নয়। এই সঙ্গত বিচার ছাড়াও রাগের সৃষ্টিগত স্বভাবের বিচার নিয়ে দেখলেও কোমল নিষাদকে ব্যবহারে আনা যায় না। র্স ন-প-ম-ম-ম-র-প, ম-প-ন, প-ম-গ-ম-র,-ম-গ-র-স। রাগরূপের এই স্বরগুলির মধ্যে প্রধান নিষাদের পরিবর্ত্তে কোমল নিষাদ এনে দেখেছি অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগে। এই রাগে গান্ধারকে বাদ না দেওয়া শুধু রাগ রূপের প্রয়োজনীয়তার জন্যই নয়, ঠাট নিরাকরণের জন্যও অপরিহার্য্য। কারণ, আদিসুরের ধারায় সারঙ্গ-রাগে কোমল নিষাদ নেই, মেঘরাগে যদি গান্ধার বাদ থাকত তাহলে রাগবিজ্ঞান অনুযায়ী উক্ত দু'টি রাগের ঠাট পৃথকভাবে রক্ষা পেত না। সারঙ্গেও কোমল নিষাদ এবং মেঘরাগেও কোমল নিষাদ দেওয়া

হচ্ছে, তার উপর আছে একই বর্জিত নিয়ে দুইটির মধ্যেই জাতীত্বে ঔড়ব। রাগরূপ রচনায় এ রকম একাকার ব্যবস্থা কোন রকমেই হবে না।

মল্লহার বা মল্লার (৬৩)

জাতি সম্পূর্ণ-ষাড়ব,—অবরোহণে নিষাদ-বর্জ্জিত। বক্রগতি। বাদী-সংবাদী,–পঞ্চম ও ঋষভ। মধ্যম বলীস্বর। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। শুদ্ধ শ্রেণী। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-ম-গ-ম-প-ধ-র্স-ন-র্স-ধ-প-ম-গ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-ম-র-প। ম-প-ধ-র্স-ন-র্স-ধ-প। ম-গ-ম-র-প-ম-ম-র-স। ম-র-ম-গ-প-ম-ম-র। ধ-ন-র্স-ধ-প-ম-প।

আলোচনা,—মল্লারের বাদীস্বর অনেকে মধ্যম বলেন। কিন্তু যথাসঙ্গতভাবে রাগের রূপ প্রকাশ ক'রে এবং ধ্রুপদ–খেয়ালের উপর দৃষ্টি দিয়ে পঞ্চম ও ঋষভকেই যথার্থভাবে বাদী-সংবাদী রূপে পাওয়া যায়। বলীস্বররূপে মধ্যমের স্থান থাকবে। মধ্যমকে বাদীত্ব শক্তি দিলে মেঘরাগের প্রভাব খুব বেশী এসে যাবে। মল্লাররাগ নিজস্ব শক্তিতে খুব বেশী নির্ভরশীল নয়। মেঘরাগের স্বররূপ তো আছেই তাছাড়া কামোদের স্বররূপও পাওয়া যায়,—যথা—র-প-ম-প, ম-গ-ম-র-প,– গ-ম-র-প। এর সংগে যখন ম-প-ধ-র্স-র্র-র্স-ধ-প-ম, এই রকম স্বর ব্যবহৃত হয় তখন সামন্তসারঙ্গ (দুর্গা) রাগের সুর এসে যায়। এইসব কারণ থাকা সত্ত্বেও সালঙ্ক বা সঙ্কীর্ণ বলতে পারা গেল না এইজন্য যে রাগরূপের উপর স্বরসংযোজনার নীতি-নিয়মের উপর ঠাট প্রতিষ্ঠায় ওই দু'টি রাগের কোনটিরই প্রকাশ আসে না—এক নিজস্ব নীতি-ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শুদ্ধ শ্রেণী না বলে উপায় রইল না।

পূর্বেই বলেছি রাগরূপের উপর নীতি-নিয়মযুক্তভাবে স্বর স্থাপন করে ঠাট গঠনের মধ্যে তার সুরের মুর্ত্তিই থাকবে প্রকৃত বিচার্য্য বিষয় হয়ে। মল্লাররাগটির সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয়ে শুনা যায়—মল্লভূমের (দক্ষিণরাঢ়) কোন গায়ক এর সুর রচনা করে মল্লহার নাম দেন, পরে মল্লার নাম এসে যায়। এই রাগটির পরিচয় হাজার বছর আগেকার লুইপাদের চর্য্যাপদে আছে এবং রাজাবল্লালসেন দরবারের গায়ক লোচনপণ্ডিতের গ্রন্থেও, তাছাড়া প্রায় ছ'শ' বছর আগের বড়ু চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থেও নানানভাবে এসেছে প্রচারের মাধ্যমে। এর এত প্রাচীন পরিচিতি ভারতের অন্য কোন গ্রন্থে বোধ হয় পাওয়া যাবে না। সে হিসেবে উক্ত শুনা কথাকে অসত্য বলে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা,—বঙ্গদেশের নানান গ্রন্থে এমন সব রাগের নাম প্রাচীনত্বের পরিচয় নিয়ে আছে যা ভারতের অন্য গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি মনে করা যায় সে সমস্ত রাগ এই দেশেই আগে সৃষ্টি হয়েছিল—তাহলে সেকথা বলা বোধ হয় একেবারেই অনুচিত হবে না। অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস থাকলে সিদ্ধান্ত সহজ হয়ে যেত॥

মেঘ-মল্লার (৬৪)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। বাদী-সংবাদী-মধ্যম ও ষড়জ। পঞ্চম বলীস্বর। সালঙ্ক শ্রেণী। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। উভয়অঙ্গযুক্তরাগ।

ঠাট,—স-র-ম-গ-ম-প-ধ-প-ন-র্স-র্স-ন-র্স-ধ-প-ন-প-ম-গ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ম-প-ন-র্স-ধ-প-ম-র-প-ন-প-ম-গ-ম-র-স।

আলোচনা,—এই রাগটির মাত্র কয়েকটি সংখ্যক ধ্রুপদ, খেয়াল আমাদের ঘরাণার মাধ্যমে জানা আছে। গানগুলির সবই বহু প্রাচীন গায়কদের দ্বারা রচিত। রাগরূপ রচনায় খেয়াল গানের মধ্যে খুব জম্‌কাল ভাব আছে এবং প্রত্যেকটি গানই বর্ষার বর্ণন নিয়ে রচিত।

ধুরিয়ামল্লার (৬৫)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার বর্জিত। বাদী-সংবাদী, পঞ্চম ও ঋষভ। বক্রগতি। সঙ্কীর্ণশ্রেণী। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। ধৈবত বলীস্বর। দুই নিষাদ ব্যবহার।

ঠাট,—স-র-ম-প-ণ-ধ-ন-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—ম-গ-র-ম-প-ধ-ণ-ধ,-প, ম-র-প-ধ-প-ম-গ-র। ম-প-ণ-ধ-প-ন-র্স। র্র-ণ-ধ-প-ম-র-ম-প-ধ, প-ম-র,-ধ-ম-র-গ-র-স-র-স।

আলোচনা,—এই রাগের দু' চারটি ধ্রুপদ, খেয়াল জানার মাধ্যমে ওই সুরেররূপকে অনুসরণ-করে ঠাট নির্মিত হল। রাগটির মিশ্রিতরূপে আছে মল্লারের অংশ বেশী এবং দেশরাগের কম। মল্লারের নির্মিত ঠাট গঠনের স্বররূপ থাকলেও দেশরাগ মিশ্রিত আছে বলে উক্ত রাগকে সঙ্কীর্ণশ্রেণী-ভুক্ত করতে হল, কারণ দেশ রাগ সালঙ্কশ্রেণীর। এই রাগের স্বররূপ অনেকটা সুরদাস-মল্লারের মত। যাই হোক্—এই ধরণের সৃষ্ট রাগের রূপ তেমন বিস্তার বহুল হয় না, সামান্য কিছু পার্থক্যের উপরই নির্ভর হয়ে থাকে।

সুরট (শাস্ত্রীয় নাম সৌরঠি) (৬৬)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার-ধৈবত বর্জিত। দুই নিষাদ। বাদী-সংবাদী, ঋষভ ও পঞ্চম। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। বড় প্রকৃতির রাগ। সরলগতি। সালঙ্কশ্রেণী।

ঠাট, – স-র-ম-প-ন-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ, – র-ম—গ-র। র-ম-প—ধ-প-ম-গ-র। ম-প-ন-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-র ॥

আলোচনা,—এই রাগের ঠাটের উপর দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাবে-আরোহণের স্বর সারঙ্গরাগের এবং অবরোহণের স্বর খাম্বাজের। কিন্তু এই দু'এর মিশ্রণে ও বাদী-সংবাদীর ক্রিয়ায় এবং স্বরসংযোজনার ব্যবস্থায় সম্পুর্ণ পৃথক রূপ ধারণ করে অতি সুন্দর ও বিস্তারবহুলরূপে এই রাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দু'টি রাগের মিশ্রণে এ রকমভাবে পরিবর্ত্তিতরূপে প্রকাশ পাওয়া খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ, যেন দু'টি রংএর মিশ্রণে সম্পুর্ণ একটি নূতন রংএর উদ্ভবের মত। এই রাগের কোন কোন প্রাচীন খেয়ালগানের আরোহণের উপর দু'এক জায়গায় ধৈবত ও গান্ধারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ধ্রুপদে সেরূপ কোথাও নেই। খেয়ালে ওই রূপ ব্যবহার হয়ে পড়াকে খেয়ালের জন্যই বিবাদীস্বররূপে গণ্য করে নিতে হয়।

সুরট রাগের মত এমন বিস্তারবহুল রাগ এখন উপেক্ষিত হয়ে গেছে। দেশরাগের কিছু চর্চা যন্ত্রের মধ্যেই বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায়। আগেকার গায়করা আসরে সুরট ও দেশ রাগের ধ্রুপদ খুব আগ্রহসহকারে গাইতেন। আমাদের ঘরাণায় ওই দুটির মধ্যে বিশেষ করে সুরট রাগের ধ্রুপদ ও খেয়াল বহু সংখ্যক আছে—রচনায় প্রাচীনগুণীদের পরিচয় নিয়ে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় এই রাগটি তখন কত আদরের ও আগ্রহের ছিল। সুরটের বিলম্বিত ও দ্রুতঅঙ্গের প্রাচীন খেয়ালগুলি গাইবার সময় মনে হয় কি অপূর্ব বন্দেজ এবং সুর-শিল্পরচনায় কত উন্নত। আমি নানান পরিচয়ের অভিজ্ঞতার উপর বলতে পারি, আমাদের ঘরাণায় ধ্রুপদের গায়কীবৈশিষ্ট্যের কথাই শুধু নয়, যত রাগের যত বিলম্বিত ও দ্রুতখেয়াল আছে তাদের গায়কী–বন্দেজও বহুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীন খেয়ালগান বিষয়ে গুণীরচয়িতাদের পরিচয় সমৃদ্ধ হয়েও আছে।

এখন এই প্রসঙ্গে রাগসৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলার বিষয় নিয়ে দেখা যাচ্ছে, মেঘ, মল্লার, সুরট, দেশ প্রভৃতি রাগের উৎপত্তির মূল কারণে আছে সারঙ্গরাগ। এর দ্বারা বেশ বুঝা যায় মনুষ্যজাতির আদি-স্বভাবগত কণ্ঠের সুর সংগৃহীত হয়ে বহুরাগ সৃষ্টি করেছে—ক্রমশঃ উৎকর্ষতার মধ্যে দিয়ে।

আমাদের ঘরাণার সুরটরাগের খেয়াল আমি যে কয়েকটি শিখেছিলাম তার প্রথম কথার তালিকা নিম্নে দিয়ে সংখ্যার পরিচয় জ্ঞাপন করলাম। বিলম্বিততালের—"ঘনগরজে মাই—লরজত প্রাণ।" ঐ—"কুঠিরে তু মানিবে-মানি।" তেতাল—"মাই আজু কোয়েলিয়া বোল।" ঐ—"বাজরহি সখিয়াঁরে মুরলীয়া।"দ্রুত তেতাল "মাই জাউঁ জাউঁ ঘন গরজত।" দ্রুতএকতাল,—"দনুজদলনী নিজজনপ্রতি-পালিনী শ্রীকালী। (রাজা নওলকিশোর রচিত 'বেথিয়ার'। ঐ—"নিপট-নিডর।" ঐ —"বীত জাত বরখা ঋতু।'' আমার আয়ত্ত ছাড়া আরো আছে। এ রকম এত সংখ্যক গান বড় বড় সমস্ত রাগের মধ্যেও পাওয়া যায় না। বাংলার নিজস্বঘরাণা বিষ্ণুপুরের এই সব সম্পদের প্রতি দৃষ্টির একান্ত অভাব এসে গেছে।

দেশ (৬৭)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার-ধৈবত-বর্জিত। মিশ্রগতি, অবরোহণের স্বরসমূহ বক্রভাবে নেমে আসে। দুই নিষাদ। বাদী-সংবাদী, ঋষভ ও পঞ্চম। তারাসপ্তকের ষড়জ বলীস্বর। সুরট এবং পাহাড়ীরাগের কিছু রূপ মিশ্রণে দেশরাগের উৎপত্তি। সুতরাং এই রাগ সঙ্কীর্ণ শ্রেণীভুক্ত। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। এর সুরের রূপকে সাধারণতঃ ঊর্দ্ধমুখী মনে হলেও সেখানে গিয়ে তৎক্ষণাৎ নীচের দিকে নেমে এসে ঋষভের উপর দাঁড়ায়। এজন্য তার বাদীস্বরের প্রভাব ধরে পূর্ব্বাঙ্গ প্রধানরূপে গণ্য হবে। আর এক কারণ, পূর্ব্বাঙ্গের কয়েকটি সুরের অঙ্কণেই রাগের পরিচয় এসে যায়, যেমন,—স-র-ম-গ-র-গ-স-র, এই সুরের রূপ প্রমাণ করে দেয় দেশরাগ বলে। এই রাগে সারঙ্গরাগের আরোহণ থাকে বলে রূপের প্রকাশ স্বভাবতই কিছু ঊর্দ্ধমুখী ; সেই ঊর্দ্ধমুখীরূপের দৃশ্য যেন বৈরাগীর ঊর্দ্ধঝুটির মত। প্রকৃত পক্ষে সেখানে তার রূপের আসল পরিচয় নয়।

ঠাট,—স-র-ম-প-ন-স́-স́ ণ-ধ-প ধ-ম-গ-র-গ-স।

পূর্ব্বের আলোচনার মন্তব্য ধরে এই রাগেও স্বরবিস্তারের সময় কোন কোন সময় অবরোহণের স্বরসমূহ সরলভাবেও নেমে আসে দেখতে পাওয়া যায়। তবে সে সময় 'সা' এ এসে পুনর্বার 'রে' সুরে দাঁড়াতে হয়। এই রাগের রূপ পরিচয় অবরোহণের মধ্যেই সর্বাধিক।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ম-গ-র-গ-স-র। ণ-ধ-ম-র। ধ-ণ-ধ-ম-গ-র। (র-গ-স। গ-র-গ-স-র। র-গ-স-র। ম-গ-স-র-গ-স-র।) স্বরাঙ্কনের উক্ত চার অংশ পাহাড়ীরাগের রূপ। র́-ণ-ধ-ম-র। ম-প-স́-র́ ণ-ধ-প। র-ণ-ধ-ম-গ-র-গ-স-র, ইত্যাদি।

আলোচনা,—এই রাগের সৃষ্টি তত্ত্বের কথাতে যে সন্ধান পাওয়া যায় তাতে এই বিশ্বাস আসে—ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বর্ষার গ্রাম্যগীতে সুরটেরই রূপ প্রভাবিত হয়ে দেশওয়ালীপাহাড়ীসুর প্রবেশ করে গ্রামবাসীদের কণ্ঠে স্বভাবক্রিয়ায় যেভাবে মিশ্রিত হয়ে সুরের রূপ দেখা দিয়েছিল তাকেই পরে দেশ নামে পরিচিত করা হয়। গ্রাম্য-কাজরীগানের মাধ্যমেই এর রূপবস্তুটি যে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখান থেকেই যে শাস্ত্রীয়সংগীতে স্থান পেয়েছে তা বেশ বুঝা যায়। বিহারঅঞ্চলে যখন ছিলাম তখন গ্রাম্য-কাজরীগানে দেশরাগের জন্মসন্ধান সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা এসে গেছল। বর্ষার বৃষ্টি ঝরারূপ দেখে বিরহ কাতর মন তখন কণ্ঠ দিয়ে এই সুর প্রকাশকরে—করুণা মাখান গভীর আবেগ নিয়ে। তাই এত অন্তরস্পর্শি এর সুর।

সুরমল্লার বা সুরদাস মল্লার (৬৮)

জাতি ষাড়ব,-গান্ধার বর্জ্জিত। আরোহণে বক্রগতি। বাদী-সংবাদী,-ধৈবত ও ঋষভ। উত্তরাঙ্গ-

প্রধান। দুই নিষাদ। পঞ্চম বলীস্বর। মধ্যপ্রকৃতির রাগ।

ঠাট,—স-র-ম-প-ধ-ম-প-ন-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—র–ম-প-ধ। প-ধ-ণ-ধ-প-ম-র-স। র্স-ণ-ধ-প-ম-র-স-র্স-ণ-ধ। প-ধ-ণ-ধ-প-ধ-ম-প–ধ-র। র্স-ণ-ধ-ম-ধ-প-ণ-ধ-প-ধ-ম-র–ণ্। র্স-ণ-র্র-ণ-ধ-প-প-ধ-ম-র-স-।

আলোচনা,— সুরমল্লার রাগের সুরে ধৈবতের বাদীত্বে এবং কোমল-নিষাদের সংযোগে দেশ ও সুরট হতে বেশ খানিকটা পার্থক্য রেখেছে। তবে দেশ রাগ থেকেই যে তার রূপসৃষ্টি হয়ে নিজস্ব চিহ্নিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়।

বিচার নিয়ে এই রাগটির উপর মল্লার নাম কেন হল তার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ঐ রাগে মল্লার রাগের রূপপ্রভাবের পরিচয় নেই। সুরট-মল্লার নামের যে যুক্ত রাগটি আছে তার পরস্পর রূপসমন্বয় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। এই সব ধরণের রাগের উপর একটা সহজ আকর্ষণ থাকলেও নির্দ্ধারিত কয়েকটি স্বরসংযোগের উপর বেশী নির্ভর করতে হয় বলে তেমন গুরুত্ব থাকে না। যেমন অনেক খাদ্য বস্তু মুখরোচক হলেও উদরপূর্ত্তি হয় না—এই ধরণের রাগগুলিও তেমনি॥

নট-মল্লার (৬৯)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। দুই নিষাদ। বাদী-সংবাদী—পঞ্চম ও ঋষভ। মধ্যম বলীস্বর। সালঙ্ক শ্রেণী। মধ্যম প্রকৃতির রাগ। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-গ-ম-প-গ-ম-র-ম-প-ধ-ন-র্স-র্স-ধ-ণ-ধ-প-ম-গ-ম-র-স॥

আলোচনা,—যথার্থ নীতি-নিয়ম নিয়ে এই রাগটির ঠাট নির্মাণের দায়িত্ব পালন খুবই চিন্তার বিষয় ছিল,—নানান গানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতরূপকে ধরে ঠাট নির্মিত হল। এই রকম ধরণের যে সব গোলমেলে রাগ আছে তাদের বিজ্ঞানসম্মত বিধিব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া খুব শক্ত। উক্ত রাগটির কোন এক প্রাচীন ধ্রুপদে মল্লারের প্রভাব খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়, আবার কোন এক প্রাচীন খেয়ালে ছায়ানটের প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়; আর একটি অনুরূপ খেয়ালের আস্থায়ীতে উক্ত রাগগুলির কোন একটিরই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তরায় মল্লারের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কোন ধ্রুপদে মেঘরাগের প্রভাব বেশী আছে। নানা মুনীর নানা মতের মত ব্যাপার এই রাগের মধ্যে কিন্তু পরিচয় আছে যথেষ্ট। কোমল নিষাদ লাগিয়ে যিনি যেমন ভাল বুঝেছেন তিনি সেইভাবে ওই রাগগুলির অংশ নিয়ে নট-মল্লার নাম দিয়েছেন। আগেই বলেছি 'নট' মানে ছায়ানট রাগ। যাইহোক্—মোটের উপর এইসব ধরণের রাগ নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিব উপর রচিত হয়েছিল কি-না তাতে সন্দেহই থেকে যায়। আর একটা কথা,—কেউ কেউ এই রাগে কড়ি-মধ্যমও ব্যবহার করেন। কড়িমধ্যম ব্যবহার করায় বিশেষ আপত্তি আছে। কারণ নটে অর্থাৎ

ছায়ানটে এবং মল্লারে যদি কড়িমধ্যম থাকত তাহলে ব্যবহার সঙ্গতরূপেই হ'তে পারত কিন্তু তা যখন নেই তখন নট-মল্লার নামের উপর ওই স্বর কেন ব্যবহার হবে ! এই রাগে কড়িমধ্যম কাণে এলেই অত্যন্ত অবিবেচনা নিয়ে প্রয়োগ হচ্ছে বলে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে যায়,—অর্থাৎ ওই স্বর রাগ-রূপের স্বভাব বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়।

কোন কোন মতে নট-মল্লারের পূর্ব্বোক্ত পরিচিত রূপকে গৌড় বা গৌড় মল্লার বলা হয় কিন্তু ওই রাগের প্রাচীন গানের মধ্যে যে সুররূপ সংযোজিত হয়ে আছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে কিভাবে রাগের রূপ প্রচারিত হয়ে আছে তাকে সর্বাগ্রে জেনে নিয়ে প্রকৃত রূপ নির্ণয় করতে হবে কোন্‌টি বিচার সম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ বিশেষ করে বিচারের উপর নির্ভর করতে হবে প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে রাগরূপ কিভাবে রচিত হয়ে আছে।

আর একটা কথা,—কোন গ্রন্থকার নট-মল্লারের বাদী মধ্যম স্বরকে ধার্য্য করেছেন। ছায়ানটের বাদী-সংবাদী ঋষভ ও ধৈবত এবং যথার্থ বিচার মতে মল্লারের বাদীস্বর পঞ্চম। কারণ—ম-র-প, পঞ্চমের প্রভাব শক্তির উপর এই তিন স্বরের উচ্চারণের মধ্যেই মল্লারের রূপকে খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং রাগের উপর বিচার ধরে নট-মল্লারের মধ্যমের বাদীত্ব শক্তি থাকা অযৌক্তিক এবং তা সম্ভব নয়। ম-র-প, এই স্বররূপকে কামোদের প্রধানরূপ বলে মনে করা সম্পূর্ণ অনুচিত হবে। কামোদে ওই তিন স্বর সময় সময় ব্যবহার হয়ে পড়লেও ওই রাগকে তিন স্বরে চিনতে পারার স্বর হল—স-র-প, কিংবা র-প-প-ধ-প। আর—র-ম-প, ম-র-ম-প, ম-গ-ম-র-ম-প, ধ-ম-প, ধ-র্স-ধ-ম-প, ধ-র্স-ন-র্স-ধ-প-ম-প-ম-গ-ম-র-প-ম-গ-ম-র-স,—ইত্যাদি স্বর সমূহের গঠনরূপ পঞ্চমের বাদীত্বের উপর নির্ভর করে আছে মল্লারের রূপে। সুতরাং পঞ্চমই যে ওই রাগের যথার্থ বাদীস্বর তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকছে না এবং নট মল্লারের বাদীস্বরও পঞ্চমই হবে বিচার সম্মতভাবে।

গৌড়মল্লার (৭০)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত। কোমল গান্ধার ও দুই নিষাদ। বাদী-সংবাদী পঞ্চম ও ঋষভ। কোমল গান্ধার বলীস্বর। ক্ষুদ্র প্রকৃতি, অর্থাৎ রূপ রচনার ক্ষেত্র সীমিত। বক্রগতি। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী, সাহানা, মল্লার এবং সিন্ধুরও কিছু রূপভাব আছে। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-ম-র-ম-প-ণ-ধ-র্স-ন-র্স-ধ-ণ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-জ্ঞ-র-স।

প্রাচীন ধ্রুপদের সুরের উপর লক্ষ্য রেখে—প্রধান রূপাঙ্গ,— স-র-ম-র-ম-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স। ণ-ধ-ণ-প-প-ম-প-ম-জ্ঞ-র-জ্ঞ-র-স। র-জ্ঞ-র-স-ণ্-স-র-প-ম-প-ধ-ম-প-র-প-জ্ঞ-ম-র-স।

আলোচনা,— এই রাগকে নামের ডাকে ‘গৌড়’ বলা হয় আবার ‘গৌড়মল্লার’ও বলা হয়। এই নামের বিষয়ের আলোচনা করে আগেই কিছু জানিয়েছি।

এই রাগের রূপের মধ্যে আমাদের ঘরাণায় ধ্রুপদ— খেয়ালের মধ্যে যে ভাবে স্বরসংযোজিত হয়ে আছে এবং প্রাচীন বহু ঘরাণায়ও এই সুরের যেরূপ প্রচলন ছিল—আজকালকার শিল্পীদের কাছে যেভাবে এর রূপ প্রচারিত হচ্ছে তাতে পূর্বের সংগে মোটেই মিল নেই। তাঁদের অধিগত সুররূপ প্রাচীন ধ্রুপদী মতের নট-মল্লার রাগের প্রায় কাছাকাছি।

হিন্দীভাষায় ধ্রুপদের নিবদ্ধসংগীত যখন সৃষ্টি হয়নি এবং পশ্চিম অঞ্চলাদি থেকে যে সময় রাগরূপের প্রবেশ সম্ভাবনা বাংলাদেশে থাকা অতি দুরূহর মতই ছিল এবং তার কোন পরিচয়ই ছিল না—সেই সময়েয় বহু পূর্ব্বে লুইপাদের চর্য্যাপদ গ্রন্থে মল্লাররাগের প্রচার উল্লেখ আছে। সুতরাং এই রাগ দক্ষিণ রাঢ়ের মল্লভূমের কোন গায়কের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে মল্লহার থেকে মল্লার নামে যে প্রচারিত হয়ে এসেছে— তার সম্ভাবনার সূত্র পাওয়া যায় বিশেষ অনুসন্ধান নিয়ে ও চিন্তার মাধ্যমে। সুতরাং গৌড়মল্লার সুরও গৌড়দেশের কোন গায়কের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে প্রচারিত হওয়া আশ্চর্য্যের কিছু নয়।

খাম্বাজ (শাস্ত্রীয় নাম 'খম্বাবতী') (৭১)

ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি,—আরোহণে ঋষভ-বর্জিত। শুদ্ধ শ্রেণী। বাদী-সংবাদী,—গান্ধার ও ধৈবত। দুই নিষাদ। সরল গতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-গ-ম-প-ধ-ণ-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-র-স। সময় সময় স-ন-স,—এই 'নি' প্রধানরূপে ব্যবহার হয়।

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-ণ-ধ। গ-ম-ণ-ধ। স-গ-ম-প-গ-ম-ণ-ধ। প-ধ-ম-গ-ম-গ-র-স ॥

আলোচনা,—এই রাগটির ধ্রুপদাঙ্গের গান বহু আছে। এর স্বররূপ অতিশয় কোমল ও মিষ্ট-রসাত্মক। এজন্য তানবৈচিত্র্যের ক্রিয়া অন্য শ্রেণীর উপর অর্থাৎ টপ্পা ও ঠুংরী ইত্যাদি শ্রেণীর গানে ব্যবহৃত হয়। খেয়ালের গায়কী নীতি-ধারার বৈশিষ্ট্য যথাযথ বজায় থাকে না এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে এই রাগে এই শ্রেণীর গান করা হয় না কিন্তু আমার মতে মারুবেহাগ, দেশ, সুরট, তিলঙ্গ ইত্যাদির মত রাগে যদি খেয়াল গাওয়া যথারীতি চলতে পারে তাহলে উক্ত রাগ এবং সিন্ধু, সিন্ধুড়া, পিলু, বারওা ইত্যাদির মত রাগেই বা খেয়ালের গায়কীরীতি বজায় না থাকার কি কারণ আছে? খেয়ালের ভরাট গাম্ভীর্য্য নিয়ে তার একটা শক্তিশালী রূপমর্য্যাদা ও সম্রাজ্য আছে সত্য কিন্তু তার সেই আদর্শগত রূপকে রক্ষা করে চলা অতিশয় কর্ত্তব্য মনে করলে অনেক রাগকে বাদ দিতে হবে।

উক্ত রাগটির নাম পরিচয় সম্বন্ধে দু' এক কথা,—শাস্ত্রীয় নাম খম্বাবতী থেকে খাম্বাজ নাম প্রচলিত হয়েছে বহুকাল হতে। এখন শুনি কেউ কেউ একে খাঁমাজ বলেন। অবশ্য প্রকৃত নাম থেকে অপভ্রংশ নাম একাধিকও থাকতে পারে কিন্তু তার জন্য রূপের পরিবর্ত্তন হতে পারে না। একথা বলার উদ্দেশ্য—দেখা যায় নামের উচ্চারণের ওই তফাতে সুরের তফাৎ করা হয়েছে। এই

তফাতের মধ্যে প্রাচীন পরিচিতির কোন সন্ধান নেই অর্থাৎ আমাদের জানিত ও প্রচলিত খাম্বাজেরই বহু ধ্রুপদ ইত্যাদি এবং গৎ প্রাচীন-ঘরাণা থেকে প্রচারিত হয়ে আছে। খম্বাবতীই প্রকৃতপক্ষে খাম্বাজ নামে এসেছে এবং তার সুরের রূপ যেভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে তা একই নিয়মে। আমরা আর অন্য কোন পৃথকভাবে সুরঅঙ্কনের মূর্ত্তি কখনও আগে দেখিনি বা কোন গুণীর মুখেও শুনা যায়নি। যাইহোক্ এখনকার ইচ্ছাকৃত মতই ভিন্নভাবে পরিবর্তনের সুর যা শুনি তা প্রকৃত খাম্বাজের মত ওরকম মোটেই সুন্দর এ দীর্ঘায়ত নয়, অর্থাৎ কোন মৌলিকত্বই নেই ॥

ঝিঁঝিট বা ঝিঁঝোটি (৭২)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে নিষাদ বর্জ্জিত। কোমল নিষাদ ব্যবহার। বাদী-সংবাদী,—গান্ধার-ধৈবত। পূর্বাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধশ্রেণী। মধ্যপ্রকৃতিররাগ। সরলগতি।

ঠাট,—স-র-গ-ম-প-ধ-স´-ণ-ধ-প-ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-ম-গ। ধ্-স-র-ম-গ। ণ্-ধ্-প্-প্-ধ্-স-র-গ-ম-গ। গ-গ-ম-প-প-ধ-ম-গ। স´-ণ-ধ-প-ম-র-ম-গ।

আলোচনা,—কেউ কেউ এই রাগের আরোহণে ভূপালীর নির্দ্ধারিত স্বর অঙ্কন করেন। কিন্তু তা এই রাগের নিয়মধর্ম্মী নয়। কারণ, প্রাচীন ধ্রুপদসমূহে আরোহণের উপর বিভিন্ন স্থানে মধ্যম স্বর সংযোজিত হয়ে আছে এবং টপ্পা গানেও পাওয়া যায়। স-র-গ-প-ধ-র্স এই রকমভাবে সময় সময় ভূপালীর মত আরোহণে স্বর উঠলেও নীতিসঙ্গত নিয়মের উপর ঝিঁঝিটের রূপগঠনের ঠাট ওইভাবে ঔড়ব-সম্পূর্ণ স্বরে নির্মিত হতে পারে না। উপরোক্ত যেভাবে ঠাট অঙ্কিত করা হল তা রাগরূপের বিশুদ্ধ নীতি-নিয়ম ধরেই। এজন্য শুদ্ধশ্রেণীতেই তার জাতিত্ব রক্ষিত হল। কারণ,—অবরোহণের স্বর খাম্বাজের হলেও আরোহণের স্বর অন্য কোন রাগ থেকে আসেনি—নূতনত্ব নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। রাগের অভ্যন্তরের আরোহণে ভূপালীর স্বর কিছু মিশে থাকলেও মধ্যমের প্রভাবে সেই সুরের প্রভাব প্রকাশ হতে পায়নি, রাগের নিজমূর্ত্তির প্রভাবের ভেতর মিশে গেছে। যাইহোক মোটের উপয় এই রাগের রূপ-পরিচয়ের উপর জ্ঞান দৃষ্টি রেখে আরোহণে মধ্যম-নিষাদ বর্জ্জিত করে "ঔড়ব-সম্পূর্ণ' জাতিত্বে ফেলে রাগরূপের ঠাট তৈরী করা চলতে পারে না।

তিলককামোদ (৭৩)

জাতি ষাড়ব-সম্পুর্ণ.—আরোহণে ধৈবত বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী,—মধ্যম ও ষড়জ। গান্ধার-নিষাদ বলীস্বর। অবরোহণে কোমল নিষাদ। মধ্য প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী। সরলগতি। পূর্ব্বাঙ্গপ্রধান।

ঠাট,— স—র—গ—ম—প—ন—র্স—ণ—ধ—প—ম—গ—র—স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন্-স-র-গ-ম-প-ধ-ম। গ-র-প-ম—গ-র-স-ন্। র-গ-র-প-ম—গ-র-স-ন্। প্-ন্-স-র-গ-প-ম, র-ম-গ—ন্-র-স।

আলোচনা.—অনেকের মধ্যে দেখা যায় ঝিঁঝিট, তিলককামোদ এবং প হাড়ী—এই তিনটি রাগের রূপ প্রকৃত নিয়ম অনুযায়ী অঙ্কিত হয় না,—এটার সঙ্গে ওটার মিশে যাওয়ার মত হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় রাগরূপের প্রকৃত অবয়ব কি, সে সম্বন্ধে সঠিক জানার অভাব বশতই এরূপ ঘটে থাকে।

এই তিনটি রাগের মধ্যে তিলককামোদ বেশ বিস্তার বহুল রাগ, এ জন্য এর ধ্রুপদের সংখ্যাও বেশী। তিলককামোদের মধ্যে পাহাড়ীরাগের প্রভাব বেশ পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে উক্ত রাগটির নামের মধ্যে হু'টি রাগের সংযোগ আছে কিন্তু রাগরূপে তার কোন সন্ধান-সম্পর্ক নেই। 'তিলক' বলে কোন রাগের সন্ধান জানা নেই, কামোদ-রাগটিরও এর মধ্যে কোথাও স্থান নেই। সুঘরাই কানড়া, গৌড়সারঙ্গ, গৌড়মল্লার,—এই ধরণের নামযুক্ত রাগগুলির শুধু নামের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যেতে পারে কিন্তু তিলককামোদ রাগটির হুটি নামে যুক্ত হয়ে থাকার মত ধরে তার কোন নিরাকরণ সম্ভাবনা নেই সুতরাং এই রাগটি পৃথক হয়ে সুরের সংগে ইচ্ছামত ওই নামকরণ করেই পরিচিত করা হয়েছে বুঝতে হবে।

তিলককামোদ রাগে গান্ধারকে ধরে অন্যান্য স্বরের পর নীচের নিষাদের সংগে অধিক যোগাযোগ রাগরূপের বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপক এবং তারমধ্যে থাকে সুন্দর রসসৃষ্টির উৎস। ওই বলীস্বর হুটি অনেকটা বাদী-সংবাদী স্বরের মত মনে হলেও রাগরূপের মুখের প্রকৃত পরিচয়ে মধ্যমই তার যথার্থ বাদীত্বের অধিকারে আছে। বাদী-সংবাদীর সংযোগ ক্রিয়া মুদারাসপ্তকের আরোহণের মধ্যেই বিশেষভাবে থাকে কিন্তু এই রাগের ওই বলীস্বর হুটিকে ওই বিভাগে তেমনভাবে ব্যবহার চলে না বলে সে জন্যও ন্যায়-নীতি-নিয়মে তারা বাদী-সংবাদীর স্থান পেতে পারে না। ন্-স-র-গ-ম-প-ধ-ম,—সুরের এই রূপই যথার্থ নিয়মে অঙ্কনের উপর এসে প্রথমেই রাগরূপকে প্রকাশ করে।

প্রায় প্রত্যেকটি ধ্রুপদ-খেয়ালের আরম্ভের সময় উক্ত সুরের রূপে মধ্যম প্রধান হয়ে রাগের রূপ প্রতিফলিত হয়ে আছে। তিলককামোদের গান্ধার-নিষাদের সংযোগ কানড়ার গান্ধার-ধৈবতের প্রভাবশালী সংযোগের মত।

পাহাড়ী (প্রকৃত নাম পাহাড়ীয়া) (৭৪)

জাতি সম্পুর্ণ,—মিশ্র গতি। বাদী মধ্যম, সংবাদী-ষড়জ। অবরোহণে কোমল-নিষাদ। ক্ষুদ্র প্রকৃতি। শুদ্ধ শ্রেণী।

ঠাট,—স-র-ম-প-ধ-ম-প-ন-র্স,—র্স-ণ-ধ-প-ধ-ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-র-ম,-প-ধ-ম-গ-স-র-গ-স। স-র-ন্-স-র-গ-স-র-প-ম-গ-স-র-ম-গ-র-স। র-ম-প-ধ-প-ম-গ-স-র-গ-স। র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-স-র-প-ম-গ-র-স॥

আলোচনা,—এই রাগের সুর বিশেষকরে পাহাড়ী-অঞ্চলের হিন্দু আদিজাতিদের স্বভাবজাত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং সুরের রূপও স্বভাবতই সীমিত। পাহাড়ী-অঞ্চলে যতবার যতরকম-ভাবে এই সুর শুনেছি তাতে পেয়েছি স্বরের পূর্ব্বাঙ্গের মধ্যেই তার ক্রিয়ার বেশী পরিচয়। পা-ধা এবং সা-পর্য্যন্ত খুব কম উঠে। কিন্তু রাগরূপের নিয়ম ধরে আমাদের দেশে এর সুরের প্রচার চলে আসছে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের কাছেও হাজার বছর আগে থাকতে। রাঢ়ভূমের বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রাম-বাসীদের নানান ভাবগত গানে এর সুরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

এই রাগের ধ্রুপদ গান নেই, কারণ—ধ্রুপদের রূপের মধ্যে ধরে, রাখার মত স্বর সংখ্যার মাল-মসলা তেমন নেই। কেবল প্রচার-পরিচয় বিশেষরূপে আছে বলে এবং স্বভাবজাত রাগরূপের অন্যতম সৃষ্টিকারক বলে রাগসংগীতে স্থান দেওয়া আছে; তাছাড়া বিয়োগমধুর সুরের স্বরূপ অন্তরে অনুভবের জন্যও বটে। এর সুর যখন কণ্ঠে প্রকাশ করা হয় তখন মনে হয় যেন কোন্ এক সুদূরের নিরালায় প্রকৃতির তপস্বিনী রূপের সান্নিধ্যে মনকে সঙ্গিহীন করে নিয়ে গেল। তখন যেন খুঁজতে থাকে চিরসাথীকে। এর প্রভাব প্রয়োজনীয়তার মূল্য ধরে বলা যায়—এই রকম প্রকৃতিগত সুরগুলির ভাব-রস অন্তরে পুষ্টি লাভ করতে করতে সমস্ত রাগের প্রাণস্বরূপকে উপলব্ধি করিয়ে দেয় এবং নিয়ে যায় তাদের রূপকে উর্দ্ধ পথে। এইসব ক্ষুদ্র রাগের রূপ যেন ক্ষুদ্র শালগ্রামের মত,—অল্পক্ষণের মধ্যে শুধু তুলসী-চন্দনেও পূজা সমাধা করা যায়।

পাহাড়ীরাগের রূপ পরিচয়ের উপর বিশেষ অধিকার নিয়েই যথাসম্মতভাবে ঠাটের উপর তার গতায়তের স্বরগুলি নির্মিত হল। কোমল নিষাদের ব্যবহার এই রাগের প্রথম অবস্থায় ছিল না। ক্রমশঃ পাহাড়ভূমি থেকে প্রকৃতির শ্যামলকোলে এই স্বর নেমে আসার পর হরিজন জাতিদের বাঁশীতে ও কণ্ঠে কোমল নিষাদ মাঝে মাঝে এসে গিয়ে এখন ওই স্বর রাগরূপের মধ্যে কায়েম হয়ে গেছে। কোমল নিষাদের সৃষ্টি ইঙ্গিতও এইভাবে ওর মধ্যে দিয়ে যেন পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে আসে এবং সেই সন্ধানের উপর নির্ভর করতে বিশেষ সংশয় আসে না। যাই হোক্—পাহাড়ী রাগে কোমল নিষাদ বাদ দিয়ে এর প্রথম অবস্থার সুর কি রকম শুনেছিলাম তার পরিচয় যথা,—স-র-ম-ম-ম-গ-র-স-র-গ-স। র-ম-প-ম-গ-স-র-গ-স। প-ধ-ম-গ-স-র-গ-স। এই সুরের মধ্যেদিয়ে আদিজাতিদের স্বভাবগত সুরের প্রভাবই পাওয়া যায়। ওই জাতিদের কাছ থেকে এসে পূর্ব্বোক্ত বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের গুণে স্বভাবের আকর্ষণ ক্রিয়ায় কোমল নিষাদের উদ্ভব হয়। এই কোমল নিষাদ এল—যখন ক্রমশঃ আবেগ নিয়ে উত্তরাঙ্গের দিকে সুর ধাবিত হয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল তখনকার সেই সুরের পরিচয় যথা,—র্স-র্স-র্স-র্স-ণ-ধ-ণ-ধ-প। ম-প-প-প-ধ-প-ধ-প-গ-ম-ম,-ম-প-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-স-র-গ-স, ইত্যাদি। এই রকম সুরের রূপকে ধরে আমাদের দেশে বিবিধ প্রয়োজনে নানানভাবের গানে, এমন কি

শোক সংগীতেও এর প্রচার চলে এসেছে। বিশেষ করে প্রেমানুরাগ ও করুণ রসাত্মক গানেই এর আকর্ষণ খুব বেশী হয়ে আছে। বাল্যকাল থেকে পল্লীর চতুর্দিকে পাহাড়ী সুর শুনে শুনে মনের মধ্যে এর উপর মায়ার এক আকর্ষণের প্রভাব থেকে গেছে।

পাহাড়ীরাগটির আদি সুর হতে ক্রমশঃ স্বভাব আবেগে কোমল গান্ধার দেখা দেয়। ওই কোমলটি ওর সুররূপের যে স্থানে ধরা দিয়েছে সেই স্থানটিতে মনে হয় যেন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে কিংবা আত্মনিবেদনের ভাব প্রকাশের উপর স্পর্শিত হয়ে প্রকাশ হতে থাকে। বাল্যকালে শুনা একটি গ্রাম্য ভাষার গানের মধ্যে তার পরিচয় যথা,—

া-া-সা | রা-না-সা | সা-া-সা | -া-পা-পা | পা-ধা-পা | মা-গা-র-সা | সা-স-রা-গ-মা | রা-া-জ্ঞা-র-সা
০০বা গা ল্যা কি ক র্ লি ০আ মা র সা দা গা য়ে কা দা ০ দি লি ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০

......ইত্যাদি। এর ভাষাভাবের সামগ্রিক অর্থ,—শ্রীরাধিকা গোচারক কৃষ্ণকে বলছেন, হে বাগাল! আমার শুভ্র-অন্তরে তোমার কালরূপের ছাপ এঁকে দিয়ে এ কি করলে? আমার কুল, মান যে অন্তরের জাল ছিঁড়ে চলে গেল,—এখন আমার উপায় কি হবে?—একদিন সন্ধ্যার একটু আগে গ্রামের পথে আসতে আসতে ধান ক্ষেতের জলে মাছ ধরা-রত একটি হরিজন নারীর সুমধুরকণ্ঠে এই গানটি শুনে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কখন কখনও মনের আবেগে যখন এই গানটি গলায় এসে যায় তখন কি জানি যেন কার আহ্বানের প্রতিক্ষার জন্য আকুলতায় চোখে জল এসে পড়ে।

যাই হোক্—এই সুরে স্বভাবগত কোমল গান্ধারেররূপ প্রবেশ করার পর যেভাবে দুই গান্ধারের সংযোজনার সুর তাতে থাকে তার দ্বারা জয়-জয়ন্তীরাগের সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধান বেশ সহজে ধরা দেয়। শুধু তাই নয়,—যে সুরের রূপকে সিন্ধু নাম দেওয়া হয়েছে তার রূপও পাহাড়ীরাগের মধ্যে দিয়েই ওই রকম-ভাবে যে এসেছে তার বহু প্রমাণ বহু প্রাচীন-পল্লী-গীতির মধ্যে পেয়ে এসেছি। পাহাড়ীরাগের সুর ক্রন্দনাতুর নারীর কণ্ঠে আসার মাধ্যমে ক্রমশঃ সেই সুরে নিরাশ বেদনার বিলাপে অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়ার কালীন কোমলগান্ধারের সুর এসে গিয়ে সেখানে দুই গান্ধারের যে সুর উৎপন্ন. হয়ে পড়ে তাই এক সময় সংগৃহীত হয়ে জয়-জয়ন্তী নামে পরিচিত হয় কোন সুরসাধকের দ্বারা। এর প্রমাণ আমি সুদূর পল্লীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বাল্যজীবনে কোন কোন নারীর ওই অবস্থার মধ্যে শুনেছি। যথা,—ন্-স-র-জ্ঞ-র, ন্-ন্-স-ন্-স-জ্ঞ-র-স, র-ম-ম-ম-গ-র-জ্ঞ-র-স-ন্-স-র-জ্ঞ-র্-স, ম-গ-র-জ্ঞ-র-স-ন্-জ্ঞ-র, ন্-ন্-ন্-স-ধ্-ণ্-জ্ঞ-র-স, ইত্যাদি ক্রন্দনের এই সুর তাদের কোন রাগের ধারণা নিয়ে নিশ্চয়ই আসে নি—আকুল আবেগে স্বভাবতই কণ্ঠের কাছে এসে ধরা দিয়েছে। এই সব দৃষ্টান্তের দ্বারা মনে এনে দেয় ওই সব সুর থেকে রাগের নাম সৃষ্টি হয়ে, কিভাবে তার প্রথম জন্মোৎপত্তি হয়েছিল। পাহাড়ীরাগ থেকে এই ভাবে নানান অবস্থার মাধ্যমেই যে পিলু, বারওা রাগেরও সৃষ্টি হয়েছিল তার সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব আসে না। আমরা যদি ঠিকমত অনুসন্ধান করতে পারি তাহলে মানবজাতির স্বভাবগত সুর থেকে কোন্ কোন্ রাগের সৃষ্টি-হয়েছে তা বুঝে নিতে পারা যাবে। আমার ধ্যান, চিন্তা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখতে পাচ্ছি—

বিশেষ করে ভূপালী, সারঙ্গ, পাহাড়ী, বিভাস, আলাইয়া, তিলককামোদ প্রভৃতি রাগগুলি প্রথমাবস্থারই স্পষ্টরাগ এবং বহুরাগ সৃষ্টির মূল উৎস। এক একটির মধ্যে দিয়ে সংগীতের রূপাকর্ষণের উপর নানান আবেগ আকুলতায় তার ভাবের অভিব্যক্তির প্রকাশরূপে কোন কোনটিতে স্বর সংখ্যার বৃদ্ধি এবং কোমল-স্বর স্বভাবগত হয়ে এসে গিয়ে সেই সমস্ত সুরেররূপ নানান নামে প্রচারিত হয়েছে। তাদের প্রত্যেকটির রূপের গঠনকে নিয়ম-নীতির উপর রক্ষা করে রাখবার জন্য সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয়ে এসেছে। অবশ্য অন্যান্য বহু কোমলযুক্ত-রাগ সঙ্গীতজ্ঞদের ইচ্ছার প্রেরণাতেও সৃষ্টি হয়েছে।

যাই হোক্—উক্ত কয়েকটি সৃষ্টিতত্ত্বের উপর আমার যে মন্তব্য প্রদত্ত হল তা রাগজ্ঞ-চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে অনুধাবন সহজ সাধ্য হবে বলে মনে করি। কোমল নিষাদ-স্বরের প্রথম উদ্ভব নিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করলাম তাতে হয়ত কেউ প্রশ্ন করতে পারেন সেই স্বরের রূপ খাম্বাজ-রাগের মধ্যে প্রথমে ধরা দেয়নি তারই বা কারণ কি? এর উত্তর,—খাম্বাজরাগে কোমল নিষাদের সুর যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করে আছে এবং তার সুরশক্তিকে প্রমাণিত করেছে সেরূপ শুধু কোন কোমল-নিষাদ বিশিষ্ট অন্যরাগে নেই, এজন্য এই রাগকে কোমল-নিষাদের ঠিক স্বভাবউদ্ভব রাগ বলা যায় না। পাহাড়ী, তিলককামোদ রাগের সুর আদি সুর থেকে এসেছে বলেই তাতে যেটুকু কোমল-নিষাদের সুর এসেছে সেও আদিভাবেই এবং খাম্বাজ তার বহু পরের সৃষ্টি বলে এই সব তথ্য যুক্তির দ্বারা বুঝতে দেরি হয় না।

সিন্ধু (শাস্ত্রীয় নাম সৈন্ধবী) (৭৫)

জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে গান্ধার-বর্জ্জিত। কোমল, গান্ধার ও নিষাদ। বাদী-সংবাদী, ঋষভ-পঞ্চম। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধ শ্রেণী। সরল গতি। মধ্যপ্রকৃতি।

ঠাট,—স-র-ম-প-ধ-ণ-র্স-র্স-ণ-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-জ্ঞ-র। র-ম-জ্ঞ-র। র-ম-প-ম-জ্ঞ-র। ণ্-র-স। র-ম-প-ণ-ধ-প-ম-প-জ্ঞ-র। ণ-ধ,-র্স-ণ-ধ-প-ম-প-ধ-প-ম-জ্ঞ-র। ইত্যাদি।

আলোচনা,—যে সমস্ত রাগে শুধু কোমল—নিষাদ বা কোমল-নিষাদ—গান্ধার ব্যবহার হয়, সেই সমস্ত রাগে স—ন—স—স্বর প্রধান নিষাদরূপে ব্যবহার হয়। ওই জায়গায় কোমল নিষাদ ব্যবহার করলে সুররূপের বাঁধন আলগা হয়ে যায়, এবং শ্রুতিমধুরও হয় না। এই নিয়মটি রাগের রূপধর্ম্মী। সিন্ধু রাগের রূপ করুণকোমল। এর রূপকে নিয়ে অঙ্কনবিস্তারের ক্ষেত্র যথেষ্ট আছে। এজন্য ধ্রুপদের সংখ্যাও কম নয়। টপ্পাগানে, প্রাচীন বাংলা গীতিতে এবং আরো নানা শ্রেণীর গানে এর সুরের প্রচলন সমধিক-রূপে আছে। কিন্তু এমন একটি সুন্দর, সরস ও মনহারিত্ব রাগের এখন তেমন চর্চা নেই এবং শিক্ষাস্থানেও বিশেষ নেই॥

সিন্ধুড়া (৭৬)

জাতি,– ঔড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার-নিষাদ-বর্জিত। গান্ধার-নিষাদ-কোমল। বাদী-সংবাদী তারার ষড়জ এবং মুদারার পঞ্চম। ঋষভ বলীস্বর। সালঙ্ক শ্রেণী। সামন্তসারঙ্গ বা দুর্গা এবং সিন্ধুরাগের মিশ্রণে সিন্ধুড়ারাগের উৎপত্তি। উত্তরাঙ্গ প্রধান। সরল গতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ ॥

ঠাট,—স-র-ম-প-ধ-স́-স́-ণ-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ, – র-ম-প-ধ-স́। প-ধ-স́-র́-জ্ঞ́-র́। স́-ণ-ধ-প-ধ-স́,–র́ণ-ধ-প-জ্ঞ-র, প-ধ-ম-জ্ঞ-র,-ণ্-স। ম-প-স́-র́-ম́-জ্ঞ́-র́স́-ধ-স́-ণ-ধ-ম-প-ধ-স́-প-জ্ঞ-র,-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-ণ্-স ॥

আলোচনা,—ওই যুক্তরাগের মধ্যে দিয়ে তার রূপের যথার্থ পরিচয় ঠাটের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হল এবং সেই ব্যবস্থামত জাতিও নিরাকৃত হল। ঠাটের মধ্যে দিয়ে রাগরূপের মধ্যে তার সংযোজিত স্বরগুলির উঠানামা নিয়ে যেভাবে নির্মিত করার ব্যবস্থা রাখতে হয়, সেই ব্যবস্থাপনার উপর সন্নিবেশিত সুরের মধ্যে দিয়েই রাগরূপের নিজস্ব ভাবধারাকে বুঝবার সহায়তা করে এবং নির্দিষ্টভাবে বোধশক্তি দেয়। রাগের স্বভাবগত রূপকে বিশুদ্ধ ও পৃথকত্বের উপর রাখতে হয় এবং তারজন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব রেখে ঠাট নির্মাণ করতে হয়। এই রাগটির কোন কোন ধ্রুপদ গানের আরোহণে প্রধান নিষাদের ব্যবহার কেন হয়ে পড়েছে তার সঙ্গতযুক্তি কোন নেই। মনে হয় নীতি-নিয়মের উপর দৃষ্টির অভাববশতই হয়ে থাকবে। গানে নিষাদের সেই স্বর অহেতুক প্রয়োগের মতই শুনায় ॥

কাফী (৭৭)

জাতি-মিশ্র-সম্পূর্ণ। দুই গান্ধার এবং দুই নিষাদ ব্যবহার। বাদী-সংবাদী,—পঞ্চম ও ঋষভ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। সালঙ্কশ্রেণী—সিন্ধু এবং খাম্বাজ রাগের মিশ্রণে এর উৎপত্তি হয়েছে এবং ওই দু'টি রাগের মিলন সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে নিজস্ব রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বক্রগতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ।

ঠাট,—স-র-জ্ঞ-র-গ-ম-প-ধ-ণ-স́-স́-ন-স́-ণ-ধ-প-ম-গ-ম-জ্ঞ-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-র-জ্ঞ-র-গ-ম-প-ম-প। গ-ম-ধ-ধ-ণ-ধ-প-গ,-স-গ-ম-ণ-প-জ্ঞ-র। র́-র́-জ্ঞ́-র́-স́-স́-ন-ন-স́-র́-স -ণ-ধ-ম-প-ধ-ন-স́। ম-ণ-ধ-ণ-প-ধ-ম-প-গ-ম-গ-প-ম, স-র-জ্ঞ-ম-ম-প ॥

আলোচনা,– এই রাগ সম্বন্ধে পূর্বে সবিশেষ পরিচয় প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং বিশেষকরে বাড়িয়ে আর অধিক জানান নিষ্প্রয়োজন মনে করলাম। যে সমস্ত রাগে যে সকল স্বরের দ্বারা তাদের সত্যকারের রূপ সৃষ্টি হয়ে প্রচারিত হয়ে আসছে তার মধ্যে কোন কোন স্বরকে বাতিল করে দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত নয়—যদি রাগবিজ্ঞানের বিচার যুক্তির মধ্যে ত্রুটি না থাকে।

জয়াবতী (৭৮)

জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব,—আরোহণে গান্ধার-ধৈবত এবং অবরোহণে ধৈবত বর্জ্জিত। বাদী—সংবাদী—ঋষভ ও পঞ্চম। দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহার। আরোহণের পূর্ব্বাঙ্গ বক্রগতি। মধ্যপ্রকৃতি। মিশ্রজাতি। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান।

ঠাট,— স—র—ম—প—ন—স´—স´—ণ—প—ম—গ—ম—জ্ঞ—র—স।

প্রধান রূপাঙ্গ,— জ্ঞ-স-র-প-ম-গ-ম-জ্ঞ-র। ণ-প-ম-জ্ঞ-র-স-গ-ম-র-ণ্-স।

আলোচনা,—এর আরোহণের সুর সারঙ্গরাগের মত কিন্তু অবরোহণের সুরে তেমন পাওয়া যায় না—কোন রাগের সঠিক নির্দ্ধারণ সুর। গানের উপর অবরোহণের উত্তরাঙ্গে নাটরাগের কিছুরূপ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় এবং পূর্বাঙ্গে নেমে আসে অনেকটা বারওাঁ ও কাফীসুরের মত হয়ে! এই রাগের কোন গান জানা নেই। জানি না এই রাগ কখন কিভাবে বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এসেছিল। এই ধরণের সব রাগের রূপ যেন লজ্জা-সরমে অতিশয় সঙ্কোচপূর্ণ।

জয়জয়ন্তী (৭৯)

জাতি, ঔড়ব—সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার নিষাদ-বর্জিত। মিশ্রগতি। দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহার। বাদী-সংবাদী—ঋষভ ও পঞ্চম। বড় প্রকৃতির রাগ। সঙ্কীর্ণশ্রেণী।

ঠাট,— স-র-ম-প-ন-স´-স´-ণ-ধ-প-ম-গ-র-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,— ম-গ-র-জ্ঞ-র। প্-র-গ-ম-র-জ্ঞ-র-স। প-ধ-ম-ণ-ধ-ম-গ-র-জ্ঞ-র-স। -

আলোচনা,—আগেকার সমস্ত ধ্রুপদ-খেয়ালের মধ্যে যেভাবে স্বর সংযোজনা আছে তার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখে ঠাট ও রূপাঙ্গ অঙ্কিত হল। এই রাগের সৃষ্টরূপ সুরটের স্বভাবে গতায়ত করে শেষেরদিকে সিন্ধুর কোমলগান্ধারকে ধরে তার সুর ওই রূপের সংগে মিশিয়ে দিয়ে তৈরি হয়। তারপর বহু পরে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে খেয়ালের মধ্যে ছায়ানটের ধ্-র-গ-র-গ-ম, র-গ-ম-প-ধ-প-গ-ম, এই রকম সুর প্রবেশ করে এখন এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়ে গেছে, এবং তাতে জয়জয়ন্তীর স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষায় ত্রুটী শূন্যই হয়ে আছে বলা যায়। আগে কেউ কেউ বলতেন জয়-জয়ন্তীতে গারা রাগের রূপ সম্পর্ক আছে কিন্তু তা প্রামাণিক নয়। কারণ গারার যা প্রকৃত স্বররূপ তার পরিচয় যথা,—ধ্ ণ্ স র গ, ম গ র গ র স, ন্ স ণ্ ধ্ প্ ম্ ণ্ ধ্ ন্ স। ম ণ ধ ণ স´ গ´ র´ স´ ণ প ধ প গ ম গ র—স। ইত্যাদি। এই সুররূপের সন্ধান জয়-জয়ন্তীতে কোথাও নেই।

বাগেশ্বরী বা বাগেশ্রী (৮০)

জাতি, ঔড়ব-সম্পূর্ণ.—আরোহণে গান্ধার-পঞ্চম বর্জিত। কোমল-গান্ধার ও নিষাদ। ধৈবত বলীশ্বর। অবরোহণে ধৈবব-মধ্যম ও গান্ধারের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতম হয়ে আছে। সরল গতি। বড়-প্রকৃতির রাগ। সালঙ্ক শ্রেণী। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-ম-ধ-ণ-স́-স́-ণ-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-র-ম। ম-জ্ঞ-র-ম। স-ণ্-ধ্-ণ্-র-ণ্-স। ম-প-ধ-ম-জ্ঞ-র-ম। ম-ধ-ণ-স́-ণ-ধ-ম-প-ধ-ধ-ম-জ্ঞ-র,-স ॥

আলোচনা,—বাগেশ্রী রাগটি আমাদের ঘরাণার চন্দ্রকৌশ এবং সিন্ধুরাগের মিশ্রণে তৈরি বলে পরিচিত হয়ে আছে। বাগেশ্রীর আরোহণের মধ্যম থেকে চন্দ্রকৌশের সুর থাকায় এবং অবরোহণে সিন্ধুরাগের রূপ মিশ্রিত হয়ে আছে বলে এজন্য এই রাগ সালঙ্ক শ্রেণীরূপে গণ্য হয়ে থাকবে। প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়ালের মধ্যে সময় সময় আরোহণে পঞ্চমস্বরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সেই ব্যবহারের মধ্যে সিন্ধুর সুর প্রকাশিত হয়ে পড়ায় তার স্নিগ্ধ-সরস-রূপ বাগেশ্রীকে আরো রসযুক্ত করে তুলে। যেমন—ম প ধ প ধ ণ ধ প ম প ধ ম জ্ঞ র স। প ধ ণ স́ স́ ণ ধ ম প ধ ণ ধ প ম প ধ ম জ্ঞ, র ম প ধ ম জ্ঞ ম জ্ঞ র, স—ইত্যাদি। যদিও রাগরূপের বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে ঠাট নির্মাণের উপর উক্ত স্বরের রূপকে স্থান দেওয়া চলে না—তত্রাচ রাগরূপের প্রকৃতিগত ভাবের উপর দৃষ্টি দিয়ে উক্ত স্বরসমূহের ক্রিয়া অপরিহার্য্য রূপেই মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে। এরপর আর এক বিশেষ কথা,—আজকাল দেখা যায় বাগেশ্রীর আরোহণে ঋষভ বর্জ্জিত করে স জ্ঞ ম ধ ণ স́, এইভাবে ব্যবহার করা হয়। এই রকমভাবে স্বরের দ্বারা রূপঅঙ্কন করা নীতি নিয়ম নিয়ে তার স্বভাব ও সৃষ্টিগত সম্বন্ধের বিচারে মোটেই আসতে পারে না। আগেই বলেছি আগেকার কোন ধ্রুপদ-খেয়ালে ওইরকম নিয়মে স্বরের সংযোজনা নেই এবং আগেকার গুণীপরম্পরা মুখেও শুনিনি। যাইহোক্—এখন রাগ-বিজ্ঞানের বিচারে আসা যাক্—পূর্বে তিনস্বরে রাগ নির্ণয় যেভাবে দেখিয়েছি তাতে স র ম, ছাড়া স জ্ঞ ম, হতে পারে না। কারণ ওই সুরে মালকৌশকেই চিনিয়ে দেয়। প্রমাণের দিক দিয়ে একে অকাট্য মনে করতে কোন প্রকারেই দ্বিধা আসতে পারে না। মুদারার পূর্ব্বাঙ্গে এবং উদারার নিম্ন অংশ ধরে রাগবিস্তারের মধ্যে 'রে' সুরের সংযোগে রাগরূপের প্রকৃত ভাবময় বস্তুর ক্রিয়া যেমন সুন্দর-ভাবে সম্পাদিত হয় তেমন কোমল গান্ধারকে ধরে হয় না। উদাহরণ—যেমন, স র জ্ঞ র ম জ্ঞ র ণ্ ধ্ ম্ ধ্ ণ্ স, ণ্ র, স ণ্ স ণ্ স র ণ্—ধ্ স, র ণ্ ধ্ স র ম—ম জ্ঞ র ম, ণ্ র জ্ঞ—ম জ্ঞ র স—ম জ্ঞ র ম ইত্যাদি। এই স্বর রচনার ঋষভ স্বরগুলি বাদ দিয়ে সেই সেই স্থানে গান্ধার প্রয়োগ করলেই বুঝা যাবে রাগের উপর ঋষভ স্বরটিই যথার্থ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে, গান্ধারটি নয়। তারপর স র ম. স্বর রাগরূপের উত্থানে স্বভাবগত সহজ ও স্বাভাবিক স্বর, না, স জ্ঞ ম স্বর,—এই

পরিক্ষায় কণ্ঠে প্রকাশ করলেই ধরা পড়ে যাবে—প্রথমটিই যথার্থ বলে। বাগেশ্রীর রূপে প্রধান ধৈবতের প্রভাব যথেষ্ঠ আছে। এই প্রভাবের ক্রিয়া নিয়ে কোমল গান্ধারের সংগে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ-ভাবে করলে রাগের রূপধর্মানুযায়ী স্বরের নিলন সংযোগে অর্থাৎ হার্মোনী ও বিজ্ঞানের সুবিচার করা হবে না,—ঋষভের সংগেই হবে। আর একটা বিশেষ যুক্তির কথা,—বাগেশ্রীকে অষ্টাদশ কানড়ার মধ্যে ধরা আছে,—তার সঙ্গতকারণ সুন্দরভাবেই পাওয়া যায়—স্বর রচনার মধ্যে,—যেমন, ণ্ র স র ণ্ ধ্—ণ্ স ণ্ র স, ণ্ স র স র ম জ্ঞ র স ণ্ ধ্—স ণ্ স, ইত্যাদি। এই স্বরগুলির মধ্যে যেখানে যেখানে ধৈবত আছে সেখানে কোমল-ধৈবত দিলেই কানড়ার মত শুনতে লাগবে।

আজকাল যেভাবে আরোহণের উপর স্বর প্রয়োগ করে এবং পঞ্চমকে এক রকম উপেক্ষা করে রূপ অঙ্কিত করা হয় তাতে বাগেশ্রী—মালকৌশ জাতীয় হয়ে পড়ে। এই হয়ে পড়ার মধ্যে যেমন কোন যুক্তি নেই তেমনি তাতে তার রূপের স্বাভাবিক নমনীয়তা কমে গিয়ে তীক্ষ্ণতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ স্থলে প্রশ্ন ধরে কেউ বলতে পারেন আরোহণে ঋষভ-পঞ্চম দুই-ই বাদ দিয়ে স ম ধ ণ র্স—এই-ভাবেও তো স্বর নিয়ে উঠা যেতে পারে? উত্তর—তা হতে পারে না, কারণ নীতি-নিয়ম রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রাগের জাতিত্ব-স্বীকারে আরোহণে তিন স্বর বাদ দেওয়া চলতেই পারে না,—কারণ জাতী-তিনটির বেশী নেই। রাগরূপের উপর গঠনক্রিয়ার সীমা সম্ভাবনা যথা-যথর উপর চার স্বরে কেন হয় না তার উপযুক্ত বিচার রেখেই তিনটির অধিক জাতী সৃষ্টি হতে পারে নি। মেজাজের উপর দিয়ে স জ্ঞ ম ধ কিংবা স ম ধ, এই সুর যখন এসে যায় তখন তারা রাগের অঙ্কন বিস্তারের ক্ষেত্রে মিশে যায়। এ রকম বহু রাগের মধ্যেই হয়ে পড়ে,—বিশেষতঃ তান-বৈচিত্র্য ক্রিয়ায়, তাতে রাগভ্রষ্ট হয় না।

‘আভোগী’ নামে একটি রাগের সৃষ্টরূপ আজকাল সঙ্গীতজ্ঞ মহলে প্রচলন হয়েছে। এর সুররূপে আছে উত্তরাঙ্গের দিকে বাগেশ্রী রাগের মত সুর এবং পূর্ব্বাঙ্গে সিন্ধুরাগের রূপ, তার সংগে ঋষভ থেকে একেবারে নীচের ধৈবতে আসা যাওয়ার আধিক্য থাকে। মনে হয় যেন ওইখানের ওই দুটি স্বরই রাগ-রূপের মধ্যমণি অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্র—এবং বাদী-সংবাদীর মত। আগেই বহুবার বলেছি এই সব ধরণের রাগ শুধু নূতন নাম করণের উপরই তার বিশেষত্ব।

বাচস্পতী—এই নামে একটি রাগের সুর সম্প্রতি কানে এল। সুরের মধ্যে কি-যে হল তার নিরাকরণে কোন আগ্রহই এল না। সে সময় একজন বিশিষ্ট শ্রোতা বললেন,—‘বিদ্যাদিগ্‌গজ’ নামে একটি রাগ শুনেছি, সেটিও ওরই সহোদর মতই।” এই বলে তিনি বেশ একটু হাসলেন। নূতন নূতন রাগসৃষ্টির প্রেরণা বরাবরই থেকে এসেছে এবং হয়ত থাকবেই,—এটা যদি যুগের তাগিদ্ বলেও মনে করা যায়, তাহলে আমি বল্‌ব—বড় রাগের মত যদি সে সব রাগের গঠনরূপ না হয় তাহলে সে সৃষ্টিতে নিজেরও কোন লাভ নেই এবং শিক্ষার্থী ও শ্রোতাদেরও নেই।

কানড়া (কাহ্নার) (৮১)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। কোমল—গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। বাদী-সংবাদী, ঋষভ ও পঞ্চম। গান্ধার-ধৈবত বলীস্বর। বড় প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,— স-র-ম-জ্ঞ-ম-প-ণ-দ-ণ-র্স, র্স-দ-ণ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-ণ্দ্-ণ্-র-স। প্-স-র-স-র-মজ্ঞ—ম-র-স। ণ্-স-র-ণ্দ্-ণ্-প্-প্ণ্দ্-ণ-র—স। ম-প-ণদ ণ র্স। স-র-মজ্ঞ-দ্-ণ্-র—স।

আলোচনা,— শুনা যায় দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুরলী বাদনে এই সুরটিকে বিশেষ প্রিয় করে নিয়েছিলেন সেজন্য তাঁর নামে এই রাগটির কাহ্নার নাম হয়। অর্থাৎ এই রাগ কাহ্নার (কৃষ্ণের) বলে পরিচিত হয়, পরে উচ্চারণের পরিবর্ত্তন এসে গিয়ে কানড়া নাম হয়ে পড়ে। কৃষ্ণকে কাহ্না বা কাহ্নাই সম্বোধন বহু গানেও আছে। কানড়ার কোমলস্বর তীব্র কোমলরূপে ব্যবহার করতে হয়—সে কথা আগেই জানিয়েছি। এই কোমল ব্যবহার আগের স্বরকে স্পর্শ করে করতে হয়। তবে ঋষভের কাছে কোমল গান্ধার যদি সময় সময় প্রকৃত কোমলরূপে ব্যবহৃত হয়ে নীচে নেমে আসে তাতে রাগরূপ বিঘ্নিত হয় না,—শান্ত রসসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োজন নিয়েই এসে পড়ে। এই রাগটির প্রচারিতরূপ সার্ব্বজনীনভাবে একই প্রথার অঙ্কনরীতিতে চলে আসছে। সুতরাং আলোচনার বিশেষ আর কিছু নেই।

সুঘরাই কানড়া (৮২)

জাতি ষাড়ব। ধৈবত বর্জ্জিত। কোমল, গান্ধার ও নিষাদ। বাদী-সংবাদী,—ঋষভ ও পঞ্চম। গান্ধার বলীস্বর। শুদ্ধশ্রেণী। বক্রগতি। এর রূপ বিশেষ করে দুই অঙ্গের উপরই নির্ভর করে আছে।

ঠাট,— স-র-ম-জ্ঞ-ম-প-ণ-র্স,-র্স-ণ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,— ণ-প-মজ্ঞ-ম-র-ণ্-র—স। ম-প-ণ-প-ম-প-মজ্ঞ-ম-র-ণ্-র-স।

আলোচনা,—কানড়ার ধৈবত বাদ দিয়ে নূতনত্বের প্রয়াস নিয়েই যে এর রূপ সৃষ্টি হয়েছিল তা বেশ বুঝা যায়। যাই হোক্—উত্তরাঙ্গে ধৈবতের জায়গাটায় ছায়া পড়ে যাওয়ার মত মনে হলেও পূর্ব্বাঙ্গের স্বররূপের উজ্জ্বলতা নিয়ে উভয়ের মিশ্রণে আলো-ছায়ার মত রূপের লেখা মনকে স্পর্শই করে,- যদিও রাগের সমষ্টিগতরূপ স্বাতন্ত্র্যতায় তেমন উজ্জ্বল নয়।

নায়কী কানড়া (৮৩)

জাতি, ষাড়ব-সম্পূর্ণ—আরোহণে গান্ধার-বর্জ্জিত। কোমল-গান্ধার—ধৈবত এবং দুই নিষাদ। বাদী-

সংবাদী,—মধ্যম ও ষড়্জ। বক্রগতি। সঙ্কীর্ণশ্রেণী,—কানড়া-আড়ানা এবং সাহানার স্বররূপ থেকে তৈরি।

ঠাট,— স-র-ম-প-ণ-দ-ণ-র্স-র্স-দ-ণ-প-ম-প-জ্ঞ-ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,— স-র-ম-জ্ঞ-ম-স-র-ণ্‌-ম। র-প-প-মজ্ঞ-ম-ণ্‌-র-স-ণ্‌-দ্‌-ণ্‌-স। র-প-প-মজ্ঞ-ম-ণ-প-মজ্ঞ ম-স-র-মজ্ঞ-ম-র—স।

আলোচনা,—এই রাগটির সৃষ্টি তাৎপর্য্যও 'সুঘরাই'এর মতই। যাই হোক্—রাগরূপের নীতি-নিয়ম রক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েই ঠাট রচিত হল। আমি প্রত্যেকটি রাগের রূপকে যেরূপ যথাযথ ভাবে নিরিক্ষণ করে তাদের ঠাট, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করলাম তাতে প্রত্যেকটির পৃথকত্ব নিয়ে নিজস্বরূপের প্রতীককে বুঝে নিতে কোনই অসুবিধা আসবে না বলে বিশ্বাস রাখি। একটা কথা মনে হয় জানান হয় নি,—স্বরের কোন গতির মধ্যে কোন স্বর বাদ থাকলে—সেই সুর প্রয়োজন বুঝে যদি ব্যবহার করেই নীচের স্বরে চলে আসে তাহলে দোষের এবং রাগরূপের ক্ষতি হয় না। যেমন, উক্ত রাগে ম-জ্ঞ-ম এই ভাবে গান্ধার ব্যবহার হতে পারে।

আড়ানা (৮৪)

জাতি,—ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে গান্ধার-ধৈবত বর্জ্জিত। সালঙ্ক শ্রেণী,—আরোহণে সারঙ্গের এবং অবরোহণে কানড়ার রূপ নিয়ে রচিত। কোমল-গান্ধার, ধৈবত এবং দুই নিষাদ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। বাদী-সংবাদী,—তারাসপ্তকের ষড়্জ এবং মুদারার পঞ্চম। বড়প্রকৃতির রাগ। অবরোহণে বক্রগতি।

ঠাট,—স-র-ম-প-ন-র্স-র্স-ণ-দ-ণ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—ম-প-র্স। ণ-দ-ণ-প-ম-প-র্স। ম-প-র্স—ণ-প।

আলোচনা,—কানড়ার রূপসন্নিকট রাগগুলির মধ্যে এই রাগটির প্রাধান্যই বেশী। তবে এই রাগের বহু ধ্রুপদ-খেয়াল থাকলেও এবং স্বর বিস্তারের বহু সুযোগ আছে স্বীকার করেও চড়ার দিকেই রাগের স্বভাবগত সম্পর্ক অত্যধিক বলে রস-লালিত্যের অভাব আছে এবং রূপের চিত্রাংশগুলো বড় বেশী পরস্পর সম্পর্ক রেখে প্রদর্শন করতে হয়। চড়ার দিকে রাগের স্বভাবই এই। আড়ানার আরোহণে কানড়ার সম্পর্ক ধরে ণ দ ণ প, এবং রাগরূপের প্রধান প্রমাণ্য নির্দেশের উপর র্স ণ প, এই স্বর ব্যবহার হয় বটে—কিন্তু সেই নজির ঠাট নিরূপণের জন্য নয়। কারণ সুঘরাই এবং নায়কী—এই রাগ দুটির ঠাটের সংগে আড়ানার ঠাট সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকতে হবে। এজন্য যে ভাবে এই রাগের ঠাট নির্মিত হয়েছে তা যথেষ্ঠ সঙ্গত কারণের উপরই॥

গারা (৮৫)

জাতি সম্পূর্ণ। আরোহণের উত্তরাঙ্গে এবং অবরোহণের স্বর বক্রগতি বিশিষ্ট। দুই নিষাদ। বাদী-সংবাদী,—গান্ধার ও ধৈবত। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। পূর্বাঙ্গ প্রধান। সঙ্কীর্ণ শ্রেণী।

ঠাট,—স-র-গ-ম-প-ণ-ধ-ন-র্স,-র্স-ধ-ণ-প-গ-ম-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—ধ্-ণ্-স-র-গ, ম-র-গ-র-স। ন্-স-র-স-ধ্-ণ্-প্-প্-ণ্-ধ্-ন্-স। গ-ম-প-গ-ম-র-গ-র-স। ম-ণ-ধ-ন-র্স-ধ-ণ-প-গ-ম-র-গ-ম-প-ম-গ-র-স। ম-প-র্স-ধ-প ॥

আলোচনা,—এই রাগের রূপকে যথাযথভাবে বজায় রেখে বিস্তার-বৈচিত্র্য প্রকাশের সহজ উপায় খুব বেশী নেই। কারণ এর রূপকে রক্ষা করে কয়েকটি বিশেষ চিহ্নিত স্বররূপ। সুরের মূর্ত্তি নিজস্ব পদ্ধতিতে সৃষ্টি নয়,—দু' চারটি রাগের টুকরো অংশ নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। সেগুলি এসেছে ঝিঁঝিট, সেনীমল্লার, ছায়ানট ও মল্লার থেকে। যেমন ঝিঁটিটের—স র গ গ ণ্ ধ্ গ ম গ র স। সেনীমল্লারের—ম্ ণ্ ধ্ ন্ স। ছায়ানটের—র গ ম প ম গ ম র স। মল্লারের—ম প র্স ধ প ম গ ম র প গ ম র। পরে—গ র স ন্ স র গ ন্ স এই রকম সুরে মিশে যায় ॥

১। বর্ত্তমানে দেখা যায় 'যোগ' নাম দিয়ে অনেক গায়ক-বাদকদের দ্বারা সুরের এক মূর্ত্তি গড়তে। সেই মূর্ত্তিরূপ এক অদ্ভুত ধরণের মনে হয়। আরম্ভিক সময়ে আসে মালকৌশের মত রূপ, তারপর থাকে ভীমপলশ্রী ও তিলং এর মত রূপের ক্রিয়া। এর রূপের মূর্ত্তিতে রাগবিজ্ঞানের কোন রীতি-নীতির বালাই আছে বলে মনেই হয় না এবং রাগরূপ রচনার উপর তেমন কোন আকর্ষণই আসে না এবং দেখেছি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে রূপ অঙ্কন হয় না—আড়ষ্টতা থাকেই—অবশ্য ইহাই স্বাভাবিক। এইসব ধরণের রাগ শিল্পীদের কি করে মনঃপুত হয় তাই ভাবি। এক গায়ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—যোগ নাম কি কোন অর্থ ধরে হয়েছে? তিনি বলেছিলেন,—মনে হয় কয়েকটি রাগ মিশিয়ে হয়েছে বলেই উক্ত নাম দেওয়া হয়েছে।" তাহলে বলতে হয়, বিশেষ করে আজকাল যে সব নূতন নূতন নামে রাগ প্রচারিত হচ্ছে সেগুলি 'যোগ' থেকে ওই অর্থে পৃথক কোথায়! এ রকম নিরর্থক নাম না দিয়ে সঙ্গতভাবে ওমুক ওমুক রাগকে একত্রে করে প্রকাশ করছি বলাই উচিত মনে করা ভাল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আসে,— কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগরূপের দ্রুতাদি তানবৈচিত্র্যের ক্রিয়া-কলাপই এখন আমাদের কাছে বিশেষ করে সমাদৃত হয়েছে বলে দ্রুতগামী যানবাহনের গতির মতই মনের গতিও হয়ে আছে এবং তার জন্য আমাদের সংযম, বিচার-বুদ্ধির গাঢ়ত্ব বর্দ্ধিত না হয়ে তরলত্বই বেশী দেখা দিচ্ছে। এর বিশেষ কারণ, মন এখন প্রায় সর্বদাই চতুর্দিকের দ্রুতরূপ দেখছে বলে ধীর স্থিরতার অবকাশ না পেয়ে সে-ও ছুটছে।

২। আমাদের ঘরাণায় প্রাচীন মারুরাগের রূপের সংগে মনে হয় বর্ত্তমানের কোন শিল্পীরই পরিচয় নেই এবং পৃথকভাবেও 'মারু' নাম দিয়ে কাউকে সুরের রূপ প্রকাশ করতে দেখা যায় না।

শুধু মারু বেহাগেরই প্রচার চলছে কিন্তু তার মধ্যে 'মারু' সত্যকারের কোন নামের সুররূপ আছে বলে তার সন্ধান যথার্থভাবে নেই। আমাদের জানিত মারুরাগের মধ্যে অবশ্য তেমন কোন বৈশিষ্ট্যতার উপর নির্মিত রূপ নেই। প্রাচীন পরিচিতির সন্ধান জানার প্রয়োজন বিধায় তার স্বররূপ অঙ্কিত হল। যথা,—স র প,—ধ ণ ধ প ম গ র গ ম,—গ ম প ধ ণ র্স,—ধ র্স ণ ধ প ম, স র প,—গ ম প ধ ণ ধ ণ স, ন র্স ন র্স ন র্স র্র র্স ণ ধ প ম গ র গ ম স র প। এই রাগটির একটি মাত্র খেয়াল আমার ওই রকম সুরে জানা আছে। শুনা যায় আমাদের দেশের মল্ল-রাজাদের কোন এক রাজাকে তাঁর বিশেষ এক উদ্দেশ্যে বহির্গমনের সময় পুরোহিতবংশের এক বৃদ্ধা ওই সুরে মাঙ্গলিক স্তোত্র পাঠ করে রাজার মস্তকে আশীষ দান করে ছিলেন। রাজা সেই যাত্রায় সাফল্য লাভ করায় প্রত্যেক যাত্রাকালীন সানাই বাদকরা রাজনির্দেশে অন্য সুর বাদ দিয়ে ওই সুরই বরাবরের জন্য বাজিয়ে এসেছিল। মল্লভূমের শেষ রাজা রামচন্দ্রের সময়েও এর প্রমাণ পরিচয় পেয়েছিলাম।

সাহানা (৮৬)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। গান্ধার–নিষাদ কোমল। বাদী–সংবাদী—ঋষভ-পঞ্চম। গান্ধার বলীস্বর। শুদ্ধশ্রেণী। মধ্যাকৃতির রাগ। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান।

ঠাট,— স–র–ম–জ্ঞ–ম–প–ণ–ধ–ণ–র্স–র্স–ধ–ণ–প-ম-জ্ঞ–ম-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-প-মজ্ঞ। ম-র-স-ণ্-স-র-প-ম-প-জ্ঞ,-ম-র-স। ম-ম-প-ণ-ধ-ণ-প-ম-প-ধ-মজ্ঞ-ম-র—স।

আলোচনা.— এই রাগের ধ্রুপদ খেয়ালের উপর দৃষ্টি দিয়ে বুঝা যায়—কানড়ার কোমল ধৈবতের পরিবর্ত্তে প্রধান-ধৈবত দিয়েই যেন ওই নাম নিয়ে এই রাগেররূপ রচনা হয়েছে—পরিপূর্ণ শান্ত-স্নিগ্ধ রসের সৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। রাগরূপ রচয়িতার মনে বোধ হয় এই উদ্দেশ্যই এসেছিল যে, বড়রাগের মধ্যে দিয়ে এমন একটি রাগরূপ তৈরী করা আবশ্যক যাতে সুনির্দিষ্ট করে মাঙ্গলিক শুভানুষ্ঠানের উপযোগী হয়ে উৎপন্ন হয়। পরে এর স্বররূপের মধ্যে সেই সত্য সম্ভাবনা আছে এই অনুভব করে ওই সব ক্রিয়ার সর্ব্ব প্রথমে এই সুর ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন খেয়ালের মধ্যে এই রাগে বিবাহ বাসরের বর্ণনা আছে।

এই রাগের উপর প্রধান ধৈবত দিয়ে কানড়ার মত স্বর রচনা করে গেলে সাহানার রূপাঙ্কন সহজ হতে পারবে। দেখেছি অনেকে এই বোধদৃষ্টির অভাব নিয়ে তান-বৈচিত্র্য যখন প্রকাশ করেন তখন বড় বেশী বাহার ঘেঁসা হয়ে পড়ে। উত্তরাঙ্গের ক্রিয়া অতি সতর্ক হয়ে করার আবশ্যক থাকে। আমার মনে হয় উপরদিকে স্বরাঙ্কনের ক্রিয়ার আগ্রহ বেশী না থাকাই ভাল। কারণ, তান উৎপন্নের মেজাজ এসে গেলে রূপকে বিশুদ্ধভাবে সামলে রাখা শক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। আর একটা কথা,— এর চড়ার দিকে খেয়ালের রচনা সুর রাগরূপের স্বভাবধর্ম্মী মোটেই নয়।

দেবশঙ্খ (চলিত কথায় দেবশাখ) (৮৭)

জাতি, ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত। কোমল গান্ধার এবং তুই নিষাদ। বাদী-সংবাদী—পঞ্চম ও ঋষভ। সালঙ্ক শ্রেণী—মল্লার এবং সাহানারাগের মিশ্রণে তৈরি। মধ্যপ্রকৃতির-রাগ। অবরোহণে বক্রগতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-ম-প-ধ-ন-স´-স´-ন-স´-ধ-ণ-প-জ্ঞ-ম-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-ম·প-ধ-ণ-প-ধ-স´। প-ম-প-ধ-প-ম-র-প । জ্ঞ-ম-র-ণ-প-র-মজ্ঞ-ম-র-স। ধ-স´-র´-ন-স´-ধ-প-জ্ঞ-ম-র-স ॥

আলোচনা,—এই রাগটি প্রচলিত রাগের পর্য্যায়গত নয়। আমাদের ঘরাণার প্রাচীন গৌড়রাগের সুরের সংগে অনেকখানি সম্পর্ক আছে ॥

সেনীমল্লার (মিঁয়ামল্লার) (৮৮)

জাতি সম্পূর্ণ। বক্রগতি। কোমল গান্ধার ও তুই নিষাদ। পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান। বাদী-সংবাদী—ঋষভ ও পঞ্চম। বড়প্রকৃতির রাগ। সালঙ্ক শ্রেণী,—কানড়া ও মল্লারের সংমিশ্রণে রচিত।

ঠাট,—স-র-ম-জ্ঞ-ম-প-ণ-ধ-ন-স´-স´-ন-স´-ধ-ণ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-স-ন্-স-ম-প-ণ্-ধ্-ণ্-স। ম-প-ধ-স´-ন-স´-ধ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স। জ্ঞ-ম-র-স-ন্-ণ্-প্-ণ্-ধ্-ন্-স ॥

আলোচনা,—এই রাগটি তানসেন রচনা করে তাঁর 'সেনী' এই শ্রেষ্ঠ উপাধির নামটি সংযোগ করে 'সেনীমল্লার' নাম দিয়েছিলেন। তাঁর আরো তু' একটি রচিত যে রাগ আছে তার মধ্যে এই রাগটিই শ্রেষ্ঠ। তু' তিনটি ছাড়া তাঁর রচিত রাগ আর নেই। কারণ প্রকৃতসাধকরা জানেন বড় বড় রাগ যে কয়েকটি আছে তাদের নিয়েই সাধনায় প্রকৃত আনন্দ আসে। আমার বিচার দৃষ্টিতে এই রাগকে দ্বিতীয় নাম মিঁয়ামল্লার না বলে—সেনীমল্লার বলাই যুক্তিযুক্ত। এই রাগের স্বরগতি বিশেষভাবে কানড়ার মত নিয়ম ধরেই চলে। এই রাগে তুই নিষাদের পরস্পর সংযোগ নূতনত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন নিয়ে আছে। এর সুরের নীতিধারা সমস্ত ঘরাণায় একইভাবে চলে আসছে ॥

বাহার (৮৯)

জাতি মিশ্র সম্পূর্ণ। বক্রগতি। কোমল গান্ধার এবং তুই নিষাদ। বাদী-সংবাদী—মধ্যম ও ষড়জ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধশ্রেণী। বড় প্রকৃতিররাগ।

ঠাট—স-ম-প-জ্ঞ-ম-ণ-ধ-ন-র্স-র্স-ণ-ধ-ণ-প-ম-জ্ঞ-ম-র-স ।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ণ-প-ম । ধ-ণ-র্স-ণ-প-ম । ম-ম-ধ-ণ-ধ-ন-র্স ।

আলোচনা.—রাগরূপের নীতি-বিজ্ঞান অনুসারে যেভাবে স্বর সংযোজনার উপর ঠাট নির্মিত হয়ে আছে তার দ্বারাই এই রাগের রূপ পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাবে। রাগরূপের উপর অবরোহণে র্স ণ ধ ণ প, এই স্বরগুলির মধ্যে ধৈবতকে যদি কোমল করা হয় তাহলে কানড়ার রূপ পাওয়া যাবে। তাছাড়া জ্ঞ ম র স, এই স্বরগুলিও কানড়ারূপের অন্তর্গত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কানড়ারাগের সম্পর্ক ধরেই বাহাররাগের সৃষ্টির মূলসূত্র এসেছে এবং এই জন্যই অষ্টাদশ কানড়ার মধ্যে এই রাগকে ধার্য্য করা আছে।

পিলু (৯০)

জাতি, ষাড়ব-সম্পুর্ণ। আরোহণে ~~ঋষভ~~ ধৈবত বর্জ্জিত। কোমল-গান্ধারও ধৈবত। বাদী-সংবাদী—ঋষভ ও পঞ্চম। নিষাদ বালীস্বর। মধ্যাকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী। সরলগতি। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-র-জ্ঞ-ম-প-ন-র্স, র্স-ন-দ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—র-ন্-স-র-জ্ঞ-র। প-ম-জ্ঞ-র-স-ন্। প্-ন্-স-ন্-দ্-প্-ম্-প্-ন্-স-র-ম-জ্ঞ-র-স। র-র-ম-ম-প,-দ-প-ম-প-ন-র্স। ন-দ-প-ম-জ্ঞ-র-ন্-স-জ্ঞ-র-স।

আলোচনা,—কারো কারো ধারণা এই রাগের আরোহণে ধৈবত ব্যবহার হয়। আমি এই রাগটিকে গভীর-ভাবে চর্চা করে এসে এবং বহু গানের ও গৎএর মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত রূপের পরিচয় সম্বন্ধ যেভাবে পেয়েছি তাতে আরোহণে ধৈবত ব্যবহার সম্পুর্ণ রাগরূপে বিরোধী। যে নিয়মের উপর আমাদের ঘরাণায় এবং প্রাচীন পরিচয়ের মধ্যে পিলুরাগের রূপ প্রচারিত হয়ে এসেছে তাতে তার মধ্যে পৃথকত্ব নিয়ে নিজস্ব মূর্ত্তির সুন্দর বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। জানি না কেন অনেক প্রকাশকের মধ্যে খাঁটি পিলুর রূপ দেখতে পাওয়া যায় না। এই রাগটির স্বররূপ অতিশয় আবেক-মধুর বলে প্রকাশকালীন এক অপূর্ব ভাবাবেশ এসে মনকে মুগ্ধ করে দেয়। পিলু এবং বারওঁা রাগের জন্য সময় নির্দ্ধারণ প্রয়োজন বুঝে পরিবর্ত্তন হতে পারে। কারণ এই ধরণের রাগ ঠিক প্রভাবের উপর সময়ের সংগে অধিকারের যোগ্যতা তেমন নেই। তবে অন্যস্থান অপেক্ষা নির্ব্বাচিত স্থানই যোগ্য বলে মনে হল।

বাহারওয়া—(চলিতকথায় বারওঁা) (৯১)

জাতি, ষাড়ব-সম্পুর্ণ—আরোহণে ঋষভ বর্জিত। সালঙ্কশ্রেণী। এই রাগ খাম্বাজ ও সিন্ধুর মিশ্রণে রচিত। দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহার। ক্ষুদ্রাকৃতির রাগ। মিশ্রগতি।

ঠাট,—স-গ-ম-প-ধ-ণ-র্স-ন-র্স-ণ-ধ-প-ম-জ্ঞ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন্-স-গ-প-জ্ঞ, র-স-ন্-স-ম-জ্ঞ-র-স। প্-ন্-স-গ-ম-প-ণ-প-জ্ঞ-র-স-র-ন্-স। গ-ম-প-ধ-প-গ-ম-প-ম-গ-জ্ঞ-র-সন্-প্-ন্-স-ম-জ্ঞ-র-স। প-ধ-ণ-র্স-ণ-ধ-প-ম-গ-ম-প-জ্ঞ-র-স-ন্-স।

আলোচনা,—এই রাগটি উক্ত রাগের মিশ্রণে তৈরি হলেও রাগরূপের উপর স্বরের ব্যবহারিক নিয়মানুযায়ী রচনা কৌশলের জন্য নিজস্ব একটি ভাবমূর্ত্তি থেকে গেছে। তবে রূপ রচনার ক্ষেত্র বিশেষ-বিস্তারিত নয়। এই রাগের ধ্রুপদ অত্যন্ত কম। প্রাচীন খেয়াল একটি মাত্রই জানা আছে। রাগরূপে করুণ আবেগভাবই অত্যন্ত বেশী বলে হাল্‌কা শ্রেণীর গানেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

এক ঘরাণা প্রবীণ মুসলমানশিল্পীর মুখে সম্প্রতি বারঙারাগের খেয়াল শুনে দেখলাম তাতে আমাদের প্রাচীন পরিচিত সুরের সংগে একেবারেই সংশ্রব হীন। সেই সুরের রূপ ছিল সিন্ধুরাগের মত। আমাদের জানিত বারঙার সংগে পিলুর সুর বেশ মিশে যায় বলে পিলু-বারঙা এই যুক্ত নামের প্রকাশ-পরিচয় বহুকাল ধরে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে চলে আসছে। সিন্ধুর মত সুরে বারঙা নাম দিয়ে এই সুর এই প্রথম শুনলাম। আমার মনে হয় শাস্ত্রীয় সিন্ধুর রূপই তাঁদের ঘরাণায় বারঙা নামে এসে গেছে। মতান্তর থাকতে পারে। ধ্রুপদী এক রাগকে আর এক ভিন্ন নামে ব্যবহার ওই রকম ছাড়া হয় না।

মালকৌশ (৯২)

জাতি ঔড়ব,—ঋষভ-পঞ্চম বর্জ্জিত। গান্ধার-বৈধত-নিষাদ কোমল। বাদী-সংবাদী—মধ্যম ও ষড়জ। বড়প্রকৃতির রাগ। সরল গতি। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-জ্ঞ-ম-দ-ণ-র্স-র্স-ণ-দ-ম-জ্ঞ-স॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-জ্ঞ-ম। ম-জ্ঞ-ম-জ্ঞ-স। ম-জ্ঞ-ম-ণ-দ-ম-জ্ঞ-ম-স-ম-জ্ঞ-স॥

আলোচনা,—বহুকাল ধরে এই রাগ একই নীতিধারায় এত পরিচিত যে প্রচলিত রীতি নিয়ে আর বিশেষ কোন আলোচনার বস্তু নেই। তবে এর সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় নিয়ে পরিচয়ের যে সন্ধানটুকু এসেছে তার দ্বারা বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য চিন্তাধারার মাধ্যমে সেই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত মনে ধরা দিয়েছে তা জানাই। শাস্ত্রীয় 'মালবকৌশিক' নামে রাগটিই মালকৌশ নামে এসে গেছে—এই কথাই শুনা যায় কিন্তু এক শাস্ত্রীয়গ্রন্থে এর স্বররূপ যেভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে তা প্রচলিত স্বররূপ হতে সম্পুর্ণ পৃথক। তাতে দেখা যায় সাতটি প্রধান স্বর নিয়ে গঠিত। এই গঠিত রূপের অনেকখানি সন্ধান আমার পিতামহের কাছে পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন— বহু পুরাকালে উক্ত রাগের স্বর রচনা এইরূপ ছিল, যথা,—স-ম-গ-র-স,-গ-ম-ধ-প,-ম-ধ-ন-র্স,-র্স-ন-ধ-ম-প-গ-ম,-গ-স-র-স। এই রকমভাবে স্বরাঙ্কনের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বরগ্রাম রচনার এই ভিত্তি ধরে আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস আসে যে, এরই রূপের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে কোন সুরসাধক মনের ভাবাকর্ষণে ঋষভ-পঞ্চমকে

ত্যাগ করে স গ ম ধ ন র্স—এই স্বরগুলি নিয়ে মালবকৌশিক রূপের পরিবর্তন আনেন। প্রথম অবস্থার স্বরসংযোজনার উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই মনে হবে ঋষভ-পঞ্চমের তেমন গুরুত্ব নেই,—সহজেই লঙ্ঘন করা যায়। তারপর ক্রমশঃ মনঃপুতর আকাঙ্ক্ষা ধরে স্বভাবের আকর্ষণে পূর্ব্বোক্ত স্বরের উপর গান্ধার-নিষাদ কোমলে এসে গিয়ে কৌশিকী নাম ধারণ করে। ক্রমে ক্রমে ঋষভ-পঞ্চম বর্জ্জিত উক্ত পাঁচ সুরের উপর ধৈবতও কোমলরূপে যুক্ত হয়ে প্রাকৃতভাষায় মালকৌশ নামে পরিণত হয়। মুলকে ধরে কৌশিক আসায় এবং দু'টির আদি কথা ধরে মুলকৌশ প্রথমে হয়ে পরে মালকৌশ হয়ে পড়ায় আশ্চর্য্য কিছু নেই।

ওই আদি প্রধান সুর থেকেই প্রয়োজনের মধ্যে দিয়ে কোমল স্বর না দিয়ে দুটি স্বর ত্যাগ করে এবং কড়িমধ্যম যুক্ত করে হিণ্ডোল রাগের সৃষ্টি হয়। ওরই মধ্যে দিয়ে তারপর কোমল ঋষভের সংযোগে এবং স্বরের বিভিন্ন ক্রিয়া ধরেই দীপক, বসন্ত, সোহিনী, পরজ ইত্যাদি রাগের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এই ভাবেই কয়েকটি প্রকৃতিগত হয়ে স্বভাবজাত সুর থেকেই যে বহুরাগের সৃষ্টির সহায়তা করেছে তাতে আমার অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতে মনে সংশয় আনে না। অনেকের বিশ্বাস পারস্যদেশ থেকে অনেক সুর এসে শাস্ত্রীয়সংগীতের রাগে মিশে গিয়ে মালকৌশ ইত্যাদি রাগের সৃষ্টি করেছে এবং বহু রাগকে পরিবর্ত্তিত করে বর্দ্ধিত আকারে মাধুর্য্যমণ্ডিত করেছে। তাঁদের এই বিশ্বাসের অপ্রত্যক্ষ ও অপ্রমাণিত কথার উপর আমার কাছে কোন গুরুত্ব নেই। পারস্যদেশের সুরের চেহারা যদি স্বরলিপিতে আঁকা থাকত কিংবা সেখানের কোন সুরের সংগে আমাদের কোন্ কোন্ রাগ মিশেছে তার যথাযথ বর্ণনা থাকত তাহলে তার প্রমাণের গুরুত্ব উপলব্ধি হত। আমাদের দেশের সঙ্গীত সাধকদের শক্তি সামর্থ্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এবং শ্রদ্ধারেখে বলব—রাগের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপ যা কিছুই হোক না কেন তাঁদের দ্বারাই হয়েছিল। রাগরূপের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করলেই এই সব বিষয়ের সত্য সমাধান সহজ হয়ে যায়। এখনকার মালকৌশের রূপ এমন স্বয়ং সম্পুর্ণতা নিয়ে আছে যে, তার রূপ বৈদেশিক সুরের রূপাংশ নিয়ে তৈরি একথা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মোটেই নয়। ভারতের সৃষ্টি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রাচীনত্বের দিকে তাকিয়ে এ কথাই বরং বলা যাবে বহুশত বৎসর পূর্বে থেকে এখানের বহু সম্পদ নিয়ে গিয়ে অন্য দেশ লাভবান হয়েছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থে বহু প্রমাণ দিয়ে এ সব কথা যা লেখা আছে—তা তৃতীয় অধ্যায়ে জানা যাবে। আমরা কথায় কথায় অহেতুক কেবল নিজের দেশ ছেড়ে বাইরের উপর মনধাবিত ক'রে মনের তৃপ্তি খুঁজতে থাকি। আমার বিচার-বুদ্ধি এই কথাই বলে,—আমাদের দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ এবং যে কোন বস্তুর সৃষ্টি সন্ধান পাবার মত অভাব কিছু নেই—যদি আমরা সত্যকারের আকাঙ্ক্ষাও আত্মগত হয়ে খুঁজি।

দীপক (৯৩)

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব,—আরোহণে ঋষভ-পঞ্চম এবং অবরোহণে পঞ্চম বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী,—

মধ্যম ও ষড়জ। কোমল ঋষভ। বড় প্রকৃতির রাগ। ধৈবত বলীস্বর। সরলগতি। উত্তরাঙ্গ-প্রধান। তিন স্বরে পরিচয়-যথা—ম-ধ-ম।

ঠাট,—স-গ-ম-ন-র্স-র্স-ন-ধ-ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ—স-গ-ম-ধ। ম-গ,-গ-ঋ-স। ন্-ধ্-স-গ-ম-ধ-ন-ধ,-ধ-ন-ধ-ম। ম-গ-ঋ-স। ম-ধ-র্স-ন-র্ঋ-র্স। ন-ধ-ম-গ-ঋ-স।

আলোচনা,—দীপক রাগের রূপের উপর বক্রভাবে ম প গ এইভাবে পঞ্চম স্বর ব্যবহার রেখে পঞ্চম নামে এক রাগের পরিচয় আছে। দীপক থেকে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই বলে এর পরিচয় আর দেবার আবশ্যক মনে হ'ল না। কেউ কেউ দীপককেই পঞ্চম নামের খ্যাত করেন। তানসেনের দীপক ও মল্লার রাগ গাওয়া সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচারিত হয়ে আছে তার যথাসঙ্গত অর্থ এইভাবে হবে,—অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী তানসেন যখন প্রথম দীপক রাগ গেয়েছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারে তখন সভাস্থ সকলের মনে হয়েছিল যেন রাগরূপ থেকে তাপজ্যোতি নির্গত হচ্ছে। পরক্ষণে মল্লার রাগ গাইতে থাকাকালীন সকলের মনে এসে গেছল যেন আকাশ থেকে বারিবর্ষণ হচ্ছে। মনের এই অবস্থা গাওয়ার গুণে আসা বিচিত্র নয়। মনের এই ভাবধারা আসা শ্রোতাদের উপযুক্ত গ্রহণ শক্তির উপরও নির্ভর করে। অবশ্য গায়ককে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ও সাধনার শক্তিতে বহু উচ্চে উঠতে হবে। প্রকৃত নিয়মে থেকে প্রকৃতভাবে সংগীতকে ধরে যদি সাধনার মাধ্যমে আসা যায় তাহলে অনেক কিছু অলৌকিক শক্তি যে লাভ হবে না এ কথা বলা যায় না।

বেহাগ (৯৪)

জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে ঋষভ-ধৈবত বর্জিত। ব্যবহার দুই মধ্যম। বাদী-সংবাদী,-গান্ধার ও নিষাদ। বড় প্রকৃতির রাগ। সরলগতি। পূর্বাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-গ-ম-প-ন-র্স-র্স-ন-ধ-প-হ্ম-ম-গ-র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—তিন স্বরে—স-ম-গ। স-গ-প-হ্ম-গ-ম-গ। স-ম-গ-র-স। স-ন্-স-গ-প-ম-গ। গ-ম-ন-প-হ্ম-গ-ম-গ,—প-হ্ম-ম-গ-র-স।

আলোচনা,—রাগ রূপের উপর তার স্বরগুলির প্রয়োগ অধিকার আরোহণ-অবরোহণের উপর যেভাবে দেওয়া থাকে সেইভাবেই ঠাট নির্মিত হতে হবে। এইজন্য কড়ি মধ্যমটি অধিকাংশ সময় বক্রভাবেই ব্যবহার হলেও পর পর দুইরূপ যুক্ত হয়ে নেমে আসতে পারে বলে ঠাটেও ওইভাবে স্থান থাকবেই। তানসেন প্রভৃতি বহু ধ্রুপদ গায়কদের রচিত গানেও পর পর দুই মধ্যমের ব্যবহার আছে। এই রাগে কড়িমধ্যমের পর সোজা গান্ধার দিয়ে নেমে আসা এবং গ-হ্ম-প করে উপর দিকে উঠা চলে না। তাহলে রাগের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে পড়বে।

শঙ্করা (৯৫)

জাতি—ষাড়ব—মধ্যম বর্জ্জিত। বাদী-সংবাদী,—নিষাদ ও গান্ধার। মিশ্রগতি—আরোহণের উত্তরাঙ্গে বক্র। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। উত্তরাঙ্গ প্রধান।

ঠাট,—স-গ-প-ন-ধ-র্স-র্স-ন-ধ-প-গ-র-স ॥

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন-র্স-ন। ন-ধ-র্স-ন। প-ন-ধ-র্স-ন। প-গ-প-গ-র-স ॥

আলোচনা,—উত্তরাঙ্গে সময় সময় প ন র্স এবং পূর্ব্বাঙ্গে গ প গ, এইভাবেও হয়। প হ্ম ধ প গ, এই রকমভাবে কড়িমধ্যমের ব্যবহার প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালসমূহে ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ঐ ব্যবহার ক্ষণস্থায়ী ও সল্পপরিমাণে আছে। এখন কড়িমধ্যমের ব্যবহার আর দেখা যায় না। তবে ওই রকমভাবে ব্যবহার থাকলে ভালই হত বলে মনে করি। বর্জন করে দেওয়ায় প্রাচীন নীতি-ধারার পরিচয়ে বরং ক্ষতিই করেছে। বিবাদী স্বরের মত ওই স্বর থাকা অযৌক্তিক ছিল না। এই রাগে বেহাগের সুরের প্রভাব বেশী থাকার সংগে স্বরসংযোজনার উপর ভূপালীর প্রভাব কিছু থাকায় সালঙ্ক শ্রেণী রূপে গণ্য করতে হল।

নারায়ণী (৯৬)

জাতি ষাড়ব,— ধৈবত বর্জ্জিত। তিলককামোদের আরোহণ এবং বেহাগের অবরোহণের স্বর নিয়ে এর রূপ রচিত। সময় সময় বিবাদীরূপে বক্রভাবে উত্তরাঙ্গে ধৈবত ও কোমল নিষাদের ব্যবহার আছে, তবে রাগের পরিচিত প্রমাণ রূপের দ্বারা ঠাট গঠনে উক্ত দুই স্বর ব্যবহার হবে না।

ঠাট,—স-র-গ-ম-প-ন-র্স-র্স-ন-প-ম-গ-র-স ॥

র্স-ণ-ধ-প,— এই রকমভাবে ধ্রুপদে ব্যবহার আছে; এই স্বরের পর ধ-ম-গ-, করে নেমে আসে।

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-র-প-ম-গ-স-ন্-প্-ন্-স-গ-র-স। গ-ম-প-ন-র্স। ন-প-ম-গ-র-গ-র-স-ন্ ॥

আলোচনা,—প্রাচীন ধ্রুপদ-খেয়ালের মধ্যে দিয়ে এই রাগটির রূপপরিচয়াদি দেওয়া হল। আমাদের দেশে ওই নামের সুরে বহুকাল পূর্বে সংস্কৃতে শ্রীদুর্গার স্তুতি পাঠের একটি স্তোত্রে যে সুর দেওয়া আছে তা উক্ত লিখিত সুরের পরিচয় হতে অনেকখানি পৃথক। এর সুর এই রকম—যথা,—গ প, ধ ন, র্স ন প ণ ধ প ম, গ র গ স, স ন্ প্ ন্ স র, র গ র স ন্ র স। প গ প ধ ন প প ধ র্র র্স। গ প ধ ণ ধ প ম গ প স প ম গ র স ইত্যাদি।

শঙ্করাভরণ (৯৭)

জাতি ঔড়ব-ষাড়ব,—আরোহণে ঋষভ—ধৈবত এবং অবরোহণে ধৈবত-বর্জ্জিত। সরল গতি। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। পূর্ব্বাঙ্গ-প্রধান। শুদ্ধশ্রেণী। বাদী-সংবাদী—গান্ধার ও নিষাদ।

ঠাট,— স-গ-ম-প-ন-স´-স´-ন-প-ম-গ র-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,— স-গ-র-গ-র-স-ন্-প্-স-স-ন্-র-স। গ-প-ম-গ-র-গ-স-র-ন্-স। কোন কোন সময় মীড়যুক্ত হয়ে ধৈবত স্বরের ব্যবহার অ'ছে ধ্রুপদের মধ্যে।

আলোচনা,—প্রাচীন গানের মধ্যে স্বর সংযোজনা যেভাবে আছে তার উপর ঠাট নির্মাণের দায়িত্ব রেখে গড়া হল। 'শঙ্করাকরণ' নামে একটি ক্ষুদ্র রাগ আছে। তার সুরের রূপ খুবই করুণকাতরময়। সুরের স্বরসংযোজনায় পাওয়া যায় বেহাগ এবং প্রাচীন মারুরাগের সুর বক্রভাবে মেশানর মধ্যে দিয়ে। এই সুর এই রকম যথা,—স´-স´-ন-ধ-প-প-ম-প-ম-গ,—র-গ-ম-প-ম, গ—র-গ-প-গ—র-স-ন্—প্-ন্-স-র,-র,-গ-র-স-র,—গ-ম-প-ন-ধ-ন-স´, স´-ন-র´-স´-ন-ধ-ন-স´-ন,- স´— ন-ধ-প-প-ধ-প-ম-ম-গ-র-গ-ম-প. ইত্যাদি।

বিহঙ্গড়া (৯৮)

জাতি ষাড়ব,—ষাড়ব-সম্পূর্ণ,—আরোহণে ঋষভ বর্জ্জিত। উত্তরাঙ্গের স্বর বক্র হয়ে উঠে ও নামে। দুই নিষাদ ব্যবহার। বাদী-সংবাদী—গান্ধার ও নিষাদ। ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ, অর্থাৎ স্বাধীন সত্তা নিয়ে এর রূপের তেমন বিস্তৃতি নেই। সালঙ্কশ্রেণী, বেহাগের সংগে খাম্বাজের কোমল নিষাদের স্থানের স্বররূপ কিছু মিশ্রিত হয়ে এর রূপ সৃষ্টি হয়েছে।

ঠাট,— স—গ—ম—প—ধ—ণ—প—ন—স´—স´—ন—প-ণ-ধ-প—ম-গ—র—স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-ম-প-ন-স´-প-ধ-ণ-প-ধ-প-ম-গ-র-স।

আলোচনা,—এই রাগের ধ্রুপদ সংখ্যা অতি কম। বেহাগ থেকে সৃষ্টরাগগুলির মধ্যে-'শঙ্করা'ই শ্রেষ্ঠ। একটা কথা,—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় থেকে—রাত্রি ক্রমশঃ আরো গভীররূপ ধারণ করে, সুতরাং সেই সময় অর্থাৎ বেহাগ প্রভৃতি কিংবা বেহাগের পর কোমলযুক্ত সুরের প্রভাব কি করে সময়ের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তা বুঝা যায় না। আমার বিচারে মাত্র কোমল নিষাদ প্রভাবান্বিত রাগেও করুণ-উদাস ভাবরসের প্রকাশ খুব কম থাকে। এজন্য যথাসঙ্গত নিয়মে বেহাগের পর যে কয়টি রাগ ধার্য্য করা অ'ছে তার কোনটিতেই ওই স্বর বাবহার নেই এবং থাকা সঙ্গতও নয়। কোমল নিষাদযুক্ত রাগগুলি এজন্য উপযুক্ততার বিচারে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পূর্বেই ধার্য্য হয়ে আছে। বেহাগের পর বিহঙ্গড়ায় যখন ওই কোমল স্বর উত্থিত হয় তখন মনে হয় সময়ের সংগে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। নারায়ণী এবং ওই রাগে বেহাগের সুর আছে বলেই—বেহ'গের পর ধার্য্য করতে বাধ্য হতে হল॥

হিন্দোল বা হিণ্ডোল (৯৯)

জাতি ঔড়ব,—ঋষভ, পঞ্চম বর্জিত। বাদী-সংবাদী—গান্ধার ও ধৈবত। বড় প্রকৃতির রাগ। সরলগতি। শুদ্ধঃশ্রেণী। উত্তরাঙ্গ প্রধান। তারার ষড়জ বলীস্বর। কড়িমধ্যম।

ঠাট,—স-গ—হ্ম-ধ-ন-র্স-র্স-ন-ধ-হ্ম-গ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—হ্ম-গ-স। ন্-ধ্-ন্-স-গ। গ-হ্ম-ধ-ন-র্স-র্গ-র্স। ধ-র্স-ন-ধ-ন-ধ-হ্ম-গ-স-হ্ম গ-স।

আলোচনা,—কেউ কেউ এই রাগের আরোহণে নিষাদ ব্যবহার করতে চান না। তাঁরা বোধ হয় চিন্তা করে দেখেন নি—যে, চার স্বরের দ্বারা রাগের আরোহণের রূপ জাতিত্বের নিয়ম—নীতিতে অঙ্কিত হতে পারে না। প্রকৃত নিয়ম—নীতি ধরেই বহু প্রাচীন গায়কদের বহু ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে আরোহণে নিষাদ স্বর যুক্ত হয়ে আছে। অবশ্য নিষাদ স্বর ক্ষণস্থায়ী রূপেই ব্যবহার হবে। বেহাগের পরে হিণ্ডোল প্রভৃতি রাগগুলি কেন ব্যবহারের জন্য স্থান ধার্য্য করা হল সে কথা আগেই জানিয়েছি।

বেহাগ এবং তার সমগোত্রীয় রাগগুলির ব্যবহার প্রকৃতির সংগে সংযোগের প্রয়োজনীয়তায় অনেকখানি সময় নিয়ে থাকে। তারপর আসে ওই পরের রাগগুলির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। কেন প্রয়োজনীয়তার আবশ্যক হল সে কথাও জানিয়েছি॥

বসন্ত (১০০)

জাতি, ঔড়ব-ষাড়ব,—আরোহণে ঋষভ-পঞ্চম এবং অবরোহণে পঞ্চম বর্জিত। কোমল ঋষভ এবং দুই মধ্যম। বাদী-সংবাদী,—মধ্যম ও ষড়জ। উত্তরাঙ্গ প্রধান। গান্ধার বলীস্বর। মিশ্র-সম্পূর্ণ জাতি। বড় প্রকৃতির রাগ। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,—স-গ-ম-ধ-হ্ম-ধ-ন-র্স-র্স-ন-ধ-ম-গ-হ্ম-গ-ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—স-গ-ম-গ-ঋ-স-গ-ম। ম-ধ-হ্ম-ধ-ন-র্স। ন-ধ-ম-গ-হ্ম-গ, ম,-গ-ঋ-স।

আলোচনা,—ওই নাম নিয়ে এই রাগটির রূপ যেভাবে এখন প্রচারিত হচ্ছে তাতে মনে হয় বসন্ত রাগের প্রকৃতরূপের সংগে কারোরই পরিচয় নেই কিংবা তার ধ্রুপদ-খেয়াল জানা নেই। তাছাড়া হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবেই পরজ রাগের পনর আনা অংশ এবং উক্ত রাগের এক আনা অংশ মিশিয়ে বসন্ত নামে পরিচিত করা হচ্ছে। এই ধরণের অবৈজ্ঞানীকরূপে গঠিত রূপকে বসন্ত নামে কি করে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়—তা যদি রাগরূপ গঠনের নীতি-নিয়ম বিষয়ের এবং প্রাচীনের সংগে সম্বন্ধ রাখার অধিকারী-ব্যক্তি বিচার করে দেখেন তাহলে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন নিতান্ত অসতর্কতার দ্বারা এই কাণ্ড হয়েছে। কেননা পরজ ও বসন্তকে নিয়ে তৈরী করা ওর রূপের উপর বাদীস্বর ধার্য্য হবার উপায়

নেই। কারণ পঞ্চমকে বাদী বলতে যাওয়া চলে না। যেভাবে এর সুর উপর দিকে উঠে তাতে পঞ্চম থাকে না। তাছাড়া পঞ্চম যখন ব্যবহার হয় তখন বাদীর প্রতিষ্ঠাগত প্রভাব ও শক্তির প্রমাণ থাকে না। সুতরাং তাহলে বাদী কোন্ স্বর হবে। গান্ধার-নিষাদ নিশ্চয়ই হবে না,— প্রাথমিক নিয়ম অনুসারে মধ্যম স্বর আরোহণ-অবরোহণে স্থান পায় না,—তারপরে পৃথকভাবে তাকে উপস্থিত করা হয়। নীতি-বিজ্ঞানের এত ত্রুটি যেখানে-সেখানে রাগ বসন্ত নাম না দিয়ে পরজ-বসন্ত বলাই বিচার-বুদ্ধি সম্মত। তাতে গান্ধার-নিষাদকে বাদী-সংবাদী এবং তারার ষড়জকে বলীস্বর বলা সঙ্গত কারণ ধরেই চলবে। এটুকু আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যখন ওই পরজ-বসন্ত-যুক্ত বসন্তের পরিচয় জ্ঞাপনে আদি বসন্তের মধ্যমকে গ্রহণ না করলে ওর পরিচয় সম্ভব হয় না, তখন প্রধান বসন্তকে জ্ঞানগত কর্ত্তব্যে স্বীকার ও প্রকাশের ইচ্ছা রেখে-শেষোক্তটিকে 'পরজ-বসন্ত' বলার আপত্তি কোথায়? আগ্রহের সহিত চর্চা করে গেলে তখন বুঝা যাবে প্রকৃত বসন্তের রূপ সত্যই কত অপূর্ব্ব।

সোহিণী (১০১)

জাতি-ঔড়ব-ষাড়ব,—আরোহণে ঋষভ-পঞ্চম এবং অবরোহণে পঞ্চম বর্জ্জিত। কোমল ঋষভ। বাদী-সংবাদী,—তারার ষড়জ এবং মুদারার মধ্যম। মধ্যপ্রকৃতির রাগ। সরলগতি। উত্তরাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধশ্রেণী।

ঠাট,— স-গ-ম-ধ-ন-স́-স́-ন-ধ-ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,— গ-ম-ধ-ন-স́-ঋ́-স́। ন-ধ-ন-ধ-ম-গ-ম-ধ-ধ-ন-ঋ́-স́।

আলোচনা,—এই রাগের রূপপরিচয় প্রাচীন ধ্রুপদের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তাতে প্রধান মাধ্যমেরই ব্যবহার আছে,—এখনকার মত কড়িমধ্যম কোনখানেই ছিল না। রাগরূপের বিজ্ঞানকে ধরে বাদী নির্ণয়ের জন্য স্বভাবতই আসবে রাগের স্বভাবগত রূপের উপর প্রধান মধ্যম সংবাদী এবং তারার ষড়জ-বাদী রূপে। সুতরাং কড়িমধ্যম কেন ব্যবহার হতে পারে না তা সহজেই বুঝা যায়।

প্রধান মধ্যমযুক্ত সোহিণীর স্বররূপ কড়িমধ্যম যুক্ত অপেক্ষা অনেকবেশী শান্তরস ও আবেগ পূর্ণ। এর এই সুরের রূপকে বসন্ত অপেক্ষা সহজ নীতি-নিয়মের উপর তৈরি বলে ওর রূপসৃষ্টি বসন্তরাগের আগে বলে বুঝতে দেরি হয় না এবং এর সুরের রূপপ্রভাবে আদি সৃষ্টিরও সন্ধান মিলে। বসন্তের প্রভাব পরিচয় যথেষ্ট এবং বসন্তঋতুর শ্রেষ্ঠ ও সঙ্গত পরিচয়ের রাগ বলে এবং সময়ের প্রভাব রক্ষায় বিশেষ উপযুক্ত বলে সোহিণীর অগ্রে তার স্থান দেওয়াই বিচারে উপযুক্ত হল।

পরজ (১০২)

জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ। আরোহণে-ঋষভ-পঞ্চম বর্জ্জিত। কোমল ঋষভ-ধৈবত এবং কড়িমধ্যম।

বাদী-সংবাদী—নিষাদ ও গান্ধার। সরল গতি। শুদ্ধশ্রেণী। উত্তরাঙ্গ-প্রধান। তিনস্বরে— হ্মা-দ.ন।

ঠাট,—স-গ-হ্মা-দ-ন-স´-স´-ন-দ-প-হ্মা-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—গ-হ্মা-দ-ন,-ঋ´-স´-ন-দ-প-হ্মা-গ-হ্মা-দ-ন-স´-দ-ন। স´-গ´-ঋ´-স´-ন-দ-প-দ-ন-স´-হ্মা-দ-ন। দ-প-হ্মা-গ-হ্মা-গ-ঋ-স।

আলোচনা,—এই রাগটির রূপাকৃতি যেরূপ তাতে মনে হবে কলিঙ্গড়ার রূপের মধ্যে কড়িমধ্যম যুক্ত করে এর রূপ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ওই একটি স্বরের প্রভাবেই তাকে যথেষ্ঠ পৃথকত্বে রেখেছে।

ললিত (১০৩)

জাতি ষাড়ব,—পঞ্চম বর্জ্জিত। কোমল ঋষভ-ধৈবত এবং তুই মধ্যম। বাদী-সংবাদী--মধ্যম ও ষড়জ। সরলগতি। পূর্বাঙ্গ প্রধান। শুদ্ধ শ্রেণী। বড়প্রকৃতির রাগ।

ঠাট,—স-ঋ-গ-ম-হ্মা-দ-ন-স´-স´-ন-দ-হ্মা-ম-গ-ঋ-স।

প্রধান রূপাঙ্গ,—ন্-ঋ-হ্মা-ম। গ-হ্মা-দ-ন-দ-হ্মা-ম। গ-ম-ঋ-গ-হ্মা-ম-গ-ঋ-স ॥

আলোচনা,—এই সার্বজনীন পরিচিত রাগের বিষয়ে আলোচনার বিশেষ কিছু নেই। তবে কোন কোন ব্যক্তির কাছে শুনা যায় ধৈবতকে-কোমলের পরিবর্ত্তে প্রধান দিয়ে একমতে প্রচার আছে। এ কেবল শুনা কথাই হয়ে আছে—আমি আজ পর্য্যন্ত কোন সংগীতশিল্পীর কাছে প্রধান ধৈবত ব্যবহার করতে শুনিনি এবং বিচারগতভাবে প্রধান ধৈবত ব্যবহার হতেই পারে না, ওই স্বরসংযোজনায় সে অধিকার একমাত্র বসন্ত রাগের রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে ॥

——:(*):——

তৃতীয় অধ্যায়

গীত ও প্রবন্ধের বিষয়—

“মনুষ্যাদি নেত্রাদি অঙ্গের ন্যায় স্বর, বিরুদ (গুণ), পদ (কথা), তেনক (মঙ্গল বাচক শব্দ), পাঠ (শব্দের যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশ), এবং তাল এই ছটি অঙ্গ থাকে। গীত সমুদায় পাঁচ জাতীয় হয়, যথা,—উক্ত ষড়াঙ্গ বিশিষ্ট ভেদেনী, পাঁচ অঙ্গ যুক্ত নন্দিনী, চতুরঙ্গ যুক্ত দীপনী, তিন অঙ্গ বিশিষ্ট পাবনী, এবং তুই অঙ্গ বিশিষ্ট তারাবলী। যে সকল গীত ছন্দ এবং তালাদির নিয়মের অধীন তাদের নিযুক্ত এবং ছন্দ ও তালাদিবিহীন গীতকে অনিযুক্ত বলে থাকে। গীতের প্রথম অক্ষর ন, হ এবং ম, হওয়া উচিত নয়। প্রবন্ধ বহুবিধ হয়ে থাকে, তারমধ্যে কতকগুলির নাম, যথা,—আভোগ, স্বরৌঘ, পাঠকরণ, বন্ধকরণ, তেনকরণ, চিত্রকরণ, মিত্রকরণ, বিরুদকরণ, স্বরাত্ম্যকরণ, ধ্রুবক, ঢেকিকা, বিবর্ত্তনী, কোম্বড়, গারুগিরা, লম্ভক, রাসক, একতালী, বর্ণ, বর্ণস্বর, কৈবাড়, অঙ্কচারিণী, কন্দ, তুরগলীলা, গজলীলা, দ্বিপদী, চক্রবাল, ক্রৌঞ্চপাদ, স্বরার্থ, ধ্বনিকুট্টিনী, আর্য্যা, গাথা, দ্বিপথ, কলহংস, তোটক, ধট, বৃত্ত, মাতৃকা, রাগকদম্ব, পঞ্চতালস্বর, উমাতিলক, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদী, বস্তু, বিজয়, ত্রিপথ, চতুর্মুখ, সিংহলীল, হংসলীল, দন্তক, ঝম্পক, কন্দুক, ত্রিভঙ্গী. হরবিলাস, সুদর্শন, স্বরাঙ্ক, শ্রীবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, বদন, চচ্চরী, চর্য্যা, পদ্ধড়ী, লাহড়ী, বীরশ্রী, মঙ্গলাচার, ধবল, মঙ্গল, বনচক্রা, সরভলীল, কণ্ঠাভরণ, গত্থ, নন্দ্যাবর্ত্ত, তালার্ণব, চোল্লরী, জয়ন্ত, শেখর, উৎসাহ মধুর, নির্মল, কুণ্ডল, বামল, চারু, নন্দন, চন্দ্রশেখর, কামোদ, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক, ললিত, জয়প্রিয়, কলাপ, সুন্দর, বল্লভ, তার, সানন্দ, বিরাম, দ্রুতসৈন্য, বিবিক্রম, প্রসব, কান্তার, বৈকুন্দ, রাসভ, বাঞ্ছিত, বিশাল, শঙ্ক, শীল, মকরন্দ, নিঃশঙ্ক, বিনোদ, বরদ, কুমুদ, চন্দ্রিকা, বিপুলা, রমা, তুরগ, কুঞ্জর, হরি, শার্দ্দুল, বীরশৃঙ্গার ঝুমরি, চতুরঙ্গ, সূর্য্যপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ, রণরঙ্গ, নবরত্ন, পঞ্চাবর্ত্ত, দশাবর্ত, লহচাড়ী, লীলা, আন্দোলীতা, কৌমুদী, হংসমালিকা এবং খণ্ডন, এই সকল প্রবন্ধের আবার প্রকার ভেদ আছে। এই সমস্ত গীতের নানান প্রকার ভেদ।”

গীতগুণ—

“ব্যক্ত (গানের পদ, রাগ-স্বর জটিল না হওয়া), পূর্ণ (গমক যুক্ত), প্রসন্ন (সরলার্থ), সুকুমার (মন্দ্র, মধ্য ও তার এই প্রকার স্বর দ্বারা অলংকৃত), সম, গ্রাম, স্থায়ী. অন্তরা, আরোহী, অবরোহী, লয়স্থান ঠিক রাখিয়া বীণাদির ধ্বনির সহিত কণ্ঠস্বরের মিল রাখা), সুরক্ত (স্বরের নীচতা, উচ্চতা প্রদর্শন

এবং কখন দ্রুত লয় কখন বা মধ্যলয়, কখন বা বিলম্বিত লয় দেখান), শ্লক্ষ্ণ (স্বরমাধুর্য্য), বিকৃষ্ট (অতি উত্তম স্বর সংযোগ), এবং মধুর (লাবণ্যপূর্ণ, নির্দোষ, সারবিশিষ্ট এবং জনরঞ্জন গুণ বিশিষ্ট), গীতের এই দশটি গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক।”

গীতদোষ —

“লোকতুষ্ট, শাস্ত্রতুষ্ট, শ্রুতিকঠোর, কালবিরোধী (বেলয়), কলাবাহ্য (গীতের চতুঃষষ্ঠি কলার বহির্ভূত), গতক্রম (ক্রমভঙ্গ), অপার্থ (নিরর্থক অর্থাৎ যাহার কোন অর্থ নাই), গ্রাম্য (অশ্লীল) এবং সন্দিগ্ধ (রাগ ও অর্থের নানা প্রকার অর্থ প্রতীতি হওয়া), এই দশটি গীতের প্রধান দোষ। কিন্তু দেশী গীতে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন—পৌণরুক্ত দোষমধ্যে গণ্য হয় না, গীত মধ্যে অপভাষা থাকলে তত দোষাবহ হয় না, শব্দ সকল অত্যন্ত শীঘ্র বা অতি বিলম্বে উচ্চারিত হলেও বড় দোষের হয় না, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দ সকলের লিঙ্গ বিপর্য্যয় হতে পারে, সংযুক্ত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে পৃথকভাবে এবং অসংযুক্ত বর্ণকে সংযুক্ত করে উচ্চারণ করা যেতে পারে, হ্রস্ব বর্ণকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘ বর্ণকে হ্রস্ব করে উচ্চারণ করলেও কোন দোষের হয় না, কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত গীত সকল এ নিয়মের অধীন নয়॥”

সঙ্গীতশাস্ত্রের তাল-মাত্রাদির ব্যাখ্যা ও বিবরণ —

“অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু এবং প্লুত এই পাঁচ প্রকার মাত্রা বিন্যাস দ্বারা হস্ত-পাঢ় সহকারে অখণ্ড কালকে ছন্দোগত করে বিভাগ করাকে তাল বলে। মৃদঙ্গাদিতে তা, দিৎ, থুন্‌না প্রভৃতি যে সকল বোল বাদিত হয়, সেগুলি বাজাবার সময় হস্তক্রিয়ার সংগে সংগে বোলগুলি মুখে পঠিত হয় বলে তাদের হস্ত-পাঢ় বা হস্তপাঠ বলে।

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনই মত্তহস্তী স্বরূপ, তাল তাহার অঙ্কুশ। হস্তীপক (মাহুত) অঙ্কুশ দ্বারা হাতীর স্বেচ্ছাচারিতা যেমন নিবারণ করে, তাল দ্বারা বাদক তেমনি তৌর্য্যত্রিকের (ক্রিয়াসিদ্ধির) স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করে থাকে। বস্তুগত্যা তাল দ্বারা গীতাদির ছন্দ ঠিক থেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অপরাপর ছন্দের ন্যায় তালের চারটি পাদ বা বিভাগ আছে, সেই চারটি পাদের নাম—সম, বিষম, অতীত এবং অনাগত। শাস্ত্রকারদের মতে এই চারটি পাদ হতেই তাল গ্রহণ করার বিধি আছে। এদের প্রত্যেকটিকে এক এক গ্রহ বলা হয়েছে। গীতাদি গ্রহণের সমকালে তাল গ্রহণের নাম সমগ্রহ, গীতারম্ভের অব্যবহিত পরেই তাল গ্রহণের নাম অতীত গ্রহ, তাল গ্রহণের পর গীতাদির আরম্ভ হলে তাকে অনাগত এবং অতীত ও অনাগত এই দুটির মধ্যকালে গৃহীত তালকে বিষম গ্রহ বলে।”

সঙ্গীত শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মহাদেবের পঞ্চমুখ হতে পাঁচটি রাগেব প্রথম যেমন উৎপত্তি হয় তেমনি পাঁচটি তালও উৎপন্ন হয়। সেই পাঁচটি তালকে মার্গতাল বলে। তাদের নাম, যথা—চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্পিতাপুত্রক, সম্পকৈষ্টাক এবং উদ্ঘট। এই পঞ্চমার্গ তাল হতে বহুতর দেশী তাল উৎপন্ন হয়েছে। কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি এবং প্রস্তার এই দশটি তালের জীবন স্বরূপ। একশত পদ্মপত্র উপর্য্যুপরিভাবে স্থাপিত করে একটি সূচির দ্বারা ভেদ করতে যে সময়ের আবশ্যক, তাকে এক ক্ষণ বলে। আট ক্ষণে এক লব, আট লবে এক কাষ্ঠা, আট কাষ্ঠায় এক নিমেষ, আট নিমেষে এক কলা, আট কলায় এক ত্রুটি, আট ত্রুটিতে এক অনুমাত্রা, দুই অনুমাত্রায় এক অর্দ্ধমাত্রা, দুই অর্দ্ধমাত্রায় একমাত্রা, দুই একমাত্রায় এক গুরুমাত্রা এবং তিন একমাত্রায় একটি প্লুতমাত্রা সম্পন্ন হয়। এইরূপ ক্ষণাদি কালই তালের প্রথম প্রাণ। তালের গতি নিমেষের নাম মার্গ, মার্গ পাঁচ প্রকার, যথা,—বার্ত্তিক, কলাচিত্র, ধ্রুবক, চিত্রতর, চিত্রতম। চতুর্মাত্রায় বার্ত্তিক, দ্বিমাত্রায় কলাচিত্র, একমাত্রায় ধ্রুবক, অর্দ্ধমাত্রায় চিত্রতর এবং সিকিমাত্রায় চিত্রতম মার্গ নিষ্পন্ন হয়। এই পাঁচ প্রকার মার্গতালে দ্বিতীয় প্রাণ। ক্রিয়া দুই প্রকার—নিঃশব্দ এবং শব্দযুক্ত। নিঃশব্দকে কলা বলে এবং তাহা চার প্রকার, যথা,—ধ্রুব, শম্পা, তাল এবং সন্নিপাত। উত্তান হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কোচকে আবাপ, অধোহস্তের আঙ্গুলি প্রসারণকে নিষ্ক্রাম, উত্তানীকৃত দক্ষিণহস্তের আঙ্গুলি প্রসারণকে বিক্ষেপ, অধস্তন হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কোচকে প্রবেশ, তুড়ি দিয়ে হস্তের পতনকে ধ্রুব, দক্ষিণ হস্তের পাতকে সম্পা, বাম হস্তের পাতকে তাল এবং উভয় হস্তের পাতকে সন্নিপাত বলে। এই ক্রিয়া-তালের তৃতীয় প্রাণ। অনুদ্রুত, দ্রুত, দ্রুতবিরাম, লঘু, লঘুবিরাম, গুরু এবং প্লুত এই সাত প্রকার মাত্রাই তালের অঙ্গাত্মক চতুর্থ প্রাণ। অতিসূক্ষ্মাঘাতে অনুদ্রুত, সূক্ষ্মাঘাতে দ্রুত, পূর্ণাঘাতে লঘু, ঘাত এবং উৎক্ষেপে গুরু এবং ঘাত—উৎক্ষেপ ও বারভ্রমণে প্লুত মাত্রা ব্যবহার হয়ে থাকে। এই সকল অনুদ্রুতাদি মাত্রাকালে কোনরূপ আঘাত সম্পন্ন করতে হলে অনুদ্রুতে দেড়, দ্রুতে তিন, লঘুতে ছয়, গুরুতে বার, এবং প্লুতে অষ্টাদশ আঙ্গুলি পরিমিত স্থানান্তর হতে আঘাত করতে হয়।

তালের পঞ্চম প্রাণগ্রহ চার প্রকার, যথা,— সম, অতীত, অনাগত, এবং বিষম। এদের প্রত্যেকের লক্ষণ পরে যথাস্থানে উক্ত হবে। তালের ষষ্ঠ প্রাণ জাতি পাঁচ প্রকার যথা,—চতুরস্র, ত্র্যস্র, খণ্ড, মিশ্র এবং সঙ্কীর্ণ। চতুর্মাত্রায় চতুরস্র, আটমাত্রায় ত্রস্র, ষোড়শ মাত্রায় খণ্ড, দ্বাত্রিংশৎ মাত্রায় মিশ্র এবং চতুঃষষ্ঠি মাত্রায় সঙ্কীর্ণজাতি হয়ে থাকে। তালের সপ্তমপ্রাণ কলা আট প্রকার, যথা,— ধ্রুবকা, সর্পিনী, কৃষ্যা, পদ্মিনী, বিসর্জ্জিতা, কুঞ্চিতা, কেবিক্ষিপ্তা, উর্দ্ধগামিনীকে-আয়তা এবং হস্তপতনকে পতিত:-লয় বলে।

তালের অষ্টম প্রাণ লয়। ক্রিয়ার অনন্তর বিশ্রামে লয় বলে। লয় তিন প্রকার,—দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত। লয় প্রবৃত্তির নিয়মকে যতি বলে। যতি পাঁচ প্রকার, যথা,—সমা, স্রোতাগতা, গন্থা, পিপীলিকা এবং গোপুচ্ছা। আদি, মধ্য এবং অবসানে ঠিক এক প্রকারে লয় থাকাকে সমা, প্রথমে

মধ্য-মধ্যে বিলম্বিত এবং শেষে দ্রুত লয়াত্মিকা যতিকে স্রোতাগতা, বিলম্ব-মধ্য এবং দ্রুতাদ্যন্তাকে গন্যা, দ্রুত মধ্যাকে পিপীলিকা, প্রথমে বিলম্বিতা-মধ্যে মধ্যলয়াম্বিতা এবং শেষে দ্রুত যতিকে গোপুচ্ছা বলে।

যতি তালের নবম প্রাণ। অঙ্গাদির লিখনকে প্রস্তার বলে। প্রস্তার তালের দশম প্রাণ।

দেশী তালের মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ তাদের নাম নিম্নে প্রকাশিত হল।

যথা,—অঙ্ক, অঙ্কাভরণ, অতিরূপক, অক্রু, অনঙ্গ, অভঙ্গ, অভিনন্দন, অর্জ্জুন, অষ্টতালী, অসম, আস্ত্র, আড্ড, ইন্দ্রবজ্র, উগ্রা, উৎসব, উদীক্ষণ, উদ্দণ্ড, উর্দ্ধতালী, একতালী, ঐশিক, ওষধীশ, কঙ্কনক, কন্দ, কন্দর্প, কন্দুক, কমলা, কম্বক, করশাখা, করালমঞ্চ, করুণ, কল্যাণমঞ্চ, কীর্ত্তি, কুডুক্ক, কুন্তল, কুন্তলাচ্ছ, কুমুদেশ্বর, কুম্ভক, কোকিলা, কোকিলপ্রিয়া, কোবিদ, ক্রীড়া, খণ্ড, গজ, গজকম্প গজলীল, গণ্ডকী, গম্ভীরমঞ্চ, গোত্রাপক, গৌড়প্রভা, গৌরী, গৌরীকঞ্চলিকা, ঘটকর্কট, ঘণ্টানাদ, চক্রচণ্ড, চণ্ডকৌশিক, চচ্চরী, চতুর, চতুরস্র, চতুর্থ, চতুর্মুখ, চতুস্তাল, চন্দ্রকলা, চন্দক্রীড়, চন্দ্রাতপ, চম্পক, চিত্র, চূড়ামণি, জগচ্চন্দ্র, জগঝম্প, জনক, জয়, জয়মঙ্গল, জয়শ্রী, জৈমিনি, ঝম্প, ঝোম্বড়, টঙ্ক, ঠেগিকার, তৃতীয়, ত্রিগুণ, ত্রিপুট, ত্রিভিন্ন, ত্রিভুঙ্গী, দর্পন, দীপক, দীপিত, দীর্ঘছন্দ, দুর্বল, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধাবর্ণ, ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়মঞ্চ, নাগরাজ, নান্দী, নিজ, নিঃসারুক, নিঃশঙ্কলীল, নিরশঙ্কাসি, নীলঝোম্প, নৃপ, পঙ্কজ, পঞ্চাঘাত, পঞ্চবান, পঞ্চম, পরিক্রম, পাতালকুণ্ডলী পার্ব্বতীনেত্র, পার্ব্বতীলক্ষণ, পুরন্দর, পুষ্পক, পূর্ণ, পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণধন, পৃথ্বীকুণ্ডলী, প্রতাপরুদ্র, প্রতাপশেখর, প্রতিপ্রতিম, প্রতিমঞ্চ, প্রতাঙ্গ, প্রদ্যোতমালী, বঙ্গ, বঙ্গপ্রদীপ, বঙ্গদ্যোত, বঙ্গপ্রদীপ, বঙ্গরূপক, বঙ্গলীল, বঙ্গাভরণ, বঙ্গেশ, বজ্রমালী, বনমালী, বন্দুক, বরুণ, বর্ণ, বর্ণভিন্ন, বর্ণভীরু, বর্ণমঞ্চ, বর্ণমল্লিকা, বর্ণযতি, বর্ণলীল, বর্দ্ধন, বসন্ত, বস্তুদর্শন বিংশকলিকা, বিকঙ্ক, বিচারপ্রতিমঞ্চ, বিচিত্রা, বিজয়, বিজয়মঞ্চ, বিজয়ানন্দ, বিদ্যাম্বর, বিদ্রগ, বিন্দুমালী, বিপ্র, বিভ্রম, বিলোকিত, বিশ্বম্ভর, বিষম, বিষ্ণু, বীরবিক্রম, বৃহৎ, ব্রহ্ম, ব্রীড়া, ভগবান, ভগ্ন, ভিন্নমঞ্চ, ভৃঙ্গ, ভ্রমর, মকরন্দ, মকরভ্রম, মগদ্বিপদ, মঞ্চ, মঞ্জুমঞ্জরী, মণ্ডল, মদন, মধুব্রত, মধুমতী, ময়ুর, মলয়, মল্ল, মল্লিকা, মল্লিকামোদ, মহাসনি, মাতৃকা, মারুগি, মায়াবতী, মিশ্র, মুকুন্দ, মৃগরাজনিধি, মোক্ষপতি, মৌক্তিকযতি, যতিলগ্ন, যতিশেখর, যুগরাজ, রক্ষ, রতি, রতিলীল, রবি-বিক্রম, রবিমঞ্চ, রসপ্রদীপ, রাগবর্দ্ধন, রাগমালী, রাজকোলাহল, রাজচূড়ামণি, রাজনারায়ণ, রাজবল্লব, রাজাবিদ্যাধর, রাজমন্ত্রী, রাজমার্ত্তণ্ড, রাজমৃগাঙ্ক, রাজশীর্ষক, রাজশ্রী, রাস, রিপুভয়ঙ্কর, রূপক, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীশ, লগ্নমঞ্চ, লঘু, লঘুশেখর, ললিত, ললিতপ্রিয়, লীলা, লীলাবিলাস, লুব্ধ, লোলমকরন্দ, শঙ্খ, শরভরাজ, শরভলীল, শিব, শৌনিক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকান্ত, শ্রীকীর্ত্তি, শ্রীনন্দিবর্দ্ধন, শ্রীরঙ্গ, শ্রীশেখর, ষট্, ষণ্মঞ্চ, সন্নিপাত, সম, সম্বর, সম্ভ্রম, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, সারঙ্গ, সারঙ্গদেব, সারস, সিংহ, সিংহনন্দন, সিংহলীল, সিংহবিক্রম, সিংহবিক্রীড়িত, সিদ্ধিপ্রদ, সুঘন, সুন্দর, সোম, স্বর্ণমেরু, হংস, হংসনাদ, হংসতালিকা, হংসলীল, হেমাতপত্র এবং হুংপা।

এইগুলি শাস্ত্রসম্মত দেশী তাল, এতদ্ভিন্ন অধুনাতন বাদকেরাও অনেক দেশী তাল সৃষ্টি করেছেন।”

'সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এই সমস্ত তালের দু'চারটি ছাড়া আর কারো সংগেই বিশেষ পরিচয় নেই। এক এক সময় এই সব বিষয়ের সৃষ্টি কত বেশী প্রাচুর্য্য নিয়ে হয়েছিল তা জ্ঞানানর আবশ্যক আছে বুঝেই এই সমস্ত রাগ-তাল ইত্যাদির বিষয় উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

ব্রহ্মার মতের ছয় রাগ—ছত্রিশ রাগিণী—

ব্রহ্মার মতে বলা হয়েছে—মহাদেবের পঞ্চমুখ হতে শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত ও মেঘ—এই পাঁচটি এবং পার্ব্বতীর মুখ হতে বৃহন্নট বা নটনারায়ণ নামে একটি, মোট এই ছয়টি রাগের প্রথম জন্ম হয়। এই ছয়টি রাগের প্রত্যেকের ছ'টি ছ'টি করে ভার্য্যা আরোপিত আছে। যথা ঃ—মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী (কেদার) মধুমাধবী ও পাহাড়ী—এই ছ'টি শ্রীরাগের ভার্য্যা। দেশী, দৈবগিরী (দেবগিরী), বৈরাটী (বারাড়ী), টোড়িকা (তোড়ী), ললিতা (ললিত) ও হিণ্ডোলী (হিন্দোল) এই ছ'টি বসন্তরাগের ভার্য্যা। বিভাসা (বিভাস), ভূপালী, কর্ণাটী (কর্ণাট), পাঠহংসিকা (বড়হংস), মালবী ও পটমঞ্জরী—এই ছ'টি পঞ্চমরাগের স্ত্রী। ভৈরবী, বাঙ্গালী, সৈন্ধবী (সিন্ধু), রামকিরী (রামকেলী), গুজ্জরী ও গুণকিরী (গুণকেলী), এই ছ'টি ভৈরবরাগের স্ত্রী। মল্লারী (মল্লার) সৌরটী (সুরট), সায়েরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গার এই ছ'টি মেঘরাগের স্ত্রী। কামোদী (কামোদ), কল্যাণী (কল্যাণ), আভিরী (অহিরী), নাটিকা (নাট), সারঙ্গী (সারং) ও হাম্বিরী (হাম্বির)—এই ছ'টি নটনারায়ণ বা বৃহন্নটের ভার্য্যা।

এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী সহযোগে ষোড়শ সহস্র উপরাগ ও উপরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আবার গায়কেরা এই সকল রাগের পরস্পর মিশ্রণে বহুবিধ রাগের সৃষ্টি করেছিলেন।

হনুমন্মতানুযায়ী ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিনী।

১। ভৈরব রাগের রাগিনী—রামকেলী, ভৈরবী, গুর্জরী, বঙ্গালী ও তোড়ী।
২। মালকৌশ রাগের ঐ—ককুভা, কৌশিকী, শোভনী, বাগেশ্বরী ও খম্বাবতী।
৩। হিন্দোল রাগের ঐ—ভূপালী, মালশ্রী, পটমঞ্জরী, বেলাবলী ও ললিতা।
৪। দীপক রাগের ঐ—নাটিকা, কামোদী, প্রদপকী, কেদারী ও কর্ণাটী।
৫। শ্রীরাগের ঐ—ধনশ্রী, ত্রিবনী, মালবী, গৌরী ও জৈতশ্রী।
৬। মেঘরাগের ঐ মল্লারী, সারঙ্গ, মধুমাধবী, বড়হংসিকা ও সৌরঠি।

শাস্ত্রকারগণ—প্রত্যেকটি রাগকে এক এক ঋতুতে গাইবার জন্য নির্দেশ রেখেছেন—যথা—শরতে-ভৈরব, হেমন্তে-মালকৌশ, বসন্তে-হিন্দোল, গ্রীষ্মে-দীপক, শিশিরে-শ্রীরাগ।

তাঁরা এ কথাও বলেছেন দেশাচার মত সকল ঋতুতেই সকল রাগ গাওয়া চলতে পারে।

সংস্কৃত-সংগীত-গ্রন্থকর্ত্তা সোমেশ্বরের মতে— শিশিরে-শ্রীরাগ, বসন্তে-বসন্ত, গ্রীষ্মে-ভৈরব, শরতে পঞ্চম, বর্ষায়-মেঘ, এবং হেমন্তে নটনারায়ণ রাগ গান করার বিধি আছে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে— রাজ আজ্ঞায় কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে সময়ের রাগ অসময়ে প্রকাশ করলে পরিশেষে গুজ্জরীরাগ গেয়ে অসময়ে গাওয়ার দোষ খণ্ডন করতে হবে। এর শ্লোক—লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিৎ গায়ন্তি চ বিরাগতঃ। সুরসা গুজ্জরী তস্য দোষং হন্তীতি কথাতে। ইতি—সঙ্গীত নির্ণয়ে॥ অর্থ,—গুজ্জরীরাগ গাইলেই দোষ খণ্ডন হয়ে যাবে।

এই নির্দেশের মধ্যে তাহলে বুঝতে হচ্ছে গুজ্জরীরাগ কোন সময়ের নির্দিষ্ট রাগ নয় এবং কোন সময়ে গাওয়ার জন্যও নয়। উক্ত বিষয়ের অপরাধ স্খালনের জন্য সংরক্ষিত রাগ।

আবার এক স্থানে আছে—রাজাজ্ঞায় বা রঙ্গভূমিতেও সকল সময়ে সকল প্রকার রাগ অবাধে গান করা যেতে পারে। “রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে। ইতি নারদ সংহিতায়াং॥

আরেক স্থানে আছে—রাত্রি দশ দণ্ডের পর রাত্রি সম্বন্ধীয় যে সকল রাগ আছে, সে সকলও অবাধে গেয় বটে। “দশ দণ্ডাৎ পরং রাত্রৌ সর্ব্বেষাং গানমীরিতং॥ ইতি কল্লিনাথেনোক্তং॥

গীতের গুণ বিশ্লেষণ—

যে গান শুনলে শ্রোতার চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে সেই গানই মাধুর্য্য গুণ বিশিষ্ট। যে গান শুনলে চিত্ত বিস্ফারিত হয়, যার বন্ধন অতি গাঢ়রূপ, তাতে ওজঃ এবং শুনামাত্র যে গানের পদগুলির অর্থ উপলব্ধি হয় তাতে প্রসাদ গুণ থাকে।

নায়কাদির লক্ষণ

নায়ক,—যিনি মার্গ এবং দেশী উভয়বিধ মতের গান স্বয়ং প্রকাশ করতে পারেন, সঙ্গীত-শাস্ত্রের বিশেষ মর্ম সম্যক অবগত আছেন, গান, বাদ্য, নৃত্য এবং যন্ত্রাদির প্রকরণ সকল উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে পারেন, অভিনয়বিৎ, রস ও অলংকারের মর্মজ্ঞ, সকল গুণ ও দোষের একমাত্র পরীক্ষক, পরের অভিপ্রায় বুঝতে সক্ষম, যশোভিলাষী, পবিত্রাত্মা, ক্ষমাশীল, দাতা এবং ধীর এরূপ সর্বগুণালঙ্কৃত ব্যক্তিকে সঙ্গীতশাস্ত্রমতে ‘নায়ক’ বলা যায়।

পণ্ডিত— যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ঔপপত্তিক জানেন অর্থাৎ সঙ্গীতশাস্ত্র মাত্র পরিজ্ঞাত আছেন,—ক্রিয়াসিদ্ধে দখলকার নন তাঁকে পণ্ডিত বলা যায়।

গায়ক,—যিনি যেমন দেখেন তেমনি শিক্ষা করেন, অনুকরণ করতে সক্ষম, সুরসিক, অনায়াসে লোকের মনরঞ্জন করতে সক্ষমবান এবং ভাবুক তাঁকে গায়ক বলে নির্দেশ করে থাকেন।

উপাধ্যায়,—যিনি অতি সুন্দরাকৃতি, নৃত্যের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত বাদ্যবাদন দক্ষ, রাগজাল বিস্তার করতে সক্ষম, তাল-লয়ের বিশেষজ্ঞ, নৃত্য ও বাদ্য স্বয়ং করতে পারগ, শিল্পী এবং শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষা দিতে পারেন তাঁকে উপাধ্যায় বলা যায়।

গন্ধর্ব,—যাঁরা মার্গ ও দেশী উভয় মতানুযায়ী সংগীত কার্য্যতঃ উত্তমরূপে করতে পারেন এবং সেই সংগে শিক্ষা দিতে পারেন কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্র ভালরূপ দেখেন নি তাঁদের নাম গন্ধর্ব।

গুণী অথবা গুণকার,—কেবল ক্রিয়াসিদ্ধ যাঁর জানা আছে তাঁকে গুণী বা গুণকার বলা যায়।

কলাবৎ,—যাঁরা ধ্রুপদ ইত্যাদি উত্তমরূপে গাইতে পারেন কিন্তু যন্ত্র বা নৃত্যাদির নিয়ম ভাল জানেন না তাঁদের নাম 'কলাবৎ'।

কাবাল,—যাঁরা কেবল খেয়াল, তেলেনা ইত্যাদি গান করেন তাঁদের নাম 'কাবাল'।

ঢাড়ি,—যাঁরা কড়্খা, ইত্যাদি হালকা ধরণের গান করেন তাদের 'ঢাড়ি' বলা যায়।

মার্দ্দঙ্গী,—যিনি ধীর, বাদ্যবিদ্যাতে সুশিক্ষিত, মিষ্টভাষী, বাদ্যের বোলগুলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম, তালাভ্যাসরত, গমকাদি সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত, বিবিধবাদ্য পরিবর্ত্তন পটু, বহুবিধগীতের রীতিজ্ঞ, সন্তুষ্টচিত্ত, বাদ্যের বোলগুলি মুখে প্রকাশ করতে পারেন এবং অতি সুচতুর, তাঁকে মার্দ্দঙ্গিক বলে।

উক্ত প্রত্যেকটি গুণাবলী শাস্ত্রীয় শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

দুষ্টগায়ন —

দুষ্টগায়ন—গানের সময় নানান মুদ্রাদোষ ও নানান ত্রুটিযুক্ত ক্রিয়ার উপর বিচার করে প্রত্যেকটির এক একটি নাম আছে। এবং সেগুলি শাস্ত্রকাররা দুষ্টগায়ন নামের তালিকায় ধার্য্য করেছেন। যথা,—সন্দষ্ট—গানকালে যার দন্ত বাহির হয়, উদ্দেষ্ট—গানকলে যে বিকট চিৎকার করে, শীৎকারী—গানকালে যে বারম্বার শীৎকার করে, ভীত—লোক-সমাজে গাইবার সময় যে ভয় পায়, শঙ্কিত—যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি গান করে, কম্পিত—গানের সময় যার গলা কাঁপে, করালী—গান সময়ে যার মুখ অত্যন্ত বিকৃত হয়, কপিল—গান সময়ে যার স্বরের শ্রুতির ওজন ঠিক থাকে না, কাকী—যার কণ্ঠস্বর কাকের মত শ্রুতি কঠোর, বিতাল—গান সময়ে যে ব্যক্তি তাল ঠিক রাখতে পারে না, করভ—গান সময়ে যে ব্যক্তি মস্তক সর্বদা কাঁধের উপর রাখে, উদ্বল—গানের সময় যার গলা হতে ছাগের ধ্বনির মত ধ্বনি নির্গত হয়, ক্রৌঞ্চক—গান সময়ে যার মুখে ও কপালে শিরা দেখা দেয়, তুম্বকী—গান সময়ে যার মুখ পাখীর ঠোঁটের ন্যায় সুরু হয় এবং গলা ফুলে উঠে, বক্রী—গান সময়ে যার মুখ বেঁকে যায়, প্রসারি—গান সময়ে যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসারিত হয়, বিনিমিলক—চোখ বুজে যে গান করে, বিরস—যার গানে কিছুমাত্র রস নেই, অপস্বর—গানের স্বর যার ঠিক থাকে না, অব্যক্ত—যার গানের স্বর এবং বাণী কিছু বুঝা যায় না,

স্থানভ্রষ্ট—গানকালে যে ব্যক্তি মন্দ্র মধ্য ও তার এই স্থানত্রয় স্থির রাখতে পারে না, মিশ্রক—শুদ্ধ ও ছায়ালগ রাগ যে মিশিয়ে ফেলে, অনবধান—যে স্থায়ী প্রভৃতি ঠিক রাখতে পারে না, সানুনাসিক—যে নাকি সুরে গান করে, এই কয় প্রকার দুষ্টগায়ন অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত গায়ক ॥

কতকগুলি যন্ত্রের পরিচয়—

ক্রিয়াশক্তি—যে সকল যন্ত্র গীত বা অন্য যন্ত্রাদির অনুগত না হয়ে বাজে তাদের নাম স্বয়ংসিদ্ধ। যেমন বীণা ত্রিতন্ত্রী ইত্যাদি।

যে সকল যন্ত্র গীত বা অন্য কোন যন্ত্রের অনুগত হয়ে বাজে তাদের অনুগতসিদ্ধ বলা হয়। যেমন তানপুরা, মৃদঙ্গ ইত্যাদি।

বীণা—বীণা আমাদের অতি প্রাচীন যন্ত্র, দেবর্ষি নারদ সর্বদা এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন, ভগবতী সরস্বতীরও এটি প্রিয় যন্ত্র বলে প্রসিদ্ধ। সার্ উইলিয়ম জোন্স্‌কৃত পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠায় বীণার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা আছে। উইলার্ড সাহেব ও ট্রিটিজ অন্ দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় বীণার বিষয় বিস্তর লিখেছেন। এক স্থানে বলেছেন,—"ভারতবর্ষে যত প্রকার যন্ত্র আছে তার মধ্যে বীণা সর্বপ্রধান ও জগদ্বিখ্যাত। বীণাতে এমন কতকগুলি কঠিন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় যা পিয়ানো-যন্ত্রাদিতে কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না।"

ত্রিতন্ত্রী—এর আধুনিক নাম সেতার, এটি বীণার অনুকল্প। ত্রি শব্দকে পারস্য ভাষায় 'সে' বলে, এইজন্য আমীর খস্‌রু তিনটি তার বিশিষ্ট ত্রিতন্ত্রীকে সেতার নামে বিখ্যাত করেছিলেন। পূর্বে সেতারে তিনটির অধিক তার থাকত না,—পরে পাঁচ তার ছয় তার, সাত তার যোজিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে এখন ইচ্ছাধীন অনেক তার যোজিত হয়ে থাকে। বর্ত্তমানে তরফের তার সংযোজিত করে, উর্দ্ধে তম্বু এবং ময়ুরাদি মুখের গঠন সংযোগ করে এই যন্ত্রের যে আকৃতি প্রচলন হয়েছে তাকে আর সেতার নামে অভিহিত করা ঠিক হয় না, একে পরিবাদিনী-বীণা বলাই বিধেয়, সপ্ততন্ত্রীবীণাও বলা যায়।

এই বীণাদি যন্ত্রে নানান পদ্ধতির উপর যে সমস্ত ক্রিয়া চিত্রিত হয় তা অন্য কোন যন্ত্রে অতপ্রকার ক্রিয়া সম্ভব হবে না। যেমন—এক থেকে চার পর্য্যন্ত দুই হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন তারে পৃথক বা এক সংগে বাদিত হতে পারে তারের টানের উপর মীড়, গমক, কম্পন এবং সূক্ষ্ম আন্দোলনের দ্বারা রাগের অপূর্ব্ব রূপ ও রস সৃষ্টি করতে পারে, ঘর্ষণের দ্বারা প্রত্যেকটি সুরের রূপ স্পষ্টভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে উদারাসপ্তকের প্রথম পর্দা হতে, যন্ত্রের শেষ পর্দা পর্য্যন্ত স্বরে লালিত্যের ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, পর্দায় টান দিতে দিতে প্রত্যেকটি স্বরে আঘাত দিয়ে সুরের নানা প্রকার রূপ সৃষ্টি হয়। কৃন্তনে এবং প্রত্যেক পর্দার উপর আঘাতে রাগ রূপের লীলাবৈচিত্র্য প্রদান করে, ভ্রমর গুঞ্জনের মত রসমাধুর্য্য

নিয়ে তোড়ার স্রোত বয়ে যায়, ঝালার মধ্যে বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ায় বিস্ময় উৎপাদন করে মনকে মোহিত করে ইত্যাদি।

এরূপ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন যন্ত্র পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সর্ব্বোপরি একটা কথা—যন্ত্রের স্বরে জোওয়ারী নির্গত না হলে সুরের স্বাদ মাধুর্য্য পাওয়া যায় না, সেতারাদি যন্ত্রে সওয়ারীর উপর তারের মধ্যে দিয়ে জোওয়ারী নির্গত হয় বলে তার রসসৃষ্টির শক্তি এত বেশী। কণ্ঠ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

রবাব—এটি আফ্‌গানী যন্ত্র। পাঠান রাজত্বে এর সমাদর বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। এই যন্ত্রে সেতার, বীণার মত রাগাদির আলাপ হতে পারে। একে আফ্‌গানী যন্ত্র বলা হল বটে, বস্তুতঃ আরব্য দেশে এর প্রথম সৃষ্টি হয়। রবাব ভারতবর্ষের পশ্চিমরাজে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী রামপুর নগরে বিস্তর দেখা যেত।

কানুন—আখ্‌ওয়াল উস্‌স্বফা-নামক একজন যবন-সঙ্গীত গ্রন্থকার বলেন, এটি আরব্য দেশের যন্ত্র কিন্তু সময় সময় ভারতবর্ষেও ব্যবহৃত হত। তানসেনের বংশধর প্যারসেন কানুনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Memoirs of Baber, P. 198 পৃষ্ঠায় লিখিত আছে কানন কাবুল দেশস্থ বৃহৎ যন্ত্র।

সারঙ্গী—সংস্কৃত নাম সারঙ্গ। এটি কোমলকণ্ঠি গায়িকাদের সংগে বাজিত হয়ে এসেছে। অষ্ট্রিয়ান্‌ লম্বার্ডির অন্তঃপাতী ক্রিমোনা প্রদেশে ষ্ট্রাডিভেরিয়স্‌ এবং গোয়ার্‌ নিরেয়স্‌ নামক দু'জন প্রসিদ্ধ বেহালা নির্মাতার ন্যায় বারাণসীতে গণপতি এবং মহামন্দৌ নামে দু'জন সারঙ্গী নির্মাতা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

এস্‌রার, চলিত কথায় এস্‌রাজ— সেতার ও সারঙ্গী এই উভয়বিধ যন্ত্রের মিশ্রণে এস্‌রার যন্ত্রের সৃষ্টি। এস্‌রারের আকৃতি ময়ুরের মত করলে তাকে উর্দ্দূ ভাষায় 'তাউস' বলে। এক সময় এই আকৃতিরই বিশেষ প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ এসরারের অপেক্ষা তাউসের আকৃতি বড় হয় বলে আওয়াজের পার্থক্য কিছু থাকে রসাল ও মিষ্টত্ব নিয়ে।

বাহুলীন বা বেহালা—একে ইংরাজেরা 'ভায়লিন্‌' এবং ইটালীয়ানেরা 'ভিয়ালো' বলে। ভিয়ালো শব্দের অপভ্রংশে আমাদের দেশে বেহালা নামে খ্যাত হয়েছে। বেহালা ইউরোপীয় যন্ত্র বলে প্রসিদ্ধ, বস্তুত তা নয়। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা গ্রন্থে লেখা আছে, ভারতবর্ষের লোকেরা পূর্ব্বে বেহালাকে সারঙ্গী বলে ব্যবহার করতেন। সুতরাং বেহালার আদি জন্ম ভারতবর্ষেই বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আরো প্রমাণ, বেলজিয়ম রাজ্যের রাজধানী ব্রুসেল মহানগরস্থ সঙ্গীতশালার অধ্যক্ষ এফ্‌, জে, ফেটিস্‌কৃত সুবিখ্যাত বেহালা নির্মাতা ষ্ট্রাডিভেরিয়াসের জীবন বৃত্যান্ত এবং ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ, যা জন বিশপ কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে—ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ।

খৃঃ জন্মের ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্বে লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্ত্তৃক ধনুর্যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়, সে সময় ভারতবর্ষবাসী-ব্যক্তি-সাধারণ তাকে রাবণাস্ত্রম্ বলে ব্যবহার করত। ওই রাবণাস্ত্রমের অনুকরণে রাবাণা নামে অপর একটি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, ঐ দুই যন্ত্রেই দুটি করে তার আবদ্ধ থাকত। রাবণাস্ত্রম্ এবং রাবাণার ন্যায় অমৃতি নামে আর প্রকার ধনুর্যন্ত্রও ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছিল। আরবীয়দের "কেমানজে জৌজ" নামে এক-প্রকার ধনুর্যন্ত্র আছে। উক্ত যন্ত্র এবং অমৃতি যন্ত্রের সংগে একত্র করে দেখা হয়েছে, নিঃসন্দেহে 'কেমান্‌জেজৌজ' ভারতবর্ষের অমৃতি যন্ত্রের অনুকরণ মাত্র। পারস্য ভাষায় কেমান্‌জেজৌজ শব্দে প্রাচীন ধনুর্যন্ত্রকে বুঝায়। জৌজ্ শব্দের অর্থ প্রাচীন। পারস্য অভিধানে কেমান্‌জে শব্দ 'ভিয়ল' বলে অনুবাদ আছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সংগে পারস্য দেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, এজন্য অমৃতি হতে কেমান্‌জেজৌজের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। উভয়বিধ যন্ত্রের অবয়ব প্রায় একই প্রকার। কামানজে এবং ভিয়ল এই দুই যন্ত্রই যখন একই বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে তখন কামান্‌জের অনুকরণে যে ভিয়ালো প্রস্তুত হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকে না। কেবল দেশে নাম ভেদ হয়েছে মাত্র। যদি কেউ বলেন কামান্‌জে ভিয়োলের পূর্ব্বে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ কি? এর সদুত্তর এই, পূর্বোক্ত গ্রন্থকার এফ্ জে, ফেটিস্ সাহেব বলেছেন, খৃঃ অষ্টশতাব্দীর পূর্বে ইউরোপ মহাদ্বীপে ধনুর্যন্ত্র দেখা যেত না। রীজ সাহেব কৃত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার সহিতও এই মতের ঐক্য আছে। ইতিহাসে পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হতে রোমরাজ্যের পতনকাল খৃঃ পঞ্চশতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীনকাল বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং প্রাচীনকাল বলতে গেলে খৃঃ অষ্টশতাব্দীর অনেক আগের কালকে বুঝায়। সেই সময় অমৃতির অনুকরণে কেমান্‌জের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন ইউরোপ খণ্ডে ধনুর্যন্ত্রের কোন পরিচয়ই ছিল না। সুতরাং কেমান্‌জে অপেক্ষা ভিয়লের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হতে পারে না। আরো প্রমাণ এই, কাস্‌ল্‌স ইলাস্‌ট্রেটেড ফ্যামিলি পেপারে (১৮৬০ সাল, অগাষ্ট মাস ৩২ খণ্ড ৬ বাল্মে) লেখা আছে 'রিবেক' বলে যে এক প্রকার আরব দেশে ধনুর্যন্ত্র আছে,—যখন মুর অর্থাৎ আরব জাত্তিরা স্পেন্ দেশ অধিকার করে, সেই সময় উক্ত যন্ত্র আরব জাতি কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রথম সংস্থাপিত হয়; ব্রিটেনিকা গ্রন্থেও এরূপ লেখা আছে। আরব জাতিদের স্পেনদেশ অধিকার খৃঃ অষ্টশতাব্দীতে। এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে যে, ফ্রান্সদেশে কথিত 'রিবেক' যন্ত্রকে ভায়লিন বলেই ব্যবহার করত। এর দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে খৃঃ অষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে বেহালা প্রভৃতি ধনুর্যন্ত্রের ব্যবহার একেবারেই ছিল না। রিবেক যন্ত্রও কেমান্‌জে যন্ত্রের অনুকরণে প্রস্তুত, কেমান্‌জে আবার—আমাদের ভারতবর্ষীয় অমৃতি-যন্ত্রের অনুকরণে নির্মিত। তাহলে বেহালা যে আমাদের ভারতবর্ষীয় যন্ত্র তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই; কেবলমাত্র কালক্রমে জাতিভেদে ও অভিরুচিভেদে অবয়ব কিছু ভিন্ন এবং নাম ভিন্ন হয়ে পড়েছে। এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় বেহালার প্রথম সৃষ্টিকাল নির্ণয় নেই। পূর্ব্বোক্ত ধনুর্যন্ত্রাদি বিষয়ক গ্রন্থকার এফ্ জে ফেটিস্ সাহেব তাঁর গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করেছেন— ইউরোপখণ্ডে এমন কিছুই নেই যা এশিয়া হতে

না এসেছে। এত প্রমাণ সত্ত্বেও বেহালাকে আমাদের যন্ত্র বলে কেন স্বীকার করব না ?

ভায়লিন অর্থাৎ বেহালাকে পূর্ব্বকালে ইউরোপেও ভিয়ল বলে ব্যবহৃত হত। পূর্ব্বে যে কেমানজে শব্দ বলা হয়েছে, ইস্‌কুর্বাথ-কৃত মিউজিক হেণ্ডবুকের ২৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, জর্মনীভাষায় বেহালাকে 'জেজ' বলে। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে যে, যেমন ভিয়ালো শব্দের অপভ্রংশে আমরা বেহালা শব্দ ব্যবহার করি, তেমনি জর্মনজাতিরা কেমানজের অপভ্রংশে 'জেজ' কথা ব্যবহার করে। সুতরাং বেহালাকে ইউরোপীয় যন্ত্র বলে জেনে রাখা বৃথা। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসমূহ দৃষ্টে বেহালাকে ভারতবর্ষীয় ধনুর্যন্ত্রের মধ্যেই গণ্য করতে হবে। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে 'রিবেক' এবং রবাবের অনুকরণে ইটালীতে ভিয়লের প্রথম সৃষ্টি হয় ; তখন ভিয়লে রিবেক এবং রবারের ন্যায় তিনটি তার আবদ্ধ থাকত ; তারপর ইটালী দেশের নিকটস্থ গাস্‌পর্ড নামক জনৈক শিল্পী দ্বারা অধুনাতন আকৃতিতে ভায়লিন অর্থাৎ বেহালা প্রথম পরিণত হয়। সেই সময় থেকে বেহালাতে চারটি তার আবদ্ধ করা প্রচলিত হয়ে আসছে। ভায়লিন যন্ত্র সারঙ্গী যন্ত্রের এক রূপান্তর একথা ব্রিটানিকা গ্রন্থেও লিখিত আছে। ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের বিশের মর্মজ্ঞ আর্থার হুইটেন সাহেবও ভারতবর্ষীয় যন্ত্রের মধ্যে বেহালার নাম উল্লেখ করেছেন।

গিটার—গিটার নামে যে যন্ত্রটির চেহারা আজকাল বেশ সংখ্যা নিয়ে দেখা যাচ্ছে তাকে অনেকেই ইউরোপীয় যন্ত্রমধ্যে গণনা করে থাকেন, কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখলে একেও এসিয়াস্থ যন্ত্র বলা যায়। রীজ সাহেব কৃত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে, সেতার-নামক যন্ত্র হতে উৎপত্তি। স্কুল অফ ইউনিভার্‌সেল-মিউজিক-গ্রন্থকার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আডল্‌ফ বার্ণহার্ড মার্মস্‌ সাহেব বলেছেন, "গিটার অতি পূর্বকালাবধি ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং চীনদেশে প্রচলিত ছিল।" গিটারের অবয়ব ভেদে সেতার (জর্মন দেশীয় "জিতার") যন্ত্র তথায় বোধ হয় এখনও বাদ্যরূপে প্রচলিত আছে। ত্রিতন্ত্র বীণা অতি পূর্ব্বকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে লেখা আছে, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক বীণাযন্ত্র প্রথমে সৃষ্ট হয়। বীণা নানাবিধ (২) তারমধ্যে তিনটি তার বিশিষ্ট যে বীণা তাকে ত্রিতন্ত্র বীণা বলা হয়। যবন রাজ্যের সময় ত্রিতন্ত্র অর্থাৎ তিন তার বিশিষ্ট বলে পারস্য ভাষায় ত্রিতন্ত্র বীণা সেতার নামে প্রচলিত হয়। পারস্য ভাষায় 'সে' শব্দে তিনকে বুঝায়। আমীরখসরুই ত্রিতন্ত্র নাম পরিবর্ত্তন করে পারসীক নাম সেতার রাখেন।

---

(২) রুদ্রবীণা, ব্রহ্মবীণা, নারদবীণা, সারস্বতবীণা (যাহা পরিবাদিনী নামেও খ্যাত), কচ্ছপীবীণা, (যাকে আমরা এখন কচ্ছুয়া সেতার নামে ব্যবহার করি, এর লাউ প্রসস্ত অর্থাৎ চেপ্‌টা আকারের থাকে)। ইংরেজী এবং সংস্কৃত অভিধানকর্তা মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ সাহেব বীণা যন্ত্রকে 'লাইয়র' যন্ত্র বলে স্থির করেছেন। সঙ্গীত ইতিহাস-কর্তা বর্ণিসাহেব লাইয়র, সেতার, টেস্‌টুডো, লুট, হার্প ইত্যাদি যন্ত্রকে এক জাতি অর্থাৎ বীণা হতে উদ্ভূত বলে গণ্য করেন। বার্ণিসাহেবের গ্রন্থে আরো দেখা যায়, মিসর এবং গ্রীসদেশে অতি পূর্বকালাবধি সেতার প্রচলিত ছিল। উক্ত গ্রন্থ পাঠে প্রমাণিত হয় সেতার আম্‌ফিয়ান নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এসিয়া মাইনর রাজ্যের অন্তর্গত লিডিয়া প্রদেশ হতে প্রথমে গ্রীসদেশে নীত হয়েছিল।

'সঙ্গীত সার' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত

যখন ভারতবর্ষের সংগে পারস্যদেশের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, তখন পারসীকেরা ত্রিতন্ত্রীকে ভারতবর্ষ হতে স্বদেশে নিয়ে গিয়ে সেতার নাম দেয়। পারস্যদেশ হতে আবার ওই যন্ত্র আরব জাতিরা নিয়ে একটু অবয়ব ভেদ করে গিটার নাম রাখে। গিটার নাম যে আরব্যদেশ হতেই হয়েছিল একথা ডক্টর বার্ণিসাহেবও স্পষ্ট স্বীকার করেছেন। যাইহোক্—রীজসাহেবের এনসাইক্লোপিডিয়ায় গিটারের আদি উৎপত্তি যখন সেতার হতে নিশ্চয়ই হয়েছে এবং পূর্বকথিত মার্কস্‌সাহেব যখন গিটার বহুকালাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে বলে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেছেন তখন একে ভারতবর্ষীয় যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু বলা যেতে পারে না,—অর্থাৎ ভারতবর্ষই যে এই যন্ত্রের আদি উৎপত্তি স্থান তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এইভাবে অনুসন্ধান করে দেখলে 'হার্প' প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় যন্ত্রেরও আদি উৎপত্তি স্থান এসিয়া মহাদ্বীপে তা নিশ্চয়ই সপ্রমাণিত হতে পারবে॥

সপ্তস্বরা, স্বরসারং, স্বরশৃঙ্গার, স্বরবীণ প্রভৃতি আরো কতকগুলি যন্ত্র প্রাচীন সভ্যযুগের বলে উল্লেখ আছে। 'পিনাক' নামে অপর একটি তারযন্ত্র এই দেশের সভাতে পূর্ব্বে বাদিত হত। পিনাক মহাদেবের প্রিয় যন্ত্র বলে বিখ্যাত॥

মাঙ্গল্যযন্ত্র—শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদি কতকগুলি যন্ত্রকে মাঙ্গল্যযন্ত্র বলা হয়েছে॥

রণযন্ত্র—কাহাল অর্থাৎ জয়ঢক্কা, দগড়া, দুন্দুভি, রণ-শৃঙ্গ, দামামা, গোমুখ, মহাশঙ্খ, পনকু (সানাই), ডম্ফ প্রভৃতি কতকগুলিকে রণযন্ত্র (বাদ্য) বলে॥

গ্রাম্যযন্ত্র—মর্দ্দল (মাদোল), সরমঙ্গল, একতারা, সারিন্দা, গোপীযন্ত্র, আনন্দলহরী, খোল, ডিণ্ডিমী (খঞ্জনী), ডম্বরু, তুব্‌ড়ি (মান্দ্রাজী সাপুড়িয়ারা সর্বদা ব্যবহার করে), হুড়ুকা (যা রওয়ানি-বেহারাদের দোল প্রভৃতি উৎসবাদির সময় বাদিত হয়), রামশিঙ্গা কীর্ত্তনের সময় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহার হয়), বেণু (উড়িষ্যাদেশে প্রচলিত ২।৩ হাত লম্বা সরু তল্‌তা বাঁশে নির্মিত এক প্রকার বাঁশী)।

বিষমঢাকী—এ যন্ত্র ডমরুর মতই তবে মধ্যস্থলের সুত্রের উপর বামহস্তের অঙ্গুলির চাপ দ্বারা শব্দের বিভিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন করত দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির দ্বারা বাদিত হয়। এই যন্ত্র আমাদের দেশে সাপ নিয়ে যারা খেলা দেখায় তারা সেই সময় বাজায়।

সওয়ারীযন্ত্র—পূর্বে রাজারা যখন বায়ুসেবন বা অন্য কোন কারণে সুসজ্জিত হয়ে বহির্গমন করতেন তখন উটের পীঠে সরদ্ যন্ত্র স্থাপন করে তাঁদের আগে আগে বাজিয়ে যাওয়া হত। রাজাদের বহির্গমনকে পারস্যভাষায় সওয়ারী বলে। সওয়ারীর সময় যে সকল যন্ত্র বাজত বা হয়ত এখনও কোন কোন স্থানে বাজে তাদেরও নাম সওয়ারী যন্ত্র ;—রসন্‌চৌকি, আল্‌গোজা, কলম, ডঙ্কা ইত্যাদি॥

শাস্ত্রোক্ত চার শ্রেণী বাদ্যযন্ত্রের বিশদ পরিচয়—

ততযন্ত্র—আলাপিণী, কচ্ছপী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, বিপঞ্চী, বন্ধকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কূর্মিকা, কুব্জা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিস্বরী, শততন্ত্রী, নকুলষ্ঠী, ঠংসরী, ঔড়ম্বরী, পিনাকী, নিবদ্ধ, পুষ্কল, গদা, বারণহস্ত, রুদ্রবীণা, স্বরমণ্ডল, কপিনাসী, মধুস্যন্দী, ঘনা, শ্রুতিবীণা, নারদবীণা, সারস্বতবীণা, বিচিত্রবীণা, একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী, উন্নতা ও কোলিকা ॥

আনদ্ধযন্ত্র—পটহ, মর্দ্দল, হুড়ুক, করট, অধট, রঞ্জা, ডমরু, ঢক্কা, টুক্করী, ত্রিবলী, দুন্দুভি, ভেরী, নিঃস্বান, তুম্বকী, কম্বজ, পনর, কুন্তলী, শর্কর, টমকী, মণ্ড, মট্ট, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, উপাঙ্গ এবং দরী ॥

স্বরলিপির প্রাচীন পরিচয়

"ভারতবর্ষে স্বরলিপি পদ্ধতি আধুনিক কি পুরাতন? অর্থাৎ পূর্বে ভারতবর্ষে স্বরলিখন প্রণালী ছিল কি না? ছিল না বলেই অনেকের সংস্কার আছে, কিন্তু সে সংস্কার একান্ত ভ্রম জনিত ও অনালোচনা সম্ভূত। যেহেতু অতি প্রাচীন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রমাণ আছে, ভারতবর্ষে পূর্ব্বে স্বরলিখন প্রণালী ছিল। গমক, মূর্চ্ছনা, তাল, বাঁট, মাত্রা প্রভৃতি জ্ঞাপক চক্র, গবাক্ষাকৃতি প্রভৃতি নানাপ্রকার চিহ্ন ও বিশ্রামজ্ঞাপক পদ্ম চিহ্ন তৎকালে ব্যবহৃত হত (১)। সার্ উইলিয়মজোন্স্ মহোদয় যে সুবিখ্যাত সোমেশ্বর প্রনীত 'রাসবিবোধ' নামক সংস্কৃতগ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বন করে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত বিষয়ক বস্তু দিয়ে নিজের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, (২) তাতেও ভারতবর্ষীয় পুরাতন স্বরলিপি-পদ্ধতির কথা সুস্পষ্ট, লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে স্বরলিখিন প্রণালী যে পুরাতন এ বিষয়ে অন্যান্য প্রমাণও ক্রমে উপস্থাপিত হচ্ছে, তা অবহিত মনে দৃষ্টি করলেই পাঠকবর্গ জানতে পারবেন। আল্পিয়াস এবং গোএডেন্সিয়াস নামক দু'জন গ্রীক গ্রন্থকর্তার লেখার উপর নির্ভর করে প্রসিদ্ধ বোইথিয়স বলেন, বিখ্যাত দর্শন-শাস্ত্রোজ্ঞ পিথাগোরস্ নামক গ্রীক পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইউরোপ খণ্ডে স্বর

---

(১) কৌতুহলী পাঠকবর্গ এসিয়াটিক রিসার্চেস্ তৃতীয় বালম দেখলে প্রাচীন হিন্দুদের স্বরলিপি পদ্ধতি যে কেমন ছিল তার আদর্শ কিছু জানতে পারবেন।

(২) হিন্দু সংগীতে ঈশ্বর মত (ব্রহ্মার মত), ভরত মত, হনুমন্তমত এবং কল্লিনাথ ঋষি প্রণীত মত, এই প্রধান চারটি মত প্রচলিত আছে। বিখ্যাত সোমেশ্বর এই চারমতই সংগ্রহ করে স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সোমেশ্বরের গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়, তিনি অত্রিবংশসম্ভূত, মহাতেজস্বী, সঙ্গীতাচার্য্য জনৈক ব্রাহ্মণ। দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রেও এঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। ইনি ইন্দ্রপ্রস্থ নগরাধিপতি মহারাজ রাজপালের অতিপ্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। জেম্স প্রিন্সেফ্ সাহেব কৃত এসেজ্ অন ইণ্ডিয়ান্ আন্টিকুইটিস্ নামক গ্রন্থে রাজপালের রাজ্যকাল খৃষ্ট জন্মের ৭০ বৎসর পূর্বে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

লেখার পদ্ধতি প্রথমে সংস্থাপিত হয় (৩)। তখন এখনকার মত রেখার উপরে এবং অভ্যন্তরে লিখিত বিন্দুদ্বারা স্বর লেখা ব্যবহার ছিল না; কেবল সুরের নামগুলি গ্রীক জাতীয় বর্ণদ্বারা লিখিত হত। খৃঃ জন্মের ১৪৬ বৎসর পূর্ব্বে রোমেনেরা গ্রীসদেশ জয় করে তদ্দেশবাসীদের উৎকৃষ্ট শিল্প বিদ্যাদি গ্রহণ করে সেই সব বিষয়ের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন, বিশেষতঃ পোপ প্রথম গ্রেগরি নামক—রোমীয় ধর্মাধ্যক্ষ ঐ গ্রীক স্বরাক্ষর গ্রহণ করে দুর্জ্ঞেয় অংশ সকল একেবারে পরিত্যাগ করে অন্যবিধ উপায় দ্বারা সরল নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন। পোপগ্রেগরি খৃঃ ছয় শতাব্দীর শেষভাগে কথিত স্বরলিপির বিশুদ্ধরূপ করেছিলেন। (১) সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থকার বার্ণিসাহেব বলেন, খৃঃ দশ শতাব্দীতে ওজ নামক একজন রোমীয় মঙ্ক কর্ত্তৃক রেখা ব্যবহার পদ্ধতি প্রথম সৃষ্ট হয়, সে সময়ে আট বা নয়টি রেখা ব্যবহার হত, ঐ প্রতিরেখার আদিভাগে এক একটি স্বরাক্ষর লেখা থাকত। কেউ কেউ বলেন হার্পযন্ত্রস্থ তন্ত্রীর অনুকরণ করার জন্যই এই রেখাগুলি ব্যবহৃত হত। যাই হোক্—তখন রোমীয়েরা আমাদের মত তিনটি সপ্তকমাত্র ব্যবহার করত; বস্তুতঃ তাই স্বভাবসিদ্ধ। খাদসুরের আবশ্যক হলে বড় অক্ষর এবং চড়া সুরের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হত। সেই থেকে ক্রমে ইউরোপে স্বরলেখা পদ্ধতির অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে। বার্ণিসাহেব বলেন, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আটটি রেখার উপরে সাঙ্কেতিকচিহ্ন বিন্দুদ্বারা সুর লেখা হত। পরিশেষে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গিডোনামক (২) জনৈক মঙ্ক ইউরোপীয় সঙ্গীতের লিপিপদ্ধতির সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি রেখার উপরে এবং অভ্যন্তরে লিখিত বিন্দুদ্বারা স্বরলেখার পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন এবং এঁর সেই সৃষ্ট পদ্ধতিই অধুনাতন ইউরোপীয় স্বরলিপি পদ্ধতি অনেকাংশে বিশুদ্ধরূপে সংস্থাপিত হয়। সার্ উইলিয়ম জোন্স্ সাহেব উক্ত গিডো, মঙ্ক্ সঙ্কলিত পরিশুদ্ধ স্বরলিপি প্রণালীর সংগে আমাদের এই ভারতবর্ষীয় প্রাচীন স্বরলিপির সরলতার তুল্যতাজ্ঞানে বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

কথিত আছে গ্রীকজাতীয় পিথাগোরস্ ইউরোপে প্রথমে স্বরলেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কালক্রমে তুর্কী ব্যতীত সমুদয় ইউরোপখণ্ডে তাহা ব্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে গ্রীকজাতিরা (১) মিসর এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য দেশ হতে শিল্প দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্যতা লাভ করে, সুতরাং স্বরলেখার আদর্শটি পিথাগোরস্ যে কোন্ দেশীয় কোন্ জাতি হ'তে গ্রহণ করেছিলেন

---

(৩) বিখ্যাত বার্ণিসাহেব প্রণীত সঙ্গীত ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

(১) হামিলটন কৃত মিউজিক গ্রামার নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

(২) গিডো স্বরলিপি পদ্ধতি বিশুদ্ধরূপে সংশোধন করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি কালের অর্থাৎ সময়ের নিয়ম অথবা তার চিহ্ন স্থির করেননি, ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্রাঙ্কোনামক ব্যক্তি দ্বারাই খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে কালের নিয়ম স্থির হয়।

(১) রাহু নামক গ্রহের পুত্রগণ গ্রীকদেশে বাস করেছিলেন, সেইজন্য গ্রীসদেশকে গ্রহদের দেশ অথবা গ্রাহিক বলা হয়।—(এসিয়াটিক-রিসার্চেস্)

তা বিশেষ বিবেচনাধীন। যেহেতু বার্ণিসাহেব কৃত সংগীত ইতিহাসে দেখা যায়, গ্রীকজাতিরা সংগীতের অধিক ভাগই মিসর এবং আসিয়ামাইনার হতে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু স্বরলেখার প্রণালীর বিষয় কোথাও কিছুই লেখা নেই বরঞ্চ উক্তগ্রন্থের একস্থানে লেখা আছে, মিসরবাসী এবং ইহুদীজাতিদের স্বরলেখার প্রণালী ছিল না, সুতরাং এ স্থলে এই বিচারে আসছে যে গ্রীকরা তাহলে ওই পদ্ধতি কোন্ স্থান হতে সংগ্রহ কোরল? ভারতবর্ষ এবং মিসরে যে প্রথম সভ্যতা স্থাপিত হয়, তা সর্ববাদিসম্মত। এসিয়াটিক রিসারচেস্ এবং অন্যান্য গ্রন্থেও এর পোষকতা দেখা যায়। যাইহোক্—এই বিতর্কে না গিয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় কথিত আছে, গ্রীসদেশীয় অনেক বিদ্যার্থী জ্যোতিষ, ত্রিকোণমাপণ, ন্যায়, দর্শন এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদি শিক্ষা করতে এই জ্ঞানভাণ্ডার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাতে ভারতবর্ষ হতে কথিতশাস্ত্র সমুদয় সংগৃহীত হয়ে গ্রীসদেশে সংস্থাপিত হয়॥

পোকক্ নামক সাহেব কৃত ইণ্ডিয়া ইন্গ্রীস নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে, গ্রীক জাতিদের বিদ্যাপার্জন ও সভ্যতা লাভ ভারতবর্ষ হতেই। ভারতবর্ষীয়দের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম, প্রবৃত্তি প্রভৃতির সংগে গ্রীকদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি প্রভৃতির সংগে অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ পিথাগোরস্ও স্বয়ং ভারতবর্ষে এসে চিকিৎসা শাস্ত্র, তত্ত্ববিজ্ঞান, আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ক মত শিক্ষা করে স্বদেশে গিয়ে প্রচলিত করেন। (এ কথা ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়া’ গ্রন্থে লেখা আছে।) অধিকন্তু এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা গ্রন্থের নবম খণ্ডে স্পষ্ট লেখা আছে পিথাগোরস্ মিসর দেশে সংগীত শিক্ষা করেন নি (১)। সুতরাং তিনি যে ভারতবর্ষ হতে সংগীত শিক্ষা করেন এবং ভারতবর্ষ হতেই স্বরলিপি করার অভিপ্রায় গ্রহণ করে স্বদেশে গিয়ে লিপিপদ্ধতি সংস্থাপন করেন। এ কথা যুক্তিমত সম্পূর্ণ সম্ভব বলে মনে হয়।

আরো দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে যেমন ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরের আদিবর্ণ মাত্র গ্রহণ করে স্বরলিপি করার ব্যবহার ছিল, গ্রীসদেশেও সেইরূপ বর্ণের দ্বারা সুর লেখা হত। অধিকন্তু আমাদের ঐ বর্ণের সংগে কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহার হত, গ্রীকদের মধ্যে সে প্রথা বড় একটা ছিল না। যাই হোক্—এ বিষয়ে যে আমাদের সংগে গ্রীকদের কতক সৌসাদৃশ্য ছিল তা বলতেই হবে (২)।

---

(১) খৃঃ জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরে সঙ্গীতের চর্চা ছিল না। (এন্সাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা, বালম ৯।)

(২) এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ গ্রন্থে লিখিত আছে, বাদী, সংবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, এই কয়েকটি শব্দ যেমন আমরা রাগে ব্যবহার করি, গ্রীকরাও তেমনি সংবাদী, অনুবাদী, বিবাদীর ন্যায় হোমফোনিয়া, প্যারাফোনিয়া এবং এন্টিফোনিয়া এই তিন শব্দ ব্যবহার করত। ‘এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা’ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে সংগীত কাষ্ঠিক, যান্ত্রিক এবং আঙ্গিম, এই তিন ভাগে যেমন বিভক্ত হয়ে থাকে, গ্রীকদেরও পূর্বে ঐরূপ তিন ভাগে ছিল। উইলার্ড সাহেব বলেছেন—তালাদি নিরূপণ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীকদের ভারতবর্ষের সহিত ঐক্য ছিল।

পূর্বে এ কথা বলা হয়েছে যে, ভারতবাসীদের সংগে গ্রীকদের আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি প্রভৃতির অনেক সমতা ছিল, অতএব আমাদের সংগে গ্রীকদের সংগীত শাস্ত্র ও সঙ্গীতাঙ্গ স্বরলিপি পদ্ধতির সমতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সৌসাদৃশ্য থাকলে তা একই আকারে উৎপন্ন বোধ হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং এর দ্বারা প্রতিপন্ন হচ্ছে গ্রীসদেশীয়েরা ভারতবর্ষ হতে তা গ্রহণ করে। অতএব স্বর লিখন প্রণালী যে ভারতবর্ষের পুরাতন, তাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকছে না। তবে কালক্রমে গ্রীকদের সংগীতের রীতি রুচিভেদে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে সেই সংগে সংগে স্বরলিপি পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হয়েছে, আমাদের সংগীতের প্রকৃতি তদবস্থই আছে এবং সেই বহুকাল পূর্ব্বের ঋষিগণ প্রণীত স্বরলিপি-পদ্ধতিও অপরিবর্ত্তিত রূপেই থেকে এসেছে। কেউ তার সমুন্নতি সাধনে যত্ন নেন নি। উন্নতি সাধন দূরে থাকুক, এ দেশে স্বরযোগে রাগাদি লেখার চর্চা পর্যান্তেরও লোপাপত্তি ঘটে গেছে, এখন গেছল বলা হবে। যদি কেউ বলেন যে, স্বরলিপি প্রথা যদি পুরাতন তবে তার লোপ হল কেন? এর উত্তর এই কাল ও অদৃষ্টক্রমে ভারতবর্ষ যবন হস্তগত হওয়াতে আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনার বিলুপ্তাবস্থা হয়ে পড়ে এবং সংস্কৃতশাস্ত্র হতাদৃত হওয়ায় শাস্ত্রানুগত সংগীতেরও হতাদর হয়, পরন্তু হিন্দুশাস্ত্র বিদ্বেষী যবন রাজারা হিন্দুদের সংগীতের উৎকর্ষে এতদূর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, দ্বেষভাবে ওর অন্যান্য অংশ পরিত্যাগ করেও ক্রিয়াসিদ্ধাংশটি কোন মতেই ত্যাগ করতে পারেন নি, তাঁরা মৌখিক রূপেই সংগীত শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ওই জাতির আধিপত্য হেতু কালক্রমে হিন্দুদের পক্ষেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত হয়ে এসেছিল, অর্থাৎ তখন থেকে হিন্দুরাও কেবল শিক্ষকের (ওস্তাদের) মুখ বিনিঃসৃত ও স্বকপোলকল্পিত কথার উপর নির্ভর করে সংগীত শিক্ষা করে আসছিলেন; কণ্ঠে কয়েকটি গান এবং যন্ত্রাদিতে-কিঞ্চিৎ ক্রিয়া শিক্ষা করতে পারলেই কৃতার্থ জ্ঞান করতেন। এই সকল কারণ বশতঃ এখনও যাঁরা সংগীত শিক্ষা করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রের প্রতি যত্ন করেন না সুতরাং স্বরলিপির পক্ষেও মনোযোগ তেমন নেই। সংগীতের শাস্ত্র এবং স্বরলিপির পদ্ধতি ব্যবহার না থাকায় ওস্তাদদের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ মতভেদ এবং তারজন্য বিবাদ পর্যান্ত ঘটে উঠে, লিপি নিয়ন্ত্রিত থাকলে তা কেউই অপলাপ করতে পারতেন না, ফলে তা ছিল না বলে কম আক্ষেপের বিষয় নয়। অতএব সংগীত শাস্ত্রানুগ করে না রাখলে কোনকালেই কোনরূপে তার সমুন্নতির সম্ভাবনা নেই এবং শাস্ত্রানুগত সংগীত চর্চার ন্যায় বিলুপ্তাবস্থা স্বরলিপি পদ্ধতিরও পুনঃ প্রচার অত্যাবশ্যক। এই অভিমত আগেকার জন্য বিশেষ করে ছিল।

সঙ্গীতসার গ্রন্থকার বলেছেন,—যবন রাজাদের অধিকারকালে হতাদৃত হওয়ায় আমাদের কতকগুলি মূল্যবান সংগীতগ্রন্থ লোপ পেয়ে এবং কতকগুলি স্বরলেখা চিহ্নও সেই গ্রন্থাদির সংগে লোপ পেয়ে যায়। যে সকল চিহ্ন এখন পর্যান্ত বর্ত্তমান আছে তাও যথানিয়মে স্পষ্টরূপে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সুতরাং তার দ্বারা স্বরগ্রামযোগে আবশ্যক মত রাগাদি লেখা সম্যক সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এজন্য পূর্বরীতি স্থির রেখে আবশ্যক মত কতক কতক চিহ্ন সংগ্রহ করতে স্থির করেছি। যদি এরূপ কেউ

বলেন, বহুকাল পরিশ্রম-সংশুদ্ধ বিশ্বপ্রচলিত ইউরোপীয় পদ্ধতি সত্ত্বে—এই প্রাচীন অসম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত;—সংস্কৃত পদ্ধতির সংগে কতক কতক অংশ নূতন প্রস্তুত করত সংযোজনানন্তর গ্রহণ করার ফল কি? তার উত্তর এই—ইউরোপীয় স্বরলিপির বিশ্বপ্রচলিতত্ব সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অস্বীকার করি। যেহেতু ওই পদ্ধতি কেবল ইউরোপখণ্ডের সংগীত লেখার পক্ষে আবশ্যক হতে পারে (১)। তুর্কী ব্যতিত ইউরোপীয় সমগ্রজাতির মানসিক ভাবধারা প্রায় একইরূপ, এজন্য তাদের সংগীতের প্রকৃতিও একরূপ হওয়া উচিতও বটে। কিন্তু তা বলে পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য জাতির সংগীতের মর্ম একরূপ হ'তে পারে না, সুতরাং একই প্রকার স্বরলিপির দ্বারা যে অন্যান্য যাবতীয় দেশের সংগীত লেখা সম্ভবপর হ'তে পারে একথা আমি কদাচ স্বীকার করি না। পূর্ব্বে বলা হয়েছে, চীন, পারস্য, আরব্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি এশিয়াস্থ সমুদয় দেশে আপন আপন সংগীতের প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বরলিপি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় সংগীত লেখার পক্ষে ইউরোপীয় স্বরচিহ্ন সম্যক সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হলেও ভারতবর্ষীয় সংগীতের প্রকৃতি তার দ্বারা লিপিবদ্ধ করতে গেলে, কথিত সংস্কৃত পদ্ধতির সংগে যেমন কতকগুলি নূতন চিহ্নের যোগ আবশ্যক করে—তেমনি ইউরোপীয় পদ্ধতির সংগেও নূতন চিহ্নের যোগ আবশ্যক করে। আমাদের নানাজাতীয় রাগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্চ্ছনা, গমক, বিক্ষেপ, কৃন্তন ইত্যাদি বিষয় এবং অতি তীব্র অতি কোমল সুর, সুরের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ (যাকে শ্রুতি বলে) সর্বদা ব্যবহার হয়। সুতরাং যদি কতকগুলি নূতন চিহ্ন প্রস্তুতি করা না যায়, তাহলে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কথিত দুরূহ কাজ সমুদয় নির্বাহ হওয়া অসম্ভব। ইউরোপীয়েরা মূর্চ্ছনা, গমক, বিক্ষেপ, শ্রুতি ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করে না, সুতরাং এ সকল কঠিন ক্রিয়া রক্ষার নিমিত্ত কোন চিহ্নের প্রয়োজন তাঁদের হয় না। অণু, অর্দ্ধ এবং অসমমাত্রাদিসম্পন্ন নানা জাতীয় ছন্দের অনুযায়ী যতিপ্রধান (মাত্রাপ্রধান) তাল আমাদের সংগীতে সর্বদা ব্যবহার হয়। ওই সকল তালে অণু (সিকি), অর্দ্ধ এবং অসমমাত্রাদি থাকার জন্য এমন একটু একটু বক্রগতি আছে যে, যে সকল ইউরোপীয় "বার" (কাল নিয়ামক রেখা বিশেষ) অনুযায়ী লেখা অতি দুষ্কর। দু'টি দু'টি, চারটি, চারটি সমান মাত্রায় এক এক "বার" বিভাগ করাই ইউরোপীয় রীতি। তাদের সমভাগ ব্যতীত অসমান নিয়মে "বার" বিভাগ নেই, এবং তা ব্যবহার নেই। আমাদের তালসমূহে অঙ্কের রেখার দ্বারা ছন্দের উচ্ছাসসম্, শূন্যাদি যেরূপ ব্যবহার হয় তা-ও ইউরোপীয় রীতিতে সম্ভব হবে না। যাইহোক এ বিষয়ে আর অধিক লেখার প্রয়োজন করে না। ১৮৬০ খৃঃ ১৪ই মার্চ শনিবার সংখ্যা ২৩৩. বালাম (প্যারাগ্রাফ্) ৯, লণ্ডন-নগরীর সংগীত এবং নাটাসংক্রান্ত আর্‌চেষ্ট্রা নামক সাপ্তাহিক সমালোচন পত্রের ৩১৭ পৃষ্ঠায় সম্পাদক স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, ইউরোপীয় স্বরলিপি-পদ্ধতি অনুসারে ভারতীয় সংগীত লেখা কোন

---

(১) ইউরোপীয় তুর্কীতে ইউরোপীয় স্বরলিপি ব্যবহার নেই, যেহেতু তাদের সংগীতের প্রকৃতি ভিন্ন। উইলার্ড সাহেব বরঞ্চ ভারতবর্ষীয় সংগীতের প্রকৃতির সংগে তুর্কীসংগীতের প্রকৃতি কতক অংশে তুল্যরূপ বলে লিখেছেন।

ক্রমেই সম্পন্ন হয় না। সম্পাদক আরো বলেন, হিন্দুদের যে প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরবিভাগ প্রণালী প্রচলিত আছে, তা আমাদের বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। হিন্দু সংগীতের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ-হুইটন সাহেব প্রাচীন সংগীত বিষয়ক যে বক্তৃতা করেন, তাতেও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে হিন্দুদের সংগীত কোন ক্রমেই লেখা যায় না॥”

সঙ্গীত-সার গ্রন্থকার এ বিষয়ে আরো অনেক যুক্তি প্রদান করেছেন। আমি সেগুলি উদ্ধৃত করার আর আবশ্যক আছে মনে করলাম না॥

‘সঙ্গীত-সার’ গ্রন্থ রচয়িতার নাম—পণ্ডিতার্ণব-ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। ইনি বিষ্ণুপুর ঘরাণার আচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের শিষ্য এবং ওই স্থানেরই মানুষ। রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতচার্য্য ছিলেন। ইনি বহু প্রাচীনকালের আদি স্বরলিপির অবদান অবলম্বন করে যথাযথ উন্নত পদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। এই স্বরলিপিকে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি বলে। বহুপরে জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় আকারমাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবন করেন। তার অনেক পরে স্বর্গত বিষ্ণুনারায়ণ-ভাতখণ্ডজীর স্বরলিপি পুস্তক প্রকাশ পায়।

দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিকে সর্ব্বতোভাবে আমাদের গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা করে ভারতের ঐতিহ্য বজায় রাখা বিশেষ কর্তব্য আছে বলে মনে করি।

আমার মতে বিশ্বের সুসভ্য জাতির সংগে ভারতের শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের লিখনপ্রণালী দ্বারা ক্রিয়া-সিদ্ধির যোগাযোগ স্থাপনে একমাত্র দণ্ডমাত্রির স্বরলিপিই যথোপযুক্ত। উক্ত পদ্ধতির সংগে কেবল স্বরসমূহের সাংকেতিক চিহ্ন দরকার। সেই প্রয়োজন এইরূপভাবে নির্দ্ধারণে নিষ্পন্ন হতে পারবে। যথা,—‘সা’ এর জন্য , রে- , গ- , মা- , প- , ধা- , নি-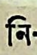, সা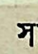 ॥ উক্ত স্বরচিহ্নগুলির উপর রেখার টান থাকায় কোমল কড়ি এবং মাত্রাদির চিহ্ন রক্ষা করার অসুবিধা কিছুমাত্র থাকছে না।

দণ্ডমাত্রিক এবং আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সাংকেতিক চিহ্নাদি—

দণ্ডমাত্রিক—একমাত্রা স্বরের উপর একটি দাঁড়ি, দুইমাত্রা—দু’টি, তিনমাত্র—তিনটি দাঁড়ি ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রা—স্বরের মাথায় ‘চন্দ্রবিন্দু’, সিকিমাত্রা ‘ডমরু’, একতৃতীয় অংশমাত্রা—ত্রিশূল, দুই তৃতীয়াংশ মাত্রা—‘বাণ’, অষ্টমাংশ মাত্রা—‘যব’, ষোড়বাংশ মাত্রা—‘নক্ষত্র’ এই চিহ্নসমূহ। স্বর—স, ঋ, গ ম, প, ধ, নি। কোমলচিহ্ন ‘ত্রিকোণ’, কড়িমধ্যম—পতাকা। নিম্নসপ্তক-স্বরের নিম্নে ‘বিন্দু’, উর্দ্ধসপ্তক-স্বরের উপর ‘বিন্দু’। আশচিহ্ন-স্বরের নীচে—‘সরলরেখা’, মীড়চিহ্ন—দুটি সরল-রেখা’, স্পর্শস্বর—স্বরের মাথার কাছে ‘ক্ষুদ্রস্বর’। পুণরাবৃত্তি—‘বন্ধনী’। তালের চিহ্ন—১-২-৩-০। সমের চিহ্ন ‘ক্রশ’।

আকারমাত্রিক—একমাত্রা—স্বরের পাশে একটি ‘আকার’, দুইমাত্রা—দুইটি ‘আকার’ ইত্যাদি।

অর্দ্ধমাত্রা—স্বরের পাশে 'বিসর্গ', সিকিমাত্রা-স্বরের পাশে একটি 'শূন্য' চিহ্ন। স্বর—স-র-গ-ম-প-ধ-ন। চারটি কোমল—ঋ, জ্ঞ, দ, ণ। কড়ি মধ্যম-'ক্ষ'। নিম্নসপ্তক—স্বরের নীচে 'হসন্ত'। উর্দ্ধ-সপ্তক—স্বরের মাথায় 'রেফ'। তালের সমের চিহ্ন এক বা দুই অঙ্কের মাথায় 'রেফ' চিহ্ন।

স্বরলিখন আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে ভাষার ব্যবহারিক অক্ষরাদির মধ্যে দিয়েই সমাধা হয় বলে সমস্ত ছাপাখানায় প্রকাশের সুবিধা থাকায় বাংলাদেশে এখন এই পদ্ধতিই বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিতে অনেকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের আবশ্যক হয়। যাই হোক বিচারের দিক দিয়ে দণ্ডমাত্রিকের লিখন নীতিকে উৎকৃষ্ট বলতেই হয়। কারণ—প্রথমতঃ কোমল-কড়ি স্বর যথাযথ উচ্চারণের উপর বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। তারপর স্বরের নীচে অক্ষর এবং উপরে মাত্রা এবং কোমলাদি চিহ্ন এবং তালাংক,—দৃষ্টির এক নিমেষেই প্রতিয়মান হয়; —মাত্রা সংখ্যার গণনার জন্য দৃষ্টি সরাতে হয় না। তাছাড়া পূর্বেই লিখেছি এর সাংকেতিক চিহ্নসমূহকে অবলম্বন করে স্বরের জন্য সঙ্কেত নিরাকরণ করে নিলেই সেই লিখন পদ্ধতি বিশ্বজনীন হতে পারবে।

এই গ্রন্থে ছাপার পরিস্থিতির জন্য রাগের রূপপরিচয় ইত্যাদিতে আমার মাত্রিক পদ্ধতির লিখন নিয়ম গ্রহণ করলাম।

'সঙ্গীত-সার' গ্রন্থের রাগসমূহের প্রাচীন প্রথায় ব্যবহারিক সময়ের নির্ঘণ্ট

প্রভাত,—১ দণ্ড হতে ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত— ভৈরব, রামকেলী, যোগীয়া, বাঙ্গালী, ভৈরবী, খট্ট, আশাবরী, গান্ধারী, ভট্টিহারিকা বা ভাটিয়ারী। ৬ দণ্ড হতে ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত—বিভাস, দৈবগিরি, কুকুভা, আলাইয়া, পটমঞ্জরী,—আমীর খস্‌রু রচিত সেফর্দ্দা বা সরফ্‌র্দা,—বক্‌সুরচিত—শুক্লবেলাবলী বা সুখল্‌বেলাওল। ১১ দণ্ড হতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত "তানসেন রচিত—দরবারীটোড়ী;" সুলতান হোসেন রচিত—সোহাটোড়ী, সুঘরাইটোড়ী, নাচারীটোড়ী, জোয়ানপুরীটোড়ী," এইগুলি, "বক্‌সু রচিত—বাহাদুরিটোড়ী" এই একটি, সিন্ধুড়া, সিন্ধু, কাফী-সিন্ধু, টোড়ী, কাফীটোড়ী, লক্ষ্মীটোড়ী, গুজ্জরী-টোড়ী, মুদ্রাটোড়ী, খট্টটোড়ী। ১৬ দণ্ড হতে ২০ পর্য্যন্ত—বৃন্দাবনী সারঙ্গ, মধুমাধবীসারঙ্গ, সামন্ত সারঙ্গ, গৌড়সারঙ্গ, "তানসেন রচিত মিঁয়াসারঙ্গ,"—এইটি মাত্র, পাঠহংসিকা বা বড়হংসসারঙ্গ, শুদ্ধ সারঙ্গ। ২১ দণ্ড হতে ২৪ দণ্ড পর্যন্ত—ভীমপলশ্রী, রাজবিজয়, ধানী, ধবলশ্রী; "সুলতান হোসেন রচিত—মুলতানী বারোঁয়া, পিলু, মালিগৌরা।" ২৫ দণ্ড হতে ২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত—ধানশ্রী, মালশ্রী, পুরিয়া-ধানশ্রী, পূর্বী, বারাটী, আহিরী। ২৯ দণ্ড হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—শ্রীরাগ, চিত্রাগৌরী, ত্রিবণী, মারোয়া বা মালব, শ্রীটঙ্ক, সারগিরি বা সাজগিরি। রাত্রি ১ দণ্ড হতে ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত—হাম্বীরী শ্যাম, কেদারী, ছায়ানট, কামোদী। ৬ দণ্ড থেকে ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত— কল্যাণ, শুদ্ধরাগ, পুরিয়া,

“খস্রু রচিত—ইমন, ইমন-কল্যাণ, ইমন-পুরিয়া,” জয়জয়ন্তী, ভূপালী। ১১ দণ্ড হতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত— শুদ্ধকানড়া,— (তানসেন একে উৎকৃষ্ট ভেবে দরবারী নামে বিখ্যাত করেন। এই রাগটি বাদশা-আক্‌বরের অতিপ্রিয় ছিল)—নায়কী কানড়া, কৌশিকী কানড়া, “সুলতান হোসেন রচিত—হোসেনি কানড়া,” “অন্যের রচিত-আড়ানা, সাহানা,” নাগধ্বনিকানড়া মুদ্রাকানড়া, বাগীশ্বরীকানড়া খম্বাবতী বা খাম্বাজ, কলিঙ্গড়া বা কালাংড়া। ১৬ দণ্ড হতে ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত—বিহাগ, “অন্যের রচিত-ইমনবিহাগ,” বিহঙ্গবিহাগ, বিহঙ্গড়া, অরুণবিহাগ, সংকীর্ণ, সম্পূর্ণ, টঙ্ক, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, রতিবাহী বা রৈণী। ২১ দণ্ড হতে ২৫ দণ্ড পর্য্যন্ত—নটনারায়ণ, কেদারনট। ২৬ দণ্ড হতে ২৯ দণ্ড ২৯ দণ্ড পর্য্যন্ত—মালকোশ, হিণ্ডোল, সোহিনী। ৩০ দণ্ড সময়ে-ললিত॥

কোটেশন্ যুক্ত যবন কর্ত্তৃক সৃষ্ট কয়েকটি রাগ ছাড়া বাকী সমস্তগুলিকে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা পূর্বতন সংস্কৃত রাগ-রাগিনী বলেছেন। সময়ের সংগে রাগসমূহের ব্যবহারের এই নির্ঘণ্ট পরবর্ত্তী সময়ের সঙ্গীত-মঞ্জরী, সঙ্গীত-চন্দ্রিকা, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মধ্যে যে সময় নিরূপণ করা আছে তাতে অনেকগুলি রাগের ব্যবহার উক্ত নির্দ্ধারণ থেকে বেশ পৃথক হয়ে আছে।

প্রকৃতির ভাবরূপের সংগে রাগের স্বভাবগত মিলন-সম্বন্ধের বিচারে শেষোক্ত গ্রন্থগুলিতে বিশেষ সতর্কতার উপর বিচার ধরে রাগরূপ ব্যবহারের সময় নিরূপণ করা আছে। আমি আমার এই গ্রন্থে যেভাবে রাগগুলিকে প্রাতঃকালের প্রথম প্রহরের প্রথম মূহুর্ত হতে পরের পর ব্যবহারের জন্য স্থান নির্ণয় করেছি তা শেষোক্ত গ্রন্থগুলির বিচারসহ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে এবং তার সংগে নিজ ধ্যান-চিন্তার দ্বারা বিচারবোধকে ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে।

আমার বিশ্বাস আমার এই সময় নির্দ্ধারণ সংগীতসুধীগণের নিকট যথোপযুক্তভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারবে॥

এক সময়ের বহুরাগ ও মিশ্র রাগরূপ সৃষ্টির তালিকা

মিশ্ররাগ এবং যে সকল রাগ সংযোগে উৎপত্তি তাদের নাম।

রাগ অংশী - ধবলশ্রী এবং গৌড় হতে। অজয়পাল—গুজ্জরী, বিহাগ এবং কেদারী হতে। অনন্ত গৌড়—বসন্ত, গান্ধার ও হরশৃঙ্গার হতে। অরুণ—মল্লার, কানড়া এবং নট্ হতে। অরুণ বিহাগ—মল্লার, বিহঙ্গ এবং কানড়া হতে। আনন্দ ভৈরব—শঙ্করাভরণ এবং কানড়া হতে। আহীর নট—আহীরী এবং নট্ হতে। আহীররূপ—হোসেনি, আহীরী, ধানশ্রী এবং তোড়ী হতে। কর্ণাটগৌড়—বেলাবলী, কর্ণাট ও গৌড় হতে। কদম্বনট্ : ধানশ্রী, কানড়া, আহীরী কেদারী নট্ এবং মধু মাধবী হতে। কর্পূরগৌরী—জ্যোতিঃ, খাম্বাবতী, জয়তশ্রী, টঙ্ক এবং বরাটী হতে। কর্ম পঞ্চম—ললিতা, বসন্ত, হিণ্ডোল এবং দেশকার হতে। কলহংস—মধু, শঙ্কর বিজয় এবং আহীরী হতে।

কল্যাণ কামোদ বা কল্যাণ বিনোদ—কল্যাণ এবং নট্ হতে। কাফী—আশাবরী, ভৈরবী এবং গুজ্জরী হতে। কুমারী—গৌরী এবং মালশ্রী হতে। কুলয়ার—বেলাবলী, কানাড়া নট্ এবং মল্লার হতে। কেদার নট—কেদারী এবং নটনারায়ণ হতে। কোলাহল (প্রকৃত নাম কোহল)—বিহঙ্গড়া, কল্যাণ ও কানড়া হতে। কোয়রবী—সারঙ্গ, সোহা, গুজ্জরী এবং গৌরী হতে। গম্ভীর নট—কানড়া এবং নট্ হতে। গাম্ভারী—সারস্বৎ এবং ধানশ্রী (সংগ্রহ কর্ত্তা গণেশ) হতে। গোপীকামোদী—কামোদ এবং কেদারী হতে। চৈত্রী—সামন্ত. ললিতা এবং পুরিয়া হতে। জয় কল্যাণ—জয়শ্রী এবং কল্যাণ হতে। জয়াবতী—ধবলশ্রী, বেলাবলী এবং স্বরস্বতী হতে। জলধর কেদার—মেঘ ও কেদারী হতে। জোয়ানপুরী তোড়ী (জৌনপুরি)—তোড়ী, কুকুভা এবং সিন্ধুড়া হতে। জ্যোতির্গৌরী—ললিতা এবং গৌরী হতে। টঙ্ক—শ্রী; কানড়া এবং ভৈরব হতে। ঠুংরী (১)—মারু, খাম্বাবতী, ঝিঝিটী এবং লুম্। দরবারী তোড়ী—তোড়ী ও কানড়া হতে। দক্ষিণ নট্—কুকুভা, বেলাবলী, পুরবী, কেদারী এবং নট্ হতে। দীপাবতী—দীপক এবং স্বরস্বতী হতে। ত্বর্গা—মালশ্রী, লীলাবতী, গোরী এবং সারং হতে। দেওয়ালী (২)—গান্ধারী, মালশ্রী এবং স্বরস্বতী হতে। নাগবরাটী—নাগধ্বনী এবং বরাটি হতে। নাচারি তোড়ী—তোড়ী, ফোর্দাস্ত এবং বাঙ্গালী হতে। নারায়ণ গৌড়—বেলাবলী, নট্ এবং গৌড় হতে। নারেস্—বেলাবলী এবং কানড়া হতে। পরমানন্দ—সারং এবং বেলাবলী হতে। পারাবতী—দেবগিরি, পুরবী এবং গৌড় হতে। পিঙ্গল নট্—সারঙ্গ বা সারং, মূলতানী এবং নট্ হতে। প্রতাপবরাটি—নট্, বিহঙ্গড়া এবং বরাটী হতে। প্রুলুই—দেবগিরি, মালশ্রী, পুরবী এবং কর্ণাট। ফোর্দস্ত-পুরবী, শ্যাম এবং গৌড়ী হতে। বহুল গুজ্জরী—দেশকার. বাঙ্গালী, রামকেলী এবং গুজ্জরী হতে। বহুলী—রামকেলী, গুজ্জরী. দেশকার, বাঙ্গালী এবং পঞ্চম (কোন মতে বাঙ্গালী রাগের অংশ এতে স্বীকৃত হয় না) হতে। বাহাত্বরি তোড়ী—তোড়ী, টঙ্ক এবং কানড়া হতে। বিচিত্রা—শঙ্করাভরণ, চৈত্রী, গৌরী এবং বরাটী হতে। বিজয়—তোড়ী, খাম্বাবতী এবং পুরিয়া হতে। বিরাগবরাটি নায়কীকানড়া এবং বরাটী হতে। রিহঙ্গবিহাগ—পঞ্চম এবং বিহাগ হতে। মঙ্গল গুজ্জরী—শ্যাম, গুজ্জরী এবং গান্ধারী হতে। মঙ্গল্যাষ্টক—জয়শ্রী, কানড়া, কেদারী, কল্যাণ, মঙ্গল, বিভাস, নট্ এবং বিহঙ্গ হতে। মঞ্জুঘোষা—শ্রী এবং ছায়ানট হতে। মধু—শুদ্ধ, বসন্ত, বেলাবলী এবং নট্নারায়ণ হতে (চৈত্র মাসেই এই রাগ গাওয়া হত)। মধু মিথুন—নট্নারায়ণ. মল্লার, হাম্বীর এবং মধুমাধবী। দ্বাপর যুগে মহাবীর কর্ণ এই রাগ সৃষ্টি করেন। মনোহর—মারওয়া এবং গৌরী হতে। মল্লারনট্—মল্লার এবং নট্ হতে। মাজ—সারঙ্গ, সুরট, বেলাবলী এবং মল্লার হতে। মাল গুজ্জরী-গৌরী এবং শরৎ হতে। মালাবতী-পঞ্চম, কামোদ, নট্ এবং হাম্বীর হতে। মিয়াঁর সারঙ্গ—সারঙ্গ, জয়জয়ন্তী এবং কানড়া হতে।

---

(১) জানি খাঁ নামক জনৈক অযোধ্যা নিবাসী ব্যক্তির ঔরসে গোলাম নবীর জন্ম হয়, এই গোলামনবীর ভাঙ্গেরণ বা সোরী নাম্নি এক প্রণয়িনী ছিল। আমরা যে সোরীর টপ্পা বলে জানি তা গোলামনবীই প্রস্তুত করে তাঁর

মুদ্রাতোড়ী—তোড়ী এবং বাগীশ্বরী হতে। রতিবল্লভ—নট্, সারঙ্গ এবং ভৈরব হতে। রতিবাহি—কল্যাণ এবং পরাজিকা হতে। রম্ভাবতী—মালশ্রী এবং মল্লারী হতে। রহস্যমঙ্গল—শঙ্করাভরণ, অরুণ এবং সুরট হতে। রাওরান্‌সি—ললিতা, লীলাবতী এবং চৈত্রী হতে। রাগেশ্বর—ভৈরব, কানড়া, আশাবরী এবং গৌরী হতে। রাজনারায়ণ নট্—পুরিয়া, তোড়ী এবং নট্ হতে। রাজহংস—মালব, শ্রী এবং মনোহর হতে। (এই রাগটি ভরত গান করতেন)। রূপশ্রী—শ্রী এবং বসন্ত হতে। লক্ষ্মীতোড়ী—সিন্ধু, তোড়ী এবং ললিতা হতে। লীলাবতী—দেশকার, জয়শ্রী এবং ললিতা হতে। শঙ্করবিজয়—মালিগৌড়া, হাম্বীর এবং নট্‌নারায়ণ হতে। ভগবান শঙ্কর কর্তৃক ত্রিপুরাসুর পরাজিত হলে ত্রিপুরান্তক সানন্দে এই রাগ সৃষ্টি করে গান করেছিলেন। তাই এই রাগের উক্ত নাম॥ শঙ্করানন্দ—শঙ্করা, বিহাগ এবং নট্ হতে। শশিরেখা—ললিতা, সারঙ্গ এবং বেহাগ হতে। শিবরতিকা—বড়হংস এবং সিন্ধু হতে। শ্রীরুবন্—শঙ্করাভরণ এবং শ্রী হতে। শ্রীসম্মদ্—ভীমপলশ্রী, শ্রী এবং টঙ্ক হতে। সংকীর্ণ—বেলাবলী এবং কলিঙ্গড়া হতে। সচীবল্লভ—গুণকেলী, গান্ধারী এবং শ্যাম হতে। সরস্বতী—নটনারায়ণ এবং শঙ্করা হতে। সামন্তসারঙ্গ—সারঙ্গ এবং মল্লারী হতে। সুখরণ—বেলাবলী এবং ফোরদস্ত্ হতে। সোহাতোড়ী—সোহা এবং তোড়ী হতে। সৌদামিনী—সোহিনী এবং ঝিঝিটী হতে। স্তম্ভ—মালশ্রী এবং মল্লারী হতে। হংস—সারঙ্গ এবং কলিঙ্গড়া হতে। হরশৃঙ্গার—পঞ্চম এবং কৌশিকী হতে। হরাক্ষ—বেলাবলী, দেওসাক্, সারঙ্গ, শুদ্ধ, মল্লারী এবং গৌণ্ড হতে। হোসেনীকানড়া—কানড়া এবং হরাক্ষ। ক্ষটাঙ্গ—জয়শ্রী, কেদারী এবং বিভাস হতে। ক্ষেম—কানড়া, সরস্বতী এবং কল্যাণ হতে॥

গৌড়ের মহারাজ বল্লালসেন বাহাদুরের দরবারের সঙ্গীতাচার্য্য লোচনপণ্ডিত প্রণীত "রাগ-তরঙ্গিনী" গ্রন্থে বহু প্রকারের রাগের নামোল্লেখ আছে এবং তারমধ্যে কয়েকটিকে জনকরাগ ধরে তার থেকে যে সমস্ত রাগ উৎপন্ন হয়েছে সেগুলি যথাযথ নিয়মে ধার্য্য হয়ে আছে।

বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাচীন চর্চার পরিচয় সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ বিরাট এক স্বীকৃতি স্বাক্ষর হয়ে আছে। উক্ত গ্রন্থের রাগগুলির নাম আমার গ্রন্থে উদ্ধৃত করে রাখবার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় তার সমগ্র দলিলটি অভিসন্ধীমূলকভাবে আমার হস্তচ্যুত হয়ে পড়ায় এতবড় গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য বিষয়বস্তুটিকে উদ্ধৃত করে রাখতে পারলাম না।

ঐ পত্নীর নামে বিখ্যাত করেছিলেন। সেই থেকে ওই নামানুসারে গোলামনবী রচিত টপ্পা সোরীর বলে প্রচলিত রয়েছে; বস্তুতঃ সোরী মিয়াঁর প্রকৃত নাম গোলামনবীই এবং ইনিই ঠুংরী রাগ ও গানের সৃষ্টিকর্তা। প্রায় একশ পঁয়ষট্টি বছর আগে পঞ্চাশ বছর বয়েসে ইনি লক্ষ্ণৌএ দেহ ত্যাগ করেন॥

(২) যবনেরা রাগ-রাগিনী প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রায় অধিক ভাগই হিন্দুদের অনুকরণে প্রস্তুত করেছিলেন। আমাদের যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা এবং দোলযাত্রাতে হিণ্ডোল রাগের ব্যবহার হয়, যবনেরাও ওই অনুকরণে দেওয়ালী পর্বে আমাদের জন্য দেওয়ালীরাগের সৃষ্টি করেছিলেন। "সঙ্গীত-সার"।

রাগ ও রাগিনীর বিবরণ—

সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা অনুযায়ী রাগ-রাগিনীর জন্ম পরিচয়ের যে বিবরণ আছে তাতে দেখা যায় কোন মতে ছয় রাগ—ছত্রিশ রাগিনী, কোন মতে ছয় রাগ—ত্রিশ রাগিনী এবং কোন মতে কুড়িটি রাগ। আবার এক মতে যা রাগ অন্য মতে তা রাগিনী। প্রত্যেক রাগের রাগিনী সম্বন্ধেও ঐক্য নেই। রাগের পুত্রাদি সম্বন্ধেও তদ্রুপ।

শাস্ত্রকাররা বলেছেন, শাস্ত্রীয়সংগীতে চার প্রকার মতই প্রধান, যথা,—ব্রহ্মার মত, ভরত মত, হনুমন্ত মত এবং কল্লিনাথ মত। এই চার ব্যক্তির স্থান, কাল, সময় ইত্যাদির সঠিক পরিচয়ের কোন সন্ধান কোন গ্রন্থে আছে বলে তা জানা নেই। কল্লিনাথে মতের ছয় রাগ ব্রহ্মার মতের অনুগামী হওয়ায় এবং ভরত মতের ছয় রাগ হনুমন্ত মতের অনুগামী হওয়ায় আসলে দুটি মতই প্রধান হয়ে আছে।

ভারতের প্রধান প্রধান প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের নাম—

দক্ষিণ দেশবাসী নায়কগোপাল (ব্রহ্মণ), হরিদাস স্বামী তানসেনের গুরু); তানসেন (রামতনু পাঁড়ে) (১), গন্ধর্ব সেন, সুরত সেন, রাজামান (২) বৈজু.-উপাধি বাউরা, ভন্নু, পাণ্ডবী, ভগবান দাস, বাবারামদাস. ঐ পুত্র সুরদাস (৩), মদনরাও. রাজবাহাদুর (৪) চণ্ডু. সুরথসেন, তুলসীদাস (৫) লক্ষ্মণদাস. দেবীলালা, জ্ঞানদাস, ঢুণ্ডি, আমীর খস্‌রু ১). জৌনপুর নিবাসী সুলতান হোসেন সির্কী (২), তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ (৩), চাঁদ খাঁ ও সুরজ্ খাঁ (৪). সেখ্ বিচ্ছু, মিরজাআক্কিল, সুজান খাঁ, গুলাব খাঁ, খুসাল খাঁ, নুর খাঁ, মহম্মদ খাঁ, মৌলদাদ, অলিয়স. মচ্ছু, ভর্বর,

---

(১) তানসেন ছিলেন অক্‌বর্ বাদশাহের দরবার গায়ক এবং দিল্লী রাজধানীতে একজন প্রধান রাজসভাসদ্ মধ্যে গণনীয় ছিলেন। অক্‌বর্ সম্রাটের রাজ্যকাল ১৫৫৬ খৃঃ অব্দ হতে ১৫৮৬ পর্য্যন্ত।

(২) কর্‌নেল্ এ, কনিং হম্‌স্ আর্চিয়লজিকল্ রিপোর্ট্‌স্ গোয়ালিয়র বৃত্তান্তে ৫৭।৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে রাজামান অতি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত এবং সঙ্গীতপ্রিয় নরপতি ছিলেন। ১৪৮৬ খৃঃ অব্দ হতে ১৫১৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র রাজ্যের অধিশ্বর ছিলেন।

(৩) সুরদাস অতি সুকবি এবং ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর রচিত যে সমস্ত পদাবলী আছে, তাতে বুঝা যায় তিনি অক্‌বরের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। সুরদাস অন্ধ ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ছিল। এসিয়াটিক্ রিসারচেস্ ১৬ বালম ৪৮ পৃষ্ঠায় উইলসন্ সাহেব লিখেছেন— সুরদাস ১২৫০০০ পদাবলী প্রস্তুত করেছিলেন। বারাণসীর একক্রোশ উত্তরে শিবপুর নামক গ্রামে সুরদাসের সমাধি হয়।

(৪) গলা চেপে বাজখাই পদ্ধতিতে যে এক প্রকার গান করার প্রথা আছে, বাজবাহাদুর সেই পদ্ধতির স্রষ্টা।

কৃষ্ণ জীবন হরে লক্ষ্মীরাম, রাজামান, সুলতান আলাউদ্দীন, মহারাজ নওলকিশোর, মহারাজ আনন্দ কিশোর বিখ্যাত বীণকার ফিরজ খাঁ, নহবৎ খাঁ, সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ (৫) নুর খাঁ (৬), পিয়ার খাঁ, বীণকার জীবন সা, গোলামরসূল, শক্কর, মাক্ষণ, মহম্মদ খাঁ. সজ্জু খাঁ সোরি (১), হাম্‌দম্ (২) মিরাবাঈ (৩), নির্ম্মলসা, মিয়াঁগস্থু, লছ্‌মীপ্রসাদ, সারদাসহায়. গোপালপ্রসাদ (৪) বীণকার নাসির্ আহম্মাদ, হসসু খাঁ, করিম খঁা, দ্বিতীয় হস্‌সু খাঁ, হর্দ্দু খাঁ, কাঁশী নিবাসী বীণকার মহম্মদ খাঁ, বড়মিঁয়া, ছোট মিয়াঁ, বীণকার ওয়ারিস্ আলি খাঁ, রবাবী বাসদ্ খাঁ, ঐ ভ্রাতষ্পুত্র সাদ্‌কলি খাঁ, কাঁশী নিবাসী সেতারী বাজপেয়ী, কুমার সিং প্রভৃতি উত্তম গুণী বলে প্রসিদ্ধ। ভবাণীপ্রসাদ, লালা কেবল্‌কিষণ, পীরবক্স, কদৌসিং বদৌসিং, হন্নু সিং, জোৎসিং এবং গোলাম আব্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তব্‌লা বাদনেও দক্ষ ছিলেন।

পরে আরো যে সমস্ত বিখ্যাত গায়ক বাদক ছিলেন আমার জানিত তাঁদের নাম, যথা,—মহারাষ্ট্রের ধ্রুপদী বিশ্বনাথ রাও (বসবাস কোলকাতা), কাশীধামের ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র (বসবাস কোলকাতা), বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক কাশীনাথ, ধ্রুপদী দৌলত খাঁ (শেষ জীবনে বসবাস-কোলকাতা), লছমীপ্রসাদ মিশ্রের পুত্র ধ্রুপদী হোরীয়া মিশ্র (কোলকাতা), ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (বিষ্ণুপুর), ধ্রুপদ ও সুরবাহার সেতার বাদক রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর), ধ্রুপদ ও সুরবাহার বাদক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর), ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর), গায়ক ও যন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর), ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী (বিষ্ণুপুর). ধ্রুপদ গায়ক মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কোলকাতা), ধ্রুপদ গায়ক ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলকাতা), এরা ত্রজন রাধিকাপ্রসাদের ছাত্র ছিলেন। ধ্রুপদ গায়ক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলকাতা), আলাপ ও ধ্রুপদ গায়ক আসাবন্দ্ খাঁ এবং তৎপুত্র নসীরুদ্দীন খাঁ (আলোওয়ার ষ্টেট), বিখ্যাত খেয়াল গায়কগণ—আলেয়াকতে খাঁ (কাশ্মীর), গুরুপ্রসাদ মিশ্র (কোলকাতা), গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নুলো (কোলকাতা), বড় মহম্মদ খাঁ (দিল্লী), নসীর্ খাঁ (দিল্লী), মজঃফর খাঁ (দিল্লী), আলতাফ্ খাঁ (পঞ্চকোটরাজ এবং কাশ্মীর নিবাসী), আশিক্ আলি খাঁ (কাশ্মীর), আহম্মদ খাঁ—ফজল্ খাঁ, মৈজুদ্দীন খাঁ (কোলকাতা), হনুমান দাস (গয়া), ফৈয়াজ খাঁ, (বরোদা), আবতুল করিম খাঁ প্রভৃতি। টপ্পায় বিখ্যাত—রম্‌জান মিঁয়া (কোলকাতা),

---

বাজবাহাতুর খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে মালোয়া প্রদেশে রাজ্য করেন। হিন্দু—রূপবতী নামে তাঁর এক গুণবতী রাণী ছিলেন। নৃত্য বিষয়ে তাঁর অতীব নৈপুণ্য ছিল। সার্‌জন্‌মাল্‌কম্ সাহেব কৃত মধ্যহিন্দুস্থান এবং মালোয়ার বৃত্তান্তের ২য় সংস্করণের প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) তুলসীদাস রচিত রাম-সীতা বিষয় নিয়ে বহু রাগরূপযুক্ত বিস্তর পদাবলী দেখা যায়। এসিয়াটিক্ রিসারচেস্ ১৬ পরিচ্ছেদের ৫০ পৃষ্ঠায় উইলসন্ সাহেব বলেন, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যকালে ১৬৮০ সম্বতে শ্রাবণী শুক্ল সপ্তমীতে গঙ্গাতীরে তুলসীদাস লোকান্তরিত হন।

রাম চট্টোপাধ্যায় (কোলকাতা), তারের যন্ত্রে—সুরবাহার ও সেতারে বিখ্যাত সজ্জাদ মহম্মদ খাঁ,—ইমদাদ্ খাঁ, তৎপুত্র ইনায়েত খাঁ, বীণ বাদনে বিখ্যাত—মজিদ্ খাঁ (রামপুর ষ্টেট) কাশীর জমিদার শিবেন্দ্রনারায়ণ বসু প্রভৃতি। সরোদ বাদনে—ফিডাহুসেন খাঁ, কেরামত্ উল্লা খাঁ। (কলিকাতা) বেঞ্জবাদনে - কৌকুভ খাঁ (কোলকাতা), ইত্যাদি। রবাব বাদনে—মহম্মদ আলি খাঁ (গিধৌড়রাজ), সাদ্দিক্ আলি খাঁ (ত্রিপুরা ও ঢাকা)। চর্মবাদ্যে—বিখ্যাত মৃদঙ্গবিদ্ মাখনলাল চৌবে (বৃন্দাবন), শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র (জামতড়া রাজ), গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিষ্ণুপুর), ঈশ্বরচন্দ্র সরকার (বিষ্ণুপুর), কীর্ত্তিচন্দ্র গোস্বামী (বিষ্ণুপুর), দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কোলকাতা), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কোলকাতা।

---

(১) এল্‌ফিনিসটন্ সাহেব কৃত পঞ্চম সংস্করণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৩৮০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ঘায়েসউদ্দীন বালবানের রাজত্বকালে বিখ্যাত কবি আমীর খস্‌রু ঘায়েসউদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র মহম্মদ কর্ত্তৃক পারস্য দেশ হ'তে ভারতবর্ষে আনীত হন। বালবান্ ১২৫৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডার ডো সাহেব কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২১ পৃষ্ঠায় দেখা যায় ১৩২৫ খৃঃ অব্দে ঘায়েসউদ্দীন টোগলকের রাজ্যের শেষকাল পর্য্যন্ত আমীর খসরু ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। উইলার্ড সাহেব কৃত ট্রিটিজ অন্‌দি হিন্দু মিউজিক গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজ্যকালে আমীর খস্‌রু বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইনি অসামান্য সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন।

একটি কিম্বদন্তী আছে—নায়ক গোপাল সঙ্গীত বিদ্যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদয় প্রদেশ জয় করে সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজধানী দিল্লীতে উপস্থিত হলে আমীর খস্‌রু তাঁকে কৌশলক্রমে নাকি পরাজিত করেছিলেন। আলাউদ্দীনের রাজ্যকাল ১৩১৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল। ইনি প্রায় ২০ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন। এল্‌ফিনিস্‌টন্ কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আমীর খসরুর বিষয় ঐক্য করে দেখলে আমীর খস্‌রু ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন, তারপর আমীরের বৃত্তান্ত কোন ইতিহাসাদিতে লক্ষিত হয় না।

(২) ধারণা ইনি খেয়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

(৩) তানসেনের পুত্রদ্বয় (৪) ঐ পুত্রদ্বয়।

(৫) ভ্রাতৃদ্বয় ও খেয়াল-ধামারের প্রথম গায়ক বলেই পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) কলাবৎ।

(১) টপ্পা গানের স্রষ্টা। ইনি মহম্মদশার রাজত্বকালে প্রকাশ পেয়েছিলেন। মহম্মদশার রাজত্বকাল ১৭১৯ খৃঃ হতে ১৭৪৮ পর্য্যন্ত।

(২) ইনিও একজন প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক বলে বিখ্যাত।

(৩) অক্‌বর্‌শা বাদশাহের রাজ্যকালে সুবিখ্যাত মিরাবাঈ তানসেন কর্ত্তৃক রাজসভায় প্রথম আনিত হন। মিরাবাঈ মাটা নগরের জনৈক গ্রাম্য রাজার কন্যা, উদয়পুরের রাজার সহিত তাঁর বিবাহ হয়। এঁর অন্যান্য বৃত্তান্ত এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ ১৬ পরিচ্ছেদের ২২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

(৪) লছমীপ্রসাদ ও গোপালপ্রসাদ এঁরা দু'জন সহোদর ভ্রাতা এবং কাশীধামের বিখ্যাত প্রাচীন মিশ্র ঘরানার গুণী ছিলেন।

প্রভৃতি। তব্‌লাবাদনে বিখ্যাত—আবিদ্‌ হুসেন খঁা, বীরুমিশ্র (৺কাশী), কণ্ঠ মহারাজ (৺কাশী), অবনীবাবু (ঢাকা) প্রভৃতি ।

এই সমস্ত নাম ছাড়া ১৯১৭ সাল হতে কয়েকটি নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে উপস্থিত থেকে আরো অনেক বিখ্যাত গায়ক-বাদকদের সঙ্গীত শ্রবণ করেছিলাম, তাঁদের নাম স্মরণে নেই ॥

নৃত্য বিষয়ক—*

মতঙ্গ এবং ভরতাদি ঋষির মতে সাঙ্গাভিনয় দ্বারা ভাব প্রকাশের নাম নর্ত্তন। নর্ত্তন প্রথমত তিন প্রকার, যথা,--নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। অভিনয় দ্বারা লোকের নানা প্রকার অবস্থা প্রকাশ করাকে নাট্য বলে।

অভিনয়।—অভি উপসর্গের সংগে 'নী' ধাতুর যোগে অভিনয় শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অভির অর্থ সম্মুখীকরণ এবং 'নী'র অর্থ প্রাপণ, সুতরাং ধাতু ও উপসর্গযোগে এই অর্থ প্রতীতি হচ্ছে যে, যে প্রক্রিয়া দ্বারা প্রয়োগ সকলকে সাক্ষাৎ ঘটনার ন্যায় দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে তাকে অভিনয় বলা যায়। অভিনয় আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্তিকভেদে চার প্রকার ।

আঙ্গিকাভিনয়।—কেবল অঙ্গ বিক্ষেপ দ্বারা যে অভিনয় প্রদর্শিত হয় তাকে আঙ্গিকাভিনয় বলে। আঙ্গিকাভিনয় আবার তিন প্রকার, যথা,—শরীর, মুখজ ও চেষ্টাকৃত। মস্তক, হস্ত, বক্ষ এবং পাদাদি অবয়ব কৃতাভিনয় শারীর ; চক্ষু ও ভ্রূবিকারাদি প্রকাশিত অভিনয় মুখজ, এবং নিশ্বাস, উচ্ছাস, অক্ষিপুটের সম্মিলন, পতন ও ঘুর্ণনাদিকৃত অভিনয় চেষ্টাকৃত ।

বাচিকাভিনয়।—কেবল নাটকাদি লিখিত বাক্য দ্বারা সম্পন্ন অভিনয়কে বাচিক অভিনয় বলে।

আহার্য্যাভিনয়।—হার, কেয়ুর, কিরীটাদি বিবিধ ভূষণ প্রদর্শনকে আহার্য্য অভিনয় বলে।

সাত্ত্বিকাভিনয়।—যার দ্বারা সমুদয় ভাবের সত্ব অর্থাৎ হর্ষ-শোকাদি জনিত মনের বিকার বিশেষ অনুভূত হয় তাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। যে অভিনয়ে স্তম্ভ (নিস্তব্ধতা), স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ (গাত্র কণ্টকিত হওয়া), স্বরভঙ্গ (গলার স্বর বিকৃত হওয়া), বেপলু (কম্পন্‌), বৈবর্ণ (শরীর বিবর্ণ হওয়া) অশ্রু (চোখের জল), এবং প্রলয় (চৈতন্যনাশ), এই আট প্রকার সাত্ত্বিকভাবের চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাকে সাত্ত্বিকাভিনয় বলে।

নৃত্য।—ধ্রুবত্ব, স্থিরতা, রেখা, ভ্রামনী, দৃষ্টি, অশ্রান্তি, প্রীতি, মেধা, বাক্য এবং গীত এই দশপ্রাণ প্রতীত তালমান লয়াশ্রিত সবিলাস অঙ্গ-বিক্ষেপকে নৃত্য বলে।

তাণ্ডব ও লাস্যভেদে নৃত্য দু'রকম হয়ে থাকে। তারমধ্যে পুরুষ নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রীনৃত্যকে

---

* নৃত্যবিদ্যার মধ্যে যে বিরাট শিক্ষা ও সাধনার বিষয়বস্তু আছে এবং কত কঠিন যে তাকে আয়ত্তে আনা সে বিষয়ের কিছু পরিচয় প্রদান করলাম।

লাস্য বলে। তাণ্ডবের আবার দু' রকম ভেদ আছে, যথা,— পেবলি তাণ্ডব ও বহুরূপ তাণ্ডব। অভিনয় বর্জ্জিত অঙ্গ বিক্ষেপ মাত্রকেই 'পেবলি' এবং ছেদন, ভেদন প্রভৃতি নানাবিধ অভিনয় যুক্ত অঙ্গ বিক্ষেপকে বহুরূপ তাণ্ডব বলে। তাণ্ডবের মত লাস্যেরও যৌবত ও ছুরিত এই দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়। নানাপ্রকার লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক নর্তকীগণ যে নৃত্য করে তাকে যৌবত লাস্য এবং নায়ক নায়িকারা নানা রস ভাবাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদি পূর্বক যে নৃত্য করে তাকে ছুরিত লাস্য বলে। কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ছুরিত শব্দের পরিবর্ত্তে স্ফুরিত শব্দ ব্যবহার করে গেছেন। যদিও এই নামগত বৈষম্য আছে কিন্তু ক্রিয়াগত কোন বৈষম্য নেই।

রস।—সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব সকল বক্ষ্যমান-ভাব, বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাব দ্বারা ব্যক্ত হয়ে আস্বাদ্যমান হয়ে আনন্দজনক হ'লে রস নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

ভাব।—নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিকারকে ভাব বলে।

বিভাব।—যার দ্বারা রসের জ্ঞান জন্মে তাকে বিভাব বলা যায়। আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দু'রকম হ'য়ে থাকে। যাকে অবলম্বন করে উৎসাহাদি স্থায়ীভাবের উদয় হয় তাকে আলম্বন বিভাব বলে। যেমন নায়ক-নায়কাদি। স্থায়ীভাবের উদ্দীপককে উদ্দীপন বিভাব বলে। যেমন— চন্দ্রকিরণ, ভূষণগৃহ ও তম্বুলাদি।

অনুভাব।—যার দ্বারা মনোগত ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তার নাম অনুভাব। যেমন কটাক্ষাদি।

ব্যভিচারিভাব।—নির্ব্বেদ, আবেগ, শ্রম, দৈন্য, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিরোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব, মরণ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, উন্মাদ, উৎসুক্য, শঙ্কা, স্মরণ, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিবাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক— এই তেত্রিশ প্রকার ভাব অবিচলিত রত্যাদি স্থায়ীভাবে কখনও প্রাদুর্ভূত, কখনও তিরোহিতভাবে সঞ্চরণ করে বলে এরা ব্যভিচারিভাব নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

রসের প্রকারভেদ।—নাট্যকারদিগের মতে রস আট প্রকার, যথা,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত। এই আট রকম রসের আটটি স্থায়ীভাব আছে। শৃঙ্গার-রসে—রতি, হাস্যরসে—হাসি, করুণরসে—শোক, বীররসে—উৎসাহ, রৌদ্ররসে—ক্রোধ, ভয়ানক-রসে—ভয়, বীভৎসরসে—জুগুপ্‌সা (নিন্দা, কুৎসা), এবং অদ্‌ভুত রসে—বিস্ময় স্থায়ীভাব।

রতি।—যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনের ভাব বিশেষকে রতি বলে। ভাব ও কটাক্ষাদি তাহার হেতু, প্রেম তার অঙ্কুর, মান তার পল্লব, প্রণয় তার কলিকা, স্নেহ তার প্রসূন, অনুরাগ তার ফল।

কটাক্ষ।—কলাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা চক্ষুর তারার বিচিত্র বিবর্ত্তনকে কটাক্ষ নামে নির্দেশ করেন।

শ্বেত, শ্যাম এবং শ্বেতশ্যাম ভেদে কটাক্ষ তিন প্রকার হয়ে থাকে।

নৃত্য।—নৃত্তাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সর্বপ্রকার অভিনয়শূন্য গাত্রবিক্ষেপ মাত্রকে অর্থাৎ যাতে কোন অভিনয়ের সম্পর্ক নেই—কেবল চিত্তানুরঞ্জক নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে নৃত্ত বলে গেছেন। নৃত্তের তিন প্রকার ভেদ আছে, যথা—বিষম, বিকট ও লঘু। শস্ত্র সঙ্কট স্থানে বা শূন্যে রজ্জু টাঙ্গিয়ে তার উপর নানা গতি বৈচিত্রকে বিষম নৃত্ত বলে। অঙ্গের বা কেশাদির বৈরূপ্য প্রদর্শন-পূর্বক নৃত্ত করাকে বিকট নৃত্ত বলা যায় এবং সামান্য উপকরণ সম্পন্ন উৎপ্লুতাদি (উল্লম্ফন, ভাসা) গতির নাম লঘু নৃত্ত।

কোন কোন পণ্ডিত নর্ত্তনের এরূপ বিভাগ না করে একেবারে নাট্য, নৃত্য, তাণ্ডব, নৃত্ত, লাস্য, বিষম, বিকট, লঘু, পেবলি এবং গৌণ্ডলী এই দশ রকম বিভাগ করেছেন কিন্তু উপরোক্ত বিভাগ অনেকের অনুমোদিত বলে ওই মতটিও উদ্ধৃত করা হল। বিদ্যাধরাদি সঙ্গীতজ্ঞেরা নৃত্য এবং নৃত্ত এই দু' রকম ভেদ স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে নৃত্য ও নৃত্ত একই প্রকার।

প্রবন্ধাদি নৃত্যে সূত্রধার, নট, নটী, বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, বিষ্কম্ভক, সময়, নায়ক, নায়িকাদির প্রবেশাদি, ভাষা, ভাষাঙ্গ, রাগ, রাগাঙ্গ এবং ক্রিয়াঙ্গ এই সকল বিষয়ের আবশ্যক হয়।

সঙ্গীত কুশল বদান্য ভাবুক নৃপ অথবা কোন প্রধান পুরুষ সুস্থ শরীর সভ্যগণের সহিত রঙ্গভূমিতে উপবেশন করলে সূত্রধার বা নর্ত্তক অথবা নর্ত্তকী আপন বৃন্দ সম্প্রদায় সমভিব্যাহারে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করবে। চারজন প্রধান গায়ক, আটজন সমগায়ক (দোহার), চারজন মার্দ্দঙ্গিক, চারজন বংশীবাদক এবং কতিপয় ততযন্ত্রবাদক এই সকলের সমবায়ে উত্তম বৃন্দ সম্প্রদায়, তার অর্দ্ধ সংখ্যক হলে মধ্যম বৃন্দ সম্প্রদায় এবং সিকি সংখ্যক হলে অধমবৃন্দ সম্প্রদায় হয়ে থাকে। বৃন্দ সম্প্রদায় রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হলে প্রথমেই বাদকগণ সমবেতভাবে স্ব স্ব যন্ত্রবাদক নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে, পরে গায়কগণ অলিদ্ধ এবং নিবদ্ধ এই দুই প্রকার গীতই গান করবে, তারপর সূত্রধার বা নর্ত্তক অথবা নর্ত্তকী যবনিকার অভ্যন্তরে মনোহর বেশে পুষ্পপূর্ণ পুষ্পপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান থাকবে। যবনিকা নিঃসারিত হলে দর্শকমণ্ডলীর চিত্তমোহিত করে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেই হস্তস্থিত পুষ্পাঞ্জলি রঙ্গভূমির বামপার্শ্বে নিক্ষেপ করবে। কোন কোন নৃত্তজ্ঞ-পণ্ডিত বলেন পুষ্পাঞ্জলির পুষ্প সংখ্যা একুশটি হওয়া উচিত; কোন কোন পণ্ডিতের মতে পুষ্পের কোন নিদিষ্ট সংখ্যা নেই—অঞ্জলিপূর্ণ হলেই হল। পুষ্পগুলি নিক্ষেপের সময় সূত্রধার (নাট্য প্রস্তাবক প্রধান-নট), নর্ত্তক অথবা নর্ত্তকীকে সমপাদ সংহত; লতাকার এবং চতুরস্র এই চার প্রকার আঙ্গিক ক্রিয়ার অধীন হতে হয়।

সমপাদ।— দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে পাদদ্বয় কেবল সরলভাবে দ্বাদশাঙ্গুলি অন্তরে স্থাপিত করার নাম সমপাদ।

সংহত।—দেহ স্বভাবিকভাবে রেখে দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠ এবং গুল্ফদ্বয় পরস্পর মিলিত রাখাকে সংহত বলে।

লতাকার।—হস্তদ্বয় পতাক করে তির্য্যগ্‌ভাবে আন্দোলিত করাকে লতাকার বলে।

চতুরস্র।—পদদ্বয় অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত অন্তরে স্থাপিত হলে তাকে চতুরস্র বলা যায়।

পুষ্পাঞ্জলি বিক্ষেপ সময়ে উক্ত চার প্রকার আঙ্গিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে নন্দ্যাবর্ত্ত, বর্দ্ধমান, সূলু, সৌষ্ঠব, তলপুষ্পপুট, পুষ্পপুট পাদাগ্রতল সঞ্চার অধ্যর্দ্ধিকাচারী প্রভৃতি আরো কতকগুলি নিয়মের অধীনতা স্বীকার করতে হয়।

নন্দ্যাবর্ত।—পাদ বিক্ষেপ সময়ে ছন্দ বা দ্বাদশ অঙ্গুলি অন্তরে পা ফেলার নাম নন্দ্যাবর্ত্ত।

বর্দ্ধমান।—দুই পায়ের পার্ষ্ণি অর্থাৎ গোড়ালী তির্য্যকভাবে (বক্রভাবে) সংস্থাপিত করে পশ্চাৎ ক্রমান্বয়ে সুলু ও গাত্রসৌষ্ঠব প্রদর্শন করার নাম বর্দ্ধমান।

সূলু। নৃত্যতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা মন্দ মন্দ বায়ু হিল্লোলে দীপ-শিখা যেমন মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হয় তেমনি অঙ্গ সঞ্চালনকে সূলু শব্দে নির্দেশ করেছেন।

সৌষ্ঠব।—কটী, জানু, কনুই এবং মস্তক সমভাবে এবং বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করে গাত্র স্বস্থান হতে চালিত করাকে সৌষ্ঠব বলে।

তলপুষ্পপুট।—নিষ্ক্রামনকালে অধ্যর্দ্ধিকাচারী গতিতে পাদ দক্ষিণে এবং ব্যাবর্ত্তন গতিতে হস্ত যুগল দক্ষিণে রেখে পরিবর্ত্তন সময়ে বামপার্শ্ব সম্যক্‌ নত করে করদ্বয় সেই দিকে নিয়ে গিয়ে পশ্চাৎ করদ্বয় পুষ্পপুটাকারে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করাকে তলপুষ্পপুট বলা হয়।

পুষ্পপুট।—হস্তদ্বয় সর্পশীর্ষাকারে মিলিত করাকে পুষ্পপুট বলে।

পাদাগ্রচল-সঞ্চার।—দক্ষিণ পার্ষ্ণি (গোড়ালী) বামদিকে এবং বামপার্ষ্ণি দক্ষিণদিকে স্থাপিত করাকে অধ্যর্দ্ধিকাচারী বলে। কোন কোন পণ্ডিত একেই হংসপাদিকা বলেন।

নাট্যাদিতে আঙ্গিকাভিনয়ের প্রাধান্য থাকে, তাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিষয় আগে জানিয়ে পরে নৃত্যাদির বিষয় লিখিত হল।

মস্তক, বক্ষঃস্থল, করপার্শ্বদেশ, কটি ও চরণ এই ছ'টি অঙ্গ মধ্যে গ্রীবা, বাহু, পৃষ্ঠ, উদর, উরু এবং জঙ্ঘা (জানু) এই ছ'টি প্রত্যঙ্গ মধ্যে এবং ভ্রূ, চক্ষু, নাসিকা, গণ্ড, অধর ও চিবুক এই ছ'টি উপাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অধর, দশন, জিহ্বা, চিবুক, মুখ, চোখ, ভ্রূ, চোখের পাতা, চোখের তারা, কপোল, নাসিকা ও নিশ্বাস এই বারটি মস্তকগত এবং পার্ষ্ণি, গুল্‌ফ, হস্তের অঙ্গুলি, পদের অঙ্গুলি, হাতের তলদেশ, পায়ের তলদেশ, মুখরাগ এবং হস্তের ক্রিয়া এই আটটি অন্যান্য অঙ্গগত উপাঙ্গ। এই সকল অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের কতকগুলি ক্রিয়া নাট্যাদিতে সর্বদা প্রযুক্ত হয়, সেগুলির নামমাত্র এ স্থলে উল্লেখ করা যাচ্ছে।—ধূত, বিধুত, আধূত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও ললিত এই চতুর্দশ প্রকার শিরঃ হয়ে থাকে। কোন কোন নৃত্যশাস্ত্র বিশারদ এই চতুর্দশ ক্রিয়ার সহিত তির্য্যঙ্‌নতোন্নত, স্কন্ধানত, আবাহ্নিক, সম ও পার্শ্বাভিমুখ, এই পাঁচটি অতিরিক্ত যোগ করে উনবিংশতি

প্রকার শিরঃ বলে থাকেন। পাতক, ত্রিপাতক, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ত্তরীমুখ, অরাল, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, ঘটকামুখ, শুকতুণ্ড, কাঙ্গুল, পখকোল, অলপল্লব, সূচীমুখ, সর্পশীর, চতুর, মৃগশীর্ষক, হংসাস্য, হংসপক্ষ, ভ্রমর, মুকুল, উর্ণনাভ, সন্দংশ, তাম্রচূড়, এই চতুর্বিংশতিবিধ অসংযুত হস্ত। অঙ্গুলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, দোলাপুষ্পপুট, উৎসঙ্গ, খটক, বর্দ্ধমান,—এই ত্রয়োদশ প্রকার সংযুক্ত হস্ত। সাকল্যে এই সপ্ত ত্রিংশৎ হস্ত ক্রিয়া অভিনয় এবং নৃত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। চতুরস্র, উদবৃত্ত, তলমুখ, স্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, অরালবটকামুখ, আবিদ্ধবক্ত্র, সূচী, রেচিত, অর্দ্ধরেচিত, নিতম্ব, পল্লব, কেশবন্ধ, উত্তানবঞ্চিত, তল, করিহস্ত, পক্ষবঞ্চিত, পক্ষপদ্যোতক, দণ্ডপক্ষ, গরুড়পক্ষ, উর্দ্ধমণ্ডলী, পার্শ্বমণ্ডলী, উরোমণ্ডলী, উরঃপার্শ্বমণ্ডলী, মষ্টিকাস্বস্তিকাবলী, নলিনীপদ্মকোশ, অলপদ্ম, উল্‌বন, বলিত এবং দলিত,—এই তিরিশ রকম হস্ত কেবল নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। সম, আভগ্ন, নিভগ্ন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত এই পাঁচ প্রকার—বক্ষ; বিবর্ত্তিত, অপসৃত, প্রসারিত, অধোমুখ এবং উন্নত—এই পাঁচ প্রকার পার্শ্ব; কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত্ত এবং রেচিত এই পাঁচ প্রকার কটী,—সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচি অগ্রতল সঞ্চর এবং উদ্ঘট্টিত, এই ছয় রকম চরণ নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হয়।

কেউ কেউ ত্রুটিত, উদ্ঘটিতোৎসেধ, ঘটিত মর্দ্দিত, অগ্রগ, পার্ষ্ণিগ, এবং পার্শ্বগ এই সপ্তবিধ চরণ নৃত্যে নির্দ্দেশ করেছেন।

একোচ্চ কর্ণলগ্ন উচ্ছ্রিত, স্রস্ত এবং লোলিত এই পাঁচ প্রকার স্কন্ধ; সম, নিবৃত্ত, বলিত, রেচিত, কুঞ্চিত, অঞ্চিত, ন্যস্র, নত এবং উন্নত এই নয় প্রকার গ্রীবা, উর্দ্ধস্থ, অধোমুখ, তির্য্যক, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অঞ্চিত, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, উর্দ্ধবেষ্টিত এবং পৃষ্ঠানুসারী, এই দশবিধ বাহু; কারোও মতে আবিক, কুঞ্চিত, নম্র, সরল, আন্দোলিত এবং উৎসারিত এই ছয় প্রকার বাহু; কম্পিত, বলিত, স্তব্ধ, উদ্বাহিত এবং নিবর্ত্তিত এই পাঁচ প্রকার উরু; আবর্ত্তিত, নত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত, পরিবর্ত্তিত এই পাঁচ প্রকার জঙ্ঘা; কারো মতে নিঃসৃত, পরাবৃত্ত, তিরশ্চীন, বহির্গত এবং কম্পিত এই পাঁচ প্রকার জঙ্ঘা। নিকুঞ্চিত, আকুঞ্চিত, চল, ভ্রমিত এবং সম এই পাঁচ প্রকার মণিবন্ধ; সংহত, কুঞ্চিত, অর্দ্ধকুঞ্চিত, নত, উন্নত, বিবৃত এবং সম এই সাত প্রকার জানু; এগুলি প্রত্যঙ্গ, নাট্যাদিতে সর্বদা ব্যবহার হয়ে থাকে।

চক্ষু বা দৃষ্টি।—কান্ত, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্‌ভুত এই আট প্রকার রসদৃষ্টি;—স্নিগ্ধ, হৃষ্ট, দীন, ক্রুদ্ধ, দৃপ্ত, ভয়ান্বিত, জুগুপ্‌সিত এবং বিস্মিত এই আট প্রকার রত্যাদি স্থায়ী ভাবজ দৃষ্টি। শূন্য, মলিন, শ্রান্ত, লজ্জিত, শঙ্কিত, মুকুল, অর্দ্ধমুকুল, জ্ঞান, জিহ্ম, নিকুঞ্চিত, বিতর্কিত, অভিতপ্ত, বিষণ্ণ, ললিভ, আকেকর, বিকোশ, বিভ্রান্ত, বিপ্লুত, ত্রস্ত এবং মদির, এই বিশংতি প্রকার নির্বেদাদি ব্যভিচারী ভাবজ দৃষ্টি। সাকল্যে ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার দৃষ্টি নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

ভ্রু।—সহজ, পতিত, উৎক্ষিপ্ত, রেচিত, নিকুঞ্চিত, ভ্রুকুটি এবং চতুর—এই সাত প্রকার ভ্রুর প্রয়োগ আছে।

পুট বা চক্ষুর পাতা।—প্রসৃত, কুঞ্চিত, উন্মেষিত, নিমোষিত, বিবর্ত্তিত, স্ফুরিত, পিহিত, বিচালিত এবং সম এই নয় প্রকার পুট নাট্যাদির অনুবর্ত্তী।

তারক বা চক্ষুর তারা।-বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুবোধে তারক ভেদ লক্ষিত হয়। তারক প্রথম দুই প্রকার, যথা—স্বনিষ্ঠ এবং বিষয়াভিমুখ। তারমধ্যে ভ্রমণ, চলন, পাত, বলন, প্রবেশন, বিবর্ত্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিষ্ক্রমন এবং প্রাকৃত এই নয় প্রকার তারক স্বনিষ্ঠ এবং সম, সাচী, অনুবৃত্ত, লোকিত, বিলোকিত, উল্লোকিত, আলোকিত এবং প্রবিলোকিত এই আট প্রকার বিষয়াভিমুখি তারক নাট্যাদির অনুকুল। উল্লিখিত নয় প্রকার স্বনিষ্ঠ তারকের মধ্যে সমুদ্বৃত্ত, বলন ও ভ্রমণ এই তিন প্রকার তারক বীর ও রৌদ্ররসে. পাত করুণ রসে. প্রবেশন বীভংস রসে, বিবর্ত্তন হাস্যরসে, চলন ভয়ানক রসে, নিষ্ক্রমন শৃঙ্গাররসে এবং অদ্ভুতরসে প্রাকৃত তারক প্রযুক্ত হয়।

কপোল।—কুঞ্চিত, কম্পিত, পূর্ণ, ক্ষাম, ফুল্ল এবং সম এই ছয় প্রকার কপোলের প্রয়োগ নাট্যাদিতে হয়ে থাকে।

নাসিকা।—স্বাভাবিক, নত, মন্দ, বিকৃষ্ট, বিধুসিত এবং স্বোচ্ছ্বাস এই ছয় রকম নাসা নাট্যাদির উপযোগী।

অধর।—বিবর্ত্তিত, কম্পিত, বিসৃষ্ট, বিনিগৃহিত, সন্দষ্ট এবং সমুদ্গ এই ছয় রকম অধরের প্রয়োগ নাট্যাদিতে থাকে। কেউ কেউ এর সংগে উদ্বৃত্ত, বিকাশী, আয়ত এবং রোচিত এই চারটি যোগ করে দশ রকম অধর নির্দেশ করেন।

দন্ত।—কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, রুচ্ছিত. গ্রহণ, সম. দংষ্ট্র এবং নিষ্কর্ষণ এই আট রকম দন্ত নাট্যাদির অনুগামী।

জিহ্বা।—ঋজু, সৃক্কানুগ, বক্র, উন্নত, লোল এবং লেহনী এই ছয় প্রকার জিহ্বার প্রয়োগ নট্যাদিতে হয়ে থাকে।

চিবুক।—ব্যাদির্ণ, শ্বসিত, বক্র, সংহত, চলসংহত, স্ফুরিত, চলিত এবং লোল এই আট প্রকার চিবুক নাটাাদিতে প্রযুক্ত হয়।

বদন।—ব্যাভুগ্ন, ভুগ্ন উদ্বাহি, বিধূত, বিবৃত এবং বিনিবৃত্ত এই ছয় প্রকার বদন নাট্যাদির উপযোগী।

পার্ষ্ণি বা পায়ের গোড়ালী।—উৎক্ষিপ্ত, পতিতোৎক্ষিপ্ত, পতিত, অন্তর্গত, বহির্গত, নিক্ষেযুক্ত, বিযুক্ত এবং অঙ্গুলি এই আট প্রকার নাট্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

গুল্‌ফ বা পায়ের গাঁট।—অঙ্গুষ্ঠ সংশ্লিষ্ট, অন্তর্গত, বহির্গত, মিথোযুক্ত এবং বিযুক্ত এই পাঁচ প্রকার গুলফ নাট্যাদির উপযোগী।

করাঙ্গুলি।—সংহত, বিষুত, বক্র, চালিত, পতিত, কুঞ্চমুল, এবং প্রসৃত এই সাত প্রকার করাঙ্গুলি নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হয়।

চরণাঙ্গুলি।—অধঃক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, কুঞ্চিত, প্রসারিত এবং সংলগ্ন এই পাঁচ প্রকার চরণাঙ্গুলির প্রয়োগ নাট্যাদিতে দেখা যায়।

পদতল।—পতিতাগ্র, ধৃতাগ্র, ভূমিলগ্ন, উদ্ধৃত, কুঞ্চন্মধ্য এবং তিরশ্চিন—এই ছয় প্রকার পদতল নাট্যাদিতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

মুখরাগ।—মুখরাগ দ্বারা মানবগণের রসানুগত মনোবৃত্তি বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। অতএব মুখরাগের বিষয় কিছুবলা আবশ্যক। স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত এবং স্যাম এই চার প্রকার মুখরাগ নাট্যাদির বিশেষ উপযোগী। সহজ মুখরাগকে স্বাভাবিক মুগরাগ বলে, স্বভাবাভিনয়ে এই প্রকার মুখরাগ ঘটে থাকে। মধুর মুখরাগকে প্রসন্ন বলে। শৃঙ্গার অদ্ভুত এবং হাস্যরসে এই প্রকার মুখরাগ জন্মে। লোহিত মুখরাগকে রক্ত বলে,—বীর, করুণ, রৌদ্র এবং অদ্ভুত রসে এইরূপ মুখরাগ হয়। শ্যামবর্ণ মুখরাগকে স্যাম বলে, বীভৎস এবং ভয়ানকরসে এই প্রকার মুখরাগ দেখা যায়।

হস্ত প্রচার।—নাট্যাদিতে উতান, অধস্তল, পার্শ্বতল অগ্রতল, স্বসম্মুখতল, ঊর্দ্ধমুখ, অধোমুখ, পরাঙ্মুখ, সম্মুখ, উর্দ্ধগ, অধোগ, পার্শ্বগ, অগ্রগ এবং সম্মুখাগত এই পনর প্রকার হস্ত প্রচারের ব্যবহার দেখা যায়।

হস্তকর্ম।—ধ্যান, সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষেপ, রক্ষণ, মোক্ষণ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, উৎকৃষ্ট, আকৃষ্টি, বিকৃষ্টি, তাড়ন, তোলন, ছেদ, ভেদ, স্ফোটন, মোটন, বিসর্জন, আহ্বান এবং অর্জন এই বিংশতি প্রকার হস্তকর্ম নাট্যাদির উপযোগী।

হস্তক্ষেত্র।—নাট্যাদিতে পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ, অধ্র, মস্তক, ললাট, কর্ণস্কন্ধ, নাভি, কটী এবং ঊরুদ্বয়, এই কয়টির স্থানে হাত রেখে অভিনয়াদি কাজ করতে হয়।

অঙ্গ।—যেখানে হাত সেইখানে দৃষ্টি এবং সেখানে মন; যেখানে মন সেখানে ভাব এবং যেমন ভাব সেখানে রস অবস্থিতি করে। গীতাদি রচনা, মুখে গাওয়া, হস্তভঙ্গী বিশেষ দ্বারা গীতের অর্থ প্রকাশ করা, চক্ষু দ্বারা গীতের ভাব দেখান এবং পায়ের দ্বারা তাল নির্ণয় করা এই পাঁচটি নৃত্যের প্রধান অঙ্গ।

গতি।—ভানবী, মৈনী, গজলীলা, তুরঙ্গিনী, হংসী, মৃগী এবং খঞ্জুরিটী—এই সাত রকম গতি নৃত্যাদিতে প্রযুক্ত হয়।

ভানবীগতি।—ভানু অর্থাৎ সূর্য্য প্রতি নিয়তই গগণমণ্ডলে পরিভ্রমণ করছেন কিন্তু তাঁর গতি যেমন কারো লক্ষিত হয় না, সেই রকম অলক্ষিত গতিকে ভানবীগতি বলে। এই রকম গতি দেখতে অতি সুন্দর।

মৈনীগতি।—জলাশয় মধ্যে মীন যেমন অবিশ্রান্তভাবে গমন করে—সেইরূপ অবিশ্রান্ত গতিকে মৈনী গতি বলে।

গজলীলাগতি।—গজ যেমন হেলতে দুলতে মন্দ মন্দ গমন করে সেই রকম গতির নাম গজলীলা-গতি।

তুরঙ্গিনীগতি।—তুরঙ্গ অর্থাৎ ঘোটক যেমন অবিশ্রান্তভাবে দ্রুতবেগে গমন করে সেই প্রকার গতিকে তুরঙ্গিনীগতি বলে।

হংসীগতি।—হংসী যেমন মন্দ মন্দ গমনকালে সর্বদা গমন পরিবর্ত্তন করে, সেই প্রকার পরিবর্ত্তনসহ গতির নাম হংসীগতি।

মৃগীগতি।—মৃগী যেমন সর্বদা চকিতভাবে চারিদিক অবলোকন করতে করতে গমন করে, সেইরূপ নিরিক্ষণপূর্বক গতিকে মৃগীগতি বলে।

খঞ্জরীটিগতি।—খঞ্জনপক্ষী যেমন দুই পা সমানভাবে রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে গমন করে সেইরূপ সলম্ফগতিকে খঞ্জরিটীগতি বলে। পণ্ডিতেরা বলেন এই সাত প্রকার গতির মধ্যে ভানবী, গজলীলা, এবং হংসী এই তিন প্রকার গতি লাস্যে; মৈনী, তুরঙ্গিনী এবং খঞ্জরিটী এই তিন প্রকার গতি তাণ্ডবে নিয়ত প্রযুক্ত হয়ে থাকে। মৃগীগতি তাণ্ডব ও লাস্য দ্বিবিধ নৃত্যেই ব্যবহৃত হতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত উক্ত সাত প্রকার গতি না বলে লাবী, হংসী, মায়ুরী, তুরঙ্গিনী, কুঞ্জরী, তিত্তিরী, কুক্কুটী এবং মৈনী এই আট প্রকার গতি স্বীকার করে গেছেন।

নৃত্যপ্রকরণ—

যতিনৃত্য।—কুট অথচ অত্যন্ত কোমল হস্তপাঠ, বা অদ্রুতাল কিংবা একতালী অথবা যতি (পুনঃ পুনঃ বিরামান্ত বাদ্যখণ্ড দ্বারা নির্মিত যে বাদ্য বিশেষ তার নাম যতি), এই সকল বাদ্যে কূটাক্ষরের সংগে পায়ের পার্শ্ব, অঙ্গুলি, মূল, পার্ষ্ণি এবং চরণের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করতে করতে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাকে যতিনৃত্য বলে। যতিনৃত্যের সংগে অষ্টতালী গান করবার বিধি আছে।

শব্দচালিনৃত্য।—নর্ত্তক এক পায়ে অবস্থিত হয়ে শব্দের বর্ণানুসারে গতি করবে এবং দ্বিতীয় পায়ে দক্ষিণাবর্ত্ত গতি প্রদর্শন করে পর্য্যায়ক্রমে চতুর্মাত্রানিষ্পন্নবার্ত্তিক, দ্বিমাত্রাপ্রযুক্তকলা চিত্র, একমাত্রাসম্পন্ন ধ্রুবক, অর্দ্ধমাত্রানিম্মিত চিত্রতর এবং অণু অর্থাৎ সিকিমাত্রা নিষ্পন্ন চিত্রতম মার্গে গতিকৌশল প্রদর্শন করলে তাকে শব্দচালি নৃত্য বলা যায়।

কারো মতে প্রথমে পাঁচটি মার্গতালে, পরে রাসতালে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তার নাম শব্দচালি। কারো মতে স্থান (স্থিতি), চারী (এক পা গতি), করণ (দুই পা গতি), খণ্ডন (ছয় পা গতি), মণ্ডন (আঠার পা গতি), প্রমাণ (গীতবাদ্যের সহিত নৃত্যের সমতা) ইত্যাদি ভূষিত নৃত্যের নাম শব্দচালি নৃত্য।

উড়ুপনৃত্য।—নেরি, করণনেরি, মিত্র, চিত্র, নেত্র, জারমাপ, মুরু, চুন্ন, লাবনী, কর্ত্তরী, তুল্ল এবং প্রখর এই দ্বাদশ প্রকার নৃত্যকে উড়ুপনৃত্য বলে।

নেরিনৃত্য।—বিলম্বিত লয়াশ্রিত, আদিতালের অনুগত, রেখা (যাতে লোকের চিত্ত ও নয়ন-

রঞ্জন হয় এরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের সন্নিবেশকে রেখা বলে), মুদ্রা (হৃদয়রঞ্জক অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের অবস্থা বিশেষের নাম মুদ্রা), প্রমাণ এবং নানা প্রকার হস্তক্রিয়া ইত্যাদি ভূষিত চতুর্দিকে চক্রাকারে নৃত্যকে নেরিনৃত্য বলে। নেরিনৃত্য আবার নটনেরি, ভাবনেরি, শুদ্ধনেরি, সালঙ্কনেরি এবং সঙ্কীর্ণনেরি এই কয় রকম হয়ে থাকে ।

নটনেরিনৃত্য। নেরিনৃত্য অধিক দ্রুতমানে সম্পন্ন হলে তাকে নটনেরিনৃত্য বলে।

ভাবনেরিনৃত্য।—রসভাবাদিজ্ঞাপক দৃষ্টি সম্বন্ধ নেরিই ভাবনেরি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

শুদ্ধনেরিনৃত্য।--নেরিনৃত্য পতাক হস্তে (অঙ্গুষ্ঠ সঙ্কুচিতভাবে তর্জনীর মূলদেশ স্পর্শ করলে এবং অপরাপর অঙ্গুলিগুলি প্রসারিতভাবে একত্র মিলিত থাকলে পতাক কর বলে) বিভূষিত হলে শুদ্ধনেরিনৃত্য নামে কথিত হয়।

সালঙ্কনেরিনৃত্য।—একত্র সংযুক্ত দুই হস্ত শোভিত নেরিনৃত্যের নাম সালঙ্কনেরি।

সঙ্কীর্ণনেরিনৃত্য।—নেরিনৃত্য কখন সংযুক্ত কখন অসংযুক্ত হস্তে সম্বন্ধ হলে তাকে সঙ্কীর্ণনেরিনৃত্য বলে।

করণনেরিনৃত্য।- নেরিনৃত্য করণ সংযুক্ত হলে করণনেরিনৃত্য নামে অভিহিত হয়।

মিত্রনৃত্য।—যে নৃত্যে ধ্রুব ও অতিচিত্র মার্গ দ্বারা গতি সঙ্কুচিত হয়, যা রূপক-তালের অনুগত এবং পুনঃ পুনঃ হস্ত সঞ্চালন সমন্বিত তাকে মিত্রনৃত্য বলে।

চিত্রনৃত্য।—বিচিত্রগতি বিশিষ্ট রেখা এবং সৌষ্ঠব সমন্বিত, একতালি-তাল ও চিত্রতর মার্গের অনুগত নৃত্যকে চিত্রনৃত্য বলা যায়।

নেত্রনৃত্য।—ক্রীড়াতালের অনুগত, বালকেরা ক্রীড়াকালে যেরূপ চক্র দেয়, সেই প্রকার চক্র ভ্রমন-সঙ্গত, কখন সঙ্কুচিত, কখন বিস্তৃত যতি বিশিষ্ট নৃত্যের নাম নেত্রনৃত্য।

জানমাননৃত্য।—যে নৃত্যে সূচী কখন সম কখন বিষমভাবে এবং স্থূলু মধ্যম লয়ে সম্পন্ন হয়, যা আদি তালের অনুগত তাকে জানমাননৃত্য বলে।

মূরুনৃত্য।—উৎকট অর্থাৎ শস্ত্রাদি সঙ্কট স্থানে সরলভাবে অবস্থিত হয়ে শরীর তির্যগভাবে চারিদিকে মুড়ে ত্রিপতাক হস্ত (ত্রিপতাকহস্ত পতাক হস্তেরই সমান, বিশেষের মধ্যে এতে অনামিকা নত ভাবে বক্র থাকে) পুনঃ পুনঃ ছুড়ে ক্রীড়াতালে যে নৃত্য করা হয় তাকে মূরু নৃত্য বলে।

হুল্লনৃত্য।—একটি পা উচু করে সর্ব শরীর সুন্দররূপে দোলায়িত করত লঘুশেখর তালে যে নৃত্য সম্পন্ন করা হয় তাকে হুলুনৃত্য বলে।

লাবনীনৃত্য।—সমপাদে অবস্থিত হয়ে কটীর ঊর্দ্ধভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে (পায়রা লোটার পূর্বের ন্যায়) ভ্রমণ দ্বারা সম্পন্ন করা নৃত্যকে লাবনীনৃত্য বলে।

কর্ত্তরীনৃত্য।—সমপাদে অবস্থিত হয়ে আদিতালে অতি দ্রুতলয়ে কখন দক্ষিণাবর্ত্তে কখন বা বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করাকে অর্থাৎ প্রকৃত পায়রা লোটাকে কর্ত্তরীনৃত্য বলে।

তুল্ল নৃত্য।—গঞ্জলীল তালে চতুর্দিক ভ্রমণ করে সৌষ্ঠবান্বিত নৃত্য করার নাম তুল্ল নৃত্য।

প্রসার নৃত্য।—হস্ত ও পদ কখন প্রসারিত কখন সঙ্কুচিত করে আদিতালে যে নৃত্য সম্পন্ন করা যায় তাকে প্রসার নৃত্য বলে।

উপ্লুৎতাছ্য নৃত্য।—প্রতি তালে উপ্লুৎতাদি করণপূর্বক নৃত্য করার নাম উৎপ্লুতাছ্যনৃত্য, একে লড়ধ্যাও নৃত্যাও বলে।

রায়বঙ্গাল নৃত্য।—একপায়ে স্থলুবদ্ধ করে অন্য পা বুকের উপর রেখে যে নৃত্য করা যায় তাকে রায়বঙ্গাল নৃত্য বলে।

অরাল নৃত্য।—যে নৃত্যে প্রথমে স্থলুবদ্ধ করে উৎপ্লুত গতি প্রদর্শনপূর্বক পক্ষীর ন্যায় চরণ ভূমিতে পাতিত করত ভ্রামিত হয়ে ভূম্বিত পতিত হতে হয় তাকে অরাল নৃত্য বলা যায়।

নিঃশঙ্ক নৃত্য।—প্রথমে স্থলু পরে উৎপ্লুতি তারপর চরণদ্বয় মিলিত করে স্বস্থান হ'তে দূরে পতিত হওয়ার নাম নিঃশঙ্ক নৃত্য।

কুরুময়ী নৃত্য।—সর্বাঙ্গ জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ঘুর্ণিত করে পাদদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে নিয়ে গিয়ে একটি পায়ের উপর অপর পা'টি ঘুরিয়ে নৃত্য করার নাম কুরুময়ী নৃত্য।

অণ্ডান্তর নৃত্য।—একটি পা সম্মুখে নিক্ষেপ করে অন্য পায়ে তাকে লঙ্ঘন করত শেষে দুই পা সম্মুখ মিলিত করায় যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাকে অণ্ডান্তর নৃত্য বলে।

ডিণ্ডি নৃত্য।—উৎপ্লুত গতি কালে কাপড় নিঙড়াইবার সময় যেমন পাক দেওয়া যায় সেইরূপে দুই পায়ে জড়াইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভূপতিত হওয়াকে ডিণ্ডি নৃত্য বলে।

ঢেঙ্কী-নৃত্য।—দুই পা সমান করে উৎপ্লুত হয়ে একবার এ পাশ একবার ওপাশে পতিত হওয়াকে ঢেঙ্কী নৃত্য বলে।

বীরু নৃত্য।—এক পা ভূমিতে রেখে দ্বিতীয় পা পূর্বের ন্যায় ভূমিতে পাতিত করার নাম বীরুনৃত্য।

পক্ষিশার্দ্দুল নৃত্য।—প্রথমে নানা প্রকার গতিবৈচিত্র্য প্রদর্শন করে হস্তদ্বয় ছেড়ে ভ্রামিত করার নাম পক্ষিশার্দ্দুল নৃত্য।

শব্দ নৃত্য।—অঙ্গচালন এবং পাদবিক্ষেপ দ্বারা দ্রুতাদিমানে বাদ্যাক্ষর (তা দিৎ ইত্যাদি) দেখানর নাম শব্দ নৃত্য। শব্দনৃত্য অঙ্গ দ্বারা স্বর, লোচন চেষ্টার দ্বারা ভাব এবং পায়ের দ্বারা তাল, লয় ও বাদ্যাক্ষর প্রকাশ করতে হয়। চতুরস্তকর সমাধান করে একটি কর শিখরাকারে নাভিতে, অপর কর পতাক হস্তাকারে সম্মুখে স্থাপন করে একটি পা সূয্যাকারে সম্মুখে, অপরটি অকিতাকারে পশ্চাতে স্থাপন করে পাদব্যাবৃত্তি করে অর্থাৎ সম্মুখের পা পশ্চাতে এবং পশ্চাতের পা সম্মুখে এনে

করদ্বয় শিখরাকারে প্রথম নাভিতে, তাহার পর স্তনেতে তারপর স্কন্ধে স্থাপন করে পায়ে বাদ্যাক্ষর প্রকাশ করতে হয় ।

বিবর্ত্তন নৃত্য ।—ধ্রুব তালে স্বর পাঠের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ও বামাঙ্গ বিবর্ত্তন করে নৃত্য করার নাম বিবর্ত্তন নৃত্য ।

চমৎকার নৃত্য ।—দুই হাত মিলিত করে বাদ্যের অক্ষর প্রকাশ করত নৃত্য করার নাম চমৎকার নৃত্য । চমৎকার নৃত্যে গারুগি তালই সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।

গীত নৃত্য ।—বর্ণসজ্ঘাত গ্রথিত গীতের অনুসারী সসৌষ্ঠব নৃত্যের নাম গীত নৃত্য । যখন যে প্রকার গীতের সংগে নৃত্য হবে, তখন সেই গীতের নামেই নৃত্যের নামকরণ হবে । অঙ্গে স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণ সমুদয়, নেত্রাদি উপাঙ্গে ভাব সমুদয়, হস্তে অর্থ এবং পায়ে তাল গ্রহণ প্রকাশিত হবে ।

স্বরমঞ্চ নৃত্য ।—যে গীতে যে রাগ এবং যে রাগে যে যে স্বরগ্রহ-অংশ ও ন্যাসরূপে অবলম্বিত ; গীতনৃত্যকালে প্রাধান্যরূপে সেই সেই স্বরভিনয় বিশেষরূপে প্রকাশ করা উচিত ।

ষড়জাভিনয় নৃত্য ।—দক্ষিণ হস্ত আবাল আকার, বামহস্ত চতুরাকার, দক্ষিণপদ পরিমণ্ডিত এবং বামপদ ময়ূরললিত আকারে যে নৃত্য সম্পন্ন হয়, পণ্ডিতেরা তাকে ষড়জাভিনয় নৃত্য বলেন ।

গান্ধারাভিনয় নৃত্য ।—শুকতুণ্ড হস্তে করুণ দৃষ্টিতে, অধোমুখ মস্তকে চারীযোগে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাকে গান্ধারাভিনয় নৃত্য বলে ।

ঋষভাভিনয় নৃত্য ।—দক্ষিণ হস্ত হংসাস্যাকার করে বামহস্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কটীদেশে স্থাপন করে মস্তক সমভাবে রেখে যে নৃত্য করা হয় তার নাম ঋষভাভিনয় নৃত্য ।

মধ্যমাভিনয় নৃত্য ।—প্রথম দুই হস্ত পতাকাকার, পশ্চাৎ স্বস্তিকাকার করে বিধুত মস্তকে, হাস্যদৃষ্টিতে সম্পাদিত নৃত্যকে মধ্যমাভিনয় নৃত্য বলা হয় ।

ধৈবতাভিনয় নৃত্য ।—কাঙ্গুল হস্তে, বীতায় দৃষ্টিতে, পরাবৃত মস্তকে সম্পাদিত নৃত্যের নাম ধৈতাভিনয় নৃত্য ।

পঞ্চমাভিনয় নৃত্য ।—অলপল্লব হস্তে, বিধূত মস্তকে, কান্ত দৃষ্টিতে যে নৃত্য হয় তার নাম পঞ্চমাভিনয় নৃত্য ।

নিষাদাভিনয় নৃত্য ।—কটীস্থিত করি হস্তে দীন দৃষ্টিতে, বিধুত মস্তকে যে নৃত্য প্রদর্শিত হয় তার নাম নিষাদাভিনয় নৃত্য ।

সানগসৃত্ত নৃত্য ।—ধ্রুব, মঞ্চ, রূপক, ঝম্পা, তৃতীয়া, অষ্টতালি এবং একতালি এই সাতটি তালে ক্রমান্বয়ে নৃত্য করার নাম সালগসৃত্ত নৃত্য ।

মঞ্চ নৃত্য।—মঞ্চতালে প্রথমে দুই বা তিনবার ধ্রুবকের সংগে তারপরে একবার আভোগের সহিত, পশ্চাৎ পুনরায় ধ্রুবকের সহিত বিচিত্র হস্তন্যাস পূর্বক নৃত্য করার নাম মঞ্চ নৃত্য।

রূপক নৃত্য।—রূপকতালে প্রথমে উদ্‌গ্রাহ এবং আভোগের সহিত পরে ধ্রুবকের সংগে দ্রুতাদি লয়ে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাকে রূপক নৃত্য বলে।

ঝম্পা নৃত্য।—ঝম্পা তালে মধ্যমলয়াশ্রিত গানের সহিত নানাপ্রকার কলা এবং লাস্যাঙ্গের যোগে নৃত্য করার নাম ঝম্পা নৃত্য।

তৃতীয় নৃত্য।—দ্রুতলয়াশ্রিত তৃতীয় তালে পূর্বোক্ত অভিনয়িক হস্তে লাস্যাঙ্গে নৃত্য করার নাম তৃতীয় নৃত্য।

অদ্রুততাল নৃত্য।—দ্রুততালে উৎগ্রহাদি বিলম্বিত লয়ে নানাপ্রকার লাসাঙ্গের সংগে ধ্রুবগানে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাকে অদ্রুতাল নৃত্য বলে।

একতালি নৃত্য।—একতালী গানের সংগে মধ্যে মধ্যে ভ্রমরিকা প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্বক কলাস আলাপ গান করে নানাপ্রকার লাস্যাঙ্গযুক্ত একতালী তালের অনুগত বিবিধ নৃত্যকরার নাম একতালী নৃত্য।

পট্টি নৃত্য।—ত্রৈলঙ্গ ভাষায় রচিত প্রথমপাদ তালহীন গীতের সংগে এক যতি সংযুক্ত পূর্বের সুর উচ্চারণ করে তার সংগে নৃত্য করার নাম পট্টিনৃত্য।

সূলুপ নৃত্য।—মৃদঙ্গাদি যন্ত্রে বাদিত কিন্নরীতাল এবং তেন্ শব্দের সংগে নৃত্যকরাকে সূলুপ নৃত্য বলে।

পদ নৃত্য।—কর্ণাট ভাষায় রচিত গীত এবং নানাপ্রকার ততবাদ্যের সংগে যে কোন তালে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাকে পদ নৃত্য বলে।

বৈপোত নৃত্য।- মস্তক, গ্রীবা, হস্ত এবং পাদ কম্পিত করে অন্ধ্র বা কর্ণাট ভাষায় রচিত ধ্রুব গানের সংগে নানা লাস্যাঙ্গ প্রদর্শন পূর্বক যে নৃত্য সম্পাদিত হয় তাকে বৈপোত নৃত্য বলে।

বন্ধপূর্ব নৃত্য।—দুই, তিন, চার, পাঁচ ছয় বা সাতজন একত্র হাতে হাতে পায়ে পায়ে মিলিয়ে চক্রভ্রমণ আকারে যে নৃত্য হয় তাকে বন্ধপূর্ব্ব নৃত্য বলে। বন্ধপূর্ব্ব নৃত্য স্ত্রীলোক দ্বারাই অধিকতর সুন্দর হয়।

কাঞ্চি নৃত্য।—আটটি গোপনারীর সংগে আটটি কৃষ্ণ মূর্ত্তির নৃ তাকে কাঞ্চি নৃত্য বলে।

জকড়ী নৃত্য।—দুজন তুরস্ক দেশীয় সুরা পানের মত হয়ে স্বভাষায় রচিত গান করতে করতে পুষ্প গুচ্ছ হাতে করে যে নৃত্য করে তার নাম জকড়ী নৃত্য।

শাবর নৃত্য।—শবর জাতিরা নিজ ভাষায় গান করতে করতে যে নৃত্য করে তাকে শবর নৃত্য বলে।

কুরঙ্গী নৃত্য।—শবর জাতীয় স্ত্রীলোক গুঞ্জা (কুঁচ) দ্বারা বেশভূষা করে স্বভাষায় গান করতে করতে যে নৃত্য করে তার নাম কুরঙ্গীনৃত্য॥

শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ নৃত্যের মধ্যে কতকগুলি নৃত্যের নাম এবং অতি সংক্ষেপে লক্ষণ নির্দিষ্ট হল॥

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় বস্তুর প্রায় অধিকাংশই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত 'সঙ্গীত-সার' গ্রন্থ হতে এবং সংস্কৃত সঙ্গীত-সার গ্রন্থ হ'তে উদ্ধৃত হল। এই সমস্ত বিষয় বস্তুর প্রত্যেকটিই আমাদের জেনে রাখা অত্যাবশ্যক মনে করে এই গ্রন্থে সেগুলি সন্নিবেশিত করে দেওয়া অতিশয় কর্ত্তব্য বলে মনে হ'ল। এরদ্বারা একই গ্রন্থের মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের বিরাট সৃষ্টির অনেক কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারবে।

* * *

বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের ইতিহাস

বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূম রাজত্বে প্রাচীনকালের ধারা নিয়ে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের প্রচারতত্ত্বের বিষয় যথাযথভাবে আলোচনা করবার আকাঙ্ক্ষা বহুদিন আগে থেকেই ছিল কিন্তু তার নানান তথ্য সন্ধানের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল। এখন বহু কিছু তথ্য অনুসন্ধান করে যে সমস্ত সত্য আমার কাছে সংগৃহীত হয়েছে এবং বহুপূর্বে থেকে এ সম্বন্ধে বহু পরিচয় সংরক্ষিত হয়েছিল সেগুলি উপস্থাপিত করে দেখানর কাজে ব্রতী হলাম। এর দ্বারা মল্লভূম তথা দক্ষিণরাঢ়ভূমের কতদূর পশ্চাৎ থেকে রাগসঙ্গীত চর্চার গৌরবময় ঐতিহ্য আছে তার প্রাচীন প্রামাণিক পরিচয় অনেকখানি পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের মল্লভূম রাজত্বে যথাযথ আদর্শের মাধ্যমে শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের যে বিরাট বিস্তৃতি ঘটেছিল তার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যতই অনুসন্ধান করা যায় ততই অবাক বিস্মিত হ'তে হয়।

একথা বিশেষ করে বলার আবশ্যক করে না যে, রাজা, জমীদারদের এবং জন-গণ চিত্তে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আবহাওয়ার প্রভাবই এনে দেয় নানান কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য এবং জাতির কল্যাণ ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি। রোম, গ্রীস্, ইটালী প্রভৃতি দেশের প্রাচীন মনীষীরাও তাঁদের গ্রন্থে এ কথা লিখে গেছেন।

যাইহোক্—প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রারম্ভিক পর্য্যায়ের আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি মল্লভূম রাজত্বের শুধু প্রথম যুগ থেকেই নয় তার বহু পূর্ব্বে হতেও আঞ্চলিক রাজা-জমীদারদের সময়েও রাগসঙ্গীতের চর্চার ধারা অব্যাহত যে ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ উৎস না থাকলে তার মল্লরাজত্বে কি করে আসতে পারে! (ওই উৎস যে কতদূরের গভীরে ~~ধারা~~ নিহিত তা নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য।)

পাঠকগণের অবগতির জন্য জানাই,—মল্লরাজত্বের বর্ষসীমা এখন ১২৭৩ বৎসর। অর্থাৎ বঙ্গাব্দ হতে একশত এক বৎসরের কম। মহারাজ আদি মল্ল বা রঘুনাথ মল্ল এই রাজ্যের প্রথম অধিপতি। তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের বহু ভূঃস্বামীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁদের বিপুল ধনসম্পত্তি করায়ত্ত করে নিয়ে বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়ে উঠেন। তাঁর পরাক্রমের কাছে বহু সামন্ত রাজা এবং দেশীয় সর্দ্দারদের মাথা নত করতে হয়েছিল। এস্থলে উল্লেখযোগ্য—গড়মন্দারণের রাজারাও ছিলেন বিরাট ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপশালী। ইতিহাসে জানা যায় গৌড়ের মহারাজ বল্লালসেন ছিলেন উক্ত বংশের এক রাজার ভগিনীপুত্র।

কয়েক বছর আগে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার গ্রামোন্নয়ণ ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল—"মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুর সঙ্গীত চর্চার জন্য সুবিখ্যাত হয়ে রয়েছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর,

সাঁওতালপরগণার কিয়দংশ এবং ছোটনাগপুরের অধিত্যকার অধিকাংশ নিয়েই মল্লরাজ্য গঠিত ছিল।"

দক্ষিণরাঢ় ভূমের বহু প্রাচীনকালের যে সমস্ত কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ভাস্কর্য্য শিল্পকলাদির নিদর্শন রয়েছে এবং নূতন করে আবিষ্কৃত হচ্ছে তার দ্বারা এই অঞ্চলকেই প্রাচীনত্বের পুরোভাগে অবস্থিত বলে মনে বারবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই প্রমাণের কয়েকটি উদাহরণ,—খৃষ্টপূর্ব পঞ্চশত বৎসর পূর্বের দক্ষিণরাঢ়ের শেষ পশ্চিমপ্রান্তে সুবৃহৎ সংস্কৃতিকেন্দ্রের বহু নিদর্শন আছে। সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে শীলাখোদিত বহু নর-নারীর মূর্ত্তিতে অপূর্ব শিল্পচাতুর্য্য। তাছাড়া এক বৃহৎ শীলালিপির তলদেশে উক্ত সন তারিখ লিখিত আছে। ওই শীলালিপি এবং কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি সম্প্রতিকালে 'ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের কেন্দ্রভূমি বাঁকুড়ার সন্নিকট শুশুনিয়া পাহাড়ের সানুদেশে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী পুখন্নাগ্রামের (পূর্বনাম পুষ্করণ) বিখ্যাত বর্মণরাজা সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার কীর্ত্তিগুলির নিদর্শন ইতঃস্ততভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য উত্তররাঢ়ের বীরভূম জেলায় পাণ্ডুরাজার মৃত্তিকা প্রোথিত প্রাসাদ স্তূপের মধ্যে তিন হাজারেরও বেশী সময়ের কতকগুলি বস্তুর নিদর্শন পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। এগুলি শুধু প্রাচীনত্বের প্রমাণই নয়—প্রত্যেক স্থানের শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গীতের প্রভাব যে জড়িত ছিল সে কথাও বিশেষভাবে মনে আসে। কারণ সঙ্গীতের চর্চা ও ভালবাসার মধ্যে দিয়েই আসে নানান শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা ও চরমোৎকর্ষ। সৃষ্টি সুন্দরের মধ্যে যে মনমোহিনী ভাবরূপ বিকশিত হয় তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যেন বহির্ভাগে যুগলরূপে সুর ও ছন্দকে

দক্ষিণরাঢ়ে বহু প্রকারের শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্ব সময়ের যে চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে করে প্রমাণিত হচ্ছে পুরাকালের হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠার পরিচয় এবং সুবিস্তৃত কৃষ্টির গৌরব। এখন পর্য্যন্ত সবকিছু সন্ধান পেয়ে যা দেখা যাচ্ছে তাতে বঙ্গদেশের মধ্যে সভ্যতায়, বিদ্যাচর্চায়, বিবিধ শিল্প সাধনায়, কাব্যে ও সাহিত্যে এবং সর্ববিষয়ে গড়ে উঠেছিল দক্ষিণরাঢ়ভূমই সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে। শুধু তাই নয় এই সমস্ত বিষয়ের নানান প্রমাণ দৃষ্টে এও মনে হয় যে, আর্য্যসভ্যতার বিবিধ বিষয় নিয়ে তার প্রথম যুগ থেকেই হয়ত একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই প্রথম যুগের কয়েকটি সুরের রূপ নিয়ে সামবেদীয় সঙ্গীতেরই ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। তারপর ক্রমশঃ সেই সমস্ত সুরের রূপ থেকে এবং সে যুগের মানুষের অন্তরে প্রকৃতিদত্ত হয়ে যেসব সুরের রূপ কণ্ঠে ধরাদিয়েছিল সেই সমস্ত সুরকে নিয়ে বিভিন্ন মূর্ত্তির রাগ গড়ে উঠে এবং স্তোত্র, পদাবলী, বাংলাগীতি ইত্যাদির মাধ্যমে তার চর্চ্চার বিস্তৃত হতে থাকে। এই মন্তব্য আমার বাস্তব দৃষ্টির অভিজ্ঞতা প্রসূত।

প্রমাণের ধারায়—

বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয়সঙ্গীত চর্চ্চার প্রাচীন ধারাবাহিকতার নিদর্শন ধরে নিম্নেকার পরিচয়েও প্রায় পাঁচ শত বৎসরের আগে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ওই সময়ের নির্মিত বহু মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় গীত-বাদ্যেরত বহু নরনারীর মূর্ত্তি। সেগুলিতে আছে নানান-বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন শিল্পীরূপ এবং নৃত্যলীলার অপরূপ সমাবেশ। ওই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বহু প্রাচীনকালের বীণাদি যন্ত্র, সুরমণ্ডল, শরদ এবং পাখোওয়াজ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

বাদ্যযন্ত্রের এই সমস্ত সাক্ষাৎ প্রমাণে বেশ বুঝা যায় এই দেশের সঙ্গীত-শিল্পীদের হাতে বাদ্যগুলি বহুকাল আগে থাকতে নিশ্চয়ই বাদিত হত।

বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দিয়ে সঙ্গীতের এই যে ব্যাপক প্রচার ও চর্চা তার নিবিড় প্রভাব রাজাদের এবং মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীদের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল বলেই মন্দিরগাত্রে ও তার অভ্যন্তরে উৎকীর্ণ করে রাখার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল গভীর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে।

প্রাচীনতত্ব ধরে —

তথ্য সন্ধানে অগ্রসর হয়ে প্রথম সম্মুখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে— মল্লভূম রাজত্বে রাগসঙ্গীত চর্চার প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন ও সাক্ষ্য বুদ্ধশিষ্য লুইপাদের রচিত হাজার বৎসর আগেকার চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় গ্রন্থের পদাবলীসমূহে কতকগুলি রাগরূপের নাম সমাবেশ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখে গেছেন,—লুইপাদ এই রাঢ়ের মানুষ ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে নেপাল দরবার থেকে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামক একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথির গান-গুলির নাম চর্যাপদ। চর্যাপদ গীতের আকারে লেখা কিছু সংখ্যক পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের সূচনায় রাগের নাম উল্লেখ আছে। এর থেকে সহজেই বুঝা যায় চর্যাপদ মূলতঃ গান হিসেবেই রচিত হয়েছিল। চর্যায় ব্যবহৃত রাগের মধ্যে পটমঞ্জরী রাগের সংখ্যা অনেক বেশী। মল্লারী, ভৈরবী, কামোদ, বরাড়ী, গুর্জ্জরী, গোড়ী, দেশাখ, রামশ্রী, ধানশ্রী, মালশ্রী প্রভৃতি রাগগুলির পরিচয় ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে। চর্যাগানে কয়েকটি চর্মবাদ্যের উল্লেখ আছে, যথা,—ডমরু, পটহ, বাদল করটা, কাঁসি (কশালা) ইত্যাদি॥

মল্লভূমে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে কয়েক ক্রোশব্যাপী বিভিন্ন গ্রামে লুইচাঁদ ঠাকুরের পূজাদি প্রচলিত হয়ে বহুকাল ধরে অব্যাহতভাবে চলে আসছে। এইসব পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বৈশাখী পূর্ণিমায় করা হয়। বুদ্ধদেবের জন্ম ওই শুভদিনে বলে' তাঁর শিষ্য লুইপাদ বা লুইচাঁদকে ওই দিনেই বুদ্ধস্মরণে পুজার দিন ধার্য্য হয়েছিল। এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে অন্যান্য

মহাপুরুষদের ন্যায় লুইপাদ ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের নিকট দেবতা বিশেষ ছিলেন এবং তিরোধানের পর তাঁর পূজার প্রচলন হয়। এই বিশ্বাসের মূলে সন্দেহ রাখবার মত কিছু নেই।

মল্লভূমে লুই সহর নামে এক জনবহুল স্থান ছিল,—এখনও ক্ষীণকায় নিয়ে আছে। অনুসন্ধানকারীরা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে তাঁদের যে মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন তাতে বুঝা যায় লুইপাদের নামানুসারেই উক্ত সহরের নামকরণ হয়েছিল এবং শিষ্যদেরই প্রচেষ্টায় নগর গড়ে উঠে।

তারপর সঙ্গীতচর্চ্চার ধারাবাহিকতার প্রমাণ স্বরূপ হয়ে আছে মল্লভূমের ময়নাপুর গ্রাম হতে কবি রমাই পণ্ডিতের রচিত পুঁথি আকারে 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থ। রমাই পণ্ডিত উক্ত গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতের মতে উক্ত রচিত গ্রন্থের বর্ষকাল খৃষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকালে।

ওই স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের গ্রামসমূহে সঙ্গীতের পরিবেশসহ ধর্মঠাকুরের পূজা বহু সংখ্যা নিয়ে হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধের আবরণ দেবতা বলে মনে করে গেছেন।

রাজানুগ্রহে মল্লভূমের বহু ধর্মমঙ্গল রচয়িতা—যথা,—দ্বিজ রামচন্দ্র, সীতারাম, রূপরাম, মাণিকরাম প্রভৃতি।

শেষোক্ত ব্যক্তির রচিত ধর্মমঙ্গলে সে সময়কার এক রাজা-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে (পালায়) লুই এর নাম উল্লেখ আছে। তিন শত বৎসর আগেকার প্রাচীন পুঁথিতে এবং বিক্ষিপ্ত পত্রেও লুইপাদ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সঙ্গীত চর্চ্চার প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ লুইপাদের এই সমস্ত প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রদত্ত হল। তাছাড়া উক্ত বহু প্রকার গ্রন্থেও রাগরূপের বিভিন্ন নামের পরিচয় আছে।

তারপর কবি বড়ূ চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদে। এঁর রচিত বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে অনেকগুলি রাগ ও তালের নাম আছে। যথা—

(১) কোড়ারাগ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডক ॥ (২) বরাড়ীরাগঃ ॥ যতি (যৎ) ॥ (৩) ককুগুজ্জরীরাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥ দণ্ডকঃ ॥ (৪) ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥ (৫) গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ (৬) পাহাড়ীয়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ (৭) পাহাড়ীয়ারাগঃ ॥ চিত্রলগনী ॥ একতালী ॥ (পৃথক ছন্দ-তাল থাকায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ হল) (৮) দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং—অথবা কানড়া-যতিঃ ॥ (৯) আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥ (১০) রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ (১১) মালবরাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥ (১২) বেলাবলীরাগঃ ॥ যতি ॥ (১৩) দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ (১৪ পাহাড়ীয়ারাগঃ ॥ প্রকীন্নকলগনী ॥ ক্রীড়াতালঃ ॥ (১৫) ভাটিয়ালীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ (১৬) কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ (১৭) মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ (১৮, ককূ (ককূভা) রাগঃ ॥ রূপকং ॥ (১৯) মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ (২০) কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ (২১) শ্রীরামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥ (২২) ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥

(২৩) বিভাষ রাগঃ॥ রূপকং॥ যতির্ব্বা॥ (২৪) শ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥ (২৫) ললিতরাগ॥ কুড়ুক্কঃ॥ (২৬) বঙ্গাল বরাড়ী রাগঃ॥ রূপকং॥ (২৭) বিভাস ককূরাগঃ॥ একতালী॥ (২৮) বঙ্গাল রাগ॥ রূপকং॥. (২৯) শৌরীরাগঃ॥ রূপকং॥ ৩১) পঠমঞ্জরী রাগঃ॥ ক্রীড়া॥ (৩২) সিন্ধোড়া রাগঃ॥ রূপকং॥ (৩৩) বসন্তরাগঃ॥ যতি॥ (৩৪) বিঠালীরাগঃ॥ রূপকং॥ (৩৫) কাছ গুজ্জরী॥ একতালী॥ (৩৬) মাহারাঠারাগঃ॥ রূপকং॥

দেখা যাচ্ছে কয়েকটি রাগে একাধিক তাল সংযোজিত হয়ে আছে। এরদ্বারা বুঝা যায় তখন তাল ফেরতা নিয়ে গাওয়ার প্রচলন বেশ ছিল। কয়েকটি তালের নাম দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের তালের নামের মত। এরদ্বারা দাক্ষিণাত্য সঙ্গীতের সংগে যোগাযোগের সম্ভাবনার কথা মনে আসে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের বহু সংখ্যক গীতাবলীতে উক্ত রাগগুলি বিভিন্ন স্থানে বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে পাহাড়ীয়া রাগের সংখ্যা বেশী।

উক্ত রাগের নামগুলির পরিচয়ে বুঝা যাচ্ছে—এক সময় বহুরাগের যে সৃষ্টি হয়েছিল এবং গৌড়ের বল্লাল সেন দরবারের সঙ্গীতজ্ঞ লোচন পণ্ডিত রচিত রাগ তরঙ্গিনী গ্রন্থে যে বহু সংখ্যক রাগের নাম উল্লেখ আছে, তখনকার সেই সমস্ত প্রচলিত রাগরূপ হতে কতকগুলি বাছাই করে নিয়ে সেগুলির নাম বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংযোগ করেছিলেন। তার মধ্যেও পরের সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা কয়েকটি রাগ বাতিল হয়ে যাওয়ার দরুণই মনে হয় সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। পশ্চিম ভারতের ধ্রুপদাদি সঙ্গীতের উপর প্রচারিত ধারাবাহিক অনেকগুলি রাগের নাম শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের রাগের সংগে সম্পর্ক আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে রাগ সঙ্গীতের সংযোগ সমন্বয় ভারতে সম্প্রতি কালের নয়, বহুশত বৎসর ধরে চলে আসছে ধারাবাহিকতা নিয়ে। এই প্রমাণ ধরে তখনকার দিনের পরিচিত রাগের রূপ গঠন বহুলাংশে এখনকার দিনের মতই যে ছিল সে বিশ্বাসে সন্দেহ আসে না। ক্রমশঃ হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদির এক রকম সৃষ্টিকাল হতেই মল্লভূমের বিষ্ণুপুরের প্রচলিত সমস্ত গানে নিযুক্ত মত নূতন করে বহু রাগের সংখ্যা বেড়ে চলতে থাকে এবং এইভাবেই পশ্চিমের প্রাচীন গুণীদের ধ্রুপদ খেয়ালের মাধ্যমেও বিষ্ণুপুর ঘরাণায় রাগরূপের প্রাচীন নীতিধারা সংরক্ষিত হয়ে আছে। আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এইরূপ ঘরাণা পরিচয় ভারতের অন্য কোন স্থানে পাওয়া দুঃসাধ্য বলেই মনে করি।

মল্লভূমে আগে রাগ সঙ্গীতের চর্চায় প্রধান স্থান অধিকার করেছিল—পদাবলী, স্তোত্র, সংস্কৃতে রচিত কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি, এবং বন্দনাগীতি ও বাংলা ভাষায় নানানভাব সমৃদ্ধ গান। গীত পদ্ধতিতে রাগ রূপের গঠন বৈচিত্রা এবং তানাসংকাবে ভূষিত হয়ে যে থাকত তার প্রমাণ প্রাচীন বাংলাগীতির গায়কীতে পাওয়া যায় এবং আমাদের বংশের প্রাচীন গায়কদের গায়কী পরিচয়েও।

হিন্দীগানের প্রবেশ সময়ের বহু পরেও উক্ত গীতপদ্ধতি অব্যাহত হয়ে ছিল প্রধান স্থান অধিকার করে।

উদাহরণ স্বরূপ সর্বশেষে একটি সংস্কৃত ভাঙ্গা প্রাচীন বাংলা গান স্বরলিপি আকারে প্রকাশ

করলাম। গানের কথার সংগে সুরের ভঙ্গিমাময় বৈচিত্র্যরূপ এবং তালের লঘু-গুরু ছন্দের সমাবেশ দেখে বুঝা যাবে কি রকম সুন্দর সুর- তালের রচনা কৌশল তখন জানা ছিল।

হিন্দী ভাষায় ধ্রুপদাদি নিবদ্ধ সঙ্গীত কোন্ সময়ে মল্লভূমে প্রবেশ করেছিল তার প্রামাণিকভাবে দিন তারিখের সঠিক ইতিহাস না থাকলেও বিচার, যুক্তি ও তথ্য এবং বিশেষ পরিচয়ের মাধ্যমে তার প্রমাণ সম্বন্ধে বাস্তব সত্য বলে যা ধরতে পেরেছি তাতে এই দৃঢ় বিশ্বাস আসে যে উক্ত গানের সৃষ্টি বেশী বিলম্বে আসে নি। অন্ততঃ বেশ কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেই এসেছিল।

বিশেষ করে প্রমাণ স্বরূপ এর বিবরণ আমি পেয়েছিলাম আমার পিতামহ রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। তিনি বলেছিলেন—তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ হরিচরণ দেবশর্মার নিকট প্রাপ্ত হয়ে নিম্নোক্ত ইতিহাসের কথা। "উক্ত হরিচরণের ঊর্দ্ধতন হতে বংশ পরম্পরা তৎসময়ের মল্লরাজধানী প্রদ্যুম্নপুর রাজদরবারের গায়ক ও পণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার সেই সময়ে রাজধানীর কিয়ৎদূরে পুরীর শ্রীক্ষেত্রধাম যাত্রার একমাত্র পথে তীর্থযাত্রী পরিব্রাজক সঙ্গীত সাধকরা গমনাগমনের সময় উক্ত রাজধানীর সন্ধান পেয়ে তথায় আগত হতেন। তাঁরাই উক্ত রাজগায়কদের নিকট প্রথম কয়েকটি ধ্রুপদ সঙ্গীত বিতরণ করে যান।

এরপর ধ্রুপদাদি নানান শ্রেণীগত সঙ্গীতের বিস্তৃত প্রচারের বর্ণনার ভূমিকায় বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের আসার পরিচয় অগ্রে দেওয়ার আবশ্যক থাকে।

মল্লভূমের রাজা আদিমল্ল বা রঘুনাথ মল্ল হতে বংশ পরম্পরায় ষঠীতম রাজা রামকৃষ্ণ পর্যান্তই এই রাজ্যের রাজত্ব কোন প্রকারে রক্ষিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে (১) উক্ত বংশের এক রাজা নাম জগৎমল্ল নিতান্ত প্রয়োজনবোধে বিষ্ণুপুরের পাহাড় ভঙ্গিমাময় বিস্তৃত বনভূমি অঞ্চলের উপর দুর্গাদি নির্মাণ ও নগর গড়ে তুলবার জন্য বিষ্ণুপুরের উত্তর প্রান্তে বসবাস করেন। এবং তাঁর সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদেরও আসতে হয়েছিল। কিছুকাল পরে রাজ আহ্বানে আমাদের পূর্ব পুরুষ এসে উপস্থিত হন এবং রাজ সন্নিধানের ওই স্থানে গৃহাদি নির্মাণ করিয়ে নেন। তাঁদের বহু পুরুষ পর্য্যন্ত রাজদরবারে গায়ক ও পণ্ডিতের পদ সমভাবে চলে এসেছিল এবং সঙ্গীতে বিদ্যার সংগে সংস্কৃত ও ভাগবত পাঠ—এই দুইটিরও চর্চা আমার পিতা ও আপন খুল্লতাত পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। আমাদের পল্লীটি গায়ক পল্লী এবং পরে ওস্তাদ পাড়া রূপে পরিচিত হয়ে আসছে।

---

(১) জগৎমল্লের বিষ্ণুপুর আসার বর্ষপঞ্জী নিয়ে মত ভেদ দেখা যায়। কারো কারো মতে হাজার বৎসর আগে জগৎ মল্লের আসা হয়েছিল। আমার বিচার যুক্তি মত খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই তাঁর আসা যথার্থ বলে মনে হয়। যুগান্তর দৈনিক পত্রিকায় গ্রামোন্নয়ন ১২ সংখ্যাতেও ওই তারিখ দেওয়া আছে। আসার ওই পূর্ব্বের তারিখই যথার্থ কিনা তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্ণয় মত এক এক রাজার ত্রিশ বৎসর ধরে রাজত্ব করার আয়ুষ্কাল ধরে দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশতম রাজা জগৎ মল্লের বিষ্ণুপুরে আসা প্রায় ছয় শত বৎসরের মধ্যে ঘটছে। কিন্তু এদিকের গণনায় মিল হচ্ছে না। কারণ মল্লরাজত্বে ষষ্ঠীতম পর্য্যন্ত রাজার

তারপর বিষ্ণুপুর ধ্রুপদাদি সঙ্গীতের বিপুল সমৃদ্ধির সংগে সংগে তার কৃষ্টির মহীরুহ থেকে অনেকগুলি সঙ্গীত শাখার সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে যথা—পাঠকপাড়ার আচার্য্য গদাধর চক্রবর্ত্তীর প্রপিতামহের দ্বারা গীত ও বীণা বাদ্যের সুন্দর ঘরাণার সৃষ্টি হয়। তারপর হয় রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের, দীনবন্ধু গোস্বামীর, বৃন্দাবন ও নিতাই নাজ্জির, পাখোওয়াজ বাদ্যে মাধব চক্রবর্ত্তী এবং জগৎচাঁদ গোস্বামীর, রামকেশব চক্রবর্ত্তী ধ্রুপদে, ঠুমরী ও টপ্পা গানে মামতুমিঁয়া প্রভৃতির দ্বারা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিরাটরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিস্তার লাভ করে।

ওই সমস্ত গুণী ব্যক্তিদের প্রত্যেকেরই গায়কী ও বাদনভঙ্গি বিভিন্নভাবে ছিল। আমার বাল্য জীবনে তাঁদের শিষ্য পরম্পরার কাছে এর পরিচয় সমুপস্থিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরে তিন চারটি বাঈজী ঘরাণাও ছিল। বাল্যকালে ভৈরবী এবং লক্ষ্মী বাঈজীর গান শুনে রাগরূপের বলিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছিলাম। এঁরা পাকা সুরের উপর গমকের ঢেউ দিয়ে টপ্পা গানও অদ্ভুত গাইতেন। ওই সময়ের পূর্বে আরো যে সমস্ত বাঈজী ছিলেন তাঁদের মধ্যে যেগুলির নাম এক বৃদ্ধা বাঈজীর কাছে সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলি যথা—হীরা, রাধা, ভক্তি, মাতঙ্গিনী, শচী। শুনেছি এরা বিশেষ করেই নৃত্যগীতে সমপারদর্শিনী ছিলেন। রাজ্য পতনের পর বাঈজী পাড়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আগে দেখেছি যে কোন শুভানুষ্ঠানে নটিদের আহ্বান করা হত। তাঁরা এসে আগে ধ্রুপদে রচিত মঙ্গলগীত দু' চারটি গাইতেন। এবং গান নির্বাচন তাদের সময়োপযোগী রাগ নিয়ে থাকত। এখনও মনে পড়ে

রাজত্ব করাই নামের তালিকায় আছে। তাহলে জগৎ মল্লের আসার পর নিম্নদিক থেকে একত্রিংশ রাজার সংখ্যা ধরে হিসাব মত মল্লরাজত্বের শেষ বর্ষসীমা ১২৭২ বৎসর ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। আবার নিম্নদিক থেকে ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার সংখ্যা তত্ত্ব ধরে গণনা করে দেখা যাচ্ছে প্রথম দিকের হিসেব ধরে বর্ষসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যাই হোক্—জগৎ মল্লের আসার উদ্দেশ্য ধরে বিচার মত সময়ের নিরূপণ আমার জানিত বর্ষ সংখ্যাই যথার্থ। কারণ তিনি যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দুর্গাদি নির্ম্মাণ ইত্যাদির জন্য পূর্ব্ব রাজধানী ত্যাগ করে এসে সাময়িকভাবে বিষ্ণুপুরের উত্তর প্রান্তে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ এর মন্দির নিকটস্থ স্থানে বসবাস করলেন, তাতে, তিনি এবং তাঁর পরবর্ত্তী রাজারা ওই ক্ষুদ্র স্থানে কতদিন বাস করতে পারেন ? দেখা যাচ্ছে প্রায় পাঁচশত বৎসর আগের মহারাজ বীরহাম্বিরের সময়েই বিশেষ বর্দ্ধিত আকারে তৈরি হতে থাকে দুর্গ ইত্যাদি নির্ম্মাণের কাজ। তাহলে উনবিংশতিতম রাজত্ব করার রাজধানী ত্যাগ করে পরের রাজারা বিষ্ণুপুরে এসে ছয় শত বৎসর ধরে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন কি ওই ক্ষুদ্র স্থানে ? এ কখনই সম্ভবপর নয়। জায়গা নির্ব্বাচন এবং বনভূম্যাদির বৃক্ষকর্ত্তন ইত্যাদি নিয়ে দু' তিন পুরুষ সময় গত হতে পারে। তাতেও সন্দেহ থেকে যায়। আমার মনে হয় রাজাদের পর পর নামের তালিকায় ভুল ভ্রান্তি আছে। তখনকার ব্যাপারে এ রকম থাকা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। জগৎমল্ল বা যে রাজাই এসে থাকুন চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এসেছিলেন। কারণ অত বড় প্রতিপত্তিশালী রাজাদের পক্ষে দুর্গ ও তৎ অভ্যন্তরে গৃহ নির্মাণ করতে বহু শত বৎসরে লাগতে পারে না। যাই হোক আমাদের পূর্ব্ববংশের আসার পরিচয়কে বিশ্বাস রেখেও বলতে হয় জগৎমল্লের বিষ্ণুপুরে আসা অত বেশী পূর্বের নয়। আমি মনে করি সব দিক দিয়ে ভাল করে বিচার বিবেচনা করে দেখলে আমার কথার সমর্থনে আসবে॥

তাঁদের সুকণ্ঠে গাওয়া রাগ শুক্লাবেলাবলী ও ঝাঁপতালে "শুভলগন শুভসদন ছত্রধর মাঙ্গ..." আড়ানা ঝাঁপতালে "শুভঘরি শুভদিন মহবত..." বিবাহে সাহানা রাগে বিলম্বিত খেয়াল-"রাজ দুলারীকে বনরা আইল মাঙ্গ..."।" ইত্যাদি।

এই কিছুকাল আগেও তাদের মুখে এই সব গান শুভানুষ্ঠানে শুনে অতিশয় আনন্দ আসত। সর্ব বিষয়ের উপর এমন সুন্দরভাবে ও নীতি নিয়ম ধরে রাগ সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা অন্যত্র খুঁজে পাওয়া দুর্লভ হবে। এত বড় গৌরবের বস্তুকে রক্ষার জন্য প্রচেষ্টার একান্ত অভাব দেখে খুবই দুঃখ আসে। বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলা খুবই প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য ছিল—গৌরবকে বাঁচাবার জন্য। শাশ্বত নীতি ধারার বহু সংখ্যক ধ্রুপদাদি গান চর্চার অভাবে প্রায় লুপ্ত হয়ে পড়ল।

তারপর বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের আসার সময় থেকে সেখানের দক্ষিণাঞ্চলের প্রান্ত সীমাবর্ত্তী অহল্যাবাঈ রোড ধরে তীর্থযাত্রী সঙ্গীত সাধক, সাধুসন্ত প্রভৃতির বিষ্ণুপুরে গমনাগমন বৃদ্ধি হতে থাকে, এবং সঙ্গীত সাধকদের অনুকম্পায় ধ্রুপদাদি সঙ্গীতের প্রচার বর্দ্ধিত আকারে দেখা দেয়। এই রকমভাবে প্রার পাঁচশত বৎসর পূর্বের মহাপ্রতাপশালী ইতিহাস বিখ্যাত মল্লমহারাজ বীরহাম্বীরের সময়ে নানান শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধির সংগে সংগে উক্ত সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখার গীত বাদ্যের বিশেষ উৎকর্ষ হয় এবং বিশেষ করে সেই সময় থেকেই বিষ্ণুপুর বাংলা দেশের মধ্যে ধ্রুপদাদি সঙ্গীতের পীঠস্থান ও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তার পরিচয় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে পরিব্রাজক সঙ্গীত সাধকদের দ্বারা ঘরাণা সৃষ্টির এক বিশেষ পরিচয় আছে। আমার যখন ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সে সময় তখনকার মানভূম জেলার-পুরুলিয়া সহরের এক সঙ্গীতের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে আমার পিতামহ আমাকে সংগে নিয়ে যান। সেই আসরে ঘোঙ্গার কথক বংশের এক অশীতিপর বৃদ্ধ গুণীগায়কের সংগে সাক্ষাৎ লাভ হয়। পিতামহের আগ্রহে তাঁদের সঙ্গীত ঘরাণার পরিচয়ে তিনি বলেছিলেন,—"প্রায় পাঁচশত বৎসর আগে এক পরিব্রাজক হিন্দু সঙ্গীত সাধকের কৃপায় আমাদের বংশে ধ্রুপদ ও বীণা যন্ত্র শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। তিনি দীর্ঘকাল থেকে গিয়ে উপযুক্ত পাত্র বুঝে তাঁর ওই দুটি সাধনার সম্পদ দান করে গেছলেন।

পরে আমাদের বংশের কোন কোন সঙ্গীত চর্চারত ব্যক্তি বিষ্ণুপুর ঘরাণার গীত-বাদ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং তৎসঙ্গে সেখানের বাঈজীদের কাছেও নৃত্যে তালিম নিয়ে ছিলেন। এই রকমভাবে চলে এসেছে। আমাদের বংশের সঙ্গীতজ্ঞরাই বিহারের পঞ্চকোট মহারাজাদের, কাতরাশ ও ঝরিয়া রাজাদের এবং গিধৌড়ের মহারাজাদের দরবারে একাধিপত্যভাবে সঙ্গীতজ্ঞ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছেন। পঞ্চকোটের মহারাজ আমাদের কথক উপাধি দিয়েছিলেন। সেই থেকেই কথক বংশ নামে পরিচিত হয়ে আসছে।"

বাল্যজীবনে উক্ত রাজাদের দরবারে ঘোঙ্গার কথক বংশের সঙ্গীতজ্ঞদের সংগে আমার বিশেষ ভাবে পরিচয় হয়েছিল। এঁদের কাছে উচ্চ স্তরের গায়কী এবং যন্ত্রের কাজ পাইনি বটে কিন্তু সুর ও

তাল সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছিলাম। আমার চৌদ্দ বৎসর বয়েসের সময় কাত্‌রাশ রাজের কাছে নিযুক্ত উক্ত বংশের এক কমবয়স্ক গায়কের সম্মুখীন হয়ে রাজসাক্ষাৎএ আমার উপর যে সমস্ত প্রশ্নবান নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম এঁদের সঙ্গীতচর্চ্চার মধ্যে জ্ঞানের দূরদর্শিতা বেশ আয়ত্তাধীনে ছিল। সেদিন সর্ব্বশেষে আমার গানের সময় তিনি যে পরীক্ষার প্রশ্ন করেছিলেন তা সত্যই সুরে দখল সম্বন্ধে অতিশয় মূল্যবান। বললেন—"আমি তানপুরার 'সা' সুরটি একবার বাজিয়ে ছেড়ে দেবো এবং তানপুরাটি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব—সেই সুর ধরে গাইবার পর দেখব তানপুরার সুরের সংগে গান ছেড়ে দেবার পর ঠিক মিল আছে কি না।" আমি সাহস করে বসে গেলাম গাইতে আমার বিশ্বাস ছিল ঠিক পারব—কারণ আমি অতি বাল্যজীবন থেকেই প্রত্যহ দু'তিন বার করে প্রথমতঃ 'সা' সুরে বহুবার বহুক্ষণ সাধনা করে এসেছি। গান চলতে লাগল—সঞ্চারী গাইবার সময় দূর থেকে টুং করে তানপুরার সুরটা কাণে আস্‌তেই বুঝলাম আমার গান ঠিক সুরের ওজন ধরে চলছে। খুব উৎফুল্ল হ'য়ে পড়লাম, জানিনা তার জন্যই বোধ হয় আভোগ গেয়ে ছেড়ে দেবার পর দেখা গেল তানপুরা থেকে সুরের ওজন ঝুলে গেছে। মনটা এত খারাপ হয়ে গেছল যে চোখ দিয়ে জলপড়া সামলাতে পারিনি। যাইহোক আমার এই অবস্থার কারণ রাজা এবং রাজগায়ক বুঝতে পারলেন এবং উভয়েই খুব আদর দেখিয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। পরে বুঝতে লাগলাম সুরের উপর প্রকৃত দখলের এই পরীক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়।

এই কত্থক বংশের এইসব দিক দিয়ে কত যে গভীর দৃষ্টি ছিল তারই পরিচয় দিলাম। আজকাল আর এ সকল আলাপ, আলোচনা ও প্রশ্নাদির কোন বালাই-ই নেই।

যাইহোক্—পরিব্রাজক সঙ্গীত সাধকদের দ্বারা যে ঘরাণার সৃষ্টি হয়ে এসেছিল, উক্ত পরিচয়টি একটি প্রামাণিক নিদর্শন। তাছাড়া তানসেন গুরু হরিদাস স্বামীর শাস্ত্রীয় ধ্রুপদাদি সংগীতে সাধনার কথা সর্ব্বজন বিশ্রুত।

মহারাজা বীরহাম্বীরের সময়ে উত্তর, পশ্চিম ভারত হতে ওই একমাত্র শ্রীক্ষেত্রের পথে যে সমস্ত রাজা, মহারাজা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যেতেন তাঁদের বহু লোকজন ইত্যাদির সংগে গায়ক, বাদক এবং বাঈজী প্রভৃতিও থাকতেন।

আমার পিতামহ এবং তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিরা বলতেন—এ রকম তীর্থগামী রাজাদের আসা, যাওয়ার সমারোহ তখন প্রায়ই দেখেছি এবং সেইসব রাজাদের ওস্তাদ ও বাঈজীদের গান-বাজনা শুনবার জন্য সহরবাসীদের সংগে আমরা যেতাম। উক্ত রাজারা এসে তুরস্ক ময়দানে (তুর্কীর মাঠে) ছাউনী ফেলে দু' দশ দিন বিশ্রাম নিতেন। বিষ্ণুপুর মহারাজ তাঁদের বহুবিধ সাহায্য করতেন।

উক্ত মল্ল মহারাজের সময় থেকে তীর্থযাত্রী রাজাদের সংগে সঙ্গীতজ্ঞ থাকার সংবাদ পেয়ে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চ্চারত ব্যক্তিরা যেতেন সঙ্গীত শ্রবণের বাসনা নিয়ে। তীর্থযাত্রী রাজারাও আগ্রহ সহকারে তাঁদের গায়ক, বাদক ও বাঈজীদের গীতবাদ্য শুনাতেন। এমন কী বিষ্ণুপুর রাজের এবং

স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞদের একান্ত অনুরোধে তাঁদের কোন কোন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের রেখে যেতেন। আবার বহুদিন পরে ফিরবার পথে তাঁদের সংগে করে নিয়ে যেতেন। এই রকম সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিব্রাজক সঙ্গীতসাধকদের কৃপায় বিষ্ণুপুরের ঘরাণায় নানান শ্রেণীর শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আগত রাজাদের বাঈজীরাও বিষ্ণুপুরের নর্ত্তকীদের কণ্ঠসঙ্গীতে ও নৃত্যে তালিম দিয়েছিলেন।

আমার জানিত বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ভাণ্ডারে বিভাগীয় বস্তু তালিকার কিছু সংখ্যা প্রদত্ত হল। যথা—চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল. তেওরা ইত্যাদি আরো বিভিন্ন তাল নিয়ে পাঁচ শতর মত ধ্রুপদ। উক্ত ধ্রুপদ সংখ্যার মধ্যে বহু রাগের সংগে আছে অষ্টাদশ কানড়া, ত্রয়োদশ তোড়ী, দ্বাদশ মল্লার, নবম নট, সপ্ত সারং ইত্যাদি। আর আছে, গীত, সঙ্গীত, ধারু, গুলন্‌কস্‌, কওলকলওয়ানা, স্বররঙ্গ, যুগলবন্ধ, প্রবন্ধ, তালফেরতা ইত্যাদি।

বহুরাগ নিয়ে প্রায় দুই শতর মত বিলম্বিত ও দ্রুত্‌ খেয়াল। ধ্রুপদ-খেয়াল যুগ্মভাবে তৈরি সপ্তরং। তারপর আছে কয়েকটি রাগমালা। ত্রিবট, চতুরঙ্গ এবং তেলানা বা তারানাও বহু আছে। আর আছে টপ্পা প্রায় পঞ্চাশটির অধিক। ঠুমরীও অনেক আছে। ভজনও কম নেই। সেতার, এসরাজের গৎও বহু। পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানের বিখ্যাত পাখোওয়াজ ও বাঁওয়া-তবলা বাদকদের বহু প্রকারের ঠেকা, বোল, পরম ইত্যাদিও সংরক্ষিত হয়েছিল। বহু প্রাচীন শাস্ত্রীর গ্রন্থও সংগ্রহ হয়েছিল। মোটামুটি এই তালিকাটিতে বিষ্ণুপুর ঘরাণার পরিচয়ে এক বিরাট দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলে অভিহিত হবে।

বিষ্ণুপুরে ঐ সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বেথিয়ারাজ ঘরাণারও অনেকগুলি ধ্রুপদ এবং কিছু সংখ্যক খেয়াল এসে পৌঁছেছিল। আমার প্রপিতামহের কাছে শেখা পিতামহের নিকট আমি বাল্যজীবনে উক্ত ঘরাণার একটি খেয়াল গান শিখেছিলাম।

পিতামহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—যে সমস্ত সংগীতজ্ঞ বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সংগীত বিতরণ করে গেছলেন তাঁদের নাম-ধাম আপনার জানা আছে কি-না। তদুত্তরে বলেছিলেন—"পিতার কাছে দু' একজনের নাম পেয়েছিলাম। তবে সেই সঙ্গীতজ্ঞদের থাকা খুব বেশীদিন করে ছিল না বলে নাম-ধামের পরিচয় পাওয়ার আগ্রহ তেমন ছিল না,—খাঁ সাহেব, ওস্তাদ এবং চৌবেজী, মিশিরজী এই রকম জাতিগত উপাধি ধরে সম্বোধন থাকত। রাজ দরবারে নিশ্চয় প্রত্যেকের নাম-ধাম ছিল।"

পিতামহ যে দু'জন খাঁসাহেবের নাম করে ছিলেন—তাঁদের মধ্যে একজন ধ্রুপদ এবং অন্যজন খেয়াল গায়ক ছিলেন। বয়েসও তাঁদের বৃদ্ধত্বের কোঠায় ছিল। বাল্যকালে শুনা, এজন্য তাঁদের নাম ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না। ইতিহাস লিখে রাখা বা মনে রাখার আগ্রহ তখন কারোরি ছিল না। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় কেউ ভাবতেন না। ইতিহাস লেখা ও ইতিহাস জানার আগ্রহ যখন থেকে সুরু হল তখন সংগ্রহ কারকদের কাছে বহু সঠিক সত্য

সমুপস্থিত হতে পারে নি, অভিজ্ঞতায় এই আমার বিশ্বাস হয়। এজন্য বহুক্ষেত্রেই কিম্বদন্তী এবং লেখকের নিজ বিচার বোধের উপর কল্পনার সাহায্য হয়ত না নিয়ে উপায় ছিল না। যাই হোক্ বিষ্ণুপুর বা দ্বিতীয় দিল্লী' নামক গ্রন্থ প্রভৃতির রচয়িতা ও বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ইতিহাসের প্রথম লেখক বলেছেন—"যে সময় রেল কিংবা যান বাহনের ব্যবস্থা ছিল না, পায়ে হেঁটে দিল্লী যেতে তু' মাস সময় লাগত সেই সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে (কোন অংশে তা লেখা নেই। বিষ্ণুপুরের মল্ল মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ দিল্লী হ'তে তানসেন বংশধর বিখ্যাত ধ্রুপদী বাহাতুর সেনকে মাসিক পঞ্চশত মুদ্রা ধার্য্য করে বিষ্ণুপুর ধ্রুপদ গানের শিক্ষা ও প্রচারের জন্য এনে স্থায়ীভাবে রেখেছিলেন এবং তাঁর দ্বারাই বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান ছাত্র গদাধর চক্রবর্ত্তী রাজদরবারে গায়ক পদে নিযুক্ত হন···।"

বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ইতিহাসের যা সত্য তার অনেক কিছু পরিচয় যথাসাধ্য দিয়েছি। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহাতুর সেনের আসরে বিষয় নিয়ে একান্ত কর্ত্তব্য বোধে সত্যের পরিচয়ে আমাকে অনেকগুলি কথার অবতারণা করতে বাধ্য হতে হল। প্রথমতঃ আমার বক্তব্য, বাহাতুর সেন যদি এসে থাকেন তাহলে তিনি রাজার দ্বারা ওইভাবে আহূত হয়ে আসেন নি। অন্যান্যদের মত পরিব্রাজকরূপে কিংবা তীর্থযাত্রী রাজাদের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে কিছু দিনের জন্য এসে তাঁর গান কিছু বিতরণ করে গেছলেন। এরই কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ইতিহাসের প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের জন্য তার পশ্চাৎ দিকে তাকাবার অবকাশ না রেখে এবং তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর না হয়ে বাহাতুর সেনকে নিয়েই ইতিহাসের পুরোভাগে স্থান দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় বিষ্ণুপুরের পরিচয়ের উপর সঙ্গীতের খান্দানী গৌরব ও কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাহাতুর সেনকে ধরে এইভাবে ইতিহাস গড়া হয়েছে। লেখক আন্তরিকভাবে তাঁর ধারণা মত এর মধ্যেই হয়ত দেশের সুনামকে বড় করে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি যদি পশ্চাৎবর্ত্তী ইতিহাসের দিকে সন্ধান রেখে যা প্রকৃত সত্য তাকে উপলব্ধির চেষ্টার জন্য অবকাশ রাখতেন তাহলে সগর্বে দেখতে পেতেন সঙ্গীত ইতিহাসের সত্য সম্ভার নিয়ে সর্ব্বোচ্চ গৌরব ও কৌলিন্য সেইখানেই বহুকাল আগে থাকতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

দ্বিতীয় কথা, বাহাতুর সেনকে আনার সময়কাল মাত্র আড়াই শত' বছরের মত। বিষ্ণুপুর বাংলার সঙ্গীত পীঠস্থান ও কেন্দ্র এই পরিচয়ের উপর ওইটুকু সময় মোটেই উপযুক্ত নয়। তখন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানেও সঙ্গীতচর্চ্চার পরিচয় পাওয়া যাবে। পীঠস্থানের পরিচয় বহু প্রাচীনের ইতিহাস নিয়েই থাকে।

তারপর,—বাহাতুর সেনের দ্বারাই ধ্রুপদাদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই কথার উপর বিতর্ক ধরে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—আহ্বানকারী মল্লরাজার যদি উক্ত সঙ্গীতে জ্ঞানবোধ না থাকত এবং সেখানে উপযুক্ত গায়ক-বাদক না থাকত তাহলে বাহাতুর সেন কি রকম স্তরের গায়ক তা কে

বুঝতে পারল ! জহুরী না থাকলে কি জওহর চেনা যায় ! তাছাড়া সে সময় মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকাল। তখনকার দিল্লীর অবস্থা চিন্তা করলে দিল্লী হ'তে গায়ক আনতে পাঠানর কথা বিশ্বাসে আনা মুস্কিল। সে সময়ে বাহাদুর সেনের নাম বিখ্যাত গায়ক রূপেও ইতিহাসে কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁর নাম কি করে সংগ্রহ করতে পারলেন ? শুধু তাই নয় তাঁর গান না শুনেই মাসিক পাঁচ শত মুদ্রা ধার্য্য হয়ে গেল—এ কথা কি বিশ্বাসে আসে ?

এইসব দেশে তখন টাকার মূল্যমান বহু উর্দ্ধে ছিল। রাজা-জমিদাররা তখন অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতু স্থায়ী ব্যক্তিদের জমিজমাদি দান করতেন। পাঁচ শত টাকায় তখন এ দেশের রাজাদের একটা বড় রকম বিভাগের ব্যয় নির্বাহ হয়ে যেত।

যখন আমি পনের বছর বয়েসে ভেলাইডিহার রাজার সঙ্গীতশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলাম তখন লোকে আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে শুনে অবাক হয়ে গেছল। পঞ্চাশ টাকাতেই তখন স্বচ্ছন্দে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়ে যেত। রাজাদেরও দেওয়া মাইনের সীমা ওর উর্দ্ধে খুব বেশী বোধ হয় ছিল না।

মোটের উপর সব কিছু বিচার বিবেচনা করে দেখলে এ কথাই সাব্যস্ত আসে—বাহাদুর সেন পূর্বোক্ত দুই প্রকারের কোন একটির অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যেই এসেছিলেন এবং তৎপূর্বে বিষ্ণুপুরে উপযুক্ত গায়ক-বাদক ছিলেন বলেই তিনি তাঁদের কাছে ও রাজদরবারে সমাদর লাভ করেছিলেন। এই রকমভাবেই উর্দ্ধ ভারত হতে নিম্নদিকের দক্ষিণ রাঢ়ভূমের মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ঘরাণা হতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রেণীগত বহু সম্পত্তি বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এসে পৌঁছেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটু কথা আছে বিষ্ণুপুর মহারাজা– দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজ্য সিংহাসন লাভ করে মাত্র আট বৎসরের মধ্যে নিহত হন। ওই সময়ের প্রথম কয়েক বৎসর ধরে ঘাটাল অঞ্চলের চের্‌বর্‌দার রাজা শোভা সিংহ এবং পাঠান দলপতি রহিম খাঁর দ্বারা বারম্বার বিষ্ণুপুরের উপর আক্রমণ হ'তে থাকে। আর যুদ্ধে নিযুক্ত থেকে মহারাজ রঘুনাথ সিংহ তাদের বিতাড়িত করতে থাকেন অবশেষে এক যুদ্ধে শোভা সিংহ পরাস্ত হয়ে পলাতক হন এবং রহিমা খাঁ হন নিহত। সেই অবস্থায় রহিম খাঁর অসামান্যা রূপসী বেগম লালবাঈকে নিরাশ্রয়া বুঝে এবং লালবাঈএর অভিপ্রায় ক্রমে রঘুনাথ সিংহ তাঁকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। তারপরই রঘুনাথ সিংহের লালবাঈকে নিয়ে যে সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল এবং অবশেষে রাজাকে নিহত হতে হয়েছিল তার ইতিহাস এখন অনেকেই জানতে পারছেন।

যাই হোক্—রঘুনাথ সিংহের এই আট বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনার ইতিহাস আছে তাতে তখন তাঁর মনে সঙ্গীত প্রচারের কথা উদয় হবে—এ বিশ্বাস কারোরি মনে আসবে বলে মনে করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা—বাহাদুর সেন এসে যদি স্থায়ীভাবে থাকতেন তাহলে তাঁর

বাসভূমির চিহ্ন বিষ্ণুপুরে নিশ্চয়ই থাকত স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা বংশ পরম্পরা পরিচিত হয়ে। কিন্তু তার পরিচয় ও চিহ্নাদি কিছুমাত্র নেই। অন্যান্য স্মৃতি চিহ্নর মধ্যে চারশত বৎসরের পুর্বে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বাসভূমি এবং তাঁর দেবতার ভগ্ন মন্দিরের স্মৃতি চিহ্ন আছে। লালবাঈ এর বাসগৃহ অট্টালিকার বহু চিহ্ন আছে। সুতরাং যাঁকে নিয়ে শাস্ত্রীয় ধ্রুপদাদি সঙ্গীতের উৎপত্তি ধরা হয়েছে সেই বাহাদুর সেনের কোন স্মৃতি চিহ্নাদি পাওয়া যাবে না কেন ? যাই হোক মোটের উপর প্রথম ইতিহাস লেখকের মল্লরাজ কর্তৃক বাহাদুর সেনের আসা সত্য না হলেও, তিনি কোন সময়ে যে সাময়িকভাবে এসেছিলেন এ কথা অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। যিনি এই বিষয়ের ইতিহাস লিখেছিলেন তাঁর আগে এই কাজে কেউই অগ্রসর হননি। সেদিক দিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার মূল্য সমধিক এবং মনে করে নিতে হবে বাহাদুর সেনকে ওইভাবে উপস্থিত করার বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই তাঁর মনে প্রয়োজনীয় অভিপ্রায় এসেছিল গুরুত্বের মূল্য নিয়ে।

তাঁর পরে আরো যাঁরা এই বিষয়ের ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সকলেই উক্ত প্রতিষ্ঠাবলে প্রথম লেখকের উক্তিই উদ্ধৃত করে গেছেন। কেউই যথাযথ সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পশ্চাৎ দিকে তাকাননি। দু' একজন যাঁরা সম্ভাব্য সত্য সংবাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোন ব্যক্তির কাছে জেনে বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের কিছু ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের সে লেখায় প্রচুর ভুল ভ্রান্তি হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ও তার ভূল নির্দ্ধারিত হয়নি।

এরপর বিষ্ণুপুরের গায়কদের গায়কীর বিভিন্ন ধরণের বিষয় জানিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করলাম। পিতামহ এবং অন্যান্য প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে যেরূপ শুনেছি তা এই, গদাধর চক্রবর্ত্তীর ধ্রুপদ ও আলাপের গায়কী ছিল বেশ উচ্চস্তরের। আচার্য্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুরূহ গায়কীধারা পছন্দ করেননি বা নেননি। তাঁর শিষ্য হলেও স্বনামধন্য যদুভট্ট নিজ প্রতিভাবলে উচ্চস্তরের গায়কীকে অনুসরণ করে অনন্যসাধারণ ও দেশ বিখ্যাত গায়ক হয়ে উঠেছিলেন। ইনি সুরবাহার বাদনেও বিশেষ কৃতিবান ছিলেন।

আমার পিতামহ বলেছিলেন,—"যদু যখন ত্রিপুরা রাজ দরবার হতে বহুদিন পরে বিষ্ণুপুরে এসে উপস্থিত হয় তখন সহরবাসী ও সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের উদ্যোগে মল্লেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন বিরাট প্রশস্ত স্থানে সামিয়ানা খাটিয়ে যদুর গান শুনবার ব্যবস্থা হয়। সে যুগের দুর্দ্ধর্ষ পাখোওয়াজী জগৎচাঁদ গোস্বামী (রাধিকা প্রসাদের পিতা) মহাশয় যদুর গানের সংগে সঙ্গত করেন।

সেই আসরে বহুশত নর-নারী উপস্থিত হয়েছিল। যদু যখন সম্ভাব্য চড়াসুরে তানপুরা বেঁধে সুললিত কণ্ঠে দরবারী কানড়ার রাগালাপ সুরু করল তখন তার গায়কীর অপূর্বতার কথা কি বল্‌ব! সবাই অবাক। যতক্ষণ গান চল্‌ল ততখন সমস্ত শ্রোতা, শ্রোত্রী নিশ্চল মূর্ত্তির মত হয়ে রইল। গান শেষে আমার মত অনেকেরই গণ্ডবেয়ে তৃপ্তি অশ্রু ঝরতে লাগল, এমন কি মেয়েদের পর্য্যন্ত।"

আমি এ স্থলে তাঁর গানের কথাই শুধু ভাবছি না। কি রকম তখন সব গুণগ্রাহী শ্রোতা ছিল

সেই কথাই বড় করে ভাবছি এবং তার সংগে আরো বড় করে ভাবছি কতকাল ধরে বিপুল চর্চা চলে এলে তবে নারীরা পর্য্যন্ত এ রকম সাধনার গুণ গ্রহণ করতে পারে। খুব আশ্চর্য্য লাগে বাংলা দেশের সঙ্গীত জগতে যদু ভট্টের মত ব্যক্তির এবং আরো অন্যান্য বিখ্যাত গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতির স্বরূপ আমাদের দেশের কোন সঙ্গীত সম্মেলনের নামে থাকে না এবং বোধ হয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নেই। *

---

* কয়েক মাস আগে (১৯৬৮ সালে) এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় কোলকাতার সে যুগের গায়ক গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী পরিচয় সম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার একস্থানে লিখেছেন—'প্রথমাবস্থার যদু ভট্টের সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যখন মারা যান তখন যদু ভট্টের বয়েস ছিল মাত্র পঁনর, (এই সংবাদ সংগ্রহ সঠিকতার উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল নয়) তখন ওই বয়েসে যেটুকু শিখেছিলেন তাতে সঙ্গীত বিদ্যার মত এত বড় কঠিন বিদ্যাকে আয়ত্বে আনার মত মোটেই উপযুক্ত নয়। তারপর থেকে প্রকৃত পক্ষে যদুভট্ট কোলকাতায় এসে উক্ত গঙ্গানারায়ণের কাছেই যথোপযুক্তভাবে শিক্ষা লাভ করেন। যদুভট্ট খাণ্ডার বাণীর ধ্রুপদই বেশী করে আগে জানতেন—ইত্যাদি।" যদুভট্ট সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের এই বিবরণ সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাছাড়া তিনি যদি পশ্চাৎ দিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ রাখতেন তাহলে দেখতে পেতেন ভারতের বহু ক্ষণজন্মাব্যক্তি পঁনর বছরের মধ্যে এক এক বিষয়ে অসাধ্য সাধনা করে গেছেন। সঙ্গীত বিষয় নিয়ে আমাদের দেশেই তার উদাহরণ অনেক আছে, তার মধ্যে কয়েকজনের কথা—আমার বড় কাকা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ওই বয়েসে কুঁচিয়াকোলের জমীদার বাড়ীর সঙ্গীতাচার্য্য পদে ব্রতী হন,—মেজ কাকা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের গায়ক পদে নিযুক্ত হন তখন তাঁর বয়েস ষোল মাত্র। এর পরে তাঁরা আর কারো কাছেই শিখেননি, হয়ত দু' চারটে গান কারো কাছে সংগ্রহ করে নিয়ে থাকতে পারেন।

আমার নিজের কাকা অম্বিকাচরণ ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় এঁরাও ওই বয়েসেই শিক্ষার কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। আমি যখন ভেলাইডিহার রাজাবাহাদুরের সঙ্গীত শিক্ষক পদে নিযুক্ত হই তখন আমার বয়স পঁনর মাত্র। উক্ত রাজার কাছে আমি যাবার সময় পর্য্যন্ত গয়ার মিশ্র বংশের এক গায়ক ও যন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাজাবাহাদুরকে তখন শেখাতেন।

আমার পাঁচ ছেলেকে তিন চার বছর বয়েস থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে এসেছিলাম তাদের পনর বছর বয়েসের মধ্যেই শিক্ষায় যে শক্তি ও সাফল্য অর্জিত হ'তে দেখে এসেছি তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় নি; শিক্ষার সুযোগ আর না পেলেও নিজের দ্বারাতেই সাধনার মাধ্যমে অভিষ্ট লাভে বাধা আসবে না। যাঁরা কণ্ঠশক্তি ও তালবোধের প্রতিভা নিয়ে শিখতে আসে তাঁরা যদি চার, পাঁচ বছরে সাধনার একাগ্রতায় শিল্পীরূপে গড়ে উঠতে পারে তাহলে বাড়ীর ছেলেরা ১২ বছরে কতদূর এগোতে পারে সে কথা বিশেষ করে বলার আবশ্যকই থাকে না। সুতরাং যদুভট্টর মত প্রতিভাশালীর ব্যক্তির পক্ষেও পঁনর বছর বয়েসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সময়কাল নিশ্চয়ই যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে যাঁদের কোন ধারণা-বোধ নেই তাঁরাই এইভাবে অবাস্তব উক্তি করেন। মেজ কাকা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বলেছিলেন—"গঙ্গাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র-বেহালাবাদক-হরিপদ বাবুর

বিষ্ণুপুরে মহিলাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিচারবোধ এবং শক্তি সামর্থ্যের বিষয় নিয়ে দু' একটি উদাহরণ স্বরূপ চমকপ্রদ ঘটনার বিষয় উদ্ধৃত করলাম। আমার পিতামহ তাঁর পিতার কাছে শুনে আমাকে বলেছিলেন,—"এক সময় এক বড় দরের খেয়াল-গায়ক আসেন পূর্ব্বোক্ত অনাহূত ভাবে। তাঁর গানের দিনে আমাদের মদনমোহনগঞ্জ অঞ্চলের বহু মহিলাও শুনতে যায় রাজদরবারে। গান শুনে মহিলারা মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিল--"খুব-তৈরি হলে কি হবে—গলা মোটেই মিষ্টি নয়, তাছাড়া গানের সময় বড় অঙ্গভঙ্গি করছিল,—গান গাওয়ার সময় এ কি বদ অভ্যাস রে বাবা! কৈ আমাদের পাড়ার গাউয়ারাও এ রকম ভাবে কেউ গায় না,—তাদের গানও কত মিষ্টি লাগে;—গান শুনে আহা করতে মন যাবে না এ আবার কি!"

দ্বিতীয় ঘটনা,—বিষ্ণুপুরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ সরোবরে অতি প্রত্যূষে নিয়মিত অভ্যাসের উপর উক্ত অঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মহিলারা স্নান করতে যেত। এখনও যায়। এক দিন গায়ক পক্ষভুক্তা দুই দলের মহিলাদের মধ্যে হঠাৎ গায়কীর সমালোচনা নিয়ে এক পক্ষের এক মহিলা অনুকরণে গলায় দেখিয়ে দিয়ে বলে—'তোদের গাউয়্যা এই রকম করে গায়'। তখন অপর পক্ষের এক মহিলা সংগে সংগে ছাড়া গলায় সুর তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলে তোদের গাউয়্যা এ রকম করে গায়।' সেই সময় বহিরাগত এক ওস্তাদ তানপুরা হাতে যাচ্ছিলেন রাজদরবার উদ্দেশ্যে। মেয়েদের গলায় ওই রকম তৈরি সুরের অনুকরণ শুনে হতভম্ব হয়ে যান এবং পশ্চাৎ ফিরে প্রস্থান করতে থাকেন। তখন মহিলাদের দৃষ্টি পড়ে যাওয়ায় তারা হাঁক দিয়ে বলে—ও ওস্তাদ চলে যাচ্ছ কেন?

ওস্তাদ তখন আরো দ্রুত পদচালনা করে অদৃশ্য হয়ে যান। আমার পিতা পার্শ্ববর্ত্তী জলসোপানে বসে থেকে এই ঘটনার সমস্ত কিছু চাক্ষুষ করেছিলেন এবং বাড়ীতে এস খুব হর্ষ সহকারে সকলকে বলেছিলেন। তারপর এই ঘটনার কথা সহরে রাষ্ট্র হয়ে গেছল।"

আমি পিতামহের কাছে যেদিন এই ঘটনার কথা শুনেছিলাম—গর্বে আমার বুক ভরে গেছল।

পিতামহ বলেছিলেন—এ রকম চমকপ্রদ ঘটনা অনেক আছে। তাই ভাবি কত বংশ পরম্পরা সঙ্গীতের পরিবেশে মানুষ জন্মালে তবে সঙ্গীতে এই রকম আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চয় হয়!

আমার যুবাকালের প্রথম সময়ে আমাদের দেশের যাত্রার দলের গোবিন্দ বৈরাগী, শচীনন্দন দাস এবং কানাই দাসের সুললিত ভরাটি কণ্ঠে সাবলীল তান বিস্তার দিয়ে যাত্রার গান শুনে মনে হত এরা

মুখে শুনলাম,—তিনি বললেন "যদুভট্ট তাঁর পিতামহের কাছে কিছু ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষার এই সংবাদ আগে কারো কাছেই শুনা যায়নি,—হয়ত দু'চারটে ধ্রুপদ নিয়ে থাকতে পারেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক না থাকলেও প্রয়োজন হলে সংগ্রহের আদান প্রদান চলে—স্বচ্ছতার উপর এবং দিবার প্রেরণা-আগ্রহ নিয়েও।"

যদি সুযোগ পেয়ে শুধু খেয়ালগানের চর্চা করত তাহলে প্রত্যেকে দেশবিখ্যাত খেয়ালগায়ক হতে পারত। কারো কাছে না শিখেই কেবল শুনার অনুকরণ ধরে এবং ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার গুণে এই রকম গাইতে পারত। সে সময় একদিন যাত্রাতে গোবিন্দ বৈরাগীর হাতে বাঁওয়া তব্‌লা শুনে আশ্চর্যাবোধ করেছিলাম। তখন এখনকার মত নাগাড়া আকৃতির বাঁওয়া ছিল না—ডুগি নাম নিয়ে ছোট আকারের ছিল। সেই ডুগি ও তব্‌লায় দ্রুতলয়ে যখন ছন্দ, বোল উৎপন্ন করল তখন মনে হচ্ছিল যেন ডুগির আওয়াজে কয়েকটি পায়রা ডাকছে এবং তব্‌লার সুরে যেন অনেকগুলি নুপুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

এই রকম বহু নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে যে পরিচয় পেয়ে এসেছি তাতে অবাক বিস্মিত হয়ে এই কথাই মনে আসে, শুধু বিষ্ণুপুরেই নয় তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মৃত্তিকাও যেন সঙ্গীতের উর্বরা নিয়ে ভরে উঠে ছিল এবং আগেই বলেছি তা কতকাল হতে সে তথ্য নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য।

বিষ্ণুপুরে গায়কী পদ্ধতির আরো কিছু পরিচয়—আমাদের পল্লীতে রামকেশব চক্রবর্ত্তীর মধ্যে ধ্রুপদে দুরূহ গায়কী ছিল। আমার পিতামহ বলতেন তাঁর ধ্রুপদ গানের ভেতর এক একটা মীড়ের ঢেউ অদ্ভূতভাবে প্রকাশ পেত। তাঁর সন্তানরা ধ্রুপদ গাইতে পারতেন। অন্যান্য যে সব বংশে সঙ্গীতের ঘরাণা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল গায়কী ভঙ্গীর বিভিন্নধারা। বিষ্ণুপুর ঘরণায় এ-ও এক বৈশিষ্ট্যপুর্ণ ঐতিহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ধারা নিয়ে আমাদের মূলবংশ ছাড়া আর প্রায় সমস্ত বংশ থেকেই সংগীত চর্চা লোপ পেয়ে গেছে।

এ স্থলে গায়কী ধারার বিষয় নিয়ে অবশ্য এ কথা বলতে পারা যায় যে, গ্রহণ শক্তির উপর এবং শিল্প সৃজনীর শক্তি সামর্থ্যের উপরই নিজস্ব গায়কী নির্ভর করে। তবে এ কথাও অতি সত্য যে বিষ্ণুপুরে আগত হয়ে তখন বিভিন্ন গায়কীর প্রভাব-প্রতিপত্তির আবহাওয়াই বিশেষ করে বিভিন্ন ধরণের গায়কীর রূপ ধরা দিয়েছিল গায়কদের গ্রহণ ইচ্ছার পছন্দ মত। আমাদের জানিত সময়ে তারের যন্ত্রের মধ্যে সুরবাহার, সেতার এবং তাউশ বাদ্যের চর্চ্চাই ছিল বেশী। তার মধ্যে তাউশ বাদ্যের প্রচার (গঠন পরিবর্ত্তনে নাম এসরাজ) বরাবরই খুব বেশী ছিল। মল্লভূম অঞ্চলে ওই, যন্ত্র বাদক আগে বহু দেখেছি। তখনও ওই বাদ্যের এত প্রচলন ছিল যে যাত্রায়, রামায়ণে, সাঁনাই ঢুলী সম্প্রদায়দের মধ্যে এবং বহুবিধ সঙ্গীত সংস্থায় অতি সমাদরে প্রবেশ করেছিল।

ঢুলী সম্প্রদায়দের মধ্যে সঙ্গতকারদের ম্যাজিকের মত অদ্ভুত সঙ্গত সাধনা দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। তার পরিচয়,—তাউশে গৎ বাজতে লাগল—সঙ্গতকার প্রথমতঃ একটি খঞ্জনী নিয়ে সুরু করল ঠেকা বোল দিয়ে বাজাতে তারপর ছন্দে ছন্দে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর বোল দিয়ে আঘাত এবং লুফা লুফির উপর দিয়ে ক্রমশঃ সাতটি খঞ্জনীর তালের খেলা চলতে লাগল। এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার নিকট এক গ্রামে ওই সম্প্রদায়ের একজন ওই রকম খঞ্জনী বাদক এখনও আছেন বলে শুনেছি।

আগে বিষ্ণুপুরে নাম সংকীর্ত্তন উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে দূর দূরান্তর হতে যে সমস্ত কীর্তনীয়ারা আসত তাদের মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়ে থাকত মাদোল বাদ্যকার। সেই বাদ্যকারদের অদ্ভুত তৈরি হাতে বাদিত হত চৌতাল ধামার ইত্যাদি তালেও দুরূহ তেহাই ইত্যাদি ও বোল পরম বিস্ময় সহকারে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতাম। আবহাওয়ার গুণে এদের সবই নিজস্ব প্রতিভায় সৃষ্টি।

ঢুলী নামক সম্প্রদায়ের মধ্যে মনমোহন দাসের বেহালায় বিভাস, সিন্ধু ও ইমনের রাগালাপ এবং হরিচরণ দাসের সাঁনাইএ ভৈরবী ও ইমন রাগের রাগ রচনার কৌশল এখনও কানে লেগে আছে। কালের মহিমায় এখন এ সকল সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এখনও বিষ্ণুপুরে দু' একজন সানাই বাদক যখন কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠাতাদের কৃপায় আহূত হয় তখন দেখি তারা সময় কালীন রাগ এখনও বাজাতে পারছে। এই সেই দিন (১৯৬৭ সালে) বিষ্ণুপুরের আমার নূতন বাড়ী গৌরীধামের সামনের রামকৃষ্ণ আশ্রমের কালীপূজায় বাজাতে লাগল,—খুব ভোরে ললিত, পরে ভৈরব, বিভাস, ভৈরবী, অল্প বেলায় আশাবরী, তোড়ী, বিকেলে ভীমপলশ্রী, মূলতান পুরবী, শ্রী রাত্রে ইমন কল্যাণ, বাগেশ্রী, কানড়া, মালকৌশ, সিন্ধু, বেহাগ ইত্যাদি। রাগরূপের গঠন যদিও তেমন সুঠাম নয় এবং চাহিদার অভাবে সাধনার পরিচিত বিশেষ তেমন নেই তবুও এখনও বংশগত ঐতিহ্য যে ধরে রেখেছে—তাই খুব মূল্যবান বলে মনে হল। চর্মবাদ্য টিকরায় সঙ্গত করছিল প্রথমতঃ বিলম্বিতে প্রাচীন ধারায় আড়াঠেকা তালে, পরে দ্রুত গৎএ ছিল বিভিন্ন তাল। পরিচয় নিতে গিয়ে জানাল "এই আমরাই শেষ। এখন সাঁনাই ও টিকরা কেউ পছন্দ করে না। সব অনুষ্ঠানে মাইক হয়ে গেছে। তারপর বিবাহাদিতে ফ্লুট, ক্লারিওনট ও ড্রাম বাদ্যই এখন চলেছে এবং সরস্বতী, লক্ষ্মী পূজাতেও ঢাক এবং মাইকে আধুনিক সিনেমার গান বাজছে।" এই সব দুঃখময় অবস্থার কথা সবই জানা থাকা সত্ত্বেও ওদের কাছে আরো ভাল করে জেনে নিলাম।

সঙ্গীতে শিল্প রচনা সম্বন্ধে আর একটা বড় কথা,— যত রকমের যত উচ্চস্তরের গায়কী বা যন্ত্রের কাজ যে কোন দেশে প্রতিষ্ঠা হোক না কেন সেটাকেই শুধু আঁকড়ে ধরে পরিচয় প্রদানের পক্ষে বড় কথা নয়—যাঁরা তাকে যথাযথ রক্ষার মাধ্যমে আরো উজ্জ্বল করে নিজস্ব প্রতিভার রূপ দিয়ে সৃষ্টি করতে পারেন আমার মতে তাঁদের কৃতিত্বই সমধিক। সঙ্গীত এত বড় শিল্প বিদ্যা যে কাউকে নিছক অনুসরণ করার অপেক্ষা রাখে না॥

মল্লভুমের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত চর্চার পরিচয়—

ধারাবাহিক চর্চ্চার পরিচয়ে আমার জানিত কয়েকটি স্থানের নাম। যথা—ভেলাইডিহার রাজধানী, ছাতনার রাজধানী, রামগড় রাজধানী, (এগুলি বিষ্ণুপুর রাজের জায়গীরদার)। কুচিয়াকোল জমিদার বাটী, ইন্দাস জমিদার বাটী, (এই দুটি উক্ত রাজবংশের শাখা) মালিয়াড়া, সাতজোড়া, পাঞ্চাল, পাত্রসায়ের, রাজগ্রাম, বড়জোড়া, কুম্ভস্থলীর নিকট একগ্রাম এবং তেলিবেড়িয়া জমিদারবাটী।

ধ্রুপদ চর্চার ব্যাপকতার পরিচয়ে পেয়েছিলাম বাল্যজীবনে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত গ্রামে ধ্রুপদী ও পাখোওয়াজ বাদক। তখনকার সময়েও যদি গণনা করা হত তাহলে আমার বিশ্বাস শতাধিক ধ্রুপদ গায়ক ও পাখোওয়াজ বাদক অক্লেশে পাওয়া যেত। ভাল সঙ্গীতের চর্চ্চা বলতে তখন ধ্রুপদকেই বুঝাত এবং শ্রোতারাও আগ্রহ নিয়ে শুনত। তখন দেখেছি যে কোন ক্রিয়ানুষ্ঠানে ধ্রুপদের আসর এবং তাতে অন্ততঃ চার পাঁচ জন করে ধ্রুপদী থাকত। বেশীর ভাগ গায়কেরই গানের কথা বুঝা যেত না,—কেবল মীড়-গমকেরই প্রাচুর্য্য প্রধান হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম কোন ওস্তাদের মারফত্ এই ধরণের গায়কীধারা অনেকের পছন্দ হয়ে বিস্তৃত হয়েছিল কিংবা হয়ত তাঁরা হিন্দীগান গাওয়া বলতে বুঝতেন কথা প্রকাশ করা চলে না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ ধারণা তাঁদের অবাস্তব নয়।

আমাদের বংশের গায়কীরীতির নিয়মে আদি ঘরাণায় ছিল কথার ভাবের সংগে রাগরূপের উপর সুললিত ও সীমিত সুর অঙ্কনই প্রধান হয়ে। তারপর অধিক উন্নতি নিয়ে পরিবর্ত্তন আসে প্রপিতামহ ঈশ্বরচন্দ্রের গায়কীর মধ্যে দিয়ে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদ সঙ্গীত গুণগ্রাহী অশীতিপর বৃদ্ধ হৃষিকেশ দাসগুপ্ত মহাশয় একদিন সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে বলেছিলেন—“তোমার প্রপিতামহ ঈশ্বর ঠাকুরের গানের গায়কী ছিল অসাধারণ এবং কণ্ঠের পরিধি ও উচ্চতা ছিল বিস্ময়কর। রাত্রে সে পাড়ায় গান ধরলে এ পাড়া থেকে গানের কথা পর্য্যন্ত শুনতে পেতাম। তিনি হিন্দীগান গাওয়া বেশী পছন্দ করতেন না,—বন্দনাগীতি, সংস্কৃতে স্তোত্রগান এবং ভাব সমৃদ্ধ বাংলা গানে তান বিস্তার করে লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন,—এমন অপুর্ব্ব কণ্ঠ ও গান খুব কম লোকের কাছে শুনেছি···।”

আমার শিক্ষার বয়েসের সময় পিতামহের কণ্ঠে অদ্ভুত দ্রুত তান শুনে আশ্চর্য্য হতাম। তান যে এত দ্রুত হতে পারে তা তখন ধারণায় ছিল না। ইনিও তাঁর পিতার মত ভাগবত পাঠেও অদ্বিতীয় ছিলেন। সে যুগের বিষ্ণুপুরবাসী বিখ্যাত ঠুম্‌রী গায়ক মাম্‌তুমিঁয়ার কাছে বহু ঠুম্‌রী গানের তালিম নিয়েছিলেন। পিতামহ সেতার বাদ্যেও সুনিপুণ ছিলেন। দেশ বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আমার বড় কাকা ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার পিতামহের কাছে কিছু খেয়াল, ঠুম্‌রী এবং এক শতটি গৎ সেতারে তালিম নিয়েছিলেন। মেজকাকা ৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর কাছে কিছু

খেয়াল ও ঠুম্‌রী শিক্ষা করেছিলেন। আমাদের ঘরাণায় যতকিছু প্রাচীন সেতারের গৎ আছে তার প্রায় সমস্তই পিতামহের সংগৃহীত।

আমার পিতা ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত, শ্রীমৎভাগবত পাঠক এবং শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে বিশেষ অধিকারী। তাঁর কণ্ঠ ছিল দরদমাখান। আমার একমাত্র আপন কাকা ৺অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ ছিলেন যোগসাধক এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অপূর্ব্ব গায়কীর অধিকারী। ইনি আলাপ, ধ্রুপদ ছাড়াও রাগবিস্তার ও সাবলীল তানের বৈচিত্র্যক্রিয়ার দ্বারা হিন্দী ও বাংলা খেয়াল এবং ভক্তিমূলক বাংলা গানে সকলের মন মাতিয়ে দিতেন। তিনি আমাদের আদি ঘরাণার গায়কীধারার প্রেরণা নিয়ে এবং তার সংগে যুক্ত হয়ে থেকে পশ্চিমীগায়কীর মিশ্রণে প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। এঁদের আমল পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে সংস্কৃত, ভাগবত এবং শাস্ত্রীয়সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি টোল ছিল। আট, দশটি ছাত্রকে ভরণ পোষণের দায়িত্ব এবং তাদের বিদ্যার্জনের সম্ভাব্য সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত কাছে রেখে পুত্রাধিক স্নেহে শিক্ষা দিতেন।

আমাদের এই টোলগৃহেই স্বনামধন্য ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি অনন্তলালের কাছে শিক্ষা ও সাধনা করতেন। আমার আপন কাকাও তাঁর কাছে অনেকগুলি ধ্রুপদ-খেয়াল শিক্ষা করেছিলেন।

বংশের পরিচয়---

পূর্বপুরুষদের কাছে শুনা যায় পূর্বতন কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের বংশে একক পুত্র সন্তানরূপে চলে এসেছিল অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হরিচরণ পর্য্যন্ত। তারপর তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীধরের তিনটি পুত্র সন্তান লাভ হয়। জ্যেষ্ঠের নাম গঙ্গানারায়ণ, মধ্যম নিরঞ্জন, (ইনি অবিবাহিত এবং বৈরাগ্য ভাবুক ছিলেন) কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ গঙ্গানারায়ণ বংশগত বিদ্যায় দখলকার ছিলেন না। যাজনক্রিয়া ইত্যাদি নিয়েই জীবন কাটিয়ে গেছেন। বংশের সংস্কৃত ও সঙ্গীত বিদ্যার ধারা সুরক্ষিত হয়েছিল একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্রেরই মাধ্যমে।

গঙ্গানারায়ণের একমাত্র পুত্র অনন্তলালের প্রথম বয়েসে বিদ্যাদি শিক্ষায় তেমন অনুরাগ ছিল না। তারপর তাঁর খুল্লতাত ঈশ্বরচন্দ্র এক রকম জোর করেই সংস্কৃত ও ভাগবত পাঠ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন একান্ত মনযোগের অভাব তখন গান শেখানর গোড়াপত্তন করেন কিন্তু প্রায়শই স্থানান্তরে নিজ ব্যবসায় গমনাগমনের জন্য শিক্ষা দেওয়ায় অসুবিধে হচ্ছে বুঝে কিছুকাল পরে আচার্য্য রামশঙ্করের কাছে শিক্ষার ভার দিয়ে আসেন। রামশঙ্করের প্রধান ছাত্রদের মধ্যে যদুভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং অনন্তলাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৃদ্ধ প্রপিতামহের দ্বারা আমাদের যে দুটি বংশধারার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে আমাদের ধারাটিতেই

বংশগত বিদ্যা অবিচ্ছেদ গতিতে চলে এসেছে। এই ধারাতেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চায় আমার পাঁচ পুত্রের মধ্যে দিয়েও অব্যাহত ভাবে চলেছে। এবং বংশের প্রধান স্রোতধারার এই পরিচিতি এখন পর্য্যন্ত আমার পাঁচ পুত্রের দ্বারাই সম্মুখবর্ত্তী হয়ে আছে।

সঙ্গীতের ইতিহাস লেখকদের পক্ষে আমাদের বংশের পুরাকালের পরিচয় সংগ্রহ অতিশয় কঠিন ছিল বটে, তবে গভীর অনুসন্ধান নিলে আমার চেয়ে আরো অনেক বেশী তাঁরা সে সময় তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন বলে মনে করি।

যাইহোক্—আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের সময় থেকে যে সমস্ত ঘরাণা পরিচয় সম্মুখবর্ত্তী হয়েছিল তাও তাঁদের লিখিত ইতিহাসে যথাযথ সন্নিবেশিত হয়নি।

কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন—এর কারণ কি? তাহলে একমাত্র উত্তর—লেখকদের অভিপ্রায় আমি কি করে বুঝব। তবে এজন্য খুবই আশ্চর্য্য ও দুঃখ লাগে।

বিষ্ণুপুরে আরো যে সমস্ত গায়ক বাদকদের পরিচয় আছে সেগুলি খুল্লতাত গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর লিখিত 'বিষ্ণুপুর বা দ্বিতীয় দিল্লী' গ্রন্থে বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন বলে আমি সেগুলির পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক মনে করলাম এবং আমার সাধ্যমত মল্লভূম তথা বিষ্ণুপুর সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইখানেই সমাপ্ত করলাম॥

অনেক আগেকার সংস্কৃতভাঙ্গা বাংলা গানের একটি পরিচয়——

সুর-ভৈরবী—তাল-তেতাল

ভব ঘোর কর দূর রাধারাণী গো মা
দীনে হীনে সুদিন দেহি পরমপদং
বাকরূপাত্বং ক্ষিতি মতী ধৃতি রতি
বেদ বিধি উমাসতী বাণী মা।
ক্ষমা দিবা নিশা বিধাতা, ধাতা
লোক মাতা মা
নিরাকারা পরমেশা যোগমায়া অযোনীজা
বাক্‌রূপাত্বং ক্ষিতিমতীগন্যা
দেবে ধন্য বেদে মান্য
ধ্যান জ্ঞান মান প্রাণ
রাগ তান মান লয়
কর কৃপা দরশন
কর দয়া মহামায়া শ্রীপদাংরজস্যাং ভরসাং মা॥

রচনা—অজ্ঞাত

০ ১ ২ ৩
{া সপা পা দা | পা মজ্ঞজ্ঞা ঃ মঃ পা | ণণা দপা মজ্ঞা মা | জ্ঞা ঋজ্ঞাঃ ঋঃ সা } | া জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা |
{০ ভব ঘোর কর০০ দূ র রা০ ০০ ০০ ধা রা ণী০ গো মা } ০ দী নে হী
জ্ঞা-া জ্ঞা মজ্ঞজ্ঞা | া জ্ঞা-ঋা সা | সজ্ঞা ঋসা া-া | পা ঃ দঃ পা পা | পদা ণর্সা ণদা পমা | পা--
নে ০ সু দি০ ন দে হি প র ম পদং০০ বা ক রূ পা ত্বং ক্ষি তি ম তি ধৃ তি র তি দে ব
পদা পদা মপা | ণণা ণদা পমা জ্ঞমা | জ্ঞজ্ঞা জ্ঞঋা সণ্া সা | |
বিধি উমা সতী বা ০ ০ ০০০০ ণী মা০ ০ ০ ০ ০ ০

ণ্া া সা া | জ্ঞা-া মা া | পা-া দা-া | র্সা ণদদা ঃ পঃ মজ্ঞজ্ঞা | া ঋা সা-া | া-া পা ণদদা | পা -
ক্ষ ০ মা ০ দি ০ বা০ নি ০ শা০ বি ধা ০ ০ ০ তা ০০ ০ ধা তা ০ ০০ লো ক ০ ০ | ০ মা
জ্ঞজ্ঞা া ঋা | সা া া া | ণ্া সা জ্ঞা মা | পা দা ণা র্সা | ণা দা পা মা | জ্ঞ মা ঋজ্ঞা ঋা সা | দা ঃ
০ ০ ০ তা মা ০ ০ ০ নি রা কা রা প র মে শা যো গ মা য়া অ ০ যো নী জা বা ক্
দঃ দা ণা | ণর্সা র্সণা র্সা র্সা | র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা র্মজ্ঞজ্ঞা | ঋা ঋণা র্সা র্সা | জ্ঞা -া জ্ঞা া |
রূ পা ত্বং ক্ষি তি ম তি গ ন্যা দে ০ বে ধ ন্যা০ ০ বে দে০ মা ন্যা ধ্যা ন জ্ঞা ন
জ্ঞ জ্ঞা র্মা জ্ঞা া | ঋ ঋা ঋা র্সা র্সা | ণর্সা ণণা দদা পা | া সদা দা দা | পা মজ্ঞজ্ঞাঃ মঃ পা ।
মা ০ ন প্রা ণ রা গ তান মান লয় ক র কৃ পা দ র সন ০ ক র দ য়া ম হা০ ০ মা য়া

০
র্সণা র্সা ণদা পা | পমা পা ণদপা ম জ্ঞ ঋা | স ণ্া | | | |
শ্রী প দাং র জ সাং ভর সাং মা০০ ০ ০ ০ ০ ০

কবি জয়দেব ও লোচন পণ্ডিত সম্বন্ধে—

এরপর আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সাহস রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। অর্থাৎ কবি জয়দেব এবং লোচন পণ্ডিত এই দু'জন মহান ব্যক্তিদের বিশেষ করে সঙ্গীত শিক্ষার বিষয়ে এই মল্লভূম অঞ্চলের সঙ্গীত পরিবেশের মাধ্যমেই হয়েছিল কি না সে সম্বন্ধে আমার বিচার যুক্তিতে যে সমস্ত সম্ভাব্য তথ্য ও প্রমাণ ধরা দিচ্ছে সেগুলি উপস্থাপিত করছি।

এর পটভূমিকায় প্রথমতঃ বলতে চাই–তখন স্বরলিপির যথাযথ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি বলেই মনে হয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গ্রন্থগুলি ঔপপত্তিক (Theoretical) বিষয় সম্ভারেই সমৃদ্ধ এবং পদাবলী ইত্যাদিতে রাগ তালের নামই উল্লিখিত হয়ে আছে। প্রাচীন পদাবলী ইত্যাদিতে রাগ-তালের নামোল্লেখ ধরে কেবল বুঝতে পারা যায় উক্ত রচনা বস্তুর কবিগণ রাগ সংগীতের চর্চা করেছিলেন। কারণ তাঁরা সেইভাবে গাইতে এবং রাগরূপের ভাবরূপকে যথাযথভাবে যদি চিনতে না পারতেন তাহলে অহেতুক রাগের নাম সন্নিবেশ করতেন না। তাঁদের এই অধিকারের প্রমাণ আগের অনেক

সঙ্গীত সাধকদের মধ্যেও পাওয়া যায়।

রাগ সঙ্গীতের প্রভাব মাহাত্ম্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তি উপলব্ধি করে আমাদের দেশের বিজ্ঞ সাধক ও ধার্মিক ব্যক্তিরা বহু ধর্ম্মীয় ব্যবস্থায় তার স্থান দিয়েছিলেন। কয়েক শত বৎসর আগে বাংলা দেশের ৺দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা আনয়নের মধ্যে এবং সেই পুজায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রাদির মধ্যে সেই সময়ের জন্য অনেকগুলি রাগ-তালের শুধু উল্লেখই নয় গাইবার নির্দেশও আছে। এই সকল স্পষ্ট ব্যবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে আছে যে, উক্ত পূজার সর্বস্থানে রাগাদি চর্চারত গায়কের অভাব ছিল না। কারণ মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত রাগ-তাল ধার্য্য হয়েছিল সেগুলি প্রকাশের মত যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা গরিষ্ঠতা যদি না থাকত তাহলে দুর্গাপূজার গ্রন্থকার (কালীকাপুরাণ রচয়িতা) গ্রন্থে অহেতুক সন্নিবেশ করতে পারতেন না। পূজার মধ্যে রাগরূপের মূর্ত্তি আনয়নের আবশ্যকতার কথা তাঁর অন্তরেই বিলীন হয়ে থাকত।

এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি– তখনকার গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত রাগ-তালের উল্লেখ আছে সেগুলি শুধু নামের শোভাবর্দ্ধন করে নয়,--নির্ণয়কারকদের তাতে যথেষ্ঠ দখলও ছিল।

কবি জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ গ্রন্থে অনেকগুলি রাগ-তালের নাম আছে। সেইসব রাগ ও তালকে নিয়ে তিনি তাঁর ‘গীতগোবিন্দের’ পদাবলীগুলি যে গাইতেন সে বিষয়ে অবিশ্বাস আসে না। সেই রাগগুলি দক্ষিণ রাঢ়ের প্রচলিত রাগের সংগেও মিল পাওয়া যায়।

এরপর জয়দেবের সঙ্গীত শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা,—

দক্ষিণ রাঢ়ভূমের যে সময় থেকে সংগীতচর্চার বিষয় ধরে প্রমাণ দেখিয়েছি—সেই সময়ে এবং তার আরো অনেক পরে অর্থাৎ উক্ত কবির সময়েও বীরভূমের কোন স্থানে প্রাচীনের নিদর্শন ধারা নিয়ে এবং কোন দিক দিয়েই সঙ্গীতচর্চার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এখন দেখাতে চেষ্টা করব তাঁর বংশ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আছে কিনা সেই সন্ধান।

বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক শ্রীপুলীনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন জয়দেবের বিষয় নিয়ে আলোচনায় জানালেন—“জয়দেব আমাদের পূর্বপুরুষের বংশধর ছিলেন। জয়দেবের এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিল,—সেই ভাই এরই বংশধর আমরা। জয়দেব ভক্তসাধকের পর্য্যায়ে উঠার পর উপাধিতে গোস্বামী রূপে পরিচিত হন। তাঁর বিগ্রহ গোবিন্দ জীউ আমাদের বাড়ীতে বৎসরে ছয় মাস থাকেন এবং বাকী ছয় মাস কেন্দ্রবিল্লের মন্দিরে থেকে পূজিত হন।

আমাদের আদি বসবাস বা জন্মস্থান ছিল বর্দ্ধমানের দক্ষিণ সীমার বেলগা-তগিপুর গ্রামে। তারপর আমাদের ছ’ পুরুষ আগের শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বশুর সম্পত্তি লাভ করে দুর্গাপুরের নিকটবর্ত্তী ধবনীগ্রামে চলে আসেন। এর সংগে দামোদর নদের বন্যা প্রকোপ ও স্থান ত্যাগের অন্যতম

কারণ ছিল। পূর্বে বহুকাল ধরে প্রথমোক্ত গ্রামেই পুর্ব্বপুরুষরা বসবাস করেছিলেন। এখন ধবনী গ্রামই আমাদের জন্মস্থানের পরিচিত স্থান বা দেশ। জয়দেব পিতৃদত্ত বীরভূমের ক্রয় সম্পত্তি পেয়ে সেখানে তিনি চলে গিয়ে বসবাস করেন। তিনি বাল্যকালে আমাদের আদি বাস্তু গৃহের গ্রামে যখন ছিলেন তখন থেকেই তিনি সঙ্গীত প্রিয় হয়ে উঠেন এবং মনে হয় ওই অঞ্চলের কোন সঙ্গীত ঘরাণায় তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা হয়েছিল। এই সমস্ত কথা বিশেষ করে আমার জেঠা মহাশয় শ্রীশ্রীপতি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শুনা আছে।" অধ্যাপক পুলীন বাবুর কাছে এই পরিচয়ের প্রামানিক সত্য ধরে দেখতে পাচ্ছি জয়দেবের সঙ্গীত শিক্ষা লাভ দক্ষিণ রাঢ় অর্থাৎ মল্লভূমেই হওয়া বিশেষ সম্ভব। সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রমানের উপর ওই স্থলই বহু পূরাকাল থেকে পরিচিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এ কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। অন্যস্থানে আর কোথাও চর্চার প্রাচীন নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আসছে না। সুতরাং মল্লভূমের কোন সঙ্গীত ঘরাণায় যে তিনি শিক্ষা করেছিলেন তা বিশ্বাস যোগ্যরূপে প্রতীয়মান হতে বিলম্ব আসে না। বর্দ্ধমানের শেষ দক্ষিণ প্রান্ত বাঁকুড়া জেলার সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, ব্যবধান মাত্র দামোদর নদ। তাছাড়া তখন উক্ত সমস্ত অঞ্চলই মল্লরাজাদের অন্তর্গত ছিল। এই সমস্ত কারণের উপর সঙ্গীত শিক্ষা লাভের জন্য জয়দেবের পক্ষে মল্লরাজাদের কোন সঙ্গীতজ্ঞের নিকট শিক্ষার কথা মনে ধরে' বলা যেতে পারে তাঁর পক্ষে তা সহজ সুযোগের মধ্যেই হয়েছিল। অনুসন্ধানের চিন্তা প্রসারিত করে এ কথাও মনে উদয় হচ্ছে যে—জয়দেবের বংশ আমাদেরই বংশের বোধ হয় কোন একটি শাখা। শাণ্ডিল্য মুনি থেকে যে দুজনের দ্বারা বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সৃষ্টি হয় সে দু'জন হলেন—রত্নেশ্বর ও দাশরথি (দাস বাড়ুয্যে)। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্রেই একই বংশের বংশ পরম্পরা সন্তান। আগে এই বংশ পরিচয় বাল্যকালেই জানান হত। দেশের কোন নূতন জায়গা গেলে প্রশ্নে পরিচয় প্রদান নিয়ে বলতে হত আদি বাসস্থান ছিল 'কাঁটা দিয়া বন্দিঘাটি' রত্নেশ্বর ঠাকুরের সন্তান এবং ফুলে মেল। সঙ্গীতের চর্চা এবং তার প্রভাব পরিচয় ধরে এ-ও বিশ্বাস আসে যে, আমাদের বংশের সে যুগের সংগে জয়দেবের বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাও আশ্চর্য্যের কিছু নয়।

জয়দেবের নিজ পরিচয় সম্বন্ধে অধ্যাপক পুলীনবাবুর দেওয়া যে সংবাদ প্রদান করলাম এবং তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে যে সম্ভাবনার কথা উপস্থাপিত করলাম তা আশা করি বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট সত্যের রূপ নিয়ে মনে বিশ্বাস আনার সহায়তা করতে সাহায্য করবে।

লোচন পণ্ডিত সম্বন্ধে —

বাংলা তথা ভারতের শার্ঙ্গদেবের (সঙ্গীত রত্নাকর প্রণেতা) পূর্বের প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যের নাম এবং তাঁর রচিত 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থের পরিচয় বিশেষ করে জানতে পারা গেল স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন

শাস্ত্রী মহাশয়ের এক বিস্তৃত প্রবন্ধের মাধ্যমে। তাঁর এই প্রবন্ধ ১৩৬৭ সালের ২৫শে বৈশাখ 'গীতবিতান-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।

শার্ঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থকেই আমরা প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে জানতাম কিন্তু এখন প্রমাণ পাওয়া গেল গৌড়ের মহারাজ বল্লাল সেনের দরবার গায়ক লোচন পণ্ডিতের রচিত 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থ আরো বহু পূর্ব্বে লিখিত। উক্ত গ্রন্থে বহুরাগাদির ঔপপত্তিক পরিচয় সন্নিবেশিত হয়ে আছে। ওই গ্রন্থটি বঙ্গদেশ থেকে উধাও হয়ে গেছল। পরে পাওয়া যায় এলাহাবাদের কাছে। এই গ্রন্থ হতে মধ্যভারতের রাজা হৃদয়নারায়ণ (খৃঃ ১৬৬৭ সালের কাছাকাছি) তাঁর গ্রন্থ 'হৃদয় কৌতুকে' উদ্ধৃত করেন। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণযোশী মহাশয় নকল করে পুনায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে ১৯১৮ সালে শ্রীদত্তাত্রেয় যোশী মহাশয় তাহা সম্পাদন করেন। লোচন পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন "তখন বাংলা দেশে আরো অনেক সঙ্গীত শাস্ত্র গ্রন্থ ছিল (পৃঃ ৮) তাতে রাগ বিশেষে আরোহন অবরোহন ভাল করে লেখা ছিল।" লোচন পণ্ডিতের উক্ত গ্রন্থ ১১৬০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বল্লাল সেনের রাজ্য প্রাপ্তির সময়ে সম্পাদিত হয়। কবি জয়দেবের ঠিক এক পুরুষ পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'রাগ সঙ্গীত সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থে আছে কিন্তু সে সব গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়নি।' এই উক্তির দ্বারা বহু পুরাকাল হতে বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার মূল কেন্দ্র কোথায়? দক্ষিণ রাঢ়ভূমেই কি? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। বাংলা তথা ভারতের উক্ত প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত ও বাসভূমের স্থানাদি এবং সঙ্গীত শিক্ষার ঘরাণা পরিচয় ইত্যাদির বিষয় ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর উক্ত বিশদ প্রবন্ধে কোথাও উল্লেখ করেন নি। সে বিষয় লোচন পণ্ডিতের 'রাগ-তরঙ্গিনী' গ্রন্থে থাকলে নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতে বিস্মরণ হতেন না। কারণ তাঁর পক্ষে অজানা থাকবে না যে ওই বিষয়ের পরিচয় জানার আগ্রহ সকলের কাছেই তার গুরুত্ব আছে।

লোচন পণ্ডিতের পরিচয় সন্ধান এবং তাঁর গ্রন্থ পেয়ে বঙ্গদেশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার বহু দূরের প্রাচীন নিদর্শন পেয়ে আমাদের খুব গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। পিছিয়ে থাকা মনোভাব থাকলে তা এখন বিশেষ করেই দূরীভূত হবে।

যাই হোক এখন তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষে পরিচয়ের সন্ধান পাওয়ার আগ্রহ আসা খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয় নিয়ে আমার মনে যে ধারণার উদ্ভব হচ্ছে তাতে করে মনে বেশ রেখাপাত করছে যে তিনি এই দক্ষিণ রাঢ় ভূমেরই মানুষ ছিলেন। এই সম্ভাবনার উপর নানান তথ্য ধরে বিচার আলোচনার দ্বারা প্রমাণ দেখাবার চেষ্টা করব।

পুর্ব্বের আলোচনায় জানিয়েছি বাংলায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত যতদূর হস্তগত হয়ে তার প্রাচীন পরিচয় পেয়েছি তাতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর সময়ে লুইপাদ রচিত গ্রন্থের রাগ সমূহের নিদর্শনই পুরোভাগে অবস্থিত। লোচনের 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থ তার বহু পরে প্রকাশিত হয়েছে।

অবশ্য সময়ের দীর্ঘত্ব পরিচয় ব্যতিরেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাচীন গ্রন্থ ও তার মূল্য হিসেবে লোচনের গ্রন্থকেই এখন পুরোভাগে পাওয়া গেল।

যাইহোক এই আলোচনায় বাংলা দেশে সঙ্গীত চর্চার প্রাচীন পরিচয়কে যুক্তি সম্মত ভাবে ধারণ করে লোচনের পরিচয় সম্বন্ধে তার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করি। দক্ষিণ রাঢ়ের রাগ সঙ্গীতের ধারাবাহিকতার প্রমাণ ধরে দেখা যাচ্ছে লুইপাদের গ্রন্থে এবং পর পর লোচন, রমাই পণ্ডিত, বড়ু-চণ্ডীদাস প্রভৃতি ব্যক্তিদের গ্রন্থের উল্লিখিত রাগসমূহের মধ্যে নামের পরস্পর যোগাযোগে বহুলাংশে বেশ মিল আছে। তারপর সেই সব রাগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ রাগগুলি পাওয়া যাচ্ছে ধ্রুপদাদি সঙ্গীতের মধ্যেও এবং বিষ্ণুপুর ঘরাণাতেও বহু পূর্বে হতে প্রচলিত হয়ে আসছে। পূর্বাপর যোগাযোগের নিদর্শন ধরে এই বিশ্বাসে আসছে যে লুই, লোচন, জয়দেব, রমাই প্রভৃতি মহা মহা ব্যক্তিদের সঙ্গীত চর্চা ও শিক্ষার ধারা দক্ষিণ রাঢ়ের সঙ্গীত সংস্কৃতি কেন্দ্রের একই মূল ঘরাণা হতেই প্রবাহিত হয়েছিল।

দক্ষিণ রাঢ়ের উক্ত বর্ণিত প্রধান কেন্দ্রকে ধরে তার উপর গভীর দৃষ্টি চিন্তা নিয়ে এবং এই অঞ্চলের চতুর্দিকের রাগ সঙ্গীতের আবহাওয়ায় বাল্যকাল থেকে নানান তথ্য ও পরিচয় লাভ করে মনের মধ্যে যে বিশ্বাসের রেখাপাত করে আছে তাতে করে আমার মনে স্বচ্ছভাবে উদয় হচ্ছে লোচন পণ্ডিত এই অঞ্চলেরই মানুষ ছিলেন।

প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে একটা খুব সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিষ্ণুপুর হতে পাঁচ মাইল দূরত্বে পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলের এক গ্রামের নাম বাসুদেবপুর। সেখানে সম্প্রতি এক শীলালিপি আবিষ্কৃত হয়,—তাতে উক্ত গ্রামের আদি নাম লোচনপুর বলে লেখা আছে এবং আরো অনেক কিছু উক্ত শীলালিপিতে পরিচয় পেয়ে এখানের সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাচীনতত্ত্ব অনুসন্ধানবিদ্ শ্রীমানিকলাল সিংহ মহাশয় বিশ্বাস রেখে বলেন লোচন পণ্ডিতের দ্বারা সৃষ্ট ওই গ্রামের নাম তাঁর নামে প্রচারিত হয়েছিল। আমার এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহে, মানিকবাবুর সাহায্য অনেকখানি পেয়েছি। তিনি এই সব বিষয়ে খুব নির্ভরশীল। উক্ত গ্রাম হতে গড়মন্দারণ রাজার রাজধানীর দূরত্ব তিরিশ মাইলের মত। যদি বলা যায় বিষ্ণুপুরের এত নিকটে যদি লোচনের বাস্তগৃহ ছিল তাহলে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত পরিচয়ে লোচনের নাম কেন নেই ? এর উত্তর—লুই, রমাই, বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি ব্যক্তিদের কিছুকাল আগে যদি পুঁথি ও বা গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত না হত তাহলে তাঁদের নামও আমরা কেউই জানতাম না। লোচন সম্বন্ধেও আমরা এতকাল কিছুই জানতাম না। আরো হয়ত এখন কত মহা মহা ব্যক্তিদের নাম, ও পরিচয় আছে, আবিষ্কার হলে তবে জানতে পারা যাবে।

দক্ষিণরাঢ়ের সঙ্গীতসংস্কৃতির প্রাচীনত্বের যে সমস্ত প্রমাণ দিতে পেরেছি, সেরূপ ধারাবাহিকতার প্রমাণ গৌড় অঞ্চলের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। বল্লালসেনের সময়েই তার গোড়াপত্তন বা চর্চা ঘটেছিল এই ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে। অবশ্য সঠিক করে বলা মুস্কিল তার আগে ছিল কিনা। তবে প্রমাণের

অভাব দেখতে পাচ্ছি। ইতিহাসে এবং বিশেষ সন্ধানে জানা যায়— বল্লালসেনের মাতুলালয় ছিল গড়মন্দারণের রাজপরিবারে। লোচন গড়মন্দারণের দরবারে ছিলেন এবং বল্লালসেন তাঁর সঙ্গীত বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দরবারে নিয়ে গেছলেন—এ কথাই সত্যের মধ্যে দিয়ে বিচার যুক্তিতে আসে। খৃঃ ১১৬০ শতাব্দীতে বল্লালের রাজ্য প্রাপ্তির সময়েই লোচন পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এই পরিচয়ের উপর বিচার করে বলা যায় তাহলে তিনি গ্রন্থ রচনা বহু পুর্ব্বেই সমাধা করেছিলেন এবং এই গ্রন্থের আগেও তিনি অন্যান্য সঙ্গীতের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সে কথাও তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। এইসব সত্যকে ধরে বুঝতে হচ্ছে লোচন যদি গৌড়েরই বাসিন্দা হতেন তাহলে তাঁর গুণপনার খ্যাতি বহু পূর্বে থেকে সেখানে থাকতে হয় কিন্তু গৌড়ের ইতিহাসে সে খবরের সন্ধান কিছু পাওয়া যাচ্ছে না এবং সেখানে তাঁর শিক্ষা গুরুর বা ঘরাণার কোন পরিচয় নেই। তা যদি থাকত তাহলে মনে হয় তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সে সম্বন্ধের বিষয় কিছু না কিছু সন্নিবেশিত হত। যা দ্বারা আমাদের পক্ষে তাঁর পরিচয় জেনে নিতে অসুবিধা হত না। অর্থাৎ ক্ষিতিমোহন বাবু তা জানাতেন। যদি বলা যায়—লোচন তাঁর পরিচয় গোপন রাখলেন কেন! নিজের কাছেই এর উত্তরে মনে হয় হয়ত কোন গূঢ় কারণ ছিল—যার জন্য তাঁকে অপ্রকাশ রাখতে হয়েছিল। কিংবা সংগীত-গ্রন্থে সে পরিচয় দেবার আবশ্যক মনে করেননি। অবশ্য একথা সত্য যে গ্রন্থ রচয়িতার নিজ পরিচয় যদি গ্রন্থে না থাকে তাহলে দূর ভবিষ্যতে যথাযথ নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সেই দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করতে হলে একমাত্র সম্ভাব্য তথ্য ও বিচার ধরেই তার নিরাকরণের উপায় থাকে। আমি সেইগুলিই দেখিয়ে যাচ্ছি।

লোচনের পণ্ডিত পদবীর মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ের উপর তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে বেশ একটা হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে। লুইপাদ হতে প্রবর্ত্তিত ধর্মঠাকুরের যাঁরা পুজাদির ভার নিয়েছিলেন তাঁদের নামের পরে পদবী পণ্ডিত কথার ব্যবহার চলে আসছে। সেই পদবী শুধু একার নয় সেই বংশের সকলেরই থাকে। উক্ত ক্রিয়াকর্ম নিয়ে এই পদবীর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ অন্য আর কোথাও বোধ হয় নেই। সুতরাং লোচনের নামের শেষে এই পণ্ডিত কথাটির উপর স্থান পরিচয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়া যাচ্ছে। শূন্যপুরাণ রচয়িতা রমাইএর পদবীও পণ্ডিত। তাঁর গ্রন্থের রাগ-তাল সমন্বিত পদাবলীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও ধর্ম ঠাকুরকে নিয়েই।

সঙ্গীত ও শাস্ত্রচর্চার নীতিধারার সমাবেশ লক্ষ্য করে মনে এই বিশ্বাস আসে যে লোচন উক্ত বংশেরই মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর বসবাস সেই পূর্বোল্লেখিত গ্রামেই ছিল এবং সেখান থেকে তিনি গড়মন্দারণের রাজদরবারে প্রথম সঙ্গীতাচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত থেকে—পরে গৌড়ের রাজা বল্লালসেনের কাছে থাকেন।

যাইহোক্—পণ্ডিত পদবী ধরে দেখা যাচ্ছে—দক্ষিণ রাঢ়ভূমের বহু অঞ্চলেই ধর্মঠাকুরের পূজাদির অধিকারীদের মধ্যেই বিশেষভাবে পণ্ডিত উপাধি আছে।

এই পূজার প্রতিষ্ঠা ও ক্রিয়াকর্ম নিয়ে কোনরূপ জাতিভেদের গণ্ডী সৃষ্টি হয়নি। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনগঞ্জ অঞ্চলে এক কর্মকার বংশে বহুকাল আগে থাকতে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন এবং সেই থেকে তাদের আদি পদবী পরিবর্ত্তিত হয়ে পণ্ডিত নামে বংশপরম্পরা পরিচিত হয়ে আসছে।

পণ্ডিত পদবীর এই সমস্ত কারণ ধরে বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে—এই পদবীর উৎপত্তি বা জন্মস্থান দক্ষিণরাঢ়ভূমে ছাড়া অন্য আর কোথাও নেই। যদি আমাদের দেশে কোথাও থাকেও তাহলে আমি মনে করি তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের বংশ পরিচয়ের সন্ধান পেলে জানা যেতে পারবে তাঁদের আদি বাসস্থান দক্ষিণরাঢ়েই ছিল।

সকলেই জানেন সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করলে উপাধিরূপে নামের পূর্বেই পণ্ডিত কথা ব্যবহার হয়, পরে নয়।

একমাত্র এখনও পল্লীর পাঠশালার শিক্ষকদের গ্রামের ব্যক্তিরা নামের শেষে পণ্ডিত বলে সম্বোধন করেন। যেমন হরিপণ্ডিত, জগাই পণ্ডিত ইত্যাদি। ডাকার এই সম্বোধন ধরে লোচন ও রমাই পণ্ডিতের পণ্ডিত পদবীর সংগে কোন সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

পদবীতে পণ্ডিত ব্যবহারের উপরোক্ত বিবরণ সমূহের ভিত্তিতে লোচনকে ওই স্থলে অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ভূমে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে যথেষ্ঠ যুক্তি ও সত্য সম্বন্ধ আছে কি না দৃষ্টিবান তথ্যাভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণও বিচার বিবেচনা করে দেখতে পারবেন।

অনেক প্রাচীন বিষয়েরই পরিচয় প্রদানের সপক্ষে আমাদের দেশে তার সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রচারের মূলসূত্র ধরে কোন ধারা বিবরণী নেই, বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এজন্য এ বিষয়ে উৎসাহী হতে হলে পরিস্থিতির উপর বিচার দৃষ্টি রেখে তথ্যাদি অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করে এবং যদি কোন বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সংরক্ষিত ইতিহাস পাওয়া যায় তাহলে তাঁর শ্রুতিশক্তির উপর শ্রদ্ধা রেখে ইতিহাসের মালমশলা তৈরী করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই সমস্ত সংগৃহীত বস্তুর মধ্যে কিছু অনুমান বস্তুকেও মিশ্রিত করবার আবশ্যক এসে পড়ে। এই এসে পড়া আমার বুদ্ধি ও চিন্তায় বলে অনুমান শুধু কল্পনার মূর্ত্তি ধরেই আসে না, চিন্তালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে বাস্তব সত্যের মূর্ত্তি ধরেও আসে। অবশ্য এই আসা ও চিন্তা এবং সংগ্রহ কোনটিই যে আয়াস ও সহজ লভ্য নয় এ কথা বিশেষজ্ঞদের কাছে বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে গৌড়ের সঙ্গীত চর্চার বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটা জিজ্ঞাসার প্রশ্ন আসে,—আট শত পঞ্চাশ বৎসর আগে লোচন পণ্ডিত দ্বারা গৌড়ের রাজধানীতে কি সঙ্গীত চর্চার প্রাচীন পরিচিতির পীঠস্থান এবং কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠত না, যদি তিনি তার সুযোগ সুবিধা পেতেন এবং কিছুও ধারাবাহিকতা থাকত? থাকলে তাহলে তো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সহজ পরিচয়ে বিষ্ণুপুরের উপরেই তার স্থান থাকত! সুতরাং তা যখন নয় তখন এ কথাই কি বিশ্বাসরূপে ধরা দিচ্ছে না যে লোচন পণ্ডিত

একক রূপেই তিনি সেখানে থেকে ছিলেন এবং তাঁর পুর্ব পরম্পরা সঙ্গীতের কোন বংশ ধারা সেখানে তেমন ছিল না।

আশা করি পাঠকগণ এই সব যুক্তির কথাও বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

এই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য আলোচনার উপর মতামত তৎপরতার সহিত প্রকাশ করা যায় না। আমার ধারণায় সত্যের সূত্র ধরে বিচার বিবেচেনা করবার যথেষ্ট অপেক্ষা রাখে।

মানিকবাবুর দেওয়া লোচন পণ্ডিতের জন্মস্থানের পরিচয় সংবাদকে বিশেষ করে ধরে দেখা যাক লোচন পণ্ডিতের রাগ তরঙ্গিনী গ্রন্থটি উধাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কোথা থেকে হতে পারে। এর সূত্র আবিষ্কারের মধ্যে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তার উপর যদি বিচার বিবেচনা মত গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায়—মল্ল রাজাদের বিবাহাদি আদান-প্রদান পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের ক্ষত্রীয় বংশে ধারাবাহিক রূপে চলে এসেছিল এবং এখনও এই বংশের মধ্যে এই প্রথার পরিচয় আছে। বল্লাল সেন রাজার অনুরূপ সামাজিক যোগাযোগ ছিল কি না তা জানা যায় নি। যদি না থাকে তাহলে এ কথাই মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের রূপ নিয়ে আসে যে লোচন পণ্ডিত শেষ জীবনে নিজ গ্রাম উক্ত লোচনপুরে এসেছিলেন এবং মল্লরাজাদের আদি প্রত্যুম্নপুর রাজধানীতে তাঁদের এলাহাবাদ অঞ্চল নিবাসী কোন সঙ্গীত অনুশীলনকারী কুটুম্ব কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থটি কোন প্রকারে হস্তগত হয়ে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। গ্রন্থটির এই অপসারণ লোচনের মৃত্যুর পর তাঁর গৃহ হতে সহজভাবেও হয়ে যেতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে বিষ্ণুপুর রাজবাটীর গ্রন্থাদি প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত হয়েছিল। সেখান থেকেও হস্তান্তরিত হয়েছে এবং তার সংগে আরো হয়ত নানান মূল্যবান সঙ্গীতের পুঁথিও। এ সবই অনুমান হলেও অনুমান সিদ্ধ হয় বিচার যুক্তির দ্বারা ন্যায় শাস্ত্রের মত।

যাইহোক্, উক্ত বিচার যুক্তি ছাড়া গ্রন্থ উধাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অন্য কোন পথে আবিষ্কৃত হতে পারে বলে তথ্য আলোচনায় ধরা দিচ্ছে না। এই বিষয়ের এই সম্ভাবনার কথা নিবিষ্টচিত্ত পাঠকগণের মনের মধ্যে রেখাপাত করতে পারে মনে করেই লিখিত হল। মোটের উপর আমার দেওয়া এই দুই মহান ব্যক্তির পরিচয় বৃত্তান্তের আলোচনাকে আশ্রয় করে যদি অন্য কোন পথে সামগ্রিক প্রমাণসহ যথাযথ সত্য উদ্ঘাটিত হয় তাহলে আমার লেখার পরিশ্রম সার্থক হয়েই উঠবে।

পরিশেষে—বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের প্রাচীনধারাকে অনুসরণ করে শাস্ত্রীয়সংগীতের যথাযথ তথ্য সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত বিষয়বস্তুকে ধরে লিখিত হল তা অনেকেই আগ্রহসহকারে মনযোগের সহিত শ্রবণ করে, এর সমস্তকেই তাঁরা যুক্তিযুক্ত বলে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন। উক্ত শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে বিষ্ণুপুরেরও বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন।

সর্বশেষে,—পূর্ব্বেই জ্ঞাত করেছি,— মল্লভূমের প্রায় সমস্ত স্থানেই সংগীতঘরাণা লোপ পেয়ে গেছে। শাস্ত্রীয়সংগীত চর্চ্চার যে ইতিহাস জ্ঞাপন করেছি তার মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ হতে শাস্ত্রীয়সংগীতের যে ঘরাণার সৃষ্টি হয়েছিল কয়েক শত বৎসর পুর্ব হতে তা বটবৃক্ষের মত জীবনী শক্তি লাভ

করে শক্তি-তেজে-বর্দ্ধিত হয়ে বিরাট মহীরুহের মত সৃষ্টি হয়ে এসেছে এবং তার বিপুলকাণ্ডের উপর শাখা-পল্লবে সুবিস্তীর্ণ ও সুদৃঢ় থেকে সম্মুখের দিকে মস্তক আরো উন্নত করে রেখেছে আমার পাঁচ পুত্র-পাঁচটি ছোট বড় উর্দ্ধ শাখার মত। সেই স্তরে বিষ্ণুপুর শাস্ত্রীয় সংগীতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং পীঠস্থানের নাম ভগবানই কৃপা করে রক্ষা করেছেন। এই কৃপাদান তাঁর যেন থাকে পরের পর বংশের মধ্যে এই সর্বদা প্রার্থনা করি। দেশের এত বড় গৌরবকে রক্ষা করে যাওয়ার মত আর বড় কর্ত্তব্য কিছু নেই বলে আমি মনে করি।

পরিশিষ্ট

অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বিষ্ণুপুর সংগীত ইতিহাস লেখার শেষ পর্য্যায়ে আমার এবং আমার সন্তানদের সঙ্গীতের ধারা রক্ষার পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য। আমার জীবনে যেভাবে বহু সমস্যা, সহ্য ও ধৈর্য্যের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীতকে ধরে গড়ে উঠেছে তার যথাযথ পরিচয় দিতে হলে এই স্থানে অনেক পৃষ্ঠার প্রয়োজন। সুতরাং উক্ত ইতিহাসের মধ্যে সে সমস্ত জ্ঞাপন করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতে পারলাম না।

আমার উক্ত পরিচয়ের বিষয় পাণ্ডুলিপি আকার পৃথক ভাবে সামাধা করা আছে। যদি কখনও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় তাহলে মনে হয় তার পৃষ্ঠা সংখ্যা কয়েক শতর মত হয়ে পড়বে। এ স্থলে শুধু তাঁদের আগ্রহের সম্মান রক্ষার জন্য আমার এবং আমার সন্তানদের যৎসামান্য পরিচয় প্রদত্ত হল।

আমার কথায়, বাড়ীর গুরুজনদের মুখে শোনা অতি শিশুকালের সময় থেকেই তানপুরার সুরের সংগে গলায় 'সা' মিলাতে পারতাম। মা বলেন সূতিকাগার হতে বেরোবার পর থেকে সুরের আওয়াজ এলেই সেই দিকে চোখ, কাণ যেন তাকে খুঁজে বেড়াত, নড়াচড়া পর্য্যন্ত থাকত না। তিন বছর বয়েস থেকেই ঠাকুরদা' ছোট, ছোট গান শেখাতে আরম্ভ করেন এবং পাঁচ বছর বয়েস থেকেই তানপুরার তার বাজিয়ে গাইতে পারতাম। এই দশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত সমানে পাঠশালায় লেখা পড়া, বাড়ীতে বাবার কাছে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন এবং তাঁর কাছে ও ঠাকুরদা'র কাছে অনেকগুলি ধ্রুপদ, খেয়াল এবং খাঁটি রাগের উপর প্রাচীন বাংলা গান শিখেছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে মল্লভূমের বহু সম্ভ্রান্ত গ্রামের আসরে পিতা, পিতামহের সংগে গিয়ে গান শুনিয়ে প্রচুর উৎসাহ লাভ করেছিলাম।

তারপর ওই বয়েসে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় মেজ কাকা-৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর থাকার স্থান বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার পরের স্তর থেকে শিক্ষা দান করেন। তাঁর কাছে বিষ্ণুপুর ঘরাণার সমস্ত শ্রেণীর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং সেতার বাদ্যে তালিম পাই। সেখানে যাওয়ার পর থেকে সময় সময় আমার পিতামহ ৺রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানে সংগে

করে নিয়ে গিয়ে বিশিষ্ঠ সঙ্গীত গুণীদের সংগীতাদি শ্রবণ এবং তাঁদের সংস্পর্শ লাভ করিয়ে দিয়ে উচ্চ আদর্শ আমার সামনে তুলে ধরিয়ে ছিলেন। সেই বাল্যকাল হতে বহু প্রাচীন গুণীর সঙ্গীত সাধনা শ্রবণ করতে পেয়ে আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে কত যে উপকার হয়েছিল তা আমি গভীর শ্রদ্ধার সহিত উপলব্ধি করি। তাঁদের সান্নিধ্যে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের অকিঞ্চিৎকর সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করতাম আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ। সেই পরমবস্তু সঙ্গীত লাভের যাত্রাপথে আমার নির্ভর সহায়ক হয়েছিল।

তারপর ক্রমশঃ বাংলার এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীত আসরে নিমন্ত্রণ লাভ করে এসেছি। বাংলা ১৩১৮ সালে বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় অষ্টম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন স্বনামধন্য ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ কর্তৃক প্রদত্ত সুবর্ণপদক সভাপতি মহাশয় সেই সভায় আমার কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে আনন্দ চিত্তে আশীর্বাদ করেন। পনের বছর বয়েসের সময় বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ সীমান্তর্গত ভেল্লাইডিহার রাজা বাহাদুরের সঙ্গীত শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হই। ইং ১৯১৭ সালে অর্থাৎ আমার সতের বৎসর বয়েসের সময় লালগোলার (মুর্শিদাবাদ জেলার) মহারাজার সঙ্গীতজ্ঞ পদে নিযুক্ত হই। ইং ১৯১৯ সালে বাঁকুড়ায় লর্ডলিটনের আগমন উপলক্ষে সঙ্গীতের আসরে আহুত হয়ে সেখানে সঙ্গীত সভার শেষে পঞ্চকোটের মহারাজা আমাকে গভীর স্নেহে আকর্ষণ করে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর দরবারে সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান দান করেন। লালগোলার মহারাজার কাছ থেকে একান্ত অভিলাষ সূচিত পত্রাদি পেয়ে পঞ্চকোটে মাত্র দেড় বৎসর থেকে আবার লালগোলায় চলে আসি। তারপরে ১৯২১ সালের প্রথমে বিশেষ আকর্ষণ পেয়ে কোলকাতায় এসে নানান স্কুল-কলেজে, সঙ্গীত বিদ্যালয়ে এবং বহু গণ্যমান্য ও রাজা জমিদারদের গৃহ শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হই। ১৯২৩ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (অষ্টম এডওয়ার্ড) এর কোলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে যে দরবার সভা হয় তাতে ছয়টি রাগ শুনাইবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থায় পশ্চিম ভারতের সঙ্গীতগুণী মজীদ্ খাঁ, ফিডাহুসেন খাঁ, হাফিজ্ আলি খাঁ এবং বাংলার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এঁদের সংগে আমিও স্থান পেয়ে ছিলাম। সেই দরবারে মেঘ রাগ প্রকাশের জন্য আমার উপর ভারার্পণ হয়েছিল।

এই যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ স্যার প্রদোৎকুমার ঠাকুর কে, টি, বাহাদুরের দৃষ্টি আমার উপর বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় এবং সেই সময় থেকে তিনি আমাকে তাঁর প্রাসাদের সঙ্গীতজ্ঞ পদে সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করেন। তাঁর দরবারে একাদিক্রমে উনিশ বৎসর ছিলাম। ওই সময়ের মধ্যে তাঁর ব্যবস্থাপনায় হায়দ্রাবাদের নিজাম ও গোওয়ালীয়রের মহারাজকে গীত-বাদ্য শুনানর সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁদের কাছে যেভাবে প্রশংসা পেয়েছিলাম তাতে আমাকে খুবই উৎসাহিত করেছিল। ইং ১৯১৯ সাল হতে ৩৮ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিম ও উত্তর ভারতে যতগুলি ‘নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন’ হয়েছিল তার প্রায় প্রত্যেকটিতে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য সে সব স্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছলাম।

যে সব ধুরন্ধর ব্যক্তি উক্ত সম্মেলন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ড, কাশীর জমীদার—বিখ্যাত বীণকার শিবেন্দ্রনারায়ণ বসু, নবাব আলি সাহেব, উমানাথবালী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের প্রথম প্রথম অনুষ্ঠানে বহু বিখ্যাত বীণকার এবং ধ্রুপদীদের দেখতে পেয়েছিলাম এবং তাঁদের অদ্ভুত সাধনা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে মজঃফরপুরে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিচারকের পদ লাভ করি। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, পণ্ডিত পটবর্দ্ধন, নারায়ণরাও ব্যাস, দেওধর, ইনায়েত খাঁ, মজঃফর খাঁ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান সঙ্গীতজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

১৯২১ সাল হতে কোলকাতায় আমার সঙ্গীত অধ্যাপনার ক্ষেত্রস্থল হয়ে আছে।

ভট্টপল্লী বিদগ্ধ সমাজ কর্তৃক ১৯৫৮ সালে মানপত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্রী উপাধি লাভ করি এবং স্বাধীনতা শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনায় মানপত্র এবং 'সঙ্গীত-সুধাকর' ও 'সঙ্গীত-জ্ঞান-জলধি' এই দুটি উপাধি প্রাপ্ত হই।

১৯৩৬ সাল হতে 'সঙ্গীত-মুকুর', 'সঙ্গীত-জ্ঞান-প্রবেশ', 'সঙ্গীত ও কাহিনী', 'বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ খেয়াল,' 'কবিতাশত' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

এককালে—এসরাজ, ন্যাসতরঙ্গ, জলতরঙ্গ, শরদ, পাখোওয়াজ, বাঁওয়া-তব্‌লা প্রভৃতি যন্ত্রগুলি আমার বাল্যজীবন হতে নিয়মিত কণ্ঠ ও সেতার সাধনার স্তরে এনেছিলাম। বহুকাল হতে প্রথম দুটির সংগে কেবল এসরাজ যন্ত্রই এখনও সাধনার মাধ্যমে আছে। কোলকাতায় থাকার প্রথম সময় থেকে যে সব স্থানে শিক্ষা দিয়েছি তার মধ্যে কয়েকটির নাম—সঙ্গীত সম্মিলনী, গোখেল মেমোরিয়েল গার্ল্‌স্‌ হাইস্কুল, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন, ইউ, এম, জি, হাইস্কুল, ভায়সেসন্‌ স্কুল; সেণ্ট মার্গারেট স্কুল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, মিউজ, ও বি, মিউজের ক্লাস; স্যর বি, এল, মিত্র, নভালের জমীদার। শ্রীরামপুরের জমীদার তুলসী গোস্বামী (ভূতপূর্ব মন্ত্রী) সন্তোষের ও জলপাইগুড়ির রাজবাড়ী, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সি, সি, ঘোষ, বিচারপতি এস, কে, ঘোষ,—সি, সি, দত্ত প্রভৃতির এবং আই, সি, এস, এন হালদার,—জে, এন, গুপ্ত; ডাক্তার ৺বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ৺জে, কে, দত্ত, এফ, আর, সি, এস,—ডাঃ ৺অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী এফ, আর, সি, পি; ডাঃ গণপতি পাঞ্জা, ডাঃ ৺সুবোধ মিত্র (ক্যানসার বিশেষজ্ঞ), ডাঃ প্রবোদ বন্দ্যোপাধ্যায়,—ডাঃ চন্দ্র (অস্থি বিশেষজ্ঞ); ৺কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি।

বিবাহিত জীবনের পর সন্তানাদি আগমনের সংগে সংগে মনে সর্বদা জাগ্রত হয়ে থাকত বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের গৌরবময় ঐতিহ্যতে এবং বংশগত চর্চ্চার ধারাকে রক্ষা করে যেতেই হবে। তাই সন্তানদের এই শিক্ষাই আমার কাছে প্রধানতম আদর্শরূপে গণ্য হয়েছিল এবং অতি শৈশবকাল থেকেই পাঁচপুত্রকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে এসেছি ও আসছি। তারাও পরম আগ্রহের সহিত বিষ্ণুপুরের ওই ঐতিহ্যকে রক্ষায় সচেষ্ট ও যত্নবান হয়ে আছে এবং সেই সংগে লেখাপড়া বিদ্যাতেও।

শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের অনুরাগীদের কাছে আমার বড়পুত্র শ্রীমান অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (এম, এ,) পি, এইচ, ডি, পরিচয়ের অভাব নেই মনে করি। খেয়াল গানে সুবিখ্যাত নাম লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। 'সঙ্গীতে সৌন্দর্য্যবাদ' নামক দুরূহ বিষয়ের গবেষণা করে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

শ্রীমান কয়েক বৎসর ধরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্রীয়সঙ্গীতাধ্যাপক এবং নিয়মিত উচ্চসম্মানের বেতার শিল্পী। তাছাড়া কয়েক বৎসর পূর্ব হতে বরোদা, বোম্বাই দিল্লী প্রভৃতি স্থান হতে সঙ্গীতের আসরে আহ্বান পেয়ে আসছে। মধ্যমপুত্র শ্রীমান চিত্তরঞ্জন উচ্চ শিক্ষায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের (সরিষা-ডায়মণ্ড হারবার) সঙ্গীতাধ্যাপক ও বেতার শিল্পী। তৃতীয় পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন এম, এ, (দর্শনশাস্ত্রে) সঙ্গীতজ্ঞ, বেতারশিল্পী এবং বেতার কেন্দ্রের পদস্থ কর্মে স্থায়ী ব্রতী। চতুর্থ পুত্র শ্রীমান নীহাররঞ্জন নিখিল ভারত বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ে দুইবার শীর্ষস্থান লাভ করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৯ সালে বাংলায় এম, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। সঙ্গীত সাধনায় অগ্রসর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিখিলরঞ্জন ১৯৬৮ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বি, এস-সি (অনার্স) সিটি কলেজের ছাত্র। আমার দু'টি কন্যাও সঙ্গীত বিদ্যাশিক্ষা ও সাধনায় যথেষ্ঠ উন্নতি লাভ করেছিল। প্রত্যেকটি সন্তানেরই বাল্যজীবন হতে আমার মতই সঙ্গীতের উপর আকর্ষণ ছিল, এবং প্রত্যেকেই ওই বয়েস হতে বহু প্রতিযোগিতায় বিশেষ স্থান অধিকার করে এসেছে।

জ্যেষ্ঠপুত্র অষ্টম বর্ষ বয়েসে মজঃফরপুরের নিখিল ভারত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ ও খেয়ালে প্রথম স্থান লাভ করে সুবর্ণ পদকপ্রাপ্ত হয়েছিল। বর্ত্তমানের কয়েক বৎসর আগে থেকে উক্ত পুত্রের অনেকগুলি ছাত্রী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তি লাভ করেছেন এবং ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুম্‌রীতে নিখিল ভারত বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন তাছাড়া বেতার শিল্পীরূপেও স্থান পেয়েছেন।

আমার একমাত্র পৌত্র অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিয়রঞ্জনের অষ্টম বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান শান্তনু দাদুভাই তানপুরা বাজিয়ে ধ্রুপদ–খেয়াল গাইতে পারছে।

১৯৬৯ পর্য্যন্ত ধরে পুত্রদের বয়স যথাক্রমে—৪১ (একচল্লিশ), ৩২ (বত্রিশ), ৩০ (ত্রিশ), ২২ (বাইশ), ১৭ (সতের)। পৌত্র ১০ বৎসর। সাংক্ষেপিক পরিচয় এইখানেই সমাধা করলাম।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পুংক্তি	শুদ্ধ
৫		'হেডিং এ	৩২	১৬	শ্লোক কথা হবে না, হবে শ্রুতি
		স্বরোৎপত্তি' হবে	৩৪		স্থান নির্ণয় স্থানে দ্বিতীয়
৬	২৩	জটিল			রেখার পূর্বে '0'
৮	১৪	সারঙ্গ	৩৬	১৯	চিহ্নিত
৯	৭	'কথার' পাশে কমা	৩৯	৫	বিচারে
১২	১০	স্বরের	৪৮	২৯	রূপভাব
ঐ	১৩	অর্থের	৪৯	১৫	স্বতন্ত্র
১৩	১০	'ভরতঃ' পূর্ণচ্ছেদ	৫৫	১	গতি
ঐ	১৪	সঙ্গীত-রত্নাকর	ঐ	২৩	নিরাকরণ
১৪	১২	প্রভাব অস্তিত্বের	৫৭	৩	রূপভাব
১৭	২২	কোমল স্বর	৫৯	৪	বলেছেন
ঐ	২৫	দেখিয়ে	ঐ	২৭	মধ্যম স্বরের
১৮	২৪	রূপধর্ম্মের	৬০	২০	মন্দ্র
ঐ	৩০	'পারে না'র পর পূর্ণচ্ছেদ	৬৬	১৮	পরিণতি হয় এরপর পূর্ণচ্ছেদ
২০	২৩	'মত'র পর পূর্ণচ্ছেদ	৭৭	২৪	অর্থাৎ
ঐ	২৫	'অংশীদার' কমা	৮৩	৮	'এই এতবড়'র স্থানে শুধু
২২	৩	রূপমাধুর্য্যের			'সেই' কথাটি হবে
ঐ	৬	সময়কালীন	১৩০	১৭	স্বরটিকে
ঐ	ঐ	সময়কার	১৩১	১৭	গানে
ঐ	১০	কমলের মত	১৩২	৯	প্রভাতে
ঐ	ঐ	হাস্যবিকশিত	ঐ	১৭	ভাবগত
২৩	২৩	রাগেরস্বর	১৩৪	৫	'প-ম-গ-ঋ'র পর 'স' হবে
২৪	৫	শাস্ত্রীয় রাগ সংগীতের	১৩৬	১৫	আরোহণে গান্ধার নিষাদকে
২৬	১৮	শব্দব্রহ্মবাদী	১৪২	২	রাঢ়ভূমের
৩০	৬	অভিনিবেশ সহকারে	১৪৫	২৩	ঔড়ব-সম্পূর্ণ
ঐ	১৮	'মত'র পর পূর্ণচ্ছেদ	১৪৬	২৫	'করেন' এর পর পুর্ণচ্ছেদ

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পুংক্তি	শুদ্ধ
১৫২	৬	২য় ‘গ’ এর পর কমা থাকবে না	২৫৯	১৫	‘গাইতেন’ পূর্ণচ্ছেদ হবে না
১৭৮	৭	প্রথমে কোমল কথা বসবে	ঐ	২৯	বৎসর
১৯৮	৭	রূপসম্পর্ক	২৬০	৩০	যন্ত্রেরবাজ
২০৯	৩	‘স-গ-ম’ এর পর ‘ধ’ হবে	২৬১	৭	গাইতে,
২২১	১৬	‘আছে’ পূর্ণচ্ছেদ হবে না।	ঐ	২২	ইত্যাদির সংগে
২২৩	৩	নেই,	২৬২	৫	প্যারা হবে না
ঐ	৪	স্বাদমাধুর্য্য	ঐ	৯	সারঙ্গ
ঐ	৯	পশ্চিমরাজ্যে	ঐ	১১	১০ পুংক্তির সংগে যুক্ত
২২৭		হেডিং এ দুই শ্রেণী হবে			থাকবে
২২৯	১৯	করেন-পূর্ণচ্ছেদ হবে না।	২৬৩	৫	লেখা নেই এর পর বন্ধনী চিহ্ন
২৩২	২০	তিনমাত্রা			হবে।
২৩৩	১২	আকারমাত্রিক	ঐ	৬	‘বাহাদুরসেনকে’ এক কথায়
২৩৮	২০	আলেয়াফতে			হবে
২৫৩	১৫	তার গতি ধারা	ঐ	৭	বিষ্ণুপুরে
ঐ	১৬	ধারা কথা বাদ যাবে এবং	ঐ	১১	আসার
		বন্ধনী হবে না।	ঐ	১২	বাহাদুরসেন
২৫৪	৫	প্যারা হবে না	ঐ	১৭	বাহাদুরসেনকে
ঐ	১৭	শেষে পূর্ণচ্ছেদ	২৬৪	১৮	আছে,
ঐ	২৪	‘সামবেদীয় সঙ্গীতেরই’	ঐ	১৮	মহারাজ দ্বিতীয়
		যুক্ত হয়ে থাকবে।	ঐ	২২	থাকেন,
ঐ	২৭	চর্চ্চা	ঐ	২৩	রহিম
২৫৫	২	বৎসর আগের	২৬৫	১১	প্রতিষ্ঠাবান
২৫৬	৭	পণ্ডিত	ঐ	১৫	ভুলের পরিবর্ত্তে মূল্য হবে
ঐ	৮	পণ্ডিতদের	২৬৬	১৪	সাধন
২৫৭	২৫	গীতপদ্ধতিতে	ঐ	২৩	এসেছিলাম!
২৫৮	৫	সৃষ্টির	ঐ	২৪	হয়নি,
ঐ	২২	সঙ্গীত বিদ্যার	ঐ	২৬	আসেন
২৫৯	১	বিষ্ণুপুরে	ঐ	২৭	পারেন

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পুংক্তি	শুদ্ধ
২৬৬	৩০	প্যারা হবে না	ঐ	২৩	বিষ্ণুপুরের
২৬৭	৭	গাউয়্যারা তো	ঐ	২৪	বড়ুচণ্ডিদাস
ঐ	১৬	প্যারা হবে না	ঐ	২৫	পুঁথি বা গ্রন্থগুলি
২৬৮	২১	ওই যন্ত্রবাদক	ঐ	২৬	এখনও
ঐ	২৬	বাজাতে,	২৭৮	১০	সন্নিবেশিত হত,
২৬৯	৫	বোল পরম,	২৭৯	১০	প্যারা হবে না
ঐ	১৫	পরিচয়	ঐ	১৩	প্যারা হবে না
২৭১	৪	দরদ্‌মাখান	ঐ	২২	বলে,
২৭২	৭	প্যারা হবে না	২৮০	২	পূর্ণচ্ছেদ
ঐ		গানে ধন্যা এবং মান্যা হবে	ঐ	৩	প্যারা হবে না
২৭৪	৩	ধার্ম্মিক	২৮১	১২	আকারে
ঐ	২২	ভাইএরই	ঐ	২০	‘এই’ কথা বাদ যাবে
ঐ	২৩	গোবিন্দ জীউ	২৮২	২০	শুনাবার
ঐ	২৭	প্রকোপত্ত	২৮৩	২২	এস-এন হালদার
২৭৬	১০	সঙ্গীত শাস্ত্রের	ঐ	১৯	নড়ালের
ঐ	ঐ	আরোহণ	২৮৪	১	এম, এ, পি-এইচ-ডি,
ঐ	১১	অবরোহণ			বন্ধনী মধ্যে
ঐ	২০	আগ্রহের উপর	ঐ	৫	প্যারা হবে না
২৭৭	১০	সঙ্গীতসংস্কৃতি	ঐ	২২	দশমবর্ষীয়
ঐ	২০	বলেন,			

দু'টি মানপত্র—

(১)

ভারতবিশ্রুত-গীত-বাদ্য কলাবিৎ পরমাদরণীয়—
শ্রীমৎ সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ায়—
প্রদীয়মাণং মানপত্রম্ ।

সঙ্গীতশাস্ত্র বিধিসঙ্গত শুদ্ধধারাং
গঙ্গাতরঙ্গ সরণীমিব ধারয়ন্ যঃ
ষড়্‌রাগ গীতি বহুবাদ্যকলাজ্ঞ ! স ত্বং
হে সত্যকিঙ্কর ! নবোদিত শঙ্করোঽসি ॥

গোপেশ্বরাদি বহুসাধকসিদ্ধ বংশে—
জাতস্ত্বমিন্দুরিব সিন্ধুসমে দ্বিজন্মা ।
গীতস্য মর্মসরহস্যমহো ! প্রকাশ্য
গ্রন্থাবলী মমলরত্ন ততিং ত নোষি ॥

অদ্য প্রমোদভর বিহ্বল ভট্টপল্লী—
বিদ্বদগণৈরিহতু বঙ্কিমচন্দ্রতীর্থে ।
"সঙ্গীতশাস্ত্রি"—পদপূতমুপাধিরত্নং
তুভ্যং সযত্ন মুপদীক্রিয়তে গৃহাণ ॥

নৈহাটী সঙ্গীতপরিষৎ পক্ষত স্তদ্‌গুণ পক্ষপাতি—
ভট্টপল্লী বিদ্বদ্ভিরূপকল্পিতম্ ॥

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ দেবশর্মভিঃ
শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্মভিরিত্যাদি ॥

বাং ১৩৬৪।পৌষ

—:*:—

স্বাধীনতা-সংগ্রাম-শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতা দশম বার্ষিকী-

উৎসব উপলক্ষে

সঙ্গীত সুধাকর

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে—

হে সঙ্গীতাচার্য্য,

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শতবর্ষ পূর্ত্তি ও স্বাধীনতা-দশম বার্ষিকী উৎসবের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র দিবসের এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলাবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। আপনি গ্রহণ করুন-আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

হে সঙ্গীত-জ্ঞান-জলধি,

আপনার জীবনের সার্থকতা-একাগ্র-সাধনার অতুলনীয় কৃতিত্ব, আপনার সুর মাধুর্য্য-একাধারে সঙ্গীতে ও যন্ত্রে আপনার অসামান্য প্রতিভা শুধু বাঁকুড়া-জেলাবাসীর নয়—সমস্ত বাংলা তথা ভারতের গৌরব।

হে সুর-তান-লয়মহার্ণব,

আপনার আদর্শ সঙ্গীত শিক্ষার্থিদের অনুসরণীয় হোক্, সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয় আনন্দিত হোক্।

আপনার জীবন কল্যাণময় হোক্। আপনার দীর্ঘ জীবন-লাভে সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয়ে আপনার চিন্তাধারা, কলাকৌশল, অভিজ্ঞতা প্রচারিত হোক্, পরম-কারুণিক জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

ইং ১৬-৮-৫৭
বাঁকুড়া।

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির
সভ্যগণ।

आम्रा
भरतनिधि,